মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী

আত্মকথা

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ গুহ অনূদিত

গান্ধী স্মারক নিধি
বাংলা

	বিষয়	পৃষ্ঠা
	পঞ্চম ভাগ	
১	প্রথম অনুভব	৩৮৫
২	গোখেলের কাছে পুনায়	৩৮৭
৩	ধমক ?	৩৮৯
৪	শান্তিনিকেতন	৩৯২
৫	তৃতীয় শ্রেণীর লাঞ্ছনা	৩৯৫
৬	চাইলাম, পাইলাম না	৩৯৭
৭	কুম্ভমেলা	৩৯৯
৮	লক্ষ্মণঝোলা	৪০৩
৯	আশ্রম স্থাপন	৪০৭
১০	কষ্টিপাথরে	৪০৯
১১	গিরমীট প্রথা রদ	৪১২
১২	নীলের দাগ	৪১৬
১৩	বিহারী সরলতা	৪১৯
১৪	অহিংসার দর্শন	৪২২
১৫	মোকদ্দমা তুলিয়া লইল	৪২৫
১৬	কার্যপদ্ধতি	৪২৮
১৭	সঙ্গীদের সম্বন্ধে	৪৩১
১৮	গ্রামপ্রবেশ	৪৩৪
১৯	উজ্জ্বল দিক	৪৩৬
২০	শ্রমিকের সংসর্গে	৪৩৮
২১	আশ্রমে উঁকি	৪৪০
২২	উপবাস	৪৪২
২৩	খেড়া সত্যাগ্রহ	৪৪৬
২৪	'পেয়াজ-চোর'	৪৪৭
২৫	খেড়া লড়াইয়ের অন্ত	৪৫০
২৬	একতার আকৃতি	৪৫১
২৭	সেনা সংগ্রহ	৪৫৪
২৮	মরিতে মরিতে	৪৬১
২৯	রাউলট অ্যাক্ট ও আমার ধর্মসংকট	৪৬৫
৩০	সেই আশ্চর্য দৃশ্য	৪৬৮
৩১	সেই সপ্তাহ—১	৪৭১
৩২	সেই সপ্তাহ—২	৪৭৬
৩৩	পর্বতপ্রমাণ ভুল	৪৭৯
৩৪	'নবজীবন' ও 'ইয়ং ইণ্ডিয়া'	৪৮১
৩৫	পঞ্জাবে	৪৮৪
৩৬	খিলাফতের বদলে গো-রক্ষা	৪৮৭
৩৭	অমৃতসর কংগ্রেস	৪৯১
৩৮	কংগ্রেসে প্রবেশ	৪৯৪
৩৯	খাদির জন্ম	৪৯৭
৪০	মিলিল	৪৯৯
৪১	কথোপকথন	৫০২
৪২	অসহযোগ প্লাবন	৫০৪
৪৩	নাগপুরে	৫০৭
৪৪	পূর্ণাহুতি	৫০৯

চিত্রসূচী

	বিষয়	পৃষ্ঠা
১	মহাত্মা গান্ধী	প্রারম্ভে
২	ছাত্রাবস্থায় বিলাতে	”
৩	বোঅর যুদ্ধ ও জুলু 'বিদ্রোহ'-কালে ভারতীয় অ্যাম্বুলেন্স বাহিনীর নায়করূপে	২২৪
৪	দক্ষিণ আফ্রিকা সত্যাগ্রহ সংগ্রামের নায়করূপে	২২৪
৫	১৯১৫ সনে ভারতে প্রত্যাবর্তনের পর (কস্তুরবা সহ)	৩৯২
৬	খেড়া সত্যাগ্রহ কালে	৩৯২

গান্ধী স্মারক নিধি (বাংলা)-র প্রকাশিত পুস্তকাবলী

গীতাবোধ (২য় সংস্করণ)
সর্বোদয়
পঞ্চায়েত-রাজ
আমার সমাজবাদ
নারী ও সামাজিক অবিচার (৩য় সং)
সত্যই ভগবান (২য় সং)
পল্লী-পুনর্গঠন (২য় সং)
অহিংসার পথে বিশ্বশান্তি
উৎপাদক শ্রম
অছিবাদ
মোহনমালা
মহাত্মা গান্ধী (জীবনী)
গান্ধীজীর অর্থনৈতিক দর্শন
মহাত্মাজীর গঠনকর্ম-পদ্ধতি
সর্বোদয়ের পথ
সর্বোদয় ও শাসনমুক্ত সমাজ
কর্মের সন্ধান
গান্ধী-রচনা-সংকলন

অনুবাদের কথায়

মূল অনুসরণ করা হইয়াছে। তা-ই স্বাভাবিক আর সহজও বটে কারণ গুজরাটী ও বাংলা একই মায়ের দুহিতা সুতরাং সমতা অনেক। তা বলিয়া ইংরেজী অনুবাদ উপেক্ষা করা হয় নাই কেন না উপেক্ষা করার জো নাই। ইংরেজী অনুবাদকে আত্মকথা-র সংশোধিত সংস্করণ বলা যাইতে পারে এবং বস্তুত তা-ই। লেখার পরে মূল দেখার সুযোগ পূজ্য গান্ধীর হয় নাই। এখানে স্মরণ রাখিতে হইবে যে আত্মকথা কোন এক স্থানে বসিয়া গান্ধীজী লেখেন নাই। যখন যেখানে যাইতেন সেখান হইতে বা ট্রেনে চলিতে চলিতে সপ্তাহে সপ্তাহে সময়মত নবজীবন-এর জন্য কপি পাঠাইতে হইত। তাই প্রুফ দেখার সুযোগ তাঁর ছিল না। কিন্তু ইংরেজী অনুবাদের কপি দেখিয়া দেওয়ার সুযোগ তাঁর ছিল। অনুবাদক মহাদেব দেশাই যখন যেখানে তিনি যাইতেন তাঁর সঙ্গেই থাকিতেন। অনুবাদকের মুখবন্ধে মহাদেব দেশাই বলিয়াছেন যে পূজ্য গান্ধী অনুবাদ সংশোধন করিয়া দিতেন। কোন প্রসঙ্গে মহাত্মা গান্ধী নিজেই এই কথা বলিয়াছেন। এই সেই কথা :

> "যদ্যপি অনুবাদ আমার নয় তথাপি শব্দটির প্রয়োগের দায়িত্ব আমার এড়াবার উপায় নাই, কারণ প্রায় সর্বস্থলে আমি অনুবাদ সংশোধন করে দিই, এবং প্রাসঙ্গিক বিশেষণটির (volatile) প্রয়োগ করা সঙ্গত হবে কিনা, মনে পড়ে, সে সম্বন্ধে মহাদেব দেশাইর সঙ্গে আমার আলোচনা হয়েছিল। Volatile, violent and fanatical এই তিনটির একটি আমাদের বাছাই করে নেওয়ার ছিল। শেষের দুইটি বড় বেশি কঠোর মনে হয়েছিল। মহাদেব volatile বেছে নেয় এবং আমি তা পাস করে দিই। কিন্তু শব্দটির আভিধানিক অর্থ মহাদেবের কি আমার মনের পটে ছিল না।"

কৌতূহলী পাঠক ২৪৬ পৃষ্ঠার পাদটীকায় গান্ধীজীর নিজের কথায় প্রসঙ্গটির মুখ্য অংশ দেখিতে পাইবেন।

দেখা যাইতেছে গান্ধীজী ইংরেজী অনুবাদ কেবল দেখিয়াই দিতেন না, ভাল করিয়া দেখিয়া দিতেন, অতএব এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যাইবে

যে স্থলবিশেষে মূল অপেক্ষা ইংরেজী অনুবাদ অধিক প্রামাণিক। অতএব আত্মকথা-র যে দুই জায়গায় (পৃ. ২১৩ ও পৃ. ৫১০) মূলে ও ইংরেজী অনুবাদে তথ্যের অমিল দেখা যায় সেখানে আসল পাঠে ইংরেজীর তথ্য দিয়া পাদটীকায় মূলের তথ্য সন্নিবেশ করা হইয়াছে। দুই এক জায়গায় মনে হইয়াছে ইংরেজী অনুবাদে ভাব ভাল ফুটিয়াছে। সেই সেই জায়গায় ইংরেজীর অনুসরণ করা হইয়াছে। কোন কোন স্থানে মূল ও ইংরেজী দুই-ই যথাক্রমে আসল পাঠে ও পাদটীকায় দেওয়া হইয়াছে।

প্রায় সর্বত্র ইংরেজীর অনুচ্ছেদ-ভাগ অনুসরণ করা হইয়াছে।

আত্মকথা বালবোধ সন্তভাষায় রচিত। বালক ও নিরক্ষর বা অল্পাক্ষর নরনারী বুঝিতে পারে এই দৃষ্টিতে এই বই লেখা। পারতপক্ষে পূজ্য গান্ধী সন্ধিনিষ্পন্ন শব্দ বা সমাস ব্যবহার করেন নাই। তাঁর শব্দ ও বাক্যবিন্যাস যতদূর সম্ভব অক্ষুণ্ণ রাখা হইয়াছে।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মাইতি পাণ্ডুলিপি দেখিয়া দিয়াছেন। ত্রুটি দর্শাইয়াছেন। তাঁর কাছে আমি ঋণী।

১৯৬০ শ্রীবীরেন্দ্রনাথ গুহ

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
অনুবাদের কথায়	৵
প্রস্তাবনা	১

প্রথম ভাগ

	বিষয়	পৃষ্ঠা
১	জন্ম	৮
২	বাল্যকাল	৯
৩	বাল-বিবাহ	১২
৪	পতিত্ব	১৫
৫	হাইস্কুলে	১৮
৬	দুঃখদ প্রসঙ্গ—১	২২
৭	দুঃখদ প্রসঙ্গ—২	২৬
৮	চুরি ও প্রায়শ্চিত্ত	৩০
৯	বাবার মৃত্যু : আমার ডবল কলঙ্ক	৩৩
১০	ধর্মের ঝিলিক	৩৫
১১	বিলাত যাত্রার তোড়জোড়	৩৯
১২	একঘরে	৪৪
১৩	অবশেষে বিলাতে	৪৬
১৪	পছন্দ	৫০
১৫	সভ্য বেশে	৫৩
১৬	অদলবদল	৫৭
১৭	খাদ্যের পরীক্ষা-প্রয়োগ	৬০
১৮	লাজুকতা আমার ঢাল	৬৪
১৯	অসত্যের কীট	৬৮
২০	ধর্মের পরিচয়	৭২
২১	বলহীনের বল রাম	৭৬
২২	নারায়ণ হেমচন্দ্র	৭৮
২৩	মহাপ্রদর্শনী	৮২
২৪	ব্যারিস্টার ত হইলাম—তার পর ?	৮৪
২৫	অসহায় ভাব	৮৭

দ্বিতীয় ভাগ

	বিষয়	পৃষ্ঠা
১	রায়চন্দ ভাই	৯৩
২	সংসার-প্রবেশ	৯৬
৩	প্রথম কেস	৯৯
৪	প্রথম আঘাত	১০২
৫	দক্ষিণ আফ্রিকার প্রস্তুতি	১০৬
৬	নাতালে পৌঁছিলাম	১০৮
৭	অভিজ্ঞতার নমুনা	১১২
৮	প্রিটোরিয়াব পথে	১১৫
৯	আরও দুর্ভোগ	১১৯
১০	প্রিটোরিয়ায় প্রথম দিন	১২৪
১১	খ্রীস্টানদের সংস্পর্শে	১২৮
১২	ভারতীয়দের সঙ্গে পরিচয়	১৩২
১৩	'কুলি' হওয়ার বিড়ম্বনা	১৩৫
১৪	কেস তৈরী	১৩৮
১৫	ধর্মীয় মন্থন	১৪১
১৬	'কো জানে কল কী ?'	১৪৫
১৭	নাতালে থাকিয়া গেলাম	১৪৮
১৮	রঙের বাধা	১৫২
১৯	নাতাল ইণ্ডিয়ন কংগ্রেস	১৫৬
২০	বালাসুন্দবম	১৬০
২১	তিন পাউণ্ড কর	১৬২
২২	ধর্মনিরীক্ষণ	১৬৫
২৩	ঘর-সংসাব	১৬৯
২৪	দেশ অভিমুখে	১৭২
২৫	ভারতবর্ষে	১৭৫
২৬	দুই আকৃতি	১৭৯
২৭	বোম্বাইর সভা	১৮২
২৮	পুনায় ও মাদ্রাজে	১৮৫
২৯	'জলদি ফিরে আসুন'	১৮৮

তৃতীয় ভাগ

	বিষয়	পৃষ্ঠা
১	ঝড়ের পূর্বাভাস	১৯৩
২	ঝড়	১৯৫
৩	পরীক্ষা	১৯৯

	বিষয়	পৃষ্ঠা
৪	বাদল কাটিয়া গেল	২০৩
৫	বালকদের শিক্ষা	২০৬
৬	সেবাবৃত্তি	২০৯
৭	ব্রহ্মচর্য—১	২১২
৮	ব্রহ্মচর্য—২	২১৫
৯	সরল জীবন	২১৯
১০	বোঅর যুদ্ধ	২২২
১১	স্বাস্থ্য-ব্যবস্থার উন্নতি ও দুর্ভিক্ষত্রাণ	২২৪
১২	দেশগমন	২২৬
১৩	দেশে	২৩০
১৪	কেরানী ও 'বেয়ারা'	২৩৩
১৫	কংগ্রেসে	২৩৫
১৬	লর্ড কার্জন-এর দরবার	২৩৭
১৭	গোখেলের সঙ্গে এক মাস—১	২৩৯
১৮	গোখেলের সঙ্গে এক মাস—২	২৪২
১৯	গোখেলের সঙ্গে এক মাস—৩	২৪৫
২০	কাশীতে	২৪৯
২১	বোম্বাই-এ বসিলাম	২৫২
২২	ধর্মসংকট	২৫৫
২৩	আবার দক্ষিণ আফ্রিকায়	২৫৮
	চতুর্থ ভাগ	
১	যা কিছু লাভ সব বরবাদ	২৬৩
২	এশিয়ার নবাব দক্ষিণ আফ্রিকায়	২৬৫
৩	অপমান হজম করিলাম	২৬৮
৪	বাড়ন্ত ত্যাগবৃত্তি	২৭০
৫	আত্মনিরীক্ষণের ফল	২৭২
৬	নিরামিষ আহারের জন্য ত্যাগ	২৭৫
৭	মাটি ও জলের প্রয়োগ	২৭৭
৮	সাবধান	২৭৯
৯	জুলুমবাদের সহিত টক্কর	২৮২
১০	এক পবিত্র স্মৃতি ও প্রায়শ্চিত্ত	২৮৫
১১	ইংরেজদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে—১	২৮৭
১২	ইংরেজদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে—২	২৯০
১৩	'ইণ্ডিয়ন ওপিনিয়ন'	২৯৩
১৪	'কুলী-লোকেশন' বা হাড়ী-পাড়া	২৯৬
১৫	মড়ক—১	২৯৯
১৬	মড়ক—২	৩০২
১৭	লোকেশন ভস্মসাৎ	৩০৫
১৮	একখানি বই-এর জাদুপ্রভাব	৩০৭
১৯	ফিনিক্স-এর পত্তন	৩০৯
২০	প্রথম রাত	৩১২
২১	পোলক ঝাঁপ দিলেন	৩১৪
২২	রাখে কৃষ্ণ মারে কে?	৩১৭
২৩	সংসারে হেরফের : বালশিক্ষা	৩২০
২৪	জুলু 'বিদ্রোহ'	৩২৪
২৫	হৃদয়মন্থন	৩২৬
২৬	সত্যাগ্রহের জন্ম	৩২৯
২৭	খাদ্যের আরও পরীক্ষা	৩৩১
২৮	পত্নীর দৃঢ়তা	৩৩৩
২৯	ঘরোয়া সত্যাগ্রহ	৩৩৬
৩০	সংযমের দিকে	৩৩৯
৩১	উপবাস	৩৪১
৩২	শিক্ষকরূপে	৩৪৪
৩৩	অক্ষরজ্ঞান	৩৪৬
৩৪	আত্মিক শিক্ষা	৩৪৯
৩৫	ভালমন্দে	৩৫১
৩৬	প্রায়শ্চিত্তে উপবাস	৩৫৩
৩৭	গোখেল সাক্ষাৎকার	৩৫৫
৩৮	যুদ্ধে যোগ	৩৫৭
৩৯	এক ধর্মসমস্যা	৩৫৯
৪০	খুদে সত্যাগ্রহ	৩৬২
৪১	গোখেলের উদারতা	৩৬৬
৪২	ফুসফুস প্রদাহ কিভাবে সারে	৩৬৮
৪৩	রওনা	৩৭০
৪৪	আমার ওকালতি	৩৭২
৪৫	চালাকি ?	৩৭৫
৪৬	মক্কেল হয় সহকর্মী	৩৭৬
৪৭	মক্কেল কিভাবে জেল হইতে বাঁচে	৩৭৮

প্রস্তাবনা

চার কি পাঁচ বছর আগেকার কথা : অতি নিকট সাথীরা ধরিয়া বসেন আত্মকথা লিখিতে হইবে। স্বীকার করি। আর আরম্ভও করি। ফুলস্কেপের এক পৃষ্ঠাও পুরা হয় নাই, বোম্বাইতে দাঙ্গা বাধে। আর তখনকার মত ওই কাজটায় ছেদ পড়ে। তার পরে একের পর এক এমন সব ব্যাপার ঘটে যার ফলে য়রবডা জেলে গিয়া পৌঁছি। ভাই জয়রামদাসও তখন ওই জেলে। তিনি আমাকে বলেন অন্য কাজ এখন তোলা থাক, আগে আপনি আত্মকথা লিখুন। তাকে বলি যে আমার কার্যক্রম অর্থাৎ পাঠক্রম ঠিক হইয়া গিয়াছে, তা শেষ না হইলে আত্মকথা আরম্ভ করা যাইবে না। পুরা জেল খাটার সৌভাগ্য যদি হইত আত্মকথা সেখানেই লিখিতে পারিতাম। শুরু-করা কাজ শেষ হইতে তখন এক বছর বাকী ছিল ত জেল হইতে খালাস হই। স্বামী আনন্দ আবার ওই প্রস্তাব করেন। দক্ষিণ আফ্রিকার সত্যা-গ্রহের ইতিহাস লেখা তখন শেষ হইয়া গিয়াছিল, তাই আত্মকথা লেখার লোভ হয়। স্বামী আনন্দের ইচ্ছা ছিল, পুরাটা আমি লিখিয়া ফেলি, আর তা পুস্তকাকারে ছাপা হোক। কিন্তু একটানা এতটা সময় আমার নাই। লিখি ত 'নবজীবন'-এর জন্য লিখিতে পারি। 'নবজীবন'-এর জন্য কিছু ত আমার লিখিতে হয়ই। তবে আত্মকথা নয় কেন? আমার এই প্রস্তাব স্বামী মানিয়া নেন। আত্মকথা লেখার পালা শুরু হয়।

সংকল্প ত করিলাম কিন্তু কোন শুদ্ধাচারী সঙ্গী আমার মৌন দিবস সোমবারে কোমল কণ্ঠে আমায় বলেন, 'আত্মকথা আপনি লিখতে যাচ্ছেন। এ ত পশ্চিমের রীত। পূবের কেউ লিখেছেন বলে জানি নে। যদি বা লিখে থাকেন ত পশ্চিমের প্রভাবে লিখেছেন। আর আপনি লিখবেনই বা কি? সিদ্ধান্ত বলে আজ যা মানছেন কাল যদি তা মানতে আপনার আটকায়? অথবা ধরুন, যে সব সিদ্ধান্ত অনুসারে আপনি এখন নানা কাজ করছেন সেই সিদ্ধান্তই যদি আপনাকে বদলাতে হয় বা তাতে হেরফের করতে হয়? আপনার কথা ও লেখা বহুলোকের কাছে বেদবাক্যস্বরূপ আর সে মতে তারা

চলে। সে স্থলে তারা ভুল পথে চালিত হবে না কি? অতএব আত্মকথার মত কিছু না লেখাই সংগত নয় কি? আর লিখলেও এখন ত নয়ই।'

কথাটা একেবারে উড়াইয়া দেওয়া যায় না। কিন্তু আমি কি আত্মকথা লিখিতেছি? সত্যের যে সব প্রয়োগ-পরীক্ষা করিয়াছি আত্মকথার বাহানায় সেই কথাই না আমি বলিতে যাইতেছি। তবে এ কথা ঠিক যে, এই সব প্রয়োগ-পরীক্ষা আমার জীবনের টানা-প'ড়েন বলিয়া উহাদের কথা জীবন-বৃত্তান্তেরই শামিল হইবে। কিন্তু এই কথার প্রতি পৃষ্ঠায় যদি আমার পরীক্ষা-প্রয়োগের ছবি ঠিক ঠিক ফুটিয়া ওঠে তবে এই কথাকে আমি নিজে নির্দোষ বলিয়া গণনা করিব। আমার বিশ্বাস (অবশ্য এটা আমার মোহও হইতে পারে) এই যে, আমার প্রয়োগের কথা আগাগোড়া সবটা লোকের সামনে ধরিলে উপকার হইবে। রাজনীতি ক্ষেত্রে আমার এই সব পরীক্ষা-প্রয়োগের কথা ভারত ত জানেই, যাকে 'সভ্য' জগৎ বলা হয় সেই জগৎও কিছুটা জানে। এই সকল রাজনৈতিক প্রয়োগের মূল্য আমার কাছে বড় একটা নাই। আর তাই এই সকল প্রয়োগের ফলে যে 'মহাত্মা' পদবী আমি পাইয়াছি তার মূল্য আমার কাছে আরও কম। কত সময়ই না এই বিশেষণ কাঁটার মত আমাকে বিঁধিয়াছে। আমার মনে পড়ে না এই বিশেষণের দরুন ক্ষণেকের তরেও আমি অভিমানে স্ফীত হইয়াছি। কিন্তু আমার নানা আধ্যাত্মিক প্রয়োগের কথা যাহা কেবল আমিই জানি আর যাহা হইতে রাজনীতি ক্ষেত্রে কাজ করার শক্তি আমি লাভ করিয়াছি তাহা বর্ণনা করার আগ্রহ অবশ্যই আমার আছে। সত্যসত্যই যদি এই সকল প্রয়োগ আধ্যাত্মিক হয় তবে সেখানে নিজ ঢাক পেটানোর স্থান নাই। নম্রতাই শুধু উহাতে বাড়িতে পারে। যতই চিন্তা করি, পিছনের দিকে যতই তাকাই, নিজের তুচ্ছতা আমি ততই স্পষ্ট দেখিতে পাই।

আমার চাই আত্মদর্শন, ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার, মোক্ষ, আর তার জন্যই না ত্রিশ বছর ধরিয়া আমার আকুল আতুর সাধনা চলিতেছে। আমার ওঠা বসা, লেখা বলা, রাজনীতির ঝামেলা পোয়ানো সব কিছুই এই জন্য। আমি চিরদিন বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছি যে, একে যা করিতে পারে অন্য সকলেও তা করিতে পারে। তাই আমার কোন প্রয়োগই আমি নিজের মত করি নাই আর তা আমার নিজের থাকেও নাই। সকলের চোখের ওপর এই সব প্রয়োগ চলিতেছে বলিয়া তাদের আধ্যাত্মিক মূল্য কম এ কথা আমি

মনে করি না।* এমন কতকগুলি বস্তু আছে যা কেবল অন্তরাত্মাই জানে আর জানে তার স্রষ্টা পরমাত্মা। তা অন্যের কাছে ধরার কোনই উপায় নাই। যে সকল প্রয়োগের কথা বলিতে যাইতেছি তা তেমন নহে। তাদের আধ্যাত্মিক অথবা নৈতিক বলাই অধিক সংগত হইবে; কেন না নীতিনিষ্ঠাই ধর্মের প্রাণ।

অতএব আমি এমন সব আধ্যাত্মিক কথা আত্মকথায় বর্ণনা করিব যা বালক, যুবক, বৃদ্ধ সকলে বুঝিতে পারে ও করিতে পারে। এই কথা যদি আমি নিরভিমানে নির্লিপ্তভাবে লিখিতে পারি তবে অন্য প্রয়োগকারীরা তাহা হইতে আগাইয়া যাওয়ার পাথেয় পাইবেন। এই সকল প্রয়োগের বিষয়ে আমি কোনরূপ পূর্ণতা দাবি করি না। এখানে আমার ভূমিকা বিজ্ঞানীর ভূমিকায় ন্যায়: বিজ্ঞানী অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা করিয়া যথানিয়মে নিখুঁত যত্নে পরীক্ষা চালান, তবু কিন্তু তাহা হইতে উৎপন্ন সিদ্ধান্তকে তিনি অন্তিম বলেন না, এবং নিজ সিদ্ধান্তের নির্ভুলতা সম্বন্ধে নিঃসংশয় হইলেও তিনি তাঁর মন খোলা রাখেন। আমি খুব আত্মনিরীক্ষণ করিয়াছি, প্রতিটি ভাবনাকে যাচাই করিয়া লইয়াছি, তন্ন তন্ন করিয়া উহার দোষগুণ বিচার করিয়াছি, কিন্তু তাহা হইতে উৎপন্ন সিদ্ধান্ত যে অন্য সবের পক্ষেও শেষ কথা, তাহা সত্য অথবা তাহাই সত্য, এই দাবি আমি মোটেই করি না। তবে আমার দৃষ্টিতে যে এই সব সত্য আর এই ক্ষণে অন্তিম বলিয়া মনে হয় এই কথা আমি অবশ্যই বলি। তা না হইলে তদনুসারে আমার কোন কাজ উচিত নয়। কি গ্রাহ্য আর কি ত্যাজ্য এই বিচার আমি পদে পদে করিয়াছি ও সেই মতে চলিয়াছি, এবং যত দিন আমার কার্য আমার বুদ্ধির অর্থাৎ আত্মার বিচারে ত্যাজ্য মনে না হইবে ততদিন আমি আমার সিদ্ধান্ত অনুসারে চলিতে থাকিব।

নিছক তাত্ত্বিক আলোচনাই উদ্দেশ্য হইত ত আত্মকথা না লেখাই সংগত হইত। কিন্তু এইসব তত্ত্ব বা সিদ্ধান্তকে কার্যে রূপ দেওয়ার কথাই না আমি বলিতে যাইতেছি। আর তাই ত এই কথার নাম আমি দিয়াছি 'সত্যের

* এখানে মূল অনুসরণ না করিয়া ইংরাজী অনুবাদ অনুসরণ করা গেল। মূলে এইরূপ আছে: অবশ্য এমন কতকগুলি বস্তু আছে যা আত্মাই জানে, আত্মাই যা ধারণ করিতে সক্ষম। এরূপ বস্তু লোকের কাছে ধরার শক্তি আমার নাই। আমার প্রয়োগে আধ্যাত্মিক অর্থে নৈতিক, ধর্ম অর্থে নীতি, আত্মার দৃষ্টিতে আচরিত নীতি বুঝিতে হইবে।—অনুবাদক

প্রয়োগ' ওরফে আত্মকথা। অহিংসা, ব্রহ্মচর্য ইত্যাদি যে সব ব্রতকে সত্য হইতে আলাদা মনে করা হয় সেই সবের প্রয়োগের কথাও এতে আসিয়া যাইবে। কিন্তু আমার কাছে সত্য সর্বাগ্রে আর অন্য অগণিত বস্তু তার পরে। এই সত্য স্থূল অর্থাৎ বচনের সত্য নহে। ইহা যেমন বচনের সত্য তেমন বিচারেরও। ইহা আমার মনগড়া আপেক্ষিক সত্য নয়, ইহা স্বতন্ত্র শাশ্বত (মূলে 'চিরস্থায়ী' শব্দ আছে—অনুবাদক) সত্য অর্থাৎ স্বয়ং পরমেশ্বর। পরমেশ্বরের অনন্ত নাম কারণ তাঁর বিভূতি অনন্ত। এই সব বিভূতিতে আমার তাক লাগে; ক্ষণেকের জন্য আমি বিভোর হইয়া যাই। তবুও পূজারী আমি সত্যরূপী পরমেশ্বরেরই। তিনিই একমাত্র সত্য, অন্য সব কিছু মিথ্যা। এই সত্যের দর্শন আমি পাই নাই; সেই সাধনা আমি করিতেছি। তাঁর দর্শন লাভের জন্য আমি আমার সর্বাধিক প্রিয় বস্তু ত্যাগ করিতে প্রস্তুত আছি, আর আমার বিশ্বাস সেজন্য প্রাণ দিতে হয় ত তাও আমি দিতে পারিব। কিন্তু যতদিন এই পরা সত্যের সাক্ষাৎ না পাইতেছি ততদিন আমার অন্তরাত্মা যাকে সত্য বলিয়া মানিবে সেই কাল্পনিক সত্যকে অবলম্বন করিয়া, আলোকস্তম্ভ মনে করিয়া আমি তার আশ্রয়ে জীবন অতিবাহিত করিব।

জানি, এই পথে চলা আর খাড়ার ধারের ওপর দিয়া চলা একই কথা, তবুও আমার কাছে এই পথ বরাবর যারপরনাই সহজ মনে হইয়াছে। চলিতে চলিতে এই পথে আমার ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর ভুলও আমার কাছে নগণ্য মনে হইয়াছে। এই পথ আমায় পতন হইতে রক্ষা করিয়াছে আর আমার বিশ্বাস-মতে আমি আগাইয়া চলিয়াছি। এই অগ্রগতির পথে সময় সময় দূর, অতি দূর হইতে আমি পরম সত্যের—ঈশ্বরের—চকিত দর্শন লাভ করিয়াছি। সত্যই সব, সত্য বই এই জগতে আর কিছু নাই এই বিশ্বাস দিন দিন আমার বাড়িতেছে। এই বিশ্বাস কিরূপে দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হইয়াছে সে কথা জানিয়া আমার জগৎ অর্থাৎ 'নবজীবন' ইত্যাদির পাঠক যদি আমার প্রয়োগে যোগ দেন এবং সেই পরম সত্যের চকিত দর্শন লাভের নিমিত্ত আমার সাধনায় আমার সঙ্গী হন তবে তা কতই না সুখের হইবে। আমি যা করিতে পারি বালকও তা করিতে পারে এই বিশ্বাসও আমার দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে, আর এই বিশ্বাসের মূলে সবল কারণও আমার আছে। সত্য উপলব্ধির পথ যেমন কঠিন তেমনই সহজ। অভিমানীর কাছে তা নেহাত অসম্ভব মনে হইতে পারে, আর নির্দোষ বালকের কাছে নিতান্ত সম্ভব।

সত্যের সাধকের ধূলিকণা হইতেও নম্র হইতে হয়। দুনিয়া ধূলিকণাকে পায়ে দলে : সেই ধূলিকণারও পায়ের ধুলা সত্যের সাধকের হইতে হয়। কেবল তখনই, তার আগে নয়, পরা সত্যের ঝলক সে দেখিতে পাইবে। বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্র আখ্যানে এই ছবি দিব্য ফুটিয়া উঠিয়াছে। খ্রীস্টান ধর্ম ও ইসলামও ঠিক এই কথাই বলে।

এই সব প্রকরণে যা লিখিতে যাইতেছি তাতে পাঠক যদি অভিমানের লেশমাত্র দেখিতে পান তবে নিঃসন্দেহ বুঝিবেন যে আমার সাধনা ত্রুটিপূর্ণ, আর আমার চকিত দর্শন মরীচিকামাত্র। আমার মত শতসহস্র লোক ক্ষয় হয় হোক, তবুও সত্যের জয় হোক। আমার মত অল্পাত্মাকে মাপিতে গিয়া সত্যের মাপকাঠিকে চুল পরিমাণও যেন আমরা ছোট না করি।

আমি চাই যে আমার লেখাকে কেউ প্রমাণভূত মনে না করেন। ইহা আমার মিনতি। যে সব প্রয়োগের কথা বলা হইল সেই সবকে দৃষ্টান্ত মনে করিয়া নিজ নিজ বৃত্তি ও শক্তি অনুসারে সকলে নিজেদের মত প্রয়োগ করিবেন ইহাই আমি চাই। আমি মনে করি, এই সংকীর্ণ গণ্ডিতেও আমার আত্মকথায় বর্ণিত দৃষ্টান্ত পাঠকের পক্ষে সত্যসত্যই অনেকটা লাভের হইবে। তার কারণ, বলা আবশ্যক এমন কোন কথাই, তা যদি আমার অযশেরও হয়, আমি লুকাইব না। আশা করি আমার দোষত্রুটির পুরা ছবি পাঠকের সামনে আমি ধরিতে পারিব। সত্যের শাস্ত্রীয় প্রয়োগের বর্ণনা করাই আমার লক্ষ্য, আমি কত ভাল তা বলার তিলমাত্র ইচ্ছাও আমার নাই। যে গজকাঠিতে আমি নিজেকে মাপিতে চাই, আর অন্য সবারও যে গজকাঠিতে নিজেদের মাপা উচিত, সেই গজকাঠিতে নিজেকে মাপিয়া সুরদাসের কথায় আমার না বলিয়া উপায় নাই যে :

মো সব কৌন কুটিল খল কামী ?
জিন তনু দিয়ো তাহি বিসনায়ো
ঐসী নিমকহারামী।

কেন না, যাঁকে আমি অন্তরাত্মা দিয়া আমার জীবনের স্বামী বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি, যাঁর প্রসাদে এই দেহ আমি পাইয়াছি, তাঁর কাছ হইতে আজিও আমি দূরে। এই বেদনা অনুক্ষণ আমায় শূলের মত বিঁধে। এর মূলে যে

আমার নানা বিকার সে কথা আমি জানি, তবুও সে সব আমি ঝাড়িয়া ফেলিতে পারি কই।

কিন্তু এই কথা এখানেই শেষ করিব। প্রস্তাবনা হইতে প্রয়োগের কথায় যাওয়া যায় না। কথা-প্রকরণের কথা কথাপ্রকরণে মিলিবে।

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী

(২৬ নভেম্বর ১৯২৫)

আত্মকথা : প্রথম ভাগ

আত্মকথা

১

জন্ম

গান্ধীরা জাতিতে বেনিয়া, আর জানা যায় পূর্বে তাদের বৃত্তি ছিল বেনেতি। কিন্তু আমার বাপ-ঠাকুরদা তিন পুরুষ দেশীয় রাজ্যের দেওয়ান ছিলেন। মনে হয় উত্তমচাঁদ অথবা ওতা গান্ধী ন্যায়পরায়ণ লোক ছিলেন। রাজ্যের কূট-কচালের দরুন তাঁর পোরবন্দর ছাড়িতে ও জুনাগড়ে আশ্রয় লইতে হয়। নবাবসাহেবকে তিনি বাঁ-হাতে সেলাম করেন। কেউ এই আপাত-প্রতীয়মান অবিনয়ের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিয়াছিলেন 'ডান-হাত যে আগেই পোরবন্দরকে দিয়েছি'।

ওতা গান্ধী পর পর দুই বিবাহ করেন। প্রথম পক্ষে তাঁর চার ও দ্বিতীয় পক্ষে দুই পুত্র জন্মে। আমার মনে পড়ে, এঁরা যে সতাতো ভাই ছিলেন এ কথা বাল্যকালে আমি ঘুণাক্ষরেও টের পাই নাই। এঁদের পঞ্চম ছিলেন করমচাঁদ বা কবা গান্ধী আর সকলের ছোট ছিলেন তুলসীদাস গান্ধী। এই দুই ভাই একের পর আর পোরবন্দরের দেওয়ান হন। কবা গান্ধী আমার পিতা। পোরবন্দরের দেওয়ানি ছাড়ার পরে তিনি রাজস্থানিক কোর্টের সভাসদ্ হন। আজ উহা নাই। কিন্তু সে সময়ে উহার নামডাক খুব ছিল : উহা রাজাদের ও তাঁদের জ্ঞাতিগোষ্ঠীর বিবাদ-বিরোধ মিটাইবার কাজ করিত। তিনি কিছু দিন রাজকোটের ও বাঙ্কানেরেরও দেওয়ান ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি রাজকোট দরবারের পেনশনভোগী ছিলেন।

কবা গান্ধীও পর পর চার বিবাহ করেন। প্রথম দুই পক্ষে তাঁর দুই কন্যা জন্মে। শেষ স্ত্রী পুতলীবাঈ-এর গর্ভে এক কন্যা ও তিন পুত্র হয়—আমি তাঁদের সকলের ছোট।

বাবা জ্ঞাতিপ্রেমী, সত্যানুরাগী, শূর ও উদার, কিন্তু ক্রোধী ছিলেন। কিছুটা বিষয়াসক্তও বুঝি বা ছিলেন। চল্লিশের পরে তিনি শেষ বিবাহ করেন। ঘরে-বাইরে তাঁর এই সুনাম ছিল যে তিনি ঘুষের ধার ধারেন না আর তাই সকলের ওপর সমান সুবিচার করেন। একান্ত রাজ্যনিষ্ঠ

ছিলেন। একবার কোন এসিস্টান্ট পলিটিকেল এজেন্ট রাজকোটের ঠাকুর-সাহেবের অপমান করেন। তিনি উহার প্রতিবাদ করেন। সাহেব রাগিয়া যান; কবা গান্ধীকে ক্ষমা চাইতে বলেন। কিন্তু তিনি অস্বীকার করেন। ফলে ঘণ্টা কয়েক কয়েদ ভোগ করিতে হয়। তাতেও দমিলেন না দেখিয়া শেষটায় সাহেব ছাড়িয়া দেওয়ার আদেশ দেন।

টাকা জমাইবার লোভ বাবার কোনদিনই ছিল না। তাই আমাদের জন্ম প্রায় কিছুই রাখিয়া যান নাই।

অভিজ্ঞতার শিক্ষা ছাড়া শিক্ষা তাঁহার ছিল না। যাকে আজকাল গুজরাটী পঞ্চম মানের শিক্ষা বলা হয় ততটা শিক্ষা তিনি পাইয়া থাকিবেন। ইতিহাস-ভূগোলের জ্ঞান ত পানই নাই। তাহা হইলে কি হয়, তাঁর কাণ্ডজ্ঞান এত উঁচু দরের ছিল যে অতি শক্ত শক্ত প্রশ্নের মীমাংসা করিতে কি হাজারো মানুষের কাছ হইতে কাজ লইতে তাঁর আদৌ অসুবিধা হইত না। ধর্মীয় শিক্ষা ছিল না বলিলেই চলে। তবে মঠ-মন্দিরে যাওয়ার ও কথা-পুরাণ শোনার ফলে যে ধর্মজ্ঞান অগণিত হিন্দু সহজে লাভ করে সেই ধর্মজ্ঞান তাঁর ছিল। জীবনের শেষ দিকে পরিবারের বন্ধু এক পণ্ডিত ব্রাহ্মণের পরামর্শে বাবা গীতা পাঠ আরম্ভ করেন, আর পূজার সময়ে প্রতিদিন গোটা কয়েক শ্লোক জোরে জোরে পাঠ করিতেন।

মা সাধ্বী ছিলেন এই ছাপ আমার মনে গাঁথিয়া আছে। তিনি খুব ভাবুক ছিলেন। পূজাপাঠ না করিয়া কখনও খাইতেন না। হাবেলীতে (বৈষ্ণব মন্দির) যাওয়া তাঁর নিত্য কর্ম ছিল। আমার মনে পড়ে না মা চাতুর্মাস্য কোন বছর লঙ্ঘন করিয়াছেন। অতি কঠিন কঠিন ব্রত মা লইতেন ও ঠিক ঠিক পালন করিতেন। ব্রত লইতেন ত অসুখ হইলেও ভাঙ্গিতেন না। এই প্রসঙ্গে কোন এক বছরের চান্দ্রায়ণ ব্রতের কথা মনে পড়িতেছে। তাঁর অসুখ হয়, তবু ব্রত পালন করেন। চাতুর্মাস্যে তিনি একবেলা খাইতেন। অমনটা সহজ জিনিসে তাঁহার সন্তোষ ছিল না। এক চাতুর্মাস্যে এক দিন বাদ এক দিন খাইতেন। একটানা দুই-তিন দিনের উপবাস তাঁর কাছে সহজ ব্যাপার ছিল। এক চাতুর্মাস্যে ব্রত নেন যে যেদিন সূর্যনারায়ণের দর্শন না পাইবেন খাইবেন না। আমরা ছোটরা সেবার বাদল-ঢাকা আকাশের দিকে তাকাইয়া থাকিতাম; কতক্ষণে সূর্যদেব দেখা দিবেন আর মা খাবেন। এ কথা কে না জানে যে চাতুর্মাস্যের দিনে সূর্যদেবের

দর্শন প্রায়ই মিলে না। ওই চাতুর্মাস্যের কথা আমার মনে পড়ে; সূর্য যেই দেখিতাম চেঁচাইয়া বলিতাম, 'মা, মা, ওই সূর্য দেখা যাচ্ছে', মা ছুটিয়া আসিতেন আর ততক্ষণে সূর্যদেব মেঘের আড়ালে মুখ ঢাকিতেন। হাতের কাজে ফিরিয়া যাইতে যাইতে মা বলিতেন, 'তা আর কি হয়েছে। ভগবান আজ মাপায়নি।' ফের কাজে ডুবিয়া যাইতেন।

মা ব্যবহারকুশল ছিলেন। দরবারের সব খবর রাখিতেন, রাণীবাসে তাঁর বুদ্ধির খুব খাতির ছিল। তখন আমি ছোট। মা কখন কখন আমাকে সঙ্গে লইয়া যাইতেন। রাজমাতার সহিত তাঁর কোন কোন কথা আজও আমার মনে আছে।

এরূপ মাতাপিতার ঘরে সংবৎ ১৯২৫-এর ভাদ্র কৃষ্ণপক্ষে ১২ বাসরে অর্থাৎ সন ১৮৬৯ খ্রীস্টাব্দের ২রা অক্টোবর তারিখে পোরবন্দর বা সুদামা-পুরীতে আমার জন্ম হয়।

বাল্যকাল আমার পোরবন্দরেই কাটে। মনে আছে, কোন পাঠশালায় আমাকে ভরতি করা হইয়াছিল। কষ্টেসৃষ্টে ঘর কয়েক নামতা শিখিয়াছিলাম। সেই সময়কার আর কোন কথাই মনে নাই, মনে আছে কেবল এই যে অন্য ছোকরাদের সহিত ভিড়িয়া গুরুমহাশয়কে গালি দিতাম। ইহা হইতে অনুমান করা যাইবে যে আমি বোকা ছিলাম, আর আমার স্মরণশক্তি ছিল আমরা ছোকরারা যে চরণ গাইতাম সেই চরণে কথিত কাঁচা পাঁপরের মতই কাঁচা। সেই দুই পঙ্‌ক্তি না দিলেই নয়:

একড়ে এক, পাপড় শেক;
পাপড় কচ্চো,——মারো——

প্রথম শূন্য স্থানে থাকিত মাস্টারের নাম। তাঁকে অমর করার ইচ্ছা আমার নাই। আর দ্বিতীয় শূন্য স্থানে থাকিত যে গালি দিতাম তা। তা দেওয়া অনাবশ্যক।

২

বাল্যকাল

রাজস্থানিক কোর্টের সদস্য হইয়া বাবা পোরবন্দর হইতে রাজকোটে যান। তখন আমার বয়স বছর সাতেক। রাজকোটের গ্রাম-পাঠশালায় আমাকে

ভরতি করিয়া দেওয়া হয়। এই পাঠশালার দিনের কথা যায় শিক্ষকদের নামধাম আমার বেশ মনে আছে। পোরবন্দরের মত এখানকার পড়াশুনার বিষয়েও বিশেষ কোন কথা বলার নাই। বুঝি বা টায়টোয় মাঝারি রকমের পড়ুয়া ছিলাম। গ্রাম-পাঠশালা হইতে শহরতলির স্কুলে আর সেখান হইতে হাই স্কুলে যাই—ইহার মধ্যেই বারোর কোঠা পার হইয়া গিয়াছিলাম। এই পাঠকালে কখনও কোন মাস্টার বা সহপাঠীর সঙ্গে ছল-চাতুরী করিয়াছি বা মিথ্যা বলিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। আমি মহা লাজুক ছিলাম। কাহারও সঙ্গে মিশিতাম না। বই ছিল সাথী আর জানিতাম পড়া। ঘণ্টা বাজার সঙ্গে সঙ্গে স্কুলে হাজির হইতাম আর ছুটি হইতেই বাড়ী পালাইতাম। 'পালাইতাম' শব্দ ভাবিয়া-চিন্তিয়াই লিখিতেছি, কারও সঙ্গে কথা বলিতে আমার ভাল লাগিত না। ঠাট্টা-তামাশা কেউ করে এই ভয়টাও ছিল।

হাই-স্কুলের প্রথম বছরের একটি ঘটনা—পরীক্ষার সময়কার এক কথা—উল্লেখ করার মতন। শিক্ষাবিভাগের ইন্সপেক্টর জাইল্‌স বিদ্যালয় পরিদর্শন করিতে আসেন, প্রথম শ্রেণীর ছাত্রদের তিনি পাঁচটি শব্দ লিখিতে দেন। উহার একটি ছিল 'কেটল'—kettle। শব্দটার বানান আমি ভুল লিখিয়াছিলাম। মাস্টার তাঁর পায়ের জুতার ঠোক্কর দিয়া আমায় সাবধান করিলেন। কিন্তু ইশারায় সাড়া দেয় কে? পাশের ছেলের স্লেট দেখিয়া ভুল শুদ্ধ করিতে শিক্ষক বলিতে পারেন এ কথা আমার মগজে ঢুকিবার কথা নয়। আমার ত মনে হইয়াছিল ছেলেরা একে অন্যের স্লেট হইতে টুকে কিনা তাই তিনি দেখিতেছেন। অন্য সবে পাঁচটা শব্দ ঠিক ঠিক লেখে; কেবল বোকা বনি আমি! আমার বোকামির কথা পরে মাস্টার আমাকে বুঝাইতে চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁর কথার কোন ছাপ আমার মনের ওপর পড়ে নাই; অন্যের স্লেট হইতে টুকিতে আমি শিখি নাই।

তা হইলেও ওই মাস্টারের প্রতি আমার অভক্তি জন্মিয়াছিল তাহা নয়। বড়দের দোষ না দেখা আমার রক্তে। পরে ওই শিক্ষকের আরও নানা দোষের কথা আমার কানে আসিয়াছিল, তবুও তাঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধা কমে নাই। বড়দের আজ্ঞা মানিতে হয়; তাঁরা যা বলেন তেমন কর, তাঁদের বিচার করিতে বসিও না এ কথাই আমি জানিতাম।

ঠিক এই সময়ের অন্য দুইটি ব্যাপার আমার মনে গাঁথিয়া রহিয়াছে। মোটামুটি বলা যায় যে স্কুলের বই ছাড়া অন্য বই পড়ার দিকে আমার ঝোঁক

ছিল না। পাঠ্যপুস্তক পড়িতে হয়, আর পড়িতামও। কারণ মাস্টারকে ফাঁকি দিতে বা তাঁর বকুনি খাইতে আমার ভাল লাগিত না। কিন্তু মন সব সময় বইয়ে বসিত না, তাই পড়া অনেক সময় কাঁচা থাকিয়া যাইত। এই অবস্থায় বাইরের বই পড়ার আগ্রহ কোথা হইতে আসিবে? কিন্তু বাবার কেনা একখানা বইয়ের ওপর আমার নজর পড়ে—নাম 'শ্রবণ-পিতৃভক্তি' নাটক। তাহা পড়ার ইচ্ছা হয় ও খুব আগ্রহে পড়ি। তখনকার দিনে বীক্ষণ-কাচে ফেরিওয়ালারা ছবি দেখাইয়া বেড়াইত। উহার এক ছবিতে আমি দেখিয়াছিলাম কিভাবে শ্রবণ তার অন্ধ পিতামাতাকে বাঁকে করিয়া তীর্থে লইয়া যাইতেছেন। এই বই আর ওই ছবি এই দুই বস্তুর গভীর ছাপ আমার মনের ওপর পড়ে। আমারও শ্রবণের মতন হইতে হইবে—এই বাসনা জন্মে। শ্রবণের মৃত্যুতে তার মাতাপিতার বিলাপ আজও আমার চোখের ওপর ভাসে। বাজনার শখ ছিল। বাবা একটা কন্সারটিনা কিনিয়া দিয়াছিলেন। তাতে ওই বিলাপের করুণ সুর আলাপ করিতাম।

অন্য ঘটনাটি এই: এক নাটক দল আসে। নাটক দেখার অনুমতি পাইয়াছিলাম। হরিশ্চন্দ্রের আখ্যান। দেখিলাম। একবারে কি সাধ মেটে? মন বার বার দেখিতে চায়। কিন্তু বার বার দেখিতে কে দেয়? কিন্তু আমার মনে ওই নাটকের খেলা শত বার চলিত। স্বপ্নে হরিশ্চন্দ্রকে দেখিতাম। বার বার মনে প্রশ্ন জাগিত—সকলে হরিশ্চন্দ্রের মত সত্যবাদী হয় না কেন? সত্যের পথে চলার ও সত্যের জন্য যেরূপ দুঃখকষ্ট হরিশ্চন্দ্র সহিয়াছিলেন সেইরূপ দুঃখকষ্ট ভোগ করার প্রেরণা ইহা হইতে আমি পাই। আমি মানিয়া লইয়াছিলাম যে নাটকে লেখা আপদ-বিপদের মত আপদ-বিপদেই হরিশ্চন্দ্রের পড়িতে হইয়াছিল। হরিশ্চন্দ্রের কষ্ট দেখিয়া, সে কথা মনে করিয়া আমি খুব কাঁদিতাম। আজ বুদ্ধি বলে, হরিশ্চন্দ্র ঐতিহাসিক ব্যক্তি নহেন। তবু আজও হরিশ্চন্দ্র ও শ্রবণ আমার কাছে জলজ্যান্ত চরিত্র। বলিতে সংকোচ পাই যে এখন যদি আবার এই দুই নাটক পড়ি ত তখনকার মতই চোখ জলে ঝাপসা হইয়া আসিবে।

৩

বাল-বিবাহ

এই প্রকরণ যদি না লিখিতে হইত ত বাঁচিতাম। কিন্তু আমি জানি এই কথাপ্রসঙ্গে এমন অনেক তেতো ঢোক আমায় গিলিতে হইবে। সত্যের পূজারী এই দাবি করি বলিয়া এই সব এড়াইবার উপায় আমার নাই। তের বছর বয়সে আমার বিবাহ হয় এ কথা লিখিতে লজ্জায় আমার মাথা হেঁট হইতেছে। আমার কাছে বার-তের বছরের যে-সব ছেলে রহিয়াছে তাহাদের যখন দেখি ও নিজের বিয়ের কথা মনে করি তখন নিজের ওপর দয়া হয়, আর তাহাদের আমার অবস্থা হয় নাই বলিয়া 'সাধু সাধু' শব্দে তাহাদের প্রশংসা করিতে মন চায়। এরূপ অদ্ভুত বাল-বিবাহের সমর্থনে কোন নৈতিক যুক্তি আমি খুঁজিয়া পাই না।

পাঠক যেন মনে করিবেন না যে আমি বাগ্‌দানের কথা বলিতেছি। কাঠিয়াওয়াড়ে বিবাহ বলিতে বাগ্‌দান নয়, লগ্ন * বুঝায়। মাবাপ ছেলে-মেয়ের বিয়ের কড়ার করে, তার নাম বাগ্‌দান। বাগ্‌দান ভাঙ্গা চলে। বাগ্‌দানের পর বর মরিয়া গেলে কনে বিধবা হয় না। বাগ্‌দান নেহাতই বর-কনের মা বাপের ব্যাপার ; বর-কনের ইহাতে কোন হাত নাই। অনেক সময় খবরটা পর্যন্তও তাহারা জানে না। তিন তিন বার আমার বাগ্‌দান হইয়াছিল। তা কবে হইয়াছিল সে কথা আমি জানিতাম না। পর পর দুইটি মেয়ে মারা গিয়াছিল এই কথা প্রকাশ পাইতে আমি বুঝিতে পারিয়াছিলাম আমার তিন বার বাগ্‌দান হইয়াছিল। তৃতীয় বাগ্‌দান সাত বছর বয়সে হইয়া থাকিবে এমনটা আবছা আবছা মনে পড়ে। কিন্তু সে কথা আমাকে জানানো হইয়াছিল বলিয়া মনে পড়ে না। বিবাহে বরকনের দরকার হয়, তাদের কিছু নিয়ম অনুষ্ঠান করিতে হয়। এখানে যাহা লিখিতেছি সে বিবাহ সম্বন্ধেই। বিয়ের কথা পুরাপুরি মনে আছে।

পূর্বে বলা হইয়াছে, আমরা তিন ভাই ছিলাম। সকলের বড়োর বিয়ে আগেই হইয়াছিল। মেজো আমা অপেক্ষা দুই তিন বছরের বড় ছিলেন। অভিভাবকেরা ঠিক করেন মেঝোর, কাকার ছোট ছেলের (যে আমার এক-আধ বছরের বড় ছিল) ও আমার, এই তিনের বিবাহ এক সঙ্গে

* বাংলায় শব্দটি ভিন্ন অর্থে অর্থাৎ শুভ সময় অর্থে ব্যবহার হয়।

দিবেন। আমাদের ইচ্ছা অনিচ্ছার কথা থাক, কল্যাণের কথাই বা কে ভাবে! বড়োদের নজর ছিল নিজেদের সুবিধার দিকে, খরচ বাঁচানোর দিকে।

হিন্দুর বিবাহ-পর্ব যেমন তেমন ব্যাপার নয়। বরকনের মাবাপ অনেক সময় বিয়েতে ফতুর হয়। ধন ক্ষয় হয়; সময় ব্যয় হয়। মাস কয়েক আগে হইতেই জামা-কাপড় ও গয়নাপত্র তৈরির পালা শুরু হয়, ভোজের বরাদ্দ ঠিক হয়, কি কি ও কত পদ করিলে অপর পক্ষের ওপর টেক্কা দেওয়া যাইবে তার তোড়জোড় চলে। তানলয় থাক বা না থাক, মেয়েরা গান গাহিয়া চলে, গলা ভাঙ্গে অসুখে পড়ে, পড়োশীর কান ঝালাপালা করে। কোন দিন এই সব তার নিজেরও করিতে হইবে এই ভাবিয়া বেচারা পড়োশী শোরগোল, এঁটো-ঝুটো, জঞ্জাল-আবর্জনা টুঁ শব্দ না করিয়া সহিয়া লয়।

এরূপ ঝঞ্ঝাট তিন তিন বার না পোহাইয়া একবারে মিটাইয়া ফেলাই ভাল নয় কি? কম খরচে বেশি ঘটা করার সুযোগ তাতে মিলে, দরাজ হাতে পয়সা ব্যয় করা চলে। বাবা ও কাকা বুড়ো হইয়াছিলেন। আমরা তাঁদের ছোট ছেলে ছিলাম। পুত্র-বিবাহের আনন্দ জীবনে আর নাও মিলিতে পারে এমন ভাবও হয়ত বা ছিল। এই সব কারণে এক সঙ্গে তিনের বিবাহ করানো ঠিক হয়, আর তার জন্য মাস কয়েক আগে হইতেই আয়োজন চলিতে থাকে।

এই উদ্‌যোগ পর্ব হইতে আমরা বুঝিতে পাই কি ঘটিতে যাইতেছে। ভাল জামা-কাপড় পরিতে পাইব, বাজনা বাজিবে, বরের ঘোড়ায় চড়িতে পাইব, ভাল খাওয়া জুটিবে ও এক অজানা বালিকা খেলার সঙ্গী হইবে এই ভাব ছাড়া অন্য কোন ভাব তখন মনে ছিল বলিয়া মনে পড়ে না। বিষয়-ভোগের বাসনা পরে জাগে। কিভাবে জাগিয়াছিল? সে বর্ণনা করিতে পারি, কিন্তু আমার সেই লজ্জার কথা পটের আড়ালেই থাকুক। যতটুকু না বলিলে নয় তা পরে বলিব। কিন্তু যে মুখ্য বস্তু এই কথায় আমি ধরিতে চাই তার সহিত এই সবের বিশেষ সম্পর্ক নাই।

আমাদের দুই ভাইকে রাজকোট হইতে পোরবন্দরে আনা হইল। গাত্র-হরিদ্রা আদি বিবাহের পূর্বেকার নানা বিধি হইল। সে সব কথা বেশ মজার বটে, কিন্তু বর্ণনা করিয়া লাভ নাই।

বাবা দেওয়ান ছিলেন। কিন্তু নোকর ত বটেই। তাতে ছিলেন রাজার

প্রিয়। তাই আরও বেশি পরাধীন। একান্ত যেদিন না ছাড়িলে নয় সেই দিন ঠাকুরসাহেব তাঁকে ছাড়েন, আর দুই দিনের পথ কমানোর জন্য বিশেষ ডাকের ব্যবস্থা করিয়া দেন। কিন্তু—! কিন্তু দৈবের লিখন ছিল অন্য রকম। রাজকোট হইতে পোরবন্দর ৬০ মাইল—গো-গাড়ীর পাঁচ দিনের পথ। বাবা তিন দিনে আসেন। শেষের দিনে টাঙ্গা উলটিয়া যায়। বাবার খুব চোট লাগে। হাতে পটি, পিঠে পটি। বিয়ের আনন্দ তাঁর ও আমাদের অর্ধেক হইয়া গেল। তা হইলেও বিবাহ হইল। লগ্ন কি কখনও বদলানো যায়! বিয়ের বাল-উল্লাসে বাবার কষ্টের কথা আমি ভুলিয়া গেলাম। পিতৃভক্ত ত ছিলাম বটেই, কিন্তু বিষয়-ভক্তই কি কম ছিলাম? এখানে বিষয় বলিতে কেবল ইন্দ্রিয়ের বিষয় নহে, যে কোন ভোগ বুঝিতে হইবে। মাতৃ-পিতৃভক্তির কাছে সকল সুখ-ভোগ বলি দিতে হয় এই কথা পরে বুঝি, তখন জানিতাম না। তা সত্ত্বেও এই ভোগেচ্ছার দণ্ডরূপেই যেন আমার জীবনে এমন এক উল্টা ব্যাপার ঘটে যাহা আজও শেলের মত আমার বুকে বিঁধে। কিন্তু সে কথা এখানে নয়, যথাস্থানে পরে বলিব। যখনই নিষ্কুলানন্দের এই পদ

ত্যাগ ন টকে রে বৈরাগ্য বিনা,
করীয়ে কোটি উপায় জী

গাই বা শুনি তখনই এই বিপরীত আচরণের তিক্ত ঘটনার কথা মনে হয় ও লজ্জায় আমি মরিয়া যাই।

শরীরে যেন কোন আঘাতই লাগে নাই এমনটা শান্তভাবে বাবা বিবাহের সব কিছু দেখাশুনা ও বিধি-ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কোন্ কোন্ জায়গায় বসিয়া বিবাহের কোন্ কোন্ ব্যবস্থা তিনি করিয়াছিলেন তা আজও আমার চোখে ভাসে। বাল-বিবাহের কথাপ্রসঙ্গে আজ বাবার যে সমালোচনা আমি করিতেছি তেমন সমালোচনা তাঁহার আমি কোন দিন করিব এই কথা তখন আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই। সেদিন সব কিছু ঠিক মনে হইয়াছিল, ভাল লাগিয়াছিল। বিবাহের শখ ছিল, আর বাবা যা করিতেছেন ঠিকই করিতেছেন এ কথাই আমার মনে হইয়াছিল বলিয়া সেই সময়ের কথা মনে আছে।

বিবাহ-বাসরে আমাদের বসার, সপ্তপদীর, একে-অন্যের মুখে ক্ষীর দেওয়ার, সেই দিন হইতে এক সঙ্গে বরবধূ আমাদের থাকার কথা, আর

সেই প্রথম রাত।—আজও সব মনে আছে। আচম্বিতে দুই নির্দোষ বালক-বালিকা অজানতে সংসার-সাগরে ঝাঁপ দিল। প্রথম রাত কি ভাবে চলিতে হইবে পই পই করিয়া বউদি আমাকে সেই তালিম দেন। বউকে সে শিক্ষা কে দিয়াছিল তাহা আমি জানি না। তাঁহাকে আমি সে কথা জিজ্ঞাসা করি নাই, আর আজও জিজ্ঞাসা করার ইচ্ছা নাই। দুই জনেরই কেমন ডর-ডর ভাব, ভ্যাবাচাকা অবস্থা—পাঠক এইটুকুই জানুন। দুইজনেরই ভয়ানক লজ্জা—কি যে বলি আর কি যে করি! শেখানো পড়ানো এখানে কোন্ কাজের? ভাল, এই ব্যাপারে শেখানো পড়ানোর আবশ্যকতাই বা কি? সংস্কার যেখানে বলবান সেখানে শেখানো অনাবশ্যক। ধীরে ধীরে আমাদের পরিচয় ঘন ও কথাবার্তার বাধ-বাধ ভাব দূর হইতে থাকে। আমরা এক বয়সের ছিলাম। তা হইলে কি হয়, পতির কর্তৃত্ব আরম্ভ হইতে দেরী হইল না।

পতিত্ব

যে যুগে আমার বিয়ে হয় সে যুগে দম্পতি-প্রেম, ব্যয়-সংযম, বাল-বিবাহ ইত্যাদি বিষয়ে এক পয়সা বা এক পাই (কোন্‌টা মনে নাই) দামের পুস্তিকা বাহির হইত। তার দুই একখানা আমার হাতে পড়িয়াছিল, সেগুলি আমি আগাগোড়া পড়িতাম। আমার প্রকৃতি ছিল: যাহা ভাল না লাগিত তা ভুলিয়া যাইতাম, আর যাহা ভাল লাগিত সে অনুসারে চলিতাম। পত্নীব্রত হওয়া পতির ধর্ম এই কথা আমার মনে গাঁথিয়া গিয়াছিল। তা ছাড়া সত্যের ওপর ত আমার স্বাভাবিক টান ছিলই। তাই স্ত্রীকে ছলনা করার প্রশ্ন ছিল না। অল্প বয়সে স্ত্রীর সহিত বিশ্বাসঘাতকতার সম্ভাবনাও কম ছিল।

কিন্তু এই সদ্‌বিচারের এক মন্দ পরিণাম হইয়াছিল। আমি ত পত্নীব্রত তবে তারও ত পতিব্রতা হওয়া চাই এই ভাব আমায় পাইয়া বসিল। ফলে আমি ঈর্ষালু পতি বনিয়া গেলাম। 'তার এভাবে চলা উচিত' স্থলে 'তাকে এভাবে চালাতে হবে' এই বাই আমার হইল। আর তা চালাইতে হইলে ত চোখে চোখে রাখিতেই হয়। স্ত্রীর পবিত্রতা সম্বন্ধে সন্দেহের কোন কারণ ছিল না। কিন্তু সন্দেহ বাই কি কারণের ধার ধারে? তাকে আমি

চোখে চোখে রাখিলাম, কোথাও যাইতে হইলে বলিয়া যাইতে বলিতাম। এই ব্যাপার আমাদের মধ্যে তিক্ত ঝগড়া-বিবাদের হেতু হয়। না বলিয়া কোথাও যাওয়া চলিত না অর্থ এক রকমের কয়েদ। কিন্তু কস্তুর বাইর এমন কয়েদ সহিল না। না বলিয়া ইচ্ছামত চলিয়া যাইত। অমনটি যাওয়া চলিবে না বলিতাম ত আরও অধিক স্বাধীনভাবে সে চলিত, আর আমার তত বেশি রাগ হইত। ইহার ফলে যখন তখন আমাদের কথা বন্ধ হইয়া যাইত। আমার বাধা যে সে মানিত না তাতে আমি কোন দোষ দেখি না। মনে যার পাপ নাই দেবদর্শনে বা কারও সঙ্গে দেখা করিতে যাওয়ার কথায় সে বাধা মানিবে কেন? তার ওপর যদি ছড়ি ঘুরাইতে যাই তবে সেইবা আমার ওপর ঘুরাইবে না কেন? এ কথা আজ বুঝি। কিন্তু সেই সময়ে ছিল স্বামীর দাপট চালানোর অহমিকা।

তা বলিয়া পাঠক মনে করিবেন না যে আমাদের ঘরসংসারে মধুরতা ছিল না। আমার ওই বাঁকা চলনের মূলে ছিল প্রেম। আমার আগ্রহ ছিল আমার পত্নীকে আমি আদর্শ পত্নী বানাইব। সে শুদ্ধ হয়, শুদ্ধ থাকে, যা শিখি তা শেখে, যা পড়ি তা পড়ে, আমাদের দুই জীবন ওতপ্রোত হইয়া যায় এই ছিল আমার আকাঙ্ক্ষা।

জানি না কস্তুর বাইর এরূপ কোন ভাবনা ছিল কিনা। সে নিরক্ষর ছিল। স্বভাবে সে সাদাসিধা, স্বাধীন ও পরিশ্রমী ছিল, আর অন্তত আমার বেলায় কম কথার মানুষ। লেখাপড়া জানিত না বলিয়া তার দুঃখ ছিল না। আমাকে পড়িতে দেখিয়া কখনও তার পড়িতে ইচ্ছা হইয়াছে এমনটি আমার মনে পড়ে না। ইহা হইতে আমার অনুমান হয় যে আমার আকাঙ্ক্ষা এক-তরফা ছিল। আমার বিষয়-সুখ এক স্ত্রীতে কেন্দ্রিত ছিল, উহার প্রতিদান আমি আশা করিতাম। ছিলই বা প্রেম এক-তরফা তবু তা নিছক দুঃখের ছিল না, কারণ অন্তত এক দিকে তা সক্রিয় ছিল, শুভ করিতে ব্যাকুল ছিল।

স্বীকার না করিয়া উপায় নাই যে আমার স্ত্রীতে আমি অতিশয় আসক্ত ছিলাম। স্কুলে যাইবার পরও তার কাছে মন পড়িয়া থাকিত। কখন রাত হইবে আর কখন দেখা হইবে এই চিন্তা অহরহ মনের আনাচে-কানাচে উঁকিঝুঁকি মারিত। বিয়োগ অসহ্য ছিল। আজেবাজে কথা বলিয়া কস্তুর বাইকে অধিক রাত অবধি জাগাইয়া রাখিতাম। আমি মনে করি যে এই

আসক্তির সঙ্গে যদি কর্তব্যপরায়ণতা না থাকিত তবে হয় রোগে ভুগিয়া মরিতাম, নয়ত দুনিয়ার বোঝা হইয়া থাকিতাম। ভোর হইতেই দিনের কাজে লাগিতে হয় ও কাউকে ফাঁকি দিতে নাই এই দুই নিষ্ঠা, বিশেষ সত্যনিষ্ঠা, অনেক সংকট হইতে আমায় রক্ষা করিয়াছে।

বলিয়াছি যে কস্তুরবাই লেখাপড়া জানিত না। তাকে লেখাপড়া শিখাইবার আমার অত্যন্ত আগ্রহ ছিল। কিন্তু আমার বিষয়-বাসনা আমায় শিখাইতে দিলে ত? একে ত জোর করিয়া পড়াইতে হইত। তাতে আবার রাত্রির একান্তে। বড়োদের সাক্ষাতে স্ত্রীর দিকে চাওয়াও চলিত না, কথা বলা দূরের কথা। সেই দিনে কাঠিয়াওয়াড়ে একটা বাজে জঙ্গলী প্রথা ছিল—পর্দার প্রথা; আজও অনেকটা পরিমাণে আছে। অতএব সব দিক হইতে অবস্থাটা ছিল আমার চেষ্টার প্রতিকূল। তাই যৌবনে কস্তুরবাইকে লেখাপড়া শিখাইবার যে চেষ্টা করিয়াছিলাম তা প্রায় বিফল হইয়াছিল এ কথা আমার স্বীকার করিতেই হইবে। বিষয়ের ঘুম যখন ভাঙ্গে তার আগেই আমি দশের সেবায় লাগিয়া গিয়াছিলাম, ফুরসত বড় একটা মিলিত না। শিক্ষক দ্বারা পড়ানোর চেষ্টাও আমার ব্যর্থ হয়, তাই কোনমতে পত্র লিখিতে ও সহজ গুজরাটী বুঝিতে পারে এতটাই আজ কস্তুরবাইর বিদ্যার দৌড়। আমার ভালবাসা কামে মলিন না হইলে আজ সে বিদুষী হইত, তার পড়ার আলস্য আমি জয় করিতে পারিতাম। আমি জানি শুদ্ধ প্রেমের কাছে কিছুই অসম্ভব নয়।

বিষয়ভোগে মজিলেও উহার ফল হইতে কিরূপে কিছুটা বাঁচিয়া গিয়াছিলাম উহার এক কারণ ওপরে উল্লেখ করিয়াছি। অন্য একটা কারণের কথাও বলা দরকার। শত অভিজ্ঞতা হইতে আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, যার উদ্দেশ্য মহৎ স্বয়ং ভগবান তার রক্ষক। হিন্দুসমাজের বালবিবাহ হানিকর ত বটেই তবে তা হইতে বাঁচারও একটা ব্যবস্থা তাতে আছে। বাল বরবধূকে একটানা বেশিদিন এক সঙ্গে মাবাপ থাকিতে দেয় না। বালবধূর অর্ধেকের বেশিদিন বাপের বাড়ীতে কাটে। আমাদের বেলায়ও তাহাই হইয়াছে অর্থাৎ আমাদের তেরো বছর হইতে আঠারো বছরের মধ্যে মোট মিলাইয়া তিন বছরের বেশি আমরা একসঙ্গে থাকিতে পাই নাই। ছয় মাস একসঙ্গে কাটিতে না কাটিতে বাপের বাড়ী হইতে তার ডাক পড়িত। নিতে-আসার ব্যাপারটা বড়ই বিশ্রী লাগিত কিন্তু তার ফলে

আমরা দুই জনই বাঁচিয়া গিয়াছি। তা ছাড়া আঠারো বছর বয়সে আমি বিলাত যাই। ফলে দীর্ঘ বিরহের সুযোগ আমাদের লাভ হয়। বিলাত হইতে ফেরার পরে মাস ছয়েক এক সঙ্গে হয়ত ছিলাম, কারণ রাজকোট ও বোম্বাইয়ের মধ্যে আমার আনাগোনা করিতে হইত। ইহার মধ্যে দক্ষিণ আফ্রিকার ডাক আসে। সেই সময় মধ্যে আমার বিষয়বাসনার উদ্দামতা বেশ কিছুটা শান্ত হইয়া গিয়াছিল।

হাইস্কুলে

হাইস্কুলে পড়ার সময়ে আমার বিবাহ হয় সে কথা পূর্বে বলিয়াছি। আমরা তিন ভাই একই স্কুলে তখন পড়িতাম। জ্যেষ্ঠ অনেক ওপরের ক্লাসে পড়িতেন। যে ভাইয়ের বিয়ের সঙ্গে আমারও বিয়ে হয় সে আমার এক ক্লাস ওপরে ছিল। বিয়ের দরুন আমাদের দুই জনের এক বছর নষ্ট হয়। আমার ভাইয়ের পক্ষে ফলটা আরও মারাত্মক হয়। বিয়ের পরে সে পড়াই ছাড়িয়া দেয়। কত যুবকের জীবন যে এইভাবে মাটি হয় তা ভগবানই জানেন। পাঠ্যাবস্থায় বিবাহ একমাত্র হিন্দুসমাজেই হয়; পূর্বে এ দেশেও হইত না।

আমার পড়া চলিতে থাকে। হাইস্কুলে আমার নাম বোকার তালিকায় ছিল না। আমি বরাবর শিক্ষকদের সুনজরে ছিলাম। ছাত্রদের পড়ার ও আচরণের রিপোর্ট বছর বছর অভিভাবকদের পাঠানো হইত। আমার আচরণ অথবা পড়ার কথায় খারাপ রিপোর্ট কোনও দিন হয় নাই। বস্তুত দ্বিতীয় শ্রেণীর পরীক্ষার পরে নানা ইনামও আমি পাইয়াছিলাম। পঞ্চম শ্রেণীতে চার টাকার ও ষষ্ঠ শ্রেণীতে দশ টাকার জলপানি পাইয়াছিলাম, যোগ্যতাগুণে যতটা নয় তার অধিক ভাগ্যবলে। সকল ছাত্রের জন্য এই বৃত্তি ছিল না, ছিল কাঠিয়াওয়াড়ের সোরট বিভাগের ছাত্রদের মধ্যে যে প্রথম হইত তার জন্য। চল্লিশ-পঞ্চাশ জনের ক্লাসে সেই সময়ে সোরটের কয় জনই বা ছাত্র ছিল!

আমার মনে আছে আমি ভাল ছাত্র এরূপ অভিমান আমার ছিল না। পুরস্কার অথবা বৃত্তি পাইতাম ত আশ্চর্য হইতাম। কিন্তু নিজের আচরণের

বিষয়ে আমি অতীব সতর্ক ছিলাম। সামান্য দোষত্রুটি হইলেও চোখে জল আসিত। দোষ করিতাম বা দোষ করিয়াছি বলিয়া শিক্ষকের মনে হইলে আমার দুঃখের অবধি থাকিত না। মনে পড়ে একবার মার খাইয়াছিলাম। অত্যন্ত দুঃখ হইয়াছিল, মার খাইয়াছিলাম বলিয়া নয়, দোষী সাব্যস্ত হইয়াছিলাম বলিয়া। খুব কাঁদিয়াছিলাম। প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণীতে তখন ছিলাম। আর এক ঘটনা ঘটিয়াছিল সপ্তম শ্রেণীতে। সেই সময়ে দোরাবজী এদলজী গীমী হেডমাস্টার ছিলেন। তিনি উত্তম ব্যবস্থাপক ছিলেন, নিয়মমত কাজ করিতেন ও কাজ আদায় করিতেন, ভাল পড়াইতেন তাই ছাত্রপ্রিয় ছিলেন। উচ্চ শ্রেণীর জন্য ব্যায়াম-ক্রিকেট তিনি আবশ্যিক করিয়া দেন। আবশ্যিক করার পূর্বে কোনদিনও আমি খেলাধূলায় যাইতাম না। আমার লাজুক স্বভাব ছিল তার এক কারণ। এখন বুঝি যে ভুল করিয়াছিলাম। তখন আমার ধারণা ছিল যে বিদ্যার সহিত ব্যায়াম খাপ খায় না। পরে বুঝিতে পাই যে শারীরিক শিক্ষা (ব্যায়াম) ও মানসিক শিক্ষা (পড়া) বিদ্যালয়ে সমানভাবে চলা উচিত।

তবুও বলিব যে ব্যায়াম উপেক্ষা করার দরুন আমার কোন ক্ষতি হয় নাই। তার কারণ এই : বইয়ে পড়িয়াছিলাম যে খোলা হাওয়ায় হাঁটিয়া বেড়ানো ভাল ; কথাটা আমার মনে দাগ কাটিয়াছিল, আর তাই হাইস্কুলের উচ্চ শ্রেণীতে পাঠকালে অনেকটা হাঁটিয়া বেড়াইতাম। সেই অভ্যাস আজও রহিয়া গিয়াছে। বেড়ানোও ব্যায়ামই। ফলে আমার দেহ মোটামুটি পটু ও সুঠাম হইয়া যায়।

বাবার সেবা-শুশ্রূষা করার তীব্র ইচ্ছার কাছে খেলাধূলার টান নস্যাৎ হইয়া গিয়াছিল—এই ছিল অরুচির দ্বিতীয় কারণ। স্কুল ছুটি হইতে সটান বাড়ী ফিরিতাম ও সেবায় লাগিয়া যাইতাম। ব্যায়াম যখন বাধ্যতামূলক হইল তখন সেবায় বাধা সৃষ্টি হইল। বাবার সেবার নিমিত্তে ব্যায়াম হইতে রেহাই প্রার্থনা করিয়াছিলাম। কিন্তু গীমী সাহেব সেই আবেদন মঞ্জুর করারই ব্যক্তি! এক শনিবারের কথা। ক্লাস সকালবেলা হইয়াছিল। আর ব্যায়াম করার সময় ছিল বিকাল চারটায়। ঘড়ি ছিল না। দিনটা ছিল বাদলা। সময় আন্দাজ করিতে পারি নাই। স্কুলে গিয়া দেখি মাঠ শূন্য, সকলে চলিয়া গিয়াছে। পরের দিন গীমী সাহেব হাজিরা বই দেখিলেন ত দেখিলেন আমি গরহাজির। কৈফিয়ত চাহিলেন। যা ঘটিয়াছিল বলিলাম।

তিনি বিশ্বাস করিলেন না ; এক আনা কি দুই আনা (ঠিক মনে নাই) জরিমানা করিলেন।

মিথ্যুক সাব্যস্ত হইলাম। ভয়ানক দুঃখ হইল। কি করিয়া আমি প্রমাণ করি আমি মিথ্যুক নই! কোন উপায় ছিল না। দগ্ধিতেছিলাম। কাঁদিলাম। বুঝিতে পাইলাম, সত্য যে বলিতে চায়, সত্য পথে যে চলিতে চায়, অসতর্ক হওয়া তার চলে না। উহাই ছিল আমার স্কুলজীবনের প্রথম ও শেষ গাফিলতি। আবছা আবছা মনে পড়ে শেষটায় জরিমানা মকুফ করাইতে পারিয়াছিলাম। ব্যায়াম হইতেও রেহাই পাই, কারণ বাবা হেডমাস্টারকে অনুরোধ করিয়াছিলেন যে ছুটির সঙ্গে সঙ্গে আমাকে যেন বাড়ী আসিতে দেন।

ব্যায়ামের বদলে বেড়ানো চলিতে থাকে। তাই ব্যায়াম না করার মত ভুলের জন্য আমার সাজা ভুগিতে হয় নাই। কিন্তু অন্য এক ভুলের সাজা আজও ভুগিতেছি। শিক্ষার সহিত সুন্দর হাতের লেখার কোন সম্পর্ক নাই এমনতর উদ্ভট ধারণা আমার হইয়াছিল, কেন হইয়াছিল বলিতে পারি না। বিলাত যাওয়ার পরে এই ধারণা আমার বদলায়। পরে, বিশেষ দক্ষিণ আফ্রিকার উকিলদের ও তথাকার লেখাপড়া-শেখা যুবকদের মুক্তার মত হাতের লেখা যখন দেখি, তখন আমার লজ্জা ও আপসোস হয় এবং বুঝিতে পাই যে বিশ্রী হাতের লেখা শিক্ষার অপূর্ণতার চিহ্ন। পরে দুরস্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম কিন্তু পাকা হাঁড়িতে কি কাঁধ জোড়া যায়! যৌবনে যাহা হেলা করিয়াছি তাহা আজ অবধি ঠিক করিতে পারি নাই। যুবক যুবতী আমার উদাহরণ হইতে সাবধান হোক ও শিখুক যে সুন্দর হাতের লেখা শিক্ষার আবশ্যক অঙ্গ। এখন ত আমার নিশ্চিত মত এই যে, বালকদের প্রথমে আঁকিতে শেখানো উচিত। বালক ফুল দেখে, পাখি দেখে, আরও কতকি দেখে ও মনে করিয়া রাখে আর ঝট্ করিয়া সে সব চিনিয়া লয়। অক্ষরও তেমনি শেখা চাই। চিত্রকলা শেখার পরে ছবি আঁকিতে শুরু করিয়া কেউ অক্ষর লিখিতে শেখে ত তার হাতের লেখা ছাপার অক্ষরের মত সুন্দর হইবে।

এই সময়ের বিদ্যাভ্যাসের অন্য দুইটি কথা বলা দরকার। বিবাহের দরুন যে এক বছরের ক্ষতি হইয়াছিল তাহা পূরণ করিয়া লওয়ার কথা দ্বিতীয় শ্রেণীর শিক্ষক আমাকে বলেন। তখনকার দিনে পরিশ্রমী ছাত্রদের সেই

সুবিধা দেওয়া হইত। এইজন্য তৃতীয় শ্রেণীতে আমি ছয় মাস ছিলাম; গরমের ছুটির আগেকার পরীক্ষার পরে আমাকে চতুর্থ শ্রেণীতে তুলিয়া দেয়। এই শ্রেণীতে কোন কোন বিষয়ের পাঠ ইংরেজীতে শুরু হইত। আমি অথই জলে পড়ি। রেখা-গণিতও চতুর্থ শ্রেণীতে আরম্ভ হইত। একে ত এই ক্লাসে আমার ওঠার আগে কিছুটা পড়ানো হইয়া গিয়াছিল, তাতে পড়ানো হইত ইংরেজীতে তাই মগজে কিছুই ঢুকিত না। জ্যামিতি-শিক্ষক খুব ভাল পড়াইতেন, কিন্তু আমি ধরিতে পারিতাম না। কত বারই না মন দমিয়া যাইত; কত বারই না ভাবিতাম 'দূর ছাই, কাজ নাই এক বছরে দুই ক্লাস পাড়ি দিয়া, তৃতীয় শ্রেণীতেই ফিরিয়া যাই।' কিন্তু ইহাতে ছিল এক দিকে আমার নিজের লজ্জার কথা, আর অন্য দিকে ছিল যে শিক্ষক আমার অধ্যবসায়ের ওপর ভরসা করিয়া ওপরের ক্লাসে তুলিয়া দেওয়ার সুপারিশ করিয়াছিলেন তাঁর মান-অপমানের কথা। এই দুই ভয়ে নীচের ক্লাসে যাওয়ার ভাবনা দূর হইয়া যায়। প্রযত্ন করিতে করিতে যখন ইউক্লিডের তের উপপাদ্যে পৌঁছিয়া যাই তখন হঠাৎ দেখিতে পাই যে রেখা-গণিতের মত সোজা আর কিছু হইতে পারে না। যে বিষয়ে সেরেফ সোজা সরল বুদ্ধি খাটাইতে হয় সেই বিষয় আবার কঠিন কি! সেই দিন হইতে রেখা-গণিত আমার কাছে সহজ ও সরস বিষয় হইয়া যায়।

রেখা-গণিত অপেক্ষা সংস্কৃত আমার কাছে মুশকিলের হইয়াছিল। রেখা-গণিতে মুখস্থ করার কিছু ছিল না, পক্ষান্তরে সংস্কৃতে, তখন আমার মনে হইয়াছিল, সবই মুখস্থ করিতে হয়। সংস্কৃতের পড়াও চতুর্থ শ্রেণীতে আরম্ভ হয়। ষষ্ঠ শ্রেণীতে আমি হাল ছাড়িয়া দিই। সংস্কৃত শিক্ষক বড় কড়া ধাঁচের ছিলেন। আমার মনে হয় তাঁর কড়াকড়ির মূলে ছিল অধিক শেখানোর আগ্রহ। সংস্কৃত ও ফারসী শিক্ষকদের মধ্যে এক রকমের আড়াআড়ি চলিত। মৌলবী সাহেব নরম প্রকৃতির লোক ছিলেন। ছাত্রেরা বলাবলি করিত যে ফারসী খুব সহজ, আর মৌলবী সাহেব বড় ভালমানুষ। ছাত্রেরা যতটা করে তাতেই তিনি তুষ্ট। 'সহজ'-এর লোভে আমি মজি ও এক দিন ফারসী ক্লাসে গিয়া বসি। সংস্কৃত শিক্ষক দুঃখিত হন। তিনি আমায় ডাকেন ও বলেন, 'ভুলে যেও না তুমি কার ছেলে। তোমার ধর্মের ভাষা শিখবে না? তোমার যেখানে অসুবিধা আমায় বলবে। তোমাদের সবাইকে আমি ভাল সংস্কৃত শেখাতে চাই। পরে এতে অমৃতের আস্বাদ

পাবে। তোমার হার মানা উচিত নয়। ফের আমার ক্লাসে এসে বস।'

লজ্জিত হইলাম। শিক্ষকের ভালবাসা উপেক্ষা করিতে পারিলাম না। কৃষ্ণশঙ্কর পাণ্ড্যের কাছে আমি কত যে ঋণী সে কথা স্মরণ না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না। কারণ তখন যেটুকু সংস্কৃত শিখিয়াছিলাম ততটুকুও না শিখিলে আজ সংস্কৃতে শাস্ত্রের যে রস আস্বাদ করিতে পাই তাহা সম্ভব হইত না। সংস্কৃত ভাল শেখা হয় নাই বলিয়া আমার খেদ থাকিয়া গিয়াছে। কেন না, পরে আমি বুঝিতে পারিয়াছি যে হিন্দু বালক-বালিকা-মাত্রের সংস্কৃতের ভাল জ্ঞান থাকা আবশ্যক, না থাকা অন্যায়।

এখন আমার মত এই যে, ভারতবর্ষের উচ্চ শিক্ষার পাঠ্য তালিকায় মাতৃভাষা ছাড়াও হিন্দী, সংস্কৃত, ফারসী, আরবী ও ইংরেজী থাকা আবশ্যক। এই তালিকা দেখিয়া ঘাবড়াইবেন না। শিক্ষার পদ্ধতি সুব্যবস্থিত হইলে ও সব বিষয় ইংরেজীর মারফতে শেখানোর ভূত আমাদের কাঁধ হইতে নামিয়া গেলে এই সকল ভাষা শেখা কঠিন হইবে না, বরং আনন্দের জিনিস হইবে। শাস্ত্রীয় পদ্ধতিতে কোন ভাষা শিখিলে অন্য ভাষা শেখা সহজ হয়।

আসলে হিন্দী, গুজরাটী, সংস্কৃতকে এক ভাষাই বলা চলে। তেমনি ফারসী ও আরবীকে একই গোত্রে ফেলা যায়। যদিও ফারসী সংস্কৃতের ও আরবী হিব্রুর কাছাকাছি তবুও ইসলামের উদয়ের পরে এই দুইয়ের বিকাশ হইয়াছে বলিয়া এই দুইয়ের সম্বন্ধ নিকট। উর্দুকে আমি পৃথক্ ভাষার মান দেই না কারণ তা হিন্দীর ব্যাকরণ অনুসরণ করে আর উহার শব্দসম্ভার মূলতঃ ফারসী ও আরবী হইতে নেওয়া। ভাল উর্দু যে শিখিতে চায় তার ফারসী ও আরবী শিখিতেই হইবে, যেমন সংস্কৃত শিখিতে হইবে তার যে ভাল গুজরাটী, হিন্দী, বাংলা বা মারাঠী শিখিতে চায়।

দুঃখদ প্রসঙ্গ

পূর্বে বলিয়াছি যে হাইস্কুলে নিকট বন্ধু আমার কম ছিল। নিকট বলা চলে এরূপ দুইজন বন্ধু আলাদা আলাদা সময়ে ছিল। একের সহিত সম্বন্ধ বেশি-দিন টেকে নাই যদিও আমি তাকে ত্যাগ করি নাই। দ্বিতীয়ের সঙ্গ করি

বলিয়া প্রথম আমায় ছাড়িয়া যায়। দ্বিতীয়ের সঙ্গ আমার জীবনের এক দুঃখের প্রকরণ। এই সঙ্গ অনেক দিন স্থায়ী হইয়াছিল। তাকে ভাল করিব এই ভাবনা হইতে তাহার সঙ্গ করিতাম।

মেজদার সহিত তাহার প্রথমে বন্ধুত্ব হয়। মেজদা ও সে এক ক্লাসে পড়িত। তাঁর কতকগুলি দোষের কথা আমি জানিতাম। কিন্তু সে যে বিশ্বাসের অযোগ্য এ কথা কোন দিন স্বপ্নেও ভাবি নাই। মা, দাদা, আমার স্ত্রী কেউ এই মিতালিকে ভাল চোখে দেখে নাই। স্ত্রী সাবধান করিয়া দেয়। কিন্তু পতিত্বের গর্বে অন্ধ আমি তাহার কথা শুনিব কেন? মায়ের আদেশ অমান্য করার কথাই ওঠে না। বড়দার কথাও হেলা কোন দিন করিতাম না। তবে তাঁদিগকে এই বলিয়া শান্ত করিয়াছিলাম, 'ওর যে সব দোষের কথা বলছ তা আমি জানি। ওর গুণের কথা তোমরা জান না। সে আমাকে কুপথে নেবে না, কারণ তাকে সুপথে আনার জন্যই না তার সঙ্গে আমার মিতালি। আমার বিশ্বাস ভাল পথ ধরে ত সে মানুষের মত মানুষ হবে, আমার ওপর ভরসা রাখ, ভয় পেয়ো না।'

আমার মনে হয় না যে আমার কথায় তাঁদের অসোয়াস্তি দূর হইয়াছিল। তবুও আমার কথা তাঁরা মানিয়া নেন ও আমার মতে আমাকে চলিতে দেন।

পরে আমি দেখিতে পাই যে হিসাবে আমার ভুল হইয়াছিল। সুপথে আনার আগ্রহেও অথই জলে যাইতে নাই, যাকে ভাল করিতে হইবে তাহার সহিত মিত্রতার অবসর নাই। বন্ধুত্ব মানে অদ্বৈতভাবনা। এমন বন্ধুত্ব জগতে ক্বচিৎ দেখা যায়। বন্ধুত্ব একই প্রকৃতির মানুষেই শোভে ও সাজে। বন্ধুত্বে একের প্রভাব অন্যের ওপর না পড়িয়া যায় না। তাই বন্ধুত্বে সংশোধনের অবকাশ বড় কম। আমার মতে কারও সঙ্গে অতি মাখামাখি করাতে ভয় আছে, কারণ দোষ মানুষ ঝট্ করিয়া গ্রহণ করে। গুণ গ্রহণ করার জন্য প্রয়াস করিতে হয়। আত্মা তথা ঈশ্বরকে যে সখারূপে পাইতে চায় তার একলা থাকিতে হয় বা সমস্ত জগতকে আপন করিয়া লইতে হয়। আমার এই কথা ঠিক হোক বা বেঠিক হোক, আমি কিন্তু মাখামাখি মিতালির পরীক্ষায় ফেল হইয়াছি।

রাজকোটে যে সময়টায় 'সংস্কার'-এর বন্যা বহিয়াছিল তখন আমি এই বন্ধুর সংসর্গে আসি। সে আমাকে বলে যে হিন্দু শিক্ষকদের অনেকে চুপি চুপি

মাংস খায়। রাজকোটের কয়েক জন নামজাদা লোকের নামও করে। হাইস্কুলের কোন কোন ছাত্রের কথাও বলে।

আশ্চর্য হই; আঘাত লাগে। অমনটা করার কারণ জিজ্ঞাসা করি। উত্তরে সে বলে, 'মাংস খাইনে বলে আমরা বলহীন হয়ে গেছি। মাংস খায় তাই ইংরেজ আমাদের রাজা বনেছে। দেখতেই পাচ্ছ আমি জোয়ান আর কেমন দৌড়তে পারি। মাংসাহারই এর কারণ। মাংস খেলে ফোড়া হয় না, হলেও ঝট্ করে সেরে যায়। আমাদের মাস্টারেরা খায়। এত সব নামজাদা লোকে খায়। তারা কি না বুঝে-সুঝে খায়? তোমারও খাওয়া উচিত। খাও ত দেখতে পাবে তোমার গায়ে জোর কত বেড়েছে।'

এরূপ মন্ত্রণা, এমন সলা এক দিন দিয়াছিল তাহা নয়। সাজিয়ে-গুজিয়ে জোরালো উদাহরণ সহযোগে আমার কানে জপিয়াছিল অনেক বার। মেজদা অনাচার কবেই করিয়াছিল। সুতরাং সে তার কথায় সায় দেয়। তাদের শরীরের গড়ন আমা অপেক্ষা মজবুত ছিল। গায়ে শক্তিও ছিল তাদের বেশি। আর সাহসও অধিক। বন্ধুর পরাক্রমে আমি মুগ্ধ হইয়া যাইতাম। যত খুশি সে দৌড়াইতে পারিত। আর দৌড়াইতও খুব বেগে। কি লম্বা লাফ কি উঁচু লাফ দুইয়েতেই সে ওস্তাদ ছিল। শাস্তি খাওয়ার শক্তিও ছিল তেমনই। নানাবিধ শক্তির খেলাই সে সময় সময় আমাকে দেখাইত। নিজেতে যে শক্তি নাই অন্যতে তাহা দেখিয়া মানুষ আশ্চর্য হয়ই। আমারও তাহাই হইয়াছিল। আশ্চর্যের বোধ হইতে মোহ জন্মিয়া থাকে। দৌড়-ঝাঁপ করার শক্তি আমার প্রায় ছিলই না। ভাবিতাম, আমিও যদি এই বন্ধুর মত হইতে পারিতাম তবে কতই না ভাল হইত!

তা ছাড়া, আমি অত্যন্ত ভীরু ছিলাম। চোর, ভূত, সাপ ইত্যাদির ভয়ে আমি আড়ষ্ট হইয়া থাকিতাম। রাতে একা কোথাও যাইতে সাহস হইত না। আঁধারে ঘরের বাহিরে যাইতাম না। বিনা আলোতে ঘুমানো একরকম অসম্ভব ছিল। অন্ধকারে শুইতাম ত মনে হইত ওইনা ভূত আসছে, চোর উঁকি মারছে, সাপ ঘরে ঢুকছে! তাই বাতি রাখিতেই হইত। স্ত্রী পাশেই শুইত, কিন্তু তাকে এই ভয়ের কথা বলি কোন্ লাজে; সে ত তখন আর বালিকা নয়, প্রায় প্রাপ্তবয়স্কা! আমি বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে সে আমা অপেক্ষা সাহসী, অতএব লজ্জায় মরিতাম। ভূত-প্রেত সাপ-বিছার ভয় কি সে জানিত না। আঁধারে সে একলা চলিয়া যাইত। আমার বন্ধু

আমাব এই সব দুর্বলতার কথা জানিত। আমাকে সে বলিত জ্যান্ত সাপ সে হাতে ধরে, চোরের ভয় তার নাই, আর ভূত ত মানেই না। এই সব সে বিনাইয়া বিনাইয়া বলিত।

এই সময়ে নর্মদ-এর [১] রচিত এই হালকা ত্রিপদি ছাত্রদের মুখে মুখে ঘুরিত:

ইংরেজ রাজার জাত, শাসন করে দুব্‌লা ভারতীয়ে,
পুরা পাঁচ হাত ঢ্যাঙা সে যে মাংস আহারিয়ে।

এই সবের পুরাপুরি ক্রিয়া আমার মনের ওপর হইল। আমি মজিলাম। মাংসাহার ভাল, তাতে আমার শক্তি ও সাহস বাড়িবে, আর গোটা দেশ খায় ত ইংরেজ তাড়ানো যাইবে এই বিশ্বাস আমার জন্মিল।

পরীক্ষা করার দিন ধার্য হইল।

এই 'নিশ্চয়ের'—এই আরম্ভের অর্থ যে কি তা সকল পাঠক বুঝিবেন না। গান্ধীরা বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের লোক। মাবাপ গোঁড়া বৈষ্ণব ছিলেন। নিত্য হাবেলীতে যাইতেন। গান্ধী পরিবারের নিজেদেরই কতকগুলি মন্দির ছিল। তা ছাড়া জৈন ধর্মের প্রভাব গুজরাটে খুব বেশি। সকল জায়গায়, সকল কাজে তার ছাপ। তাই মাংসাহারের প্রতি যেরূপ বিরোধ ও ঘৃণা গুজরাটে শ্রাবক [২] ও বৈষ্ণবদের মধ্যে দেখা যায় সেরূপ বিরোধ ও ঘৃণা ভারতে বা অন্য কোথাও দেখা যায় না। এরূপ সংস্কারে ও পরিবারে আমি জন্মিয়াছিলাম, মানুষ হইয়াছিলাম।

মা বাবার আমি পরম ভক্ত ছিলাম। জানিতাম, আমি মাংস খাইয়াছি এই কথা শুনিলে তাঁদের মৃত্যুর অধিক যাতনা হইবে। জ্ঞানত হোক বা অজ্ঞানত হোক সত্যের সাধক আমি ছিলামই। মাংস খাইলে যে মা বাবাকে ধোঁকা দেওয়া হইবে এই জ্ঞান তখন আমার ছিল না এ কথা বলিতে পারি না। কিন্তু 'সংস্কার'-এর ঝোঁক আমায় পাইয়া বসিয়াছিল। মাংস খাওয়ার শখ ছিল না। মাংস খাইতে ভাল এই লোভে মাংস খাইতে যাইতেছিলাম তাও নয়। মাংস খাইলে আমার শক্তি ও সাহস বাড়িবে, অন্যে আমার

১ প্রসিদ্ধ গুজরাটী কবি (১৮৩৩-৮৬)। অর্বাচীন গদ্যের স্রষ্টাকর্তা। গুজরাটীর নব কাব্যধারার এক প্রধান কবি।

২ শ্রাবক—জৈন বা বৌদ্ধ গৃহস্থ।

পথে চলিয়া শক্তিমান ও সাহসী হইবে আর তার পরে ইংরেজ তাড়াইয়া ভারত স্বাধীন করিতে পারা যাইবে এই ছবি আমার সামনে ছিল। তখন 'স্বরাজ' শব্দ আমি শুনিও নাই। সংস্কারের উৎসাহে আমি বুদ্ধি খোয়াইয়াছিলাম।

৭

দুঃখদ প্রসঙ্গ—২

ধার্য দিন আসিল। আমার অবস্থা ঠিক ঠিক বর্ণনা করা শক্ত। এক দিকে 'সংস্কার'-এর উৎসাহ, জীবনে মস্ত পরিবর্তন করার মত নূতনত্বের মাদকতা ছিল; অর অন্য দিকে ছিল চোরের মতন লুকাইয়া কাজ করার লাজ। এই দুইয়ের কোন্‌টা প্রধান ছিল আমার স্মরণ নাই। নদীর কিনারে নিরালা জায়গা খুঁজিতে আমরা বাহির হইলাম। কিছু দূরে, আমাদের কেহ দেখিতে পাইবে না এমন আড়াল পাইলাম, আর সেখানে যে বস্তু কখনও দেখি নাই তা—মাংস—দেখিলাম! সঙ্গে পাউরুটিও ছিল। দুইয়ের কোনটাই রুচিল না। মাংস মনে হইয়াছিল যেন শক্ত চামড়া। উদরস্থ করা গেল না। গা-বমি করিতে লাগিল। উঠিয়া পড়িতে হইল।

সেই রাতটা কি ভাবে যে গিয়াছিল! চোখে ঘুম ছিল না। যেই চোখ বুজিয়া আসিতেছিল দারুণ দুঃস্বপ্ন দেখিতেছিলাম—দেখিতেছিলাম জ্যান্ত পাঁঠাটা যেন আমার ভিতরে ভ্যা ভ্যা করিয়া কাঁদিতেছে আর অমনি চমকিয়া চমকিয়া উঠিতেছিলাম। অনুতাপে পুড়িয়া মরিতেছিলাম। পরক্ষণেই আবার মনকে এই বলিয়া সান্ত্বনা দিতেছিলাম—মাংস খাওয়া ত কর্তব্য, আর তা খাইতেই হইবে। তাই ঘাবড়াইলে চলিবে কেন!

বন্ধু হার মানার পাত্র ছিল না। এখন সে মাংসের নানা জিনিস তৈরি করাইতে লাগিল ও নানা মসলা সহযোগে সুপাচ্য করিয়া তা সামনে ধরার ব্যবস্থা করিল। এখন আর নদীর নিরালা কিনারায় নয়, প্রধান বাবুর্চীর সঙ্গে যোগসাজসে টেবিল চেয়ারে সাজানো সরকারী ডাক-বাংলায় চুপি-চুপি।

টোপ উপেক্ষা করা গেল না, গিলিলাম। রুটিতে তখন আর সেই ঘৃণা ভাব নাই, পাঁঠার ওপর দয়া অন্তর্হিত হইয়াছে, আর মাংসে না হইলেও

মাংসের তৈরি খাদ্যে রুচি জন্মিয়াছে। এইভাবে এক বছর গিয়া থাকিবে, সেই সময় মধ্যে বার পাঁচ-ছয় মাংসের ভোজ মিলিয়া থাকিবে, কারণ সরকারী ডাক-বাংলা ইচ্ছামত পাওয়া যাইত না, আর মাংসের সুস্বাদু জিনিস তৈরি করার সুবিধাও যখন তখন হইত না। তা ছাড়া এইরূপ খাদ্যের আয়োজন করিতে পয়সাও লাগে। এই 'সংস্কারের' জন্য পয়সা খরচ করার সংগতি আমার ছিল না। অতএব সব সময় বন্ধুরই সেই খরচ যোগাইতে হইত। পয়সা সে কোথায় পাইত তা আজও আমি জানি না। তবুও পয়সা সে খরচ করিত কারণ তার উদ্দেশ্য ছিল আমাকে সে মাংসখোর করিবে, অনাচারী বানাইবে। কিন্তু তার হাতে কিছু অফুরন্ত পয়সা ছিল না। সুতরাং এরূপ ভোজ ক্বচিৎ কখনও হইত।

যেদিন এরূপ লুকানো-ছিপানো খাওয়া জুটিত সেদিন বাড়ীতে আর কোন্ পেটে খাইব! তাই মা যখন খাইতে ডাকিতেন অছিলার আশ্রয় লইতে হইত, বলিতে হইত 'খিদে নেই, হজম হয়নি।' এই-সব বাহানা যখন করিতাম মনে শেল বিঁধিত—মিথ্যা বলিতেছি, তা-ও মার কাছে! তাঁদের ছেলে মাংস খায় এ কথা মা-বাবা শোনেন ত তা তাঁদের পক্ষে বজ্রাঘাত সমান হইবে এই কথা যখন ভাবিতাম, বুকটা মোচড় দিয়া উঠিত, মনে হইত এই বুঝি ছিঁড়িয়া যাইবে।

তাই মনে মনে বলিলাম, 'মাংস খাওয়া দরকার, তার প্রচার করে ভারতে 'সংস্কার' সাধন করাও আবশ্যক, এ কথা ঠিক হলেও মা-বাবাকে মিথ্যা বলা, তাঁদের ধোঁকা দেওয়া,—মাংস না-খাওয়া হতে অধিক বড় পাপ। সুতরাং মা-বাবা যত দিন আছেন, মাংস না খাওয়াই আমার ধর্ম। তাঁদের মৃত্যুর পরে যখন স্বাধীন হব তখন প্রকাশ্যে খাব। তত দিন মাংস না ছোঁয়াই আমার কর্তব্য।'

এই সংকল্পের কথা বন্ধুকে জানাইয়া দেই। আর ওই যে ছাড়িয়াছি ত ছাড়িয়াছি। মা-বাবা জানিতে পান নাই যে তাঁদের দুই ছেলে মাংস খাইয়াছে। মাতাপিতার সহিত ছল না করার শুভ সংকল্প হইতে মাংস ছাড়িলাম বটে, কিন্তু বন্ধুত্বে ছেদ পড়িল না। পতিতকে আমি তুলিতে গিয়াছিলাম; নিজেই ডুবিলাম। ডুবিয়াছি যে সেই বোধটা পর্যন্ত আমার ছিল না।

এই সংসর্গের ফলে ব্যভিচারও আমি করিতে পারিতাম। অল্পের জন্য

আমি বাঁচিয়া গিয়াছিলাম। একবার সে আমাকে বেশ্যাপাড়ায় লইয়া যায়। আবশ্যক মন্ত্রণা দিয়া এক ঘরে আমাকে ঢুকাইয়া দেয়। পয়সা-কড়ি দেওয়ার প্রশ্ন আমার ছিল না। আগেই সে তা চুকাইয়া দিয়াছিল। আমার করার ছিল কেবল রতি-আবেদন। আমি পাপের মুখে গিয়াছিলাম। কিন্তু ভগবান যাকে বাঁচাইতে চান ডুবিতে গেলেও সে ভাসিয়া ওঠে। ওই পাপ-গৃহে আমি যেন দৃষ্টি হারাইয়াছিলাম, বোবা হইয়া গিয়াছিলাম। না মুখে কথা, না চোখে চাউনি, স্ত্রীলোকটির খাটে তার পাশে জড়সড় বসিয়াছিলাম। রাগ তার হইতেই পারে আর হইয়াছিলও এবং অকথ্য গালাগালি করিয়া সে আমায় তাড়াইয়া দিয়াছিল।

সেই সময়টায় আমার মনে হইয়াছিল, আমার পুরুষত্বে ধিক্, পৃথিবী ফাঁক হয় ত তাতে ঢুকিয়া লাজ ঢাকি। কিন্তু পরে চিরদিন আমার এই বাঁচাকে আমি ঈশ্বরের অনুগ্রহ বলিয়া দেখিয়াছি। এরূপ উপলক্ষ্য আমার জীবনে আরও চার বার আসিয়াছিল। বলিতেই হইবে যে প্রায় সব ক্ষেত্রেই নিজের চেষ্টা বিনা সংযোগবশে আমি রক্ষা পাইয়াছিলাম। নিছক নৈতিক দৃষ্টিতে দেখিলে আমার পতনের কিছু বাকী ছিল না। ভোগের বাসনা ছিল সুতরাং বলিতে হইবে ভোগই করিয়াছিলাম। তা হইলেও নৈতিক দৃষ্টিতে ইচ্ছা করা সত্ত্বেও প্রত্যক্ষ কর্ম হইতে লোকে বাঁচে ত তাকে আমরা বাঁচাই বলি। এইটি ও অন্য সব উপলক্ষ্যে আমি এইভাবে এবং এতটাই বাঁচিয়াছিলাম। তা হইলেও এমন কতকগুলি ব্যাপার আছে যাহা হইতে দূরে থাকা ব্যক্তির ও তার সম্পর্কে যারা আসে তাদের পক্ষে অতীব লাভদায়ক। মানুষের যখন বিচারশুদ্ধি ঘটে তখন ওই কার্য হইতে বাঁচাকে সে ঈশ্বরের কৃপা বলিয়া গণনা করে। প্রযত্ন করা সত্ত্বেও লোকের পতন হয় এ কথা যেমন আমি আমার অভিজ্ঞতা হইতে জানি তেমন এ কথাও অভিজ্ঞতা হইতে জানি যে ডুবিতে গিয়াও লোক নানা সংযোগবশে বাঁচিয়া যায়। এখানে পুরুষার্থ কোথায়, দৈব কোথায়, অথবা কোন্ কারণবশে শেষটায় মানুষ ডোবে বা ভাসে এই এক গূঢ় প্রশ্ন। এর মীমাংসা আজ অবধি হয় নাই, আর শেষ মীমাংসা কোনদিন হইবে কি হইবে না বলা শক্ত। কিন্তু সে কথা থাক।

মূল বিষয়ে ফিরিয়া যাই। এই বন্ধুর সংসর্গ যে সর্বনাশের সেই চৈতন্য তবুও আমার হইল না। আরও কটু অভিজ্ঞতা আমার কপালে ছিল।

যে সব দোষ সে করিতেই পারে না বলিয়া ভাবিয়াছিলাম তেমন দোষ তাকে যখন স্বচক্ষে করিতে দেখিয়াছিলাম তখনই কেবল আমার হুঁশ হইয়াছিল। সে কথা পরে বলিব কারণ যতটা সম্ভব সময়ের ক্রম অনুসারে এই কথা লিখিতেছি।

তবে এই সময়কারই ঘটনা বলিয়া সেই সব কথার একটা কথা এখানে উল্লেখ করা আবশ্যক। স্বামীস্ত্রী আমাদের দুইয়ের মধ্যে যে কিছু মন কষাকষি ও ঝগড়া হইত তার এক কারণ ছিল এই বন্ধুত্ব। পূর্বে বলিয়াছি, আমার ভালবাসা যেমন গাঢ় ছিল, সন্দেহবাইও ছিল তেমনই উৎকট। এই বন্ধু যার কোন কথাই আমি অবিশ্বাস করিতাম না সেই সন্দেহে উসকানী দিত। তার কথায় বিশ্বাস করিয়া আমার সহধর্মিণীর ওপর আমি বহু অবিচার করিয়াছি। সেই অপরাধের ক্ষমা নাই; ক্ষমা নিজকে আমি করিও নাই। এরূপ কষ্ট একমাত্র হিন্দু স্ত্রীই নীরবে ভোগ করে আর তাই ত স্ত্রীলোককে আমি সদা সহনশীলতার মূর্তিরূপে দেখি। অকারণ সন্দেহ করিলে নোকর চলিয়া যায়, শুধু শুধু সন্দেহ করিলে ছেলে বাবার ঘর ছাড়ে, বন্ধু-বন্ধুর মধ্যে সন্দেহ উঁকি মারে ত বন্ধুত্বে ছেদ পড়ে। স্বামীর ওপর স্ত্রীর সন্দেহ হয় ত স্ত্রী মুখ বুজিয়া মনে মনে দগ্ধে। কিন্তু স্বামীর স্ত্রীর ওপর সন্দেহ জন্মে ত বেচারীর কপাল পোড়ে। সে যায় কোথায়? উচ্চ বর্ণ বলিয়া গণ্য হিন্দু গৃহের ঘরণী গাঁটছড়া রদ করিতে আদালতেও যাইতে পারে না, এমনটাই একচোখো ন্যায়ের ব্যবস্থা তার বেলায়। এমন ন্যায়ই তার ওপর আমি করিয়াছিলাম। সেই বেদনা আমার চিরসাথী।

এই সন্দেহ কেবল তখনই নিঃশেষে শেষ হয় যখন অহিংসার সূক্ষ্ম জ্ঞান আমার জন্মে, অর্থাৎ ব্রহ্মচর্যের মহিমা বুঝিতে পাই, বুঝিতে পাই যে পত্নী পতির দাসী নহে, সহচারিণী সহধর্মিণী, আর এই দুই একে অন্যের সুখদুঃখের সমভাগী, তা বাদে আরও দেখিতে পাই যে স্বামীর নষ্টামি করার অধিকার থাকে ত পত্নীরও সেই অধিকার আছে। সেই সন্দেহবাইর কথা যখন মনে হয় নিজের বোকামির ও বিষয়ান্ধ নিষ্ঠুরতার কারণে নিজের ওপর ক্রোধ জন্মে, আর বন্ধুত্বের সেই মোহের কথা মনে পড়িলে নিজের ওপর হয় দয়া।

৭

চুরি ও প্রায়শ্চিত্ত

মাংস খাওয়ার সময়কার ও তার আগেকার আরও দুই একটি দোষের কথা বলা হয় নাই, এখানেই তাহা বলা দরকার। সে সব বিবাহের পূর্বেকার বা ঠিক পরেকার কথা।

এক আত্মীয়ের ও আমার বিড়ি খাওয়ার শখ জন্মে। বিড়ি খাওয়া ভাল বা উহার গন্ধ মজার এমন ভাব আমাদের কারু ছিল না। মুখ হইতে ফুক ফুক ধোঁয়া ছাড়িতে কী আরাম ভাবটা ছিল সেরেফ এই। আমার কাকা বিড়ি খাইতেন। তাঁকে ও অন্যকে বিড়ি খাইতে দেখিয়া আমাদের বিড়ি ফোঁকার সাধ হয়। গাঁটে আমাদের পয়সা কোথায় যে বিড়ি কিনিব। তাই বিড়ি খাওয়ায় পরে কাকা যে ঠুঁটো ফেলিয়া দিতেন তা আমরা লোকের নজরের আড়ালে কুড়াইয়া লইতাম।

কিন্তু বিড়ির অবশেষ সব সময় পাওয়া যাইত না। আর ধোঁয়াও তা হইতে বেশি বাহির হইত না। তাই চাকরের পকেটে যে দুইচার পয়সা থাকিত তা হইতে মধ্যে মধ্যে এক-আধ পয়সা চুরি করিতাম। তা দিয়া বিড়ি কিনিতাম। কিন্তু সমস্যা দাঁড়াইল তা রাখি কোথায়। বড়োদের সামনে বিড়ি খাওয়া যায় না সে কথা জানিতাম। এইভাবে দুই চার পয়সা চুরি করিয়া সপ্তাহ কয়েক চলে। এই সময়ে এক গুল্মের কথা শুনিতে পাই যার ডাঁটা ছিদ্রযুক্ত ও বিড়ির মত জ্বালানো ও টানা যায়। তা যোগাড় করিয়া টানিতে লাগিলাম।

তাতে কী মন ওঠে! নিজেদের পরাধীনতায় হাঁফাইয়া উঠি। বড়োদের আজ্ঞা ছাড়া কিছু করার জো নাই এইটা বেদনার কারণ হয়। জীবন অতিষ্ঠ মনে হয়; ঠিক করিলাম আত্মহত্যা করিব।

কিন্তু আত্মহত্যা করার উপায়? বিষ কে দিবে? শুনিয়াছিলাম ধুতুরা-বীজ খাইলে লোক মরে। জঙ্গল হইতে তাহা লইয়া আসিলাম। সময় ঠিক হইল—সন্ধ্যা। কেদারনাথজীর মন্দিরে গেলাম; প্রদীপে ঘি দিলাম; ঠাকুর দর্শন করিলাম। পরে নিরাপদ জায়গায় গেলাম। কিন্তু সাহসে কুলাইল না। মনে নানা ভাবের খেলা—সঙ্গে সঙ্গে যদি না মরি? মরিয়াই বা কি লাভ? পরাধীনতা মানিয়া লইলে ক্ষতি কি। ইহার মধ্যে দুই-চারটি বীজ

খাওয়া হইয়া গিয়াছে। বাকী বীজ খাওয়ার সাহস হইল না। দুইয়েরই মরণের ভয়। ঠিক করিলাম, রামজীর মন্দিরে গিয়া দেবদর্শন করিব, তাপ ভুলিয়া গিয়া শান্ত হইব ও আত্মহত্যার ভাবনা দূর করিয়া দিব।

দেখিতে পাইলাম আত্মহত্যার কথা বলা সহজ, আত্মহত্যা করা সহজ নয়। তাই কেউ আত্মহত্যা করার ভয় দেখাইলে আমার ওপর তার বড় একটা অথবা বলিব কি আদৌ কোন ক্রিয়া হয় না।

আত্মহত্যা করার কথা ভাবার ফলে হইল এই, এঁটো বিড়ি কুড়াইয়া ফোঁকার বা চাকরদের পয়সা চুরি করিয়া বিড়ি টানার অভ্যাস আমাদের দূর হইয়া যায়। বড় হওয়ার পরে বিড়ি খাওয়ার ইচ্ছা কোন দিন আমার হয় নাই। বরং এই অভ্যাসটা আমার কাছে চিরদিন অভদ্র, বিশ্রী ও হানিকর মনে হইয়াছে। পৃথিবী-সুদ্ধ লোক ধূমপানের জন্য কেন যে এমন পাগল তা আমি ভাবিয়া পাই না। রেলগাড়ীর কামরায় খুব ধূমপান চলে ত সেখানে বসা আমার পক্ষে দায় হয়, বিড়ি-সিগারেটের ধোঁয়ায় আমার দম বন্ধ হইয়া আসে।

সন্দেহ নাই, বিড়ির টুকরা চুরি করা বা বিড়ির জন্য চাকরদের পয়সা চুরি করা খারাপ কাজ। কিন্তু পরে যে চুরি করিয়াছিলাম আমার দৃষ্টিতে তা ছিল আরও বেশি কুৎসিত। বিড়ির দোষটা করিয়াছিলাম বার কি তের বছর বয়সে। আর পরের চুরি যখন করিয়াছিলাম তখন আমার বয়স ছিল পনের। আমার মাংসখোর ভাইয়ের তাবিজের এক টুকরা আমি চুরি করি। টাকা পঁচিশেক দেনা ছিল। কিরূপে এই কর্জ শোধ করা যায় আমরা দুই ভাই সে কথা ভাবিতেছিলাম। মেজদার হাতে নিরেট সোনার তাগা ছিল। তাহা হইতে তোলাটাক কাটিয়া লওয়া অসুবিধা ছিল না।

কাজটা করিলাম। ধার শোধ হইল। কিন্তু মন অশান্তিতে ভরিয়া গেল। প্রতিজ্ঞা করিলাম কখনও আর চুরি করিব না। মনে হইল বাবাকে সব বলা কর্তব্য। কিন্তু জিভে কথা সরিল না। মারধরের ভয় ছিল না কারণ বাবাকে আমাদের কাউকে কোনদিন মারধর করিতে আমি দেখি নাই। ভয় ছিল অন্য কিছু: তাঁর ভীষণ লাগিবে, হয়ত বা মাথা কুটিবেন। তবুও মনে হইল, দোষ স্বীকার করিতেই হইবে, নতুবা দোষ দূর হইবে না।

শেষে ঠিক করি, পত্র মারফতে দোষ স্বীকার করিয়া ক্ষমা চাহিব। পত্র

লিখি। তাতে সব দোষ স্বীকার করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করি। আমার দোষের জন্য তিনি যেন দগ্ধ না হন এই অনুনয় করিয়া কথা দেই যে জীবনে আর কখনও অমন পাপ করিব না।

কাঁপা হাতে বাবাকে চিঠি দেই। তাঁর তক্তপোসের পাশে বসিয়া পড়ি। ভগন্দরে বাবার ওঠার শক্তি ছিল না তাই খাটিয়ার বদলে তক্তপোসে ছিলেন।

বাবা চিঠি পড়িলেন। তাঁর চোখ হইতে মুক্তাবিন্দু গড়াইতে লাগিল। চিঠি ভিজিয়া গেল। ক্ষণেক চোখ বুজিয়া থাকিলেন; পত্র ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। পত্র পড়ার জন্য উঠিয়া বসিয়াছিলেন, আবার শুইলেন।

আমিও কাঁদিলাম। বাবার বেদনা বুঝিলাম। চিত্রকর হইলে সেই ছবি হুবহু আজ আঁকিতে পারিতাম। আজও সেই ছবি আমার চোখের সামনে তেমনই স্পষ্ট ভাসে।

মুক্তাবিন্দু নয় ত তা ছিল স্নেহশর। আমার অন্তরে তা পশে; আমাকে শুদ্ধ করিয়া দেয়। যাতে লাগিয়াছে সেই প্রেম-পরশ সেই জানে তা কি:

রামবাণ ব্যাগ্যাং রে হোয় তে জাণে।

অহিংসায় আমার হাতেখড়ি হইল। বাবার ভালবাসার অতিরিক্ত কিছু তখন তাতে আমি দেখিতে পাই নাই, কিন্তু আজ বুঝিতে পারিয়াছি যে তা শুদ্ধ অহিংসা ছিল। এরূপ অহিংসা যখন ব্যাপক হয় সাধ্য কি তখন তার ছোঁয়াচ হইতে কেউ বাঁচে? এরূপ ব্যাপক অহিংসার শক্তির মাপজোখ হয় না।

বাবার স্বভাবে এরূপ শান্ত ক্ষমা ছিল না। আমি ধরিয়া রাখিয়াছিলাম, বাবা রাগ করিবেন, মন্দ বলিবেন, হয়ত বা মাথা কুটিবেন। উল্টা যারপর-নাই ধীরভাবে জিনিসটা তিনি নেন। আমার মনে হয় মন খুলিয়া দোষ স্বীকার করিয়াছিলাম বলিয়া অমনটা ঘটিয়াছিল। যে লোক আপনা হইতে মুরব্বীর কাছে মন খুলিয়া নিজের দোষ স্বীকার করে ও কথা দেয় যে আর কখনও দোষ করিবে না সে শুদ্ধতম প্রায়শ্চিত্ত করে। আমি জানি যে এইভাবে দোষ স্বীকার করিয়াছিলাম বলিয়া বাবা আমার বিষয়ে নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন; আমার প্রতি তাঁর মহান্ প্রেম আরও বাড়িয়া গিয়াছিল।

৯

বাবার মৃত্যু : আমার ডবল কলঙ্ক

তখন আমি ষোল বছরের। ওপরে বলিয়াছি যে বাবা ভগন্দরে শয্যাগত ছিলেন। বাবার বেশির ভাগ সেবা মা, বাড়ীর এক পুরাতন চাকর ও আমি এই তিনে মিলিয়া করিতাম। আমার কাজ ছিল নার্স-এর কাজ—ঘা ধোয়ানো, ওষুধ খাওয়ানো, মলম লাগানো আর বাড়ীতে ওষুধ তৈরি করিতে হইলে তা তৈরি করা। নিত্য রাতে তাঁর পা টিপিয়া দিতাম। তিনি যখন বলিতেন বা ঘুমাইয়া পড়িতেন তখন শুইতে যাইতাম। ও কাজটা আমার অতি প্রিয় ছিল। মনে পড়ে না কোনও দিন এই কাজে আমার ছেদ পড়িত। সেই সময়ে আমি হাইস্কুলে পড়িতাম, তাই নাওয়া-খাওয়া ইত্যাদি বাদে বাকী সময় স্কুলের পড়ায় ও বাবার সেবায় দিতাম। যেদিন তিনি বলিতেন ও তাঁর শরীর ভাল থাকিত সেদিন বেড়াইতে যাইতাম।

এই সময়ে আমার পত্নী সন্তান-সম্ভবা হয়। আজ বুঝিতে পারিতেছি ওটা আমার ডবল কলঙ্কের কথা ছিল। একে ত ছাত্রজীবনে সংযম খোয়াইয়াছিলাম, তাতে যে বিদ্যালয়ের পড়াকে ধর্ম মনে করিতাম, যে মাতৃপিতৃভক্তিকে তা-অপেক্ষাও বড় ধর্ম বিবেচনা করিতাম (বাল্যকালেই না আমি শ্রবণের মাতৃপিতৃভক্তিকে জীবনের আদর্শ করিয়া লইয়াছিলাম), আমার সেই ধর্ম জৈব বাসনার মুখে ভাসিয়া যায়। রাতে বাবার পা যখন টিপিতাম মন পড়িয়া থাকিত শোবার ঘরে, তাও আবার সেই অবস্থায় যেই অবস্থায় কি ধর্মশাস্ত্র, কি বৈদ্যকশাস্ত্র, কি ব্যবহারশাস্ত্র মতে স্ত্রী-সঙ্গ ত্যাজ্য। যখন ছুটি পাইতাম মন খুশী হইত; বাবাকে প্রণাম করিয়া সোজা শোবার ঘরে যাইতাম।

বাবার অবস্থা দিন দিন খারাপ হইতেছিল। বৈদ্যেরা প্রলেপ দিল, হাকিমেরা পট্টী লাগাইল, হাতুড়েরা এটা-সেটা করিল, অন্যেরা টোটকা দিয়া দেখিল। কোন ইংরেজ সর্জন তাঁর যা কিছু করার ছিল করার পরে বলেন যে অস্ত্রোপচার ছাড়া অন্য চিকিৎসা নাই। কিন্তু গৃহ-বৈদ্য বাদ সাধেন ও বলেন যে শেষ অবস্থায় তখন চেরা-ফাড়া না করাই ভাল। তিনি প্রবীণ ছিলেন আর খ্যাতিও তাঁর ছিল। তাঁর পরামর্শ গ্রাহ্য হইল। অস্ত্রোপচারের যে সব উপচার সংগ্রহ করা হইয়াছিল বৃথা নষ্ট হইল। আমার বিশ্বাস

অস্ত্রক্রিয়া করিলে ঘা শুকাইতে বেগ পাইতে হইত না। ঠিক করা হইয়াছিল যে বোম্বাইয়ের তখনকার প্রসিদ্ধ সর্জন অস্ত্রক্রিয়া করিবেন। কিন্তু দিন যার ফুরাইয়াছে তার সুচিকিৎসা হইতে পারে কি? অস্ত্রোপচারের উপকরণ সমেত বাবা বোম্বাই হইতে চলিয়া আসেন; মৃত্যুর অপেক্ষায় থাকেন। দুর্বল হইতে হইতে এমন অবস্থা হয় যে বিছানা হইতে ওঠার শক্তি প্রায় ছিল না। কিন্তু বাবা কোন কথা শুনিতেন না, অতিশয় কষ্ট হইলেও বিছানা হইতে উঠিতেনই। বৈষ্ণব ধর্মের শাসন এতটাই কঠোর, বাহ্য শুচির ওপর এতটাই জোর।

শুচিশুদ্ধতা নিশ্চয়ই চাই। তবে আদৌ কোন ক্লেশ না দিয়া কিরূপে শোয়া-অবস্থার রোগীর শৌচাদি ক্রিয়া মায় স্নান পর্যন্ত বিছানাতেই শুচি-শুদ্ধভাবে করানো যায় সেই কৌশল পশ্চিমের ডাক্তারিবিদ্যা আমাদের কাছে ধরিয়াছে: তবুও যখনই রোগীর বিছানা দেখিবেন, দেখিবেন তা ধবধবে পরিষ্কার। এরূপ পরিচ্ছন্নতাকে আমি পুরাপুরি বৈষ্ণবধর্মসম্মত মনে করি। কিন্তু স্নানাদির জন্য বাবার বিছানা ত্যাগের আগ্রহ দেখিয়া তখন আমি আশ্চর্যান্বিত হইতাম, আমার অন্তরাত্মা ভক্তি-শ্রদ্ধায় ভরিয়া যাইত।

কাল রাত আসিল। কাকা সেই সময়ে রাজকোটে ছিলেন। আবছা আবছা মনে পড়ে বাবার অসুখের বাড়াবাড়ির খবর পাইতেই তিনি চলিয়া আসেন। দুই ভাইয়ের একের প্রতি অন্যের অতিশয় টান ছিল। কাকা দিনভর বাবার বিছানার পাশে বসিয়া থাকিতেন এবং রাতে আমাদের সকলকে ঘুমাইতে বলিয়া নিজে বাবার বিছানার পাশে শুইতেন। কখন যান এই ভয় ত ছিলই তবু কারও মনে হয় নাই যে এই রাতই শেষ রাত।

রাত তখন সাড়ে দশ কি এগার। বাবার পা টিপিতেছিলাম। কাকা বলিলেন, 'তুমি যাও, আমি বসছি।' খুশী হইলাম; সোজা শোবার ঘরে গেলাম। স্ত্রী বেচারি ঘুমে বিভোর। কিন্তু আমি ঘুমাইতে দিলে ত! জাগাইলাম। মিনিট পাঁচসাত হইয়া থাকিবে। যে চাকরের কথা ওপরে বলিয়াছি সে আসিয়া কপাটে ঘা দিল। বুকটা ধড়ফড় করিয়া উঠিল; চমকিয়া উঠিলাম। চাকর বলিল, 'ওঠ, বাপুর অবস্থা খারাপ।' অবস্থা খারাপ তা ত জানিতামই, সুতরাং 'অবস্থা খারাপ'-এর অর্থ যে এখানে কী তা বুঝিতে বিলম্ব হইল না। বিছানা হইতে লাফাইয়া উঠিলাম। বলিলাম: 'ঠিক বল, কি হয়েছে?'

'বাপু নেই।'

সব শেষ! কপাল থাবড়ানো ছাড়া আর কি করার ছিল! ভয়ানক লজ্জা হইল, অতিশয় খেদ। দৌড়াইয়া বাবার ঘরে গেলাম। মনে হইল, কামান্ধ না হইলে বাবার অন্তিম সময়ে তাঁর কাছ হইতে দূরে থাকার ব্যথা আমার সহিতে হইত না; অন্তিমক্ষণ পর্যন্ত তাঁর পা টিপিতে পাইতাম। তা নয়, কাকার মুখে শুনিতে হইল 'বাপু আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন।' বড় ভাইয়ের পরম ভক্ত কাকা অন্তিম সেবার গৌরব লাভ করেন। বাবা বুঝিতে পারিয়াছিলেন, সময় হইয়াছে। ইঙ্গিতে লেখার সরঞ্জাম চাহিয়া কাগজে লিখিয়া দেন 'তৈরি করো'। তার পরে বাবা বাহুর মাদুলি ও গলার সোনার কণ্ঠী ছিঁড়িয়া ফেলেন। সঙ্গে সঙ্গে আত্মা চলিয়া যায়।

এই আমার সেই কলঙ্ক—সেবার সময়েও ভোগাকাঙ্ক্ষা, যার ইঙ্গিত পূর্ব প্রকরণে করিয়াছি। এই কালো দাগ আজও মুছিয়া ফেলিতে পারি নাই, ভুলিতে পারি নাই। আর এই কথাও কোনক্রমেই আমার ভোলার উপায় নাই যে যদিও মাতাপিতার ওপর আমার অশেষ ভক্তি ছিল আর তাঁদের জন্য সব কিছু ত্যাগ করিতে পারিতাম তবুও পরীক্ষাকালে আমি অমন বিশ্রী ভাবে ফেল হইয়াছিলাম। ফেল হইয়াছিলাম তার কারণ সেবার সময়েও আমার মন ভোগচিন্তায় ডুবিয়া থাকিত। এটা আমার ক্ষমার অযোগ্য ত্রুটি ছিল। তাই পত্নীব্রত হইলেও নিজকে আমি বরাবর বিষয়ান্ধ বলিয়া গণনা করিয়াছি। এর হাত হইতে মুক্তি পাইতে আমার অনেক দিন লাগিয়াছে, আর বহু সংকটেও পড়িতে হইয়াছে।

ডবল কলঙ্কের এই প্রকরণ শেষ করার আগে ইহাও বলিয়া লইতেছি যে, স্ত্রী যে সন্তান প্রসব করে দুইচার দিন পরেই সে চলিয়া যায়। এ ছাড়া আর কী-ই বা হইতে পারিত? বাল দম্পতি বা মা বাপ সাবধান হইতে চান ত এই দৃষ্টান্ত হইতে সাবধান হইবেন।

১০

ধর্মের ঝিলিক

ছয় কি সাত বছর বয়সে স্কুলে ভরতি হই। ষোল পর্যন্ত পড়া চলে। স্কুলে ধর্ম বাদে সব কিছু শেখানো হইত। যা সহজেই তাঁরা দিতে পারিতেন

শিক্ষকদের কাছ হইতে তা পাই নাই বলিলে তাঁদের ওপর অবিচার করা হইবে না। তা হইলেও প্রতিবেশ হইতে এটাসেটা গ্রহণ করিয়া লইতে-ছিলাম। 'ধর্ম' শব্দ এখানে আমি উহার উদার অর্থে অর্থাৎ আত্মোপলব্ধি বা আত্মজ্ঞান অর্থে ব্যবহার করিতেছি।

বৈষ্ণব পরিবারে আমার জন্ম। তাই হাবেলিতে যাওয়া ছিল প্রায় আমার নিত্যকর্ম। কিন্তু উহার প্রতি আমার শ্রদ্ধাভাব ছিল না। উহার বৈভব ও জাঁকজমক আমার ভাল লাগিত না। হাবেলিতে অনীতি, অনাচার চলে এ কথা আমি শুনিয়াছিলাম। তাই উহার প্রতি আমার কোন টান ছিল না। সুতরাং কোন লাভ হয় নাই।

হাবেলি হইতে যা পাই নাই তা পরিবারের পুরানো পরিচারিকা আমার ধাই-এর কাছ হইতে পাইয়াছিলাম। তার স্নেহের কথা ভুলি নাই, ভুলিবার নয়। আগে বলিয়াছি, আমার ভূতপ্রেতের ভয় ছিল। রম্ভা (আমার ধাত্রী) আমায় বলে, রামনামে ভূত ভাগে। তার এই ঔষধে আমার যত-না আস্থা ছিল তার চেয়ে বেশী আস্থা ছিল তার ওপর। অতএব ভূতের ভয় হইতে বাঁচার জন্য ছোটবেলাতেই আমি রামনাম করিতে শিখি। তা অবশ্য বেশিদিন টেকে নাই। কিন্তু বাল্যকালে যে বীজ বোনা হইয়াছিল তা বৃথা যায় নাই। আজ ত রামনাম আমার মহা আশ্রয়, অমোঘ শক্তি। আমি মনে করি এই মহতী নারী যে বীজ বুনিয়াছিল তারই ইহা ফল।

আমাদের এক খুড়তুতো ভাই রামায়ণের ভক্ত ছিলেন। এই সময়ে তিনি আমাকে ও আমার মেজদাকে রামরক্ষার পাঠ শেখানোর ব্যবস্থা করেন। তা মুখস্থ করিয়া লইয়াছিলাম, স্নানের পরে ভোরে তা নিত্য পাঠ করিতাম। পোরবন্দরে থাকা পর্যন্ত তা চালু ছিল। রাজকোটের পরিবেশ কিছুটা আলাদা ছিল; সেখানে বাদ পড়ে। তার প্রতি আমার বড় একটা আকর্ষণ ছিল না। তবুও যে আবৃত্তি করিতাম তার এক কারণ ছিল দাদার কথা অমান্য করিতে নাই এই নীতিজ্ঞান, আর অন্য কারণ ছিল শুদ্ধ উচ্চারণে আবৃত্তি করিতে পারার অভিমান।

কিন্তু যে বস্তু আমার মনে গভীর দাগ কাটে সে ছিল রামায়ণের পারায়ণ। অসুখের অবস্থায় কিছুদিন বাবা পোরবন্দরে কাটান। সেখানে প্রতিদিন রাতে রামজী মন্দিরে রামায়ণ পাঠ শুনিতেন। পাঠ করিতেন লাধা মহারাজ নামে বিলেশ্বর নিবাসী এক পরম রামভক্ত পণ্ডিত। লোকে বলিত যে এক

সময়ে তাঁর কুষ্ঠ হইয়াছিল। কোন ঔষধ সেবন না করিয়া কেবল বিলেশ্বর মহাদেবের পূজান্তে ফেলে-দেওয়া বেলপাতা ক্ষতে লাগাইয়া ও রামনাম জপ করিয়া তিনি সারিয়া ওঠেন। সত্য মিথ্যা জানি না, লোকে বিশ্বাস করিত যে ভক্তিবলে তিনি রোগমুক্ত হইয়াছিলেন। আমরাও বিশ্বাস করিতাম। তবে ইহা ত চোখে-দেখা যে যখন তাঁকে আমরা রামায়ণ পাঠ করিতে দেখিয়াছি তখন তাঁর শরীর পুরাপুরি নীরোগ ছিল। লাধা মহারাজের কণ্ঠ মধুর ছিল। তিনি দোহা ও চৌ-পাই সুর করিয়া পড়িতেন, ব্যাখ্যা করিতে করিতে নিজে ভাবরসে ডুবিতেন আর তাঁর সঙ্গে শ্রোতারাও ডুবিত। খুব সম্ভব আমার বয়স তখন তের। কিন্তু বেশ মনে আছে আনন্দে বিভোর হইয়া তাঁর পাঠ শুনিতাম। ইহার ফলে রামায়ণের ওপর আমার গভীর টান ও ভক্তি জন্মে। তুলসীদাসের রামায়ণ আজ আমার দৃষ্টিতে ভক্তিমার্গের সর্বোত্তম গ্রন্থ।

কয়েক মাস পরে আমরা রাজকোটে আসি। সেখানে রামায়ণ পাঠ হইত না। তবে একাদশীর দিন ভাগবত পাঠ হইত। তা কখন কখন শুনিতে যাইতাম। কিন্তু কথকতা জমিত না: সেই গুণ কথকের ছিল না। আজ দেখিতে পাইতেছি যে ভাগবত এমন গ্রন্থ যার কথকতা সাহায্যে ধর্মরস সঞ্চার করা যায়। মহা আগ্রহে গুজরাটীতে তা আমি পড়িয়াছি। কিন্তু আমার একুশ দিনের উপবাসকালে ভারতভূষণ পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের শ্রীমুখে যখন মূল সংস্কৃতের কতক অংশ শুনি তখন মনে হইয়াছিল তাঁর মতন ভাগবত-ভক্তের মুখে ছোটবেলায় ভাগবত শোনার ভাগ্য যদি হইত তবে সেই বয়সেই ভাগবতের প্রতি আমার গাঢ় আকর্ষণ জন্মিত। বাল্যকালের শুভ-অশুভ সংস্কার মনে চিরদিনের মত গাঁথিয়া যায় ইহা নিজের অভিজ্ঞতা হইতে জানি। তাই ত সেই বয়সে উত্তম উত্তম গ্রন্থের পাঠ শোনার সুযোগ হয় নাই বলিয়া আমার খেদ রহিয়া গিয়াছে।

সকল সম্প্রদায়কে সমান দৃষ্টিতে দেখার শিক্ষা আমি রাজকোটে ওই বয়সেই পাইয়াছিলাম। মা বাবা হাবেলিতে যেমন যাইতেন, শিবালয়ে ও রামমন্দিরেও তেমন যাইতেন, আর সঙ্গে আমাদের লইয়া যাইতেন বা যাইতে দিতেন। ইহার ফলে হিন্দুধর্মের ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতি আমার মনে আদর জন্মে। তা ছাড়া প্রায়ই জৈন ধর্মাচার্যদের কেউ না কেউ বাবার কাছে আসিতেন আর অন্য কোথাও তাঁরা যা করিতেন না তা আমাদের বাড়ী

করিতেন—অজৈন আমাদের হাতে খাইতেন। তাঁদের সহিত বাবার ধর্মের ও সংসারের কথাও হইত।

মুসলমান ও পারসী বন্ধুও বাবার ছিল। তাঁরা আসিতেন। নিজ নিজ ধর্মের কথা বলিতেন। বাবা তাঁহাদের কথা সর্বদা শ্রদ্ধাভরে আর সময় সময় আগ্রহের সহিত শুনিতেন। বাবার সেবাকার্যে নিরত থাকিতাম বলিয়া আমি অনেক সময় ওই সব আলোচনা শুনিতে পাইতাম। এই পরিবেশের কারণে সকল ধর্মের প্রতি আমার মনে সমানভাব জন্মে।

তবে খ্রীস্টধর্ম সম্বন্ধে এই কথা খাটে না। উহার প্রতি তখন মন খানিকটা বিরূপ ছিল। কারণও একটা ছিল। সেই দিনে স্কুলের কাছে কোন কোণে দাঁড়াইয়া পাদরীরা বক্তৃতা করিত—হিন্দু দেবদেবী ও হিন্দু-ধর্মের নিন্দা করিত। আমার তা সহ্য হইত না। এক দিনই কেবল তা শুনিয়া থাকিব। তার পরে উহার কাছেও ঘেঁষি নাই। ঠিক ওই সময়েই এক নামজাদা হিন্দুর খ্রীস্টান হওয়ার কথা শুনিতে পাই। শহরে রটিয়াছিল যে ধর্মান্তরকালে তাকে গোমাংস ও মদ খাইতে হইয়াছিল, পোশাক বদলাইতে হইয়াছিল, আর তখন হইতে কোট-পাতলুন মায় হ্যাট তার চিরসাথী হইয়া-ছিল। বিতৃষ্ণায় আমার মন ভরিয়া যায়। যে ধর্মের কারণে গোমাংস খাইতে হয়, মদ খাইতে হয়, পূর্বপুরুষদের পোশাক ছাড়িতে হয়, সেই ধর্ম আবার কেমন ধর্ম? এই প্রশ্ন আমার মনে জাগে। আরও শুনিয়াছিলাম, যে লোক খ্রীস্টান হইয়াছে সে পূর্বপুরুষের ধর্মের, রীতিনীতির ও দেশের নিন্দা করিতে লাগিয়া গিয়াছে। এই সবের জন্য খ্রীস্টান ধর্মের প্রতি আমার বিরাগ জন্মে।

এইভাবে যদিও অন্য ধর্মের প্রতি সমভাব আসিয়াছিল তবুও এ কথা বলা যাইবে না যে ঈশ্বরে আমার বিশ্বাস ছিল। এই সময়ে বাবার পুস্তক সংগ্রহে মনুস্মৃতির অনুবাদ আমার চোখে পড়ে। তাতে জগতের উৎপত্তি আদির কথা আছে। সে সব কথা মানিয়া লওয়া আমার পক্ষে কঠিন হয়; মন উল্টা নাস্তিকতার দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে।

আমার মেজো কাকার ছেলের (তিনি এখনও বাঁচিয়া আছেন) বুদ্ধির ওপর আমার বিশ্বাস ছিল। তাঁকে আমার সংশয়ের কথা বলিলাম। কিন্তু তিনি সমাধান করিতে পারিলেন না। তিনি বলেন, 'বয়স হলে এই সব প্রশ্নের উত্তর নিজেই খুঁজে পাবে। এ বয়সে এরূপ প্রশ্ন করতে নেই।'

চুপ হইলাম : সমাধান হইল না। মনুস্মৃতির খাদ্যাখাদ্যের প্রকরণে ও অন্য কোন কোন প্রকরণে আমি চলতি প্রথার বিরোধ দেখিতে পাই। এই সব সংশয়েরও প্রায় তেমনটাই উত্তর পাইয়াছিলাম। 'সময়ে বুদ্ধি খুলবে, অধিক পড়াশোনা করলে উত্তর মিলবে' এই বলিয়া মনকে তখন প্রবোধ দিয়াছিলাম।

অন্তত এ কথাটা ঠিক যে মনুস্মৃতি হইতে তখন আমি অহিংসার শিক্ষা পাই নাই। আমার মাংস খাওয়ার কথা ওপরে বলিয়াছি। মনুস্মৃতিতে উহার পক্ষে সমর্থন রহিয়াছে। মনে হইয়াছিল সাপ, ছারপোকা ইত্যাদি মারা কর্তব্য। কর্তব্যজ্ঞানে ছারপোকা ইত্যাদি সে সময় মারিতাম মনে আছে।

তবে একটা জিনিস। জীবনের লক্ষ্য তখন স্থির হইয়া যায়—জগতের আশ্রয় নীতি আর নীতির আশ্রয় সত্য। সত্যের সাধনা আমার জীবনের ব্রত হয়। সত্যের মহিমা আমার কাছে দিন দিন বাড়িতে থাকে, সত্যের পরিধি বাড়িতে থাকে আর আজও বাড়িয়া চলিয়াছে।

অন্য এক বস্তু। অপকারের জবাব অপকার নয়, জবাব উপকার—গুজরাটী কবিতার এই বাক্য আমার অন্তরে গাঁথিয়া যায়, জীবনের সূত্র হয়। তা আমার পথপ্রদর্শক হয়। অপকারীর ভাল চাওয়া ও ভাল করা আমার জীবনের ধ্যান হয় আর তার নানা প্রয়োগ চলিতে থাকে। সেই অপূর্ব মধুর ষট্‌পদীটি এই—

যে দিয়েছে জল, দাও তায় আহার বাহার ;
নুয়েছে যে শির, চরণে দণ্ডবৎ তাহার।
যে দিয়েছে কড়ি, শোধ তা গিনির কাজ করি ;
বাঁচালো যে প্রাণে, দুঃখ তার দূর কর মরি'।
ভালো পেয়ে, মনেবাচেকাজে দশগুণ তার দেয় দিয়ে ;
মন্দ পেয়েও ভালো যে করে সত্যিকার জীবন সে জীয়ে।

১১

বিলাতযাত্রার তোড়জোড়

আমি ১৮৮৭ সনে ম্যাট্রিকুলেশন পাস করি। বোম্বাই ও আহমদাবাদ এই দুই কেন্দ্রে তখন পরীক্ষা হইত। দেশ এত গরীব ছিল যে কাঠিয়াওয়াড়ের ছাত্রেরা

পরীক্ষা দিতে নিকটে ও কম খরচার কেন্দ্র আহমদাবাদে যাইত। গান্ধী-পরিবারের অবস্থাও কিছু ভাল ছিল না। তাই আমিও আহমদাবাদই বাছিয়া লইয়াছিলাম। রাজকোট হইতে আহমদাবাদে এটাই আমার প্রথম ও একক যাত্রা।

পাস করিলাম। অভিভাবকদের ইচ্ছা আরও পড়ি। কলেজ ছিল দুই জায়গায়—বোম্বাই ও ভাবনগর-এ। ভাবনগরে কম খরচে চলিত তাই ভাবনগর শামলদাস কলেজে ভরতি হওয়া ঠিক হয়। ভরতি হইলাম। অথই জলে যেন পড়িলাম। সবই কঠিন লাগিত। অধ্যাপকদের ব্যাখ্যান না পারিতাম ধরিতে, না পাইতাম তাতে রস। অধ্যাপকদের দোষ ছিল না। আমি ছিলাম কাঁচা। সে সময়ের শামলদাস কলেজের অধ্যাপকেরা প্রথম পঙ্‌ক্তির ছিলেন। প্রথম টর্ম বা সত্র শেষে বাড়ী আসিলাম।

মাবজী দবে নামে এক বিদ্বান্‌ ও বিচক্ষণ ব্রাহ্মণ আমাদের পরিবারের পুরাতন মিত্র ও পরামর্শদাতা ছিলেন। বাবার স্বর্গবাসের পরেও তিনি আমাদের খোঁজখবর লইতেন। ঘটনাক্রমে আমার ছুটির সময়ে তিনি আসিয়া যান। মা ও বড়দার সহিত কথাবার্তা প্রসঙ্গে আমার পড়াশুনার বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। শামলদাস কলেজে পড়ি শুনিয়া তিনি বলেন, 'কাল বদলে গেছে। তোমাদের ভাইদের কেউ কবা গান্ধীর পদ পেতে চাও ত উপযুক্ত শিক্ষা বিনা তা মিলবে না। এ এখন পড়ছে সুতরাং এর দ্বারা ওই গদী রাখার চেষ্টা করতে হবে। বি. এ. পাস করতে চার-পাঁচ বছর লাগবে। এতটা সময় ব্যয়ের পরে পঞ্চাশ-ষাট টাকার চাকরি মিলবে, দেওয়ান-পদ মিলবে না। আর তারপর একে যদি আমার ছেলের মত উকিল বানাতে চাও ত আরও বছর কয়েক যাবে আর সেই সময়ের মধ্যে দেওয়ানগিরির জন্য অনেক উকিল ভিড় করবে। আমি বলি একে আপনারা বিলাত পাঠান। কেবলরাম-এর (মাবজী দবে-এর ছেলে) কাছে শুনেছি ব্যারিস্টারি পাশ করা সহজ। তিন বছরে ফিরে আসবে। চার-পাঁচ হাজারের অধিক খরচও হবে না। দেখুন, ওই যে সেদিন ব্যারিস্টার হয়ে এসেছে কেমন ঠাটে থাকে! দেওয়ান হতে চায় ত আজই হতে পারে। আমি ত বলি এ বছরই মোহনদাসকে আপনারা বিলাত পাঠিয়ে দিন। বিলাতে কেবলরামের অনেক বন্ধু আছে। তাদের নামে সে পরিচয়পত্র দেবে। মোহনের সেখানে কোন অসুবিধা হবে না।'

তাঁর কথা ঠেলা হইবে না এই নিশ্চয় বিশ্বাসে জোশীজী (শ্রদ্ধাস্পদ মাবজী দবেকে এই কথায় আমরা সম্বোধন করিতাম) আমার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, 'বিলাত যাবে কি এখানেই পড়বে? কোন্‌টা তোমার ভাল মনে হয়?' আমার মনের কথা তাঁর মুখে ভাষা পাইল। কলেজের পড়া আমার কঠিন লাগিতে ত ছিলই। বলিলাম, 'বিলাত পাঠান ত ভাল হয়। ভরসা হচ্ছে না কলেজের পরীক্ষা সহজে পাস করতে পারব। তবে ডাক্তারি পড়তে পাঠান ত কেমন?'

বাধা দিয়া বড়দা বলিলেন, 'ওটা বাবার পছন্দ ছিল না। তোমার পড়ার কথায় তিনি বলেছিলেন বৈষ্ণব আমাদের মড়া কাটা-চিরা চলে না। তাঁর ইচ্ছা ছিল তুমি উকিল হবে।'

তাঁর কথায় সায় দিয়া জোশীজী বলিলেন, 'গান্ধীজীর মতন আমি ডাক্তারি পড়ার বিরোধী নই। আমাদের শাস্ত্রে এর নিষেধ নেই। কিন্তু ডাক্তার হলে ত দেওয়ান হওয়া যাবে না। আমি চাই তুমি দেওয়ান হবে বা তার চাইতেও কিছু বড়। তবেই এই বৃহৎ পরিবারের আশ্রয় হতে পারবে। দিনকাল দিন দিন বদলাচ্ছে, কঠিন হচ্ছে। অতএব ব্যারিস্টার হওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ।'

মার দিকে তাকাইয়া তিনি বলিলেন, 'আজ আমি যাচ্ছি। আমার কথা ভেবে দেখবেন। আবার যখন আসব আশা করি শুনতে পাব বিলাত যাওয়ার তৈরি চলছে। কোন অসুবিধা হয় বা আমার কিছু করার থাকে ত জানাবেন।'

জোশীজী চলিয়া গেলেন। আমি আকাশকুসুম রচনায় লাগিয়া গেলাম।

বড়দা পড়িলেন ভাবনায়; পয়সা কোথা হইতে আসিবে? আর আমার মত যুবককে এত দূরে একলা কি করিয়াই বা পাঠান?

মা কিছুই ঠাওরাইতে পারিতেছিলেন না। বিয়োগের কথাটাই তাঁহার সহ্য হইতেছিল না। 'তোমাদের কাকা এখন পরিবারের প্রধান। তাঁকে আগে বল ত। তিনি বলেন ত দেখা যাবে' এই বলিয়া তখনকার মত আমাকে নিরস্ত করার চেষ্টা করিলেন।

বড়দা ভাবিলেন আর এক। তিনি আমাকে বলেন, 'পোরবন্দর রাজের কাছে আমাদের দাবি চলে। আমাদের পরিবার সম্বন্ধে এডমিনিস্ট্রেটর

লেলী সাহেবের ধারণা ভাল। কাকা তাঁর সুনজরে। রাজ্যের তরফ হতে ইংলণ্ডে তোমার পড়ার ব্যাপারে কিছু না কিছু সাহায্য তিনি করলেও করতে পারেন।'

এই সব আমার ভাল লাগে। পোরবন্দর যাওয়ার জন্য তৈরি হই। রেল তখন ছিল না। পাঁচ দিনের পথ, গোরুর গাড়ী ছিল ভরসা। ওপরে বলিয়াছি, আমি ভীতু ছিলাম। কিন্তু এই ব্যাপারে আমার ভয় ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। বিলাত যাওয়ার শখ আমার ওপর সওয়ার হইয়াছিল। গোরুর গাড়ীতে ধোরাজী যাই আর এক দিন আগে পৌঁছিবার জন্য সেখান হইতে উটে চড়ি। এই আমার প্রথম উটে চড়া।

পোরবন্দরে পৌঁছিলাম। কাকাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলাম। সকল কথা বলিলাম। ভাবিয়া দেখিয়া তিনি বলিলেন, 'বিলাত গেলে নিজ ধর্ম রক্ষা করা যায় কিনা জানি না। যে সব কথা শুনতে পাই তাতে সংশয় জন্মে। বড় ব্যারিস্টারদের কাছে যাই ত দেখতে পাই তাদের চালচলনে আর সাহেবদের চালচলনে কোন তফাত নাই। আহার-পানে বাছবিচার নাই। সিগারেট ত মুখে লেগেই থাকে। পোশাকও তাদের তেমনই অশিষ্ট। এ সব আমাদের পরিবারে সাজে না। কিন্তু আমি তোমার সাহসে বাধা সৃষ্টি করতে চাই না। অল্পদিন মধ্যে আমি তীর্থযাত্রায় বের হব। মরণ শিয়রে। এই অবস্থায় সমুদ্র পার হওয়ার, বিলাতে যাওয়ার অনুমতি তোমাকে কি করে দিই? কিন্তু আমি বাধা হব না। তোমার মার অনুমতিই অনুমতি। তিনি বলেন ত খুশী মনে যেতে পারো। এটুকু বলছি আমি বাধা দেব না। আমার আশীর্বাদ ত রয়েছেই।'

বলিলাম, 'এর বেশি আপনার কাছে আমি চাইনি। এখন মাকে রাজী করাতে পারলেই হয়। কিন্তু লেলী সাহেবের কাছে সুপারিশ-পত্র দেবেন ত?'

কাকা বলিলেন, 'তা কি করে দিই? কিন্তু সাহেব ভাল মানুষ। চিঠি লেখো। পরিবারের পরিচয় দেবে। দেখা করার সুযোগ নিশ্চয় দেবেন। চাইকি সহায়তা করবেন।'

জানি না কেন সাহেবের কাছে কাকা সুপারিশ করেন নাই। ঝাপসা ঝাপসা মনে পড়ে বিলাত যাওয়ার মত ধর্মবিরুদ্ধ কাজে প্রত্যক্ষ সহায়তা করিতে তাঁর আটকাইয়া থাকিবে।

লেলী সাহেবকে চিঠি লিখি। উত্তরে নিজের বাংলায় দেখা করিতে বলেন। সাহেব কুঠির সিঁড়ি চড়িতে চড়িতে আমাকে বলিলেন, 'বি. এ. পাস করে আমার সঙ্গে দেখা করো। এখন সাহায্য করা যাবে না।' এই বলিয়া সাহেব ওপরে চলিয়া গেলেন। কি বলিব তাহা ভাল করিয়া গুছাইয়া ও তালিম দিয়া আমি তৈরি হইয়া গিয়াছিলাম। ঝুঁকিয়া দুই হাতে নমস্কার করিয়াছিলাম, আমার সব পরিশ্রম বৃথা গেল!

নজর গেল স্ত্রীর গহনার দিকে। বড়দার ওপর অশেষ শ্রদ্ধা ছিল। তাঁর উদারতার সীমা ছিল না। তিনি আমাকে বাবার মত ভালবাসিতেন।

পোরবন্দর হইতে রাজকোটে ফিরিলাম। জোশীজীর পরামর্শ লইলাম। প্রয়োজন হইলে ধার করিয়াও আমাকে বিলাত পাঠাইবার কথা তিনি বলিলেন। স্ত্রীর গহনা বেচার প্রস্তাব আমি করিলাম। তাহা হইতে দুই তিন হাজারের অধিক পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। বড়দা যেভাবেই হোক টাকা যোগাড় করার ভার লইলেন।

মার মন মানে কি? তিনি খবর লইতে আরম্ভ করেন। কেহ তাঁহাকে বলে যুবকেরা বিলাতে গিয়া বখিয়া যায়, কেউবা বলে মাংস খায়; অন্য কেউ বলে মদ বিনা সেখানে চলে না। এই সব কথা মা আমাকে বলেন। তাঁকে আমি বলি, 'তুমি আমায় বিশ্বাস করবে না? তোমায় আমি ঠকাব না। শপথ করে বলছি এই তিন বস্তু আমি ছোঁব না। সে ভয় থাকলে ত জোশীজী যেতে বলতেন না।'

মা বলিলেন, 'বিশ্বাস তোমায় আমি করি। দূর দেশে যাচ্ছ, সেখানে কি জানি কি ঘটবে ভেবে পাই না। বেচরজী স্বামীকে জিজ্ঞাসা করে নি।'

বেচরজী স্বামী মোঢ় বানিয়া ছিলেন। যখনকার কথা তখন তিনি জৈন মুনি। জোশীজীর মত তিনিও আমাদের পরামর্শদাতা ছিলেন। তিনি আমার সহায় হইলেন। বলিলেন, 'এই তিন ব্রত পালন করার কথা তার কাছ থেকে নিয়ে তাকে যেতে দিতে ভয় নেই।' তিনি প্রতিজ্ঞা করাইলেন, আর আমি মাংস, মদ্য ও স্ত্রী সংসর্গ হইতে দূরে থাকিব এই প্রতিজ্ঞা করিলাম। মা আজ্ঞা দিলেন।

হাইস্কুলে সভা হয়। রাজকোটের এক যুবক বিলাত যাইতেছে ইহা তাজ্জব ব্যাপার ছিল। অভ্যর্থনার উত্তরে যা বলার ছিল সংক্ষেপে লিখিয়া

লইয়া গিয়াছিলাম। থতমত খাইয়া কোনমতে তা পড়ি। মনে আছে তখন আমার মাথা ঘুরিতেছিল, শরীর কাঁপিতেছিল।

গুরুজনদের আশীর্বাদ লইয়া বোম্বাই রওনা হইলাম। এই আমি রাজকোট হইতে প্রথম বোম্বাই যাই। বড়দা সঙ্গে ছিলেন।

কিন্তু ভাল কাজে শত বিঘ্ন। বোম্বাইতে নানা বাধা উপস্থিত হইল।

১২
একঘরে

মার আজ্ঞা ও আশীর্বাদ লইয়া মহা উৎসাহে বোম্বাই পৌঁছিলাম, ঘরে থাকিল স্ত্রীর কোলে মাস কয়েকের ছেলে। বোম্বাই পৌঁছিলাম বটে কিন্তু সেখানকার বন্ধুরা বড়দাকে বলেন যে, জুন-জুলাই মাসে ভারত মহাসাগরে ঝড় হয় আর আমার ওই প্রথম সমুদ্রযাত্রা তাই দীপাবলীর পরে নবেম্বর মাসে রওনা হওয়া সংগত হইবে। ঝড়ে কিছুদিন আগে একখানি জাহাজ ডুবিয়া যাওয়ার কথা কেহ বলেন। বড়দা ভয় পান। ঝুঁকিতে না যাওয়াই ভাল এই ভাবিয়া আমার যাওয়া পিছাইয়া দেন এবং আমাকে তাহার কোন বন্ধুর গৃহে রাখিয়া রাজকোটে নিজ কাজে ফিরিয়া যান। এক ভগ্নীপতির কাছে আমার যাওয়ার টাকা রাখিয়া যান আর বড়দা বলিয়া যান আমার সুবিধা-অসুবিধার দিকে নজর রাখিতে।

বোম্বাইতে দিন কাটিতেছিল না। বিলাতে যাওয়ার স্বপ্নে বিভোর ছিলাম।

এই অবসরে আমাদের স্বজাতির মধ্যে উত্তেজনার সৃষ্টি হইল। তখন পর্যন্ত কোন মোঢ় বানিয়া বিলাত যায় নাই। আর আমি যাইতেছি, ইহা আস্পর্ধা বইকি! জাত-সভা ডাকা হইল; আমার জবাব তলব করা হইল। গেলাম। জানি না কোথা হইতে হঠাৎ আমাতে সাহস আসিয়া গেল। না ছিল সংকোচ, না ছিল ভয়। পঞ্চায়েতের মুখ্য দূর সম্পর্কে আমাদের জ্ঞাতি ছিলেন। বাবার সহিত তাঁহার ভাল ভাব ছিল। তিনি আমাকে বলেন:

'বিলাত যাবে ঠিক করেছ। জাতের বিচারে এ কাজ ঠিক নয়। আমাদের ধর্মে সমুদ্র পার হওয়া মানা। তা ছাড়া শোনা যায় সেখানে ধর্ম রক্ষা করা যায় না। সাহেবদের সঙ্গে আহার-পান করতে হয়।'

উত্তরে আমি বলি, 'আমার মনে হয় বিলাত যাওয়া মোটেই অধর্মের কাজ নয়। আমি পড়তে যাচ্ছি। তা বাদে যে সব ভয় আপনারা করছেন তা থেকে দূরে থাকার প্রতিজ্ঞা আমি মার কাছে করেছি। এই প্রতিজ্ঞা নিশ্চয় আমাকে বাঁচাবে।'

শেঠ (মুখ্য) বলেন, 'কিন্তু আমরা বলছি সেখানে ধর্ম বাঁচানো যায় না। জান ত তোমার বাবার সঙ্গে আমার সম্পর্ক কি ছিল। আমার কথা মানা তোমার উচিত।'

জবাবে বলিলাম, 'সম্পর্কের কথা জানি। আপনি আমার গুরুজন। কিন্তু এই প্রশ্নে আমি নাচার। বিলাত যাওয়ার সংকল্প ফেরাতে পারিনে। বাবার বন্ধু ও পরামর্শদাতা বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ জোশীজী বলেছেন বিলাত যাওয়াতে দোষ নেই। মা আর বড়দার আজ্ঞাও পেয়েছি।'

'জাতের হুকুম তবে কি তুমি মানবে না ?'

'কিন্তু এখানে আমি নাচার। আমি মনে করি এতে জাতের বাধা দেওয়া ঠিক হচ্ছে না।'

এই জবাবে শেঠ চটিলেন। গালমন্দ করিলেন। কথাটি না বলিয়া বসিয়া থাকিলাম। মুখ্য আদেশ জারি করিলেন :

'আজ থেকে এ ছেলেকে একঘরে করা হচ্ছে। যে লোক একে সাহায্য করবে বা বিদায় দিতে যাবে তাকে জবাবদিহি করতে হবে। সওয়া টাকা জরিমানা করা হবে।'

এই হুকুমের কোন ক্রিয়া আমার ওপর হইল না। শেঠকে নমস্কার করিলাম, চলিয়া আসিলাম। কিন্তু ভাবনা হইল বড়দা ইহা কি ভাবে নিবেন—যদি তিনি ভয় পান ? ভাগ্যের কথা তিনি টলিলেন না ; আমাকে লিখিয়া জানাইলেন যে জাতের রায় সত্ত্বেও আমার বিলাত যাওয়ায় বাধা দিবেন না।

তবুও এই ব্যাপারের পরে বিলাত রওনা হওয়ার জন্য আমার অধীরতা বাড়িয়া যায় ; কেবলই মনে হইতে থাকে কি জানি যদি বড়দার ওপর চাপ আসে বা অন্য কোন বাধা সৃষ্টি হয়। এইভাবে যখন দিন যাইতেছিল তখন খবর পাইলাম, ৪ঠা সেপ্টেম্বর যে জাহাজ ছাড়িবে তাতে জুনাগড়ের এক উকিল ব্যারিস্টার হওয়ার জন্য বিলাত যাইবে। বড়দা যাঁহাদের কাছে আমার কথা বলিয়া গিয়াছিলেন তাঁহাদের সঙ্গে দেখা করিলাম। তাঁহারাও

বলিলেন এই সুযোগ যেন না ছাড়ি। হাতে সময় খুব কম ছিল। বড়দাকে তার করিলাম, অনুমতি চাহিলাম। অনুমতি পাইলাম। ভগ্নীপতির কাছে যাইয়া টাকা চাহিলাম। তিনি জাতের আদেশের কথা তুলিলেন: একঘরে হইতে পারিবেন না জানাইলেন। আমাদের পরিবারের এক বান্ধবের কাছে গেলাম, বড়দা পরে টাকা শোধ করিবেন বলিয়া জাহাজভাড়া ও অন্য খরচ তখনকার মত চালাইয়া দিতে অনুরোধ করিলাম। তিনি রাজী হইলেন, অধিকন্তু আমাকে উৎসাহ দিলেন। কৃতজ্ঞতা জানাইলাম, টাকা পাইলাম, টিকেট কিনিলাম।

এবার আসিল বিলাত যাওয়ার পোশাক তৈরি করার পালা। এই দিকের কিছুটা জ্ঞান ছিল এমন এক বন্ধু তা যোগাড় করিয়া দেন। তার কতকগুলি মোটামুটি ভাল লাগিয়াছিল ত অন্য কতকগুলি মনে হইয়াছিল কিম্ভূতকিমাকার। নেকটাই একেবারে বিশ্রী মনে হইয়াছিল, যদিও পরে তা শখের বস্তু হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ওয়েস্ট কোট অভদ্র মনে লইয়াছিল। কিন্তু বিলাত যাওয়ার আগ্রহে ওই সব তুচ্ছ হইয়া যায়। সঙ্গে পর্যাপ্ত খাওয়ার বস্তু লইয়াছিলাম।

বন্ধুরা জুনাগড়ের উকিল ত্র্যম্বকরায় মজমুদারের কেবিনে আমার থাকার জায়গা করিয়াছিলেন। আমার সুবিধা-অসুবিধার দিকে লক্ষ্য রাখিতে বন্ধুরা তাঁকে অনুরোধও করিয়াছিলেন। তিনি সংসার-অভিজ্ঞ বয়স্ক লোক ছিলেন। আর আমি ছিলাম সংসার-অনভিজ্ঞ আঠার বছরের যুবক। ত্র্যম্বকরায় বন্ধুদের আশ্বাস দিয়াছিলেন যে তাঁরা যেন আমার জন্য ভাবনা না করেন।

এইভাবে ১৮৮৮ সনের ৪ঠা সেপ্টেম্বর বোম্বাই বন্দর হইতে আমি রওনা হই।

১৩

অবশেষে বিলাতে

সমুদ্রের ভোগ স্টীমারে আমার আদৌ ভুগিতে হয় নাই। কিন্তু মনের অস্থিরতা দিন দিন বাড়িতেছিল। 'স্টুঅর্ড'-এর সঙ্গে কথা বলিতে পর্যন্ত লজ্জা হইত। ইংরেজীতে কথা বলার অভ্যাসই ছিল না। তাতে মজমুদার

ছাড়া সেকেণ্ড সেলুনের সকল যাত্রীই ছিল ইংরেজ। তাদের সঙ্গে কথা বলিতে পারিতাম না। তারা বলিতে চাহিত। আমি তাদের কথা প্রায় ধরিতে পারিতাম না, আর পারিলেও জবাবে কি বলিব ভাবিয়া পাইতাম না। বলার আগে প্রত্যেক বাক্য মনে আওড়াইয়া লইতে হইত। কাঁটা-চামচে খাইতে পারিতাম না। কোন্ পদে মাংস আছে বা নাই সে কথা জিজ্ঞাসা করিতে ভরসায় কুলাইত না। তাই খাওয়ার টেবিলে কখনও আমি খাইতামই না। কেবিনেই খাইতাম। মিঠাই ও ফল যা সঙ্গে নিয়া গিয়াছিলাম তা দিয়াই মোটামুটি পেট ভরিতাম। মজমুদারের কোনই সংকোচ ছিল না। সকলের সহিত তিনি মিশিতেন। ডেকে অবাধে চলাফেরা করিতেন। আমি সারা দিন কেবিনে কাটাইতাম। কচিৎ কখনও ডেকে কম মানুষ দেখিতাম ত একটু গিয়া বসিতাম। মজমুদার আমাকে সকলের সঙ্গে মিশিতে ও অবাধে কথা বলিতে বলিতেন। বলিতেন উকিলের জিবে খই ফোটা চাই। নিজের ওকালতির অভিজ্ঞতার কথাও শুনাইতেন। আরও বলিতেন যে, ইংরেজী আমাদের নিজ ভাষা নয় সুতরাং ভুল ত হইবেই, তা হইলেও বিনা সংকোচে বলিয়া যাইতে হইবে। কিন্তু আমার ভীরুতা ঘুচিল না!

এক ইংরেজ ভদ্রলোক দয়া করিয়া আমায় কথায় টানেন। তিনি বয়সে আমার বড় ছিলেন। আমি কি খাই, কি করি, কোথায় যাইতেছি, কেন কারও সঙ্গে কথা বলি না ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করেন। টেবিলে যাইয়া খাইতে পরামর্শ দেন। মাংস খাইতে নারাজ এই কথা শুনিয়া তিনি হাসেন ও বন্ধুভাবে বলেন, 'এখন আমরা লোহিত সাগরে, কোন অসুবিধা নেই। বিস্কে উপসাগরে যখন জাহাজ যাবে তখন তোমায় তোমার পণ ছাড়তে হবে। ইংলণ্ডে এত শীত যে মাংস ছাড়া চলেই না।'

বলিলাম, 'শুনেছি মাংস না খেয়েও সেখানে চলে।'

তিনি বলেন, 'জেনে রাখো, কথাটা সত্য নয়। মাংস খায় না এমন কাউকে আমি আমার পরিচিতদের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি না। লক্ষ্য করে থাকবে, আমি নিজে মদ খেলেও তোমায় খেতে বলছি না। কিন্তু আমার মনে হয় মাংস খাওয়া তোমার উচিত। তা ছাড়া ওখানে চলবে না।'

আমি বলি, 'এই উপদেশের জন্য আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ। কিন্তু মার কাছে প্রতিজ্ঞা করেছি মাংস খাব না, তাই ওই পদার্থ চলবে না। যদি দেখতে পাই মাংস ছাড়া চলবে না ত দেশে ফিরে যাব।'

বিস্কে উপসাগর দিয়া জাহাজ চলিল। দেখা গেল, মাংস-খাদ্য ছাড়া বেশ চলে। মাংস খাই নাই এই সার্টিফিকেট সংগ্রহ করিতে আমায় বলা হইয়াছিল। তাই ইংরেজ ভদ্রলোকের কাছে প্রমাণ-পত্র চাই। খুশী মনে তা তিনি দেন। কিছু দিন তা আমি খুব যত্নে রাখিয়াছিলাম। পরে দেখিতে পাই যে মাংস খাইলেও প্রমাণ-পত্র যোগাড় করা যায়। সুতরাং উহার মোহ আমার দূর হয়। আমার কথায় বিশ্বাস না হয় ত সার্টিফিকেট পেশ করিয়া কি হইবে?—এই ভাব আমার জন্মে।

যা হোক, যাত্রা শেষ হইল; সাউথেম্পটন বন্দরে পৌঁছিলাম। মনে পড়ে দিনটা শনিবার ছিল। স্টীমারে আমার পরনে কালো পোশাক ছিল। সাদা ফ্লানেলের এক প্রস্থ কোট-পাতলুনও বন্ধুরা সঙ্গে দিয়াছিলেন। সাদা মানাইবে ভাল মনে করিয়া সাদা পোশাকে নামিব ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলাম। করিলামও তাহাই। তখন সেপ্টেম্বরের শেষ দিক। দেখিলাম আমার ছাড়া কারও পরনে অমন পোশাক ছিল না। সকলের দেখাদেখি আমিও আমার বাকস-তোরঙ্গ ও উহার চাবি গ্রিণ্ডলে কোম্পানীর গোমস্তার কাছে জিম্বা করিয়া দিয়াছিলাম। মনে করিয়াছিলাম উহাই বুঝি

স্টীমারে কারও কাছে শুনিয়াছিলাম, লণ্ডনে ভিক্টোরিয়া হোটেলে ওঠা ভাল হইবে। তদনুসারে শ্রীযুত মজমুদার ও আমি ওই হোটেলে উঠি। সাদা পোশাক পরনে ছিল বলিয়া মনটা সতত উসখুস করিতেছিল। তায় হোটেলে গিয়া যখন শুনিলাম যে গ্রিণ্ডলের কাছ হইতে পরের দিন রবিবার বলিয়া সোমবারের আগে বাকস-তোরঙ্গ পাওয়া যাইবে না তখন আমার গা চিড়-বিড় করিয়া ওঠে।

ডাক্তার প্রাণজীবন মেহতা, দলপতরাম শুক্ল, প্রিন্স রণজিত সিংজী ও দাদাভাই নওরাজী এই চার জনের নামে আমার কাছে পরিচয়-পত্র ছিল। সাউথেম্পটন হইতে ডাক্তার মেহতাকে তার করিয়াছিলাম। সেই দিন সন্ধ্যা আটটার কাছাকাছি তিনি দেখা করিতে আসেন। প্রাণঢালা স্বাগত জানান। আমার পরনে ফ্লানেল দেখিয়া তিনি মুচকি হাসি হাসিলেন। কথা বলিতে বলিতে আনমনা ভাবে তাঁর রোঁয়াদার রেশমী টুপি (টপহ্যাট) হাতে তুলিয়া লই এবং কিরূপ মোলায়েম দেখার আগ্রহে তাতে হাত বুলাই আবার তাও বুলাই উল্টা। রোঁয়াগুলি এলোমেলো হইয়া যায়।

মেহতা আমার দিকে একটু রাগতভাবে তাকান। সঙ্গে সঙ্গে থামান। ভুল যা হওয়ার হইয়া গিয়াছিল। অমনটা ভুল আবার কোথাও না করি ইহাই ছিল তাঁর আমাকে বাধা দেওয়ার অর্থ। এইভাবে ইউরোপীয় রীত-রেওয়াজে আমার হাতেখড়ি হয়। হাসি-তামাশার ছলে চাল-চলনের তালিম আমাকে দেন : কারও জিনিস ধরিতে নাই, কিছুটা চেনাশোনা হইলেই কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে নাই যেমনটা ভারতে আমরা সহজে করি, জোরে কথা বলিতে নাই ; সাহেবদের সঙ্গে কথা বলিতে 'স্যর' মুখেও আনিবে না যেমন ভারতে আমরা করিয়া থাকি ; নোকর ও অধীন কর্মচারীরাই কেবল মনিবকে ওভাবে সম্বোধন করে, ইত্যাদি ইত্যাদি। তিনি আরও বলেন যে হোটেলে খরচ বড় বেশি। কোন পরিবারে থাকা ভাল। এই বিষয়টা সোমবারে আরও ভাবিয়া স্থির করা যাইবে বলিয়া তিনি বিদায় নেন।

হোটেলে উঠিয়া আমাদের দুইয়ের মনে হইল এ কোথায় আসিলাম। খরচ অত্যন্ত বেশি। মাল্টা হইতে এক সিন্ধী জাহাজে ওঠেন। তাঁর সহিত মজমুদারের খুব ভাব হয়। লণ্ডনের পরিচয় তাঁর ছিল। তিনি আমাদের জন্য ঘর দেখিয়া দেওয়ার ভার নেন। আমরা তাঁর প্রস্তাবে রাজী হই। সোমবারে জিনিসপত্র পাওয়া মাত্র হোটেলের হিসাব মিটাইয়া দিয়া আমরা সিন্ধী ভদ্রলোকের ঠিক-করা ঘরে উঠিয়া যাই। মনে আছে হোটেলের বিল দেখিয়া চমকিয়া উঠিয়াছিলাম—এক আমার ভাগেই তিন পাউণ্ড! তিন পাউণ্ড দেওয়া সত্ত্বেও পেট ভরিয়া খাইতে পাই নাই। হোটেলের কোন খাওয়ার জিনিসই আমার রুচিত না। একটা নিতাম, রুচিত না ; আর একটা নিতাম। কিন্তু পয়সা দুইটারই দিতে হইত। বস্তুত বলা যাইতে পারে যে বোম্বাই হইতে সঙ্গে-আনা বস্তু দিয়াই আমি পেটের ক্ষুধা মিটাইতেছিলাম।

ভাড়াটে ঘরে গিয়াও সোয়াস্তি ছিল না। বাড়ীর কথা, দেশের কথা সতত মনে হইত। মার স্নেহের ছবি চোখে ভাসিত। রাত হইলেই কান্না পাইত। বাড়ীর নানা কথা মনে হইত ; ঘুম আসিত না। এই দুঃখের কথা অন্যের কাছে পাড়া যাইত না, আর পাড়িয়াও লাভ ছিল না। আমি নিজেই জানিতাম না কিসে শান্তি মিলিবে। কি লোক, কি তাদের চাল-চলন, কি তাদের ঘরদোর, কি রীত-রেওয়াজ সবই অদ্ভুত ঠেকিত। কি বলিলে ও কি করিলে ভদ্রতার গণ্ডি ডিঙানো হইবে সেই জ্ঞানও প্রায় ছিল

না। তার ওপর ছিল নিরামিষ খাওয়ার বাধা-নিষেধ। খাওয়া চলে এমন জিনিস মিলিত ত তাতে না থাকিত তেল বা ঘির পরশ আর তাই তা রুচিত না। সুতরাং আমার অবস্থা হইয়াছিল জাঁতিতে চড়ানো সুপারির মতন। না লাগিতেছিল বিলাত ভাল আর না পারিতেছিলাম দেশে ফিরিতে। মন বলিতেছিল, বিলাতে আসিয়াছ ত তিন বছর থাকিয়া যাওয়াই কর্তব্য।

১৪

পছন্দ

ডাক্তার মেহতা সোমবার আমার খোঁজে হোটেলে যান। সেখানে আমার ঠিকানা পান ও নূতন ঠিকানায় দেখা করিতে আসেন। স্টীমারে এক বোকামি করিয়াছিলাম। স্টীমারে নোনা জলে স্নান করিতে হয়। নোনা জলে সাবান চলে না। সাবান মাখাকে আমি সভ্যতার অঙ্গ মনে করিতাম। সাবান মাখিতাম। গা সাফ হওয়ার বদলে তেলচিটে হইয়া ময়লা বসিয়া যায় ও দাদ হয়। ডাক্তারকে দেখাইলাম। তিনি জ্বালানো-পোড়ানো এসেটিক এসিড ব্যবস্থা করেন। এসেটিক এসিড আমায় কাঁদাইয়া ছাড়িয়াছিল! ডাক্তার মেহতা আমার ঘর ও আসবাব ভাল করিয়া দেখিয়া মাথা নাড়েন ও বলেন, '*এখানে থাকা চলবে না। এ দেশে এসে পড়াশোনার চাইতে* এদেশের রীত-রেওয়াজ শেখা অধিক আবশ্যক। তাই কোন পরিবারে থাকা দরকার। কিন্তু তার আগে অমুকের কাছে থেকে শিক্ষানবিশী করা প্রয়োজন। চল, তাঁর কাছে তোমায় নিয়ে যাচ্ছি।'

কৃতজ্ঞভাবে তাঁর প্রস্তাবে রাজী হইলাম; বন্ধুগৃহে উঠিয়া গেলাম। আদর-সংকারে কোন কমতি ছিল না। আমাকে মায়ের পেটের ভাইয়ের মত দেখিতেন। ইংরেজী আদব-কায়দা শেখান ও ইংরেজীতে কথা বলার তালিম দেন। কিন্তু আমার আহারের প্রশ্ন কঠিন হইয়া দাঁড়াইল। না-লবণ না-মসলা সেরেফ সিদ্ধ শাক-সবজি রুচিত না। গৃহিণী আমার জন্য রাঁধেনই বা কি? সকালে দুধে-ওটমীলে পরিজের ব্যবস্থা ছিল। মোটামুটি তাতে পেট ভরিত, কিন্তু দুপুর ও সন্ধ্যায় পেটের খিদে পেটেই থাকিত। বন্ধু রোজ মাংস খাইতে বলিতেন। আমার প্রতিজ্ঞার কথা বলিয়া আমি চুপ হইয়া যাইতাম। তর্কে যাইতাম না। দুপুরে রুটি, পালংশাক ও মোরব্বা

জুটিত। সন্ধ্যায়ও তাহাই। দেখিতাম, কেউ দুই-তিন টুকরার বেশি রুটি খায় না। আর বেশি চাহিতে আমার লজ্জা হইত। একে ত ভর-পেট খাওয়ার অভ্যাস ছিল তাতে খিদেও লাগিত খুব। পেট বেশি চাহিত। দুপুরে ও সন্ধ্যায় দুধের ব্যবস্থা ছিল না। আমার এই দশা দেখিয়া বন্ধু বিরক্ত হইয়া একদিন বলেন, 'মায়ের পেটের ভাই হলে তোমায় নিশ্চয় ফেরত পাঠিয়ে দিতাম। মা নিরক্ষর আর এখানকার অবস্থা কি তা-ও তিনি জানেন না। তাঁকে দেওয়া প্রতিজ্ঞার মূল্য কি? এ প্রতিজ্ঞাই নয়। শোন বলছি, আইনও একে প্রতিজ্ঞা বলবে না। এরূপ প্রতিজ্ঞা আঁকড়ে থাকা কুসংস্কার মাত্র। এরূপ কুসংস্কার ধরে থাকলে এ দেশ থেকে তুমি দেশে কিছু নিয়ে যেতে পারবে না। তুমিই ত বলেছ যে মাংস খেয়েছিলে। তা তোমার ভালও লেগেছিল। যেখানে খাওয়ার কোনই প্রয়োজন নেই সেখানে খেয়েছ, আর যেখানে খাওয়া নেহাত দরকার সেখানে ছাড়লে! এ এক উদ্ভট ব্যাপার!'

আমার সেই একই কথা। তিনি তর্ক জুড়িতেন না এমন দিন ছিল না, আর আমারও ছিল তেমনই এক উত্তর : 'না'। বন্ধু আমায় যতই বোঝান আমি ততই শক্ত হই। 'রক্ষা করো' বলিয়া ঈশ্বরের কৃপা চাহিতাম আর তা পাইতাম। জানিতাম না ঈশ্বর কে। কিন্তু ধাত্রী রম্ভা যে বিশ্বাসের বীজ পুঁতিয়াছিল তার ক্রিয়া চলিতেছিল।

একদিন বন্ধু বেন্থাম-এর গ্রন্থ হইতে উপযোগিতাবাদ অধ্যায় পড়িয়া শুনাইতে আরম্ভ করেন। প্রমাদ গণিলাম। ভাষা শক্ত ছিল; ঠিক ধরিতে পারিতেছিলাম না। তিনি ব্যাখ্যা করিতে লাগিয়া যান। আমি বলি, 'ক্ষমা করবেন, এ চুলচেরা বিচার বুঝতে পারছি না। মেনে নিচ্ছি, মাংস খাওয়া দরকার। কিন্তু যে প্রতিজ্ঞা করেছি তা ভাঙতে পারব না। এর অধিক যুক্তি আমার নেই। আপনার যুক্তি খণ্ডন করার শক্তিও আমার নেই। আপনার কাছে মিনতি, আমায় বোকা বা একগুঁয়ে জেনে এই ব্যাপারে ক্ষান্ত দিন। আমি জানি আপনি আমাকে ভালবাসেন। আপনার উদ্দেশ্য যে কি তা-ও বুঝি। আপনি আমার পরমহিতৈষী এ কথাও স্বীকার করি। আর এও দেখতে পাচ্ছি, বেদনা বোধ করেন বলেই আপনি এমনটা পীড়াপীড়ি করছেন। কিন্তু আমি নাচার। প্রতিজ্ঞা আমি ভাঙতে পারি না।'

বন্ধু চাহিয়া থাকিলেন। বই বন্ধ করিলেন। 'ভাল, তর্ক আর করব না' বলিয়া চুপ হইলেন। আমি খুশী হইলাম। ইহার পরে আর কোন দিন তিনি তর্ক করেন নাই।

কিন্তু আমার বিষয়ে তাঁর চিন্তা দূর হইল না। তিনি সিগারেট খাইতেন। মদ খাইতেন। কিন্তু ধূম বা মদ্য পান করিতে কোনদিনও তিনি আমাকে বলেন নাই। মাংস না খাইলে আমি দুর্বল হইয়া পড়িব ও মনের সুখে ইংলণ্ডে থাকিতে পাইব না এই ছিল তাঁর ভয়।

এইরূপে এক মাসের উমেদারি শেষ হয়। বন্ধুর বাড়ী ছিল রিচমণ্ড-এ। অতএব সপ্তাহে দুই এক দিনের বেশি লণ্ডনে যাওয়া সম্ভব হইত না। ডাক্তার মেহতা ও শ্রীদলপতরায় শুক্ল ভাবিয়া চিন্তিয়া ঠিক করেন যে কোন পরিবারে থাকা আমার পক্ষে ভাল হইবে। শ্রীদলপতরায় শুক্ল ওয়েস্ট কেনসিংটন-এ এক এংলো-ইণ্ডিয়ান পরিবারে আমার থাকার ব্যবস্থা করেন। ঘরনী বিধবা ছিলেন। মাংস খাই না সে কথা তাঁকে বলি। বৃদ্ধা বলেন আমার সুবিধা অসুবিধার দিকে তিনি লক্ষ্য রাখিবেন। সেখানে থাকি। ওখানেও বস্তুত অনাহার চলিতে থাকে। মিঠাই ইত্যাদি খাওয়ার বস্তু পাঠানোর জন্য দেশে লিখিয়াছিলাম। তা তখনও পাই নাই। সবই বিস্বাদ লাগিত। বৃদ্ধা প্রতিদিন জিজ্ঞাসা করিতেন, খাদ্যবস্তু কেমন লাগে, খাওয়া যায় ত? কিন্তু তিনি কি করিবেন? আমার লাজুকভাব তখনও তেমনই ছিল: সামনে তাঁরা যা দিতেন তার অধিক চাইতে পারিতাম না। বিধবার দুইটি মেয়ে ছিল। তারা আগ্রহ করিয়া দুই এক টুকরা রুটি বেশি দিত। কিন্তু বেচারা তারা কি করিয়া জানিবে যে গোটা একটা রুটির কমে আমার পেট ভরার নয়?

কিন্তু ততদিনে নিজের পায়ে ভর করার শক্তি আমার আসিয়া গিয়াছিল। পড়াশোনা তখনও ঠিক আরম্ভ হয় নাই। সংবাদপত্র মাত্র পড়িতাম। উহার মূলে ছিলেন দলপতরায় শুক্ল। ভারতবর্ষে আমি কখনও দৈনিকপত্র পড়িতাম না। প্রতিদিন পড়ার ফলে সংবাদপত্র পড়ার দিকে আমার ঝোঁক যায়। 'ডেইলি নিউজ,' 'ডেইলি টেলিগ্রাফ' ও 'পেলমেল গেজেট'-এর ওপর চোখ বুলাইতাম। তাতে এক ঘণ্টাও লাগিত না।

তাই আমি হাঁটিয়া বেড়াইতে আরম্ভ করি। নিরামিষ ভোজনালয় খোঁজার পালা শুরু হইল। গিন্নীও বলিয়াছিলেন যে খাস লণ্ডনে এরূপ

ভোজনালয় আছে। দিনে দশ বার মাইল হাঁটিতাম। কোন সস্তা বিশ্রান্তি-গৃহে যাইয়া পেট ভরিয়া রুটি খাইয়া লইতাম। কিন্তু তৃপ্তি হইত না। এমনি ঘুরিতে ঘুরিতে একদিন ফেরিংডন স্ট্রীটে গিয়া হাজির হই। 'ভেজিটেরিয়ন রেস্তোরাঁ' নামটি চোখে পড়ে। আমার আনন্দ ধরিতেছিল না যেমন বহু কামনার বস্তু পাইলে বালকের ধরে না। আনন্দে আটখানা হইয়া ভিতরে ঢুকিতেছিলাম, দরজার পাশে কাচে-মোড়া তাকে বিক্রয়ের জন্য রাখা বই দেখিতে পাইলাম। তথায় সল্ট-এর লেখা 'নিরামিষ আহার কেন?' (প্লী ফর ভেজিটেরিয়নিজ্‌ম) বই ছিল। এক শিলিং দিয়া বইখানি কিনিয়া খাওয়ার ঘরে গিয়া বসিলাম। বিলাতে আসার পরে এই প্রথম পেট ভরিয়া খাইলাম। ঈশ্বর আমার ডাক শুনিয়াছিলেন।

সল্ট-এর বই পড়িলাম। মন তা কাড়িয়া লইল। যুক্তিতে অকাট্য বলিয়া নিরামিষ আহারকে সেই দিন হইতে নিজ গরজে মানিয়া লই। মাকে দেওয়া কথা তখন আমার কাছে মহা আনন্দের ব্যাপার হইয়া যায়। এতদিন সত্যের খাতিরে, মাকে দেওয়া কথার খাতিরে, মাংস হইতে নিবৃত্ত ছিলাম, কিন্তু মন বলিত ভারতবাসী মাত্রেরই মাংস খাওয়া কর্তব্য আর ভাবিয়াও রাখিয়াছিলাম, যখন স্বাধীন হইব তখন খোলাখুলি ভাবে নিজে মাংস খাইব ও অন্যকে খাইতে বলিব। এখন চাকাটা একদম উল্টা ঘুরিয়া গেল—নিরামিষ আহারের ঘোর পক্ষপাতী হইলাম আর অন্যকে নিরামিষাশী করার আগ্রহও তেমনটাই প্রবল হইল।

১৫

সভ্য বেশে

নিরামিষের ওপর আমার অনুরাগ দিন দিন বাড়িতে লাগিল। সল্ট-এর বই পড়ার পরে আহার সম্বন্ধে আরও অধিক জানার আগ্রহ হয়। এই রকম বই যত পাইতেছিলাম কিনিতেছিলাম। হাওয়ার্ড উইলিয়ম-এর লেখা 'আহার-নীতি'—The Ethics of Diet—বইখানির নাম বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। এটাকে 'আদিম যুগ হইতে বর্তমান যুগ পর্যন্ত মানুষের আহারের ক্রমবিকাশের ইতিহাস' বলা যাইতে পারে। এতে দেখানোর চেষ্টা করা হইয়াছে যে পাইথাগোরস ও যীশু হইতে বর্তমান কালের জ্ঞানী, অবতার

ও পয়গম্বর প্রভৃতি সকলেই নিরামিষাশী ছিলেন। ডাঃ মিসিস আনা কিঙ্গস্‌ফোর্ড-এর 'উত্তম আহারের নীতি' নামক পুস্তকও আকর্ষক। তা ছাড়া ডা. এলিন্সন-এর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে লেখা হইতেও আমার সবিশেষ লাভ হইয়াছে। ওষুধের বদলে কেবল পথ্যের অদলবদল করিয়া রোগীকে ভাল করার পদ্ধতির তিনি সমর্থন করিয়াছেন। ডা. এলিন্সন নিজে নিরামিষ খাইতেন আর রোগীকেও কেবল নিরামিষ খাইতে বলিতেন। এই সব অধ্যয়নের ফলে খাদ্য বিষয়ে পরীক্ষা-প্রয়োগের বৃত্তি আমার জীবনে মহৎ আকার ধারণ করে। পরে ধর্ম প্রধান প্রেরণা হইয়া দাঁড়ায়।

তখনও কিন্তু সেই বন্ধু আমার কথা ভাবিতেন। স্নেহবশে তিনি ধরিয়া লইয়াছিলেন যে মাংস না খাইলে আমি দুর্বল হইব তাহাই নয়, অবাধে ইংরেজ সমাজে মেলামেশার অভাবে 'আনাড়ী' থাকিয়া যাইব। নিরামিষ আহার বিষয়ক নানা পুস্তক পড়িতেছি সে খবর তিনি পান। তাঁর ভয় হয়, এই সব অধ্যয়নের ফলে আমার মাথা বিগড়াইয়া যাইবে, পরীক্ষা-প্রয়োগে জীবন ব্যর্থ হইবে, ছিটগ্রস্ত হইয়া নিজ কাজ ভুলিব। তাই আমাকে শোধরানোর তিনি এক শেষ চেষ্টা করেন। তাঁর সঙ্গে নাটকে যাওয়ার আমন্ত্রণ করেন। আরও বলিয়া পাঠান যে নাটকে যাওয়ার পূর্বে হোবর্ন হোটেলে আমরা খাইয়া লইব। হোটেল নয় ত আমার মনে হইয়াছিল এক পুরী। ভিক্টোরিয়া হোটেল ছাড়ার পরে ওই প্রথম আমার অমন বৃহৎ রেস্তোরাঁয় যাওয়া। ভিক্টোরিয়া হোটেলের অভিজ্ঞতা বলা যাইবে না। কেন না তখন আমি আমাতে ছিলাম না। দেখা যাইতেছে, মতলব আঁটিয়াই বন্ধু আমাকে ওই রেস্তোরাঁয় লইয়া গিয়াছিলেন; তিনি মনে করিয়াছিলেন, লজ্জার খাতিরে সেখানে আমি কোন প্রশ্ন করিব না। শত লোকের মধ্যে আমরা দুই বন্ধু এক টেবিলে বসা। বন্ধু কি একটা পরিবেশন করিতে বলিলেন। 'সূপ' দিয়া গেল। আমি ফাঁপরে পড়িলাম। বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিতে ভরসা হইল না। পরিবেশনকারীকে ডাকিলাম।

বন্ধু বুঝিলেন। রাগত স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন: 'ব্যাপার কি?'

সসংকোচে ধীরভাবে বলিলাম: 'জিজ্ঞাসা করব এতে মাংস নেই ত?'

'ভব্য সমাজে এমন বুনো চাল-চলন অচল। ভদ্রভাবে চলতে না পার ত বেরিয়ে যাও। যেমন তেমন কোন রেস্তোরাঁয় খেয়ে নাও। পরে আমার জন্য বাইরে অপেক্ষা করো।' খুশী হইলাম, উঠিয়া পড়িলাম। পাশেই এক

নিরামিষ ভোজনগৃহ ছিল। সেদিকে গেলাম। দেখিলাম বন্ধ। কপালে উপোস ছিল। উপোসই করিলাম। বন্ধুর সঙ্গে নাটকে গেলাম। বন্ধু ওই বিষয়ে কোন কথা বলিলেন না। আমার বলার কিছু ছিল কি? ওই ছিল আমাদের দুই বন্ধুর মধ্যে শেষ যুদ্ধ। আমাদের সম্বন্ধ ঘোচেও নাই, তেতোও হয় নাই। তাঁর সকল প্রযত্নের মূলে ভালবাসা ছিল এ কথা আমি জানিতাম। তাই আচারবিচারের অমিল সত্ত্বেও তাঁর ওপর আমার টান বাড়িয়া যায়।

কিন্তু মনে হইল, বন্ধুর ভয় যে অকারণ তা প্রমাণ করা দরকার। ঠিক করিলাম, জঙ্গলী আর থাকিব না। ভব্যতার সকল চিহ্ন গ্রহণ করিয়া সর্বদিকে নিজেকে সমাজে খাপ খাওয়াইয়া নিরামিষ আহারের উদ্ভটতা ঢাকিব। 'সভ্য' হওয়ার বাতিকে অসম্ভবকে সম্ভব করিতে, ভব্য ইংরেজ বনিবার চেষ্টায় লাগিয়া গেলাম।

হইল বা আমার পোশাক বিলাতী। তবু ত তা বোম্বায়ের তৈরী। তা কি কেতা-দুরস্ত ইংরেজ মহলে আমল পাইতে পারে! এই ভাব হইতে 'আর্মি ও নেভী' স্টোরস হইতে এক প্রস্থ পোশাক তৈরী করাইলাম। উনিশ শিলিং দামের (সেই দিনের হিসাবে উহা খুবই বেশি ছিল) চীমনী টুপি মাথায় চড়াইলাম। তাতেই কি মন উঠিল! যেখানে শৌখিন লোকেরা পোশাক তৈরী করার সেই বণ্ড স্ট্রীটে গিয়া দশ পাউণ্ড দিয়া সাঁঝের পোশাক বানাইলাম—বানাইলাম না ত দশ পাউণ্ড জলে ফেলিলাম। দিলদরিয়া ভালমানুষ বড়দার কাছে ঘড়ির জন্য সোনার ডবল চেন চাহিয়া পাঠাইলাম ও পাইলাম। বাঁধা-টাই পরা শিষ্টাচার-বিরোধী বলিয়া টাই বাঁধার কলা শিখিয়া লইলাম। দেশে নাপিত যেদিন চুল কাটিতে আসিত সেদিন কেবল আরশির দর্শন মিলিত। কিন্তু এখানে আস্ত বড় আয়নার সামনে দাঁড়াইয়া পরিপাটি করিয়া টাই বাঁধিতে ও চুল দুই ভাগ করিয়া ফ্যাশন-দুরস্ত সিঁথি কাটিতে প্রত্যহ দশ মিনিট ব্যয় হইত। চুল ছিল কুঁচির মত, তাই তা পাট করিতে বুরুশ (ঝাঁটাই বলুন!)-এ-চুলে নিত্য-লড়াই চলিত। টুপি পরিতে ও খুলিতে সিঁথি না ভাঙ্গে তার তদারকে কখন যে হাত গিয়া চুলে পৌঁছিত টেরও পাইতাম না। সর্বক্ষণের আর এক সভ্য ক্রিয়া ছিল—পালিশ সমাজে বসিয়া ও ক্ষণে ক্ষণে সিঁথিতে হাত ফিরাইয়া চুল দুরস্ত রাখার চেষ্টা।

কিন্তু এতটা ফিটফাট থাকাও যথেষ্ট মনে হইত না। একমাত্র সভ্য

পোশাকেই কি সভ্য হওয়া যায়? শুনিয়াছিলাম, সভ্যতার অন্য কতকগুলি মাপকাঠিও আছে—নাচিতে জানা চাই, সরস বক্তৃতা করিতে পারা চাই, ফ্রেঞ্চ বলিতে পারা চাই, কেন না ফ্রেঞ্চ কেবল পড়শী ফ্রান্সেরই ভাষা নয়, গোটা ইউরোপেরও আদান-প্রদানের ভাষা। হাঁ, ইউরোপ ভ্রমণেরও সাধ ছিল। নিশ্চয় করিলাম, নাচ শিখিতে হইবে। এক নাচের ক্লাসে ভরতি হইলাম। এক টর্ম (সত্র)-এর জন্য তিন পাউণ্ড দক্ষিণা দিলাম। তিন সপ্তাহে গুটি ছয় পাঠ হয়ত পাইয়াছিলাম। তালে তালে পা পড়িত না। পিয়ানোর বোল ধরিতে পারিতাম না। 'এক, দুই তিন' চলিত কিন্তু অন্তরার ইঙ্গিত তালের লয় হইতে আমি ঠিক করিতে পারিতাম না। তবে এখন উপায়? এখন ত 'বাবাজী-বিড়াল-কথা'র মত কথা আমার শুরু হইল। ইঁদুর তাড়াইবার জন্য বিড়াল, বিড়ালের জন্য গাই, আর গাইয়ের জন্য লোক —এইভাবে বাবাজীর পরিবার বাড়িয়া গিয়াছিল। তেমন আমার লোভের মাত্রাও বাড়িয়া চলিল। ভাবিলাম, ভায়োলিন শিখিলে সুর-তান-লয়ের জ্ঞান হইবে। ভায়োলিন কিনিলাম, তিন পাউণ্ড খোয়াইলাম। আরও কিছু অর্থ তা শেখার জন্য গেল। বক্তৃতা করা শিখিতে হইবে ত লইলাম আর এক শিক্ষকের শরণ। ফী দিলাম তার জন্য এক গিনি। শিক্ষক বেল-এর 'স্ট্যাণ্ডার্ড এলোকু্যশনিস্ট' কিনিতে বলেন। কিনি। পিট-এর এক বক্তৃতা দিয়া পাঠ শুরু হয়।

এই বেল সাহেব আমার কানে সাবধানতার বেল (ঘণ্টা) বাজাইলেন। আমি জাগিলাম।

সারা জীবন কি আমার ইংলণ্ডে কাটিবে? জোর বক্তৃতা করিতে শিখিয়া আমার কি লাভ হইবে? নাচ নাচিয়া আমি কি করিয়া সভ্য বনিব? ভায়োলিন ত দেশেও শেখা যায়। আমি ছাত্র। বিদ্যা-রতন আমার কুড়াইতে হইবে। ব্যারিস্টারি পড়ার জন্য আমার তৈরী হইতে হইবে। সদাচারের দ্বারাই না কেবল আমি যথার্থ সভ্য হইতে পারি। তা নয় ত সভ্য হওয়ার লোভ ত্যাগ করাই ভাল।

এইরূপ চিন্তা মনে জাগিল। পত্রাকারে তা ভাষণ-শিক্ষককে জানাইয়া আর যাইব না বলিয়া ক্ষমা চাহিলাম। তাঁর কাছে দুই-তিন পাঠ লইয়াছিলাম। নৃত্য-শিক্ষিকাকে ঠিক তেমন পত্র দিলাম। ভায়োলিন সহ ভায়োলিন-শিক্ষিকার বাড়ী গেলাম ও যে দাম পাওয়া যায় তাতেই ভায়োলিন

বেচিয়া দিতে বলিলাম। তাঁর সহিত কিছুটা মিত্রতার ভাব জন্মিয়াছিল। তাই তাঁকে কি ভাবে যে আমি নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়াছি সে কথা বলি ও মোড় ঘোরার সংকল্পের কথা জানাই। ও সব জঞ্জাল হইতে মুক্ত হইয়াছি শুনিয়া তিনি খুশী হন।

সভ্য হওয়ার এই ঝোঁক মাস তিনেক ছিল। পরিপাটি পোশাকের ভূত বছর কয়েক কাঁধে সওয়ার ছিল। তা হউক, তখন হইতে আমি বিদ্যার্থী হইলাম।

১৬

অদলবদল

নাচ ইত্যাদির কালটাতে আমি ভোগবিলাসে মজিয়াছিলাম যেন কেহ মনে করিবেন না। পাঠক দেখিয়া থাকিবেন সে সময়ে ঘটে আমার বুদ্ধি ছিল; আত্মনিরীক্ষণের ভাব মোহের তলায় একদম চাপা পড়িয়াছিল তা নয়। পাইটির পর্যন্ত হিসাব রাখিতাম। খরচের বরাদ্দ ছিল: নিয়ম বাঁধিয়া লইয়াছিলাম মাসে পনর পাউণ্ডের বেশি খরচ করিব না। বাস-ভাড়া, ডাক-খরচ, খবরের কাগজ কেনার পয়সা ইত্যাদি ছোটখাটো খরচও হিসাব হইতে বাদ পড়িত না। শোয়ার আগে হিসাব মিলাইয়া শুইতাম। সেই অভ্যাস আজও বজায় আছে। আর তাই আমি বলিতে পারি যে, সার্বজনিক ক্ষেত্রে আমার হাত দিয়া যে লাখো লাখো টাকা খরচ হইয়াছে তার কড়িটির পর্যন্ত আমি সদ্ব্যবহার করিয়াছি, আর আমার পরিচালনাধীনে যে আন্দোলন চলিয়াছে তার কোনটির জন্য আমাকে ধার করিতে হয় নাই, উল্টা প্রত্যেক আন্দোলনের পরে হাতে কিছু পয়সা বাঁচিয়া গিয়াছে। যুবকদের আমি আমার পথ অনুসরণ করিতে বলি; যে অল্পবিস্তর পয়সা তাদের হাতে আসে তার যেন তারা কড়াক্রান্তি হিসাব রাখে। তার লাভ তারা অন্তে দেখিতে পাইবে যেমন তার লাভ আজ আমি ও আমার দেশবাসী দেখিতে পাইতেছি।

নিজের চালচলনের ওপর আমার দৃষ্টি ছিল। তাই কতটা খরচ করা আমার সাজে তা আমি দেখিতে পাই। খরচ অর্ধেক করিয়া ফেলা স্থির করি। হিসাব হইতে দেখিতে পাই যে গাড়ী ভাড়ার অঙ্কটা মোটা। তা

ছাড়া, পরিবারে ছিলাম তাই সপ্তাহে সপ্তাহে বিল চুকাইতে হইত। সময় সময় লোকাচারও পালন করিতে হইত—যেমন পরিবারের লোকদের রেস্তোরাঁয় ভোজ দেওয়া বা তাঁদের সঙ্গে বাইরে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে যাওয়া। তখন গাড়ীভাড়া আমাকেই গণিতে হইত কারণ ও দেশের রেওয়াজ এই যে মেয়েরা সঙ্গে থাকিলে তার খরচ পুরুষের বইতে হয়। তা বাদে বাইরে যাইতাম ত খাওয়ার জন্য ঘরে ফেরা যাইত না। বাহিরে খাইতে হইত। তাই বলিয়া সাপ্তাহিক বিলের অঙ্ক কম হইত না। এইভাবে খরচের অঙ্কটা বেশ মোটা হইয়া যাইত। দেখিলাম, এই সব খরচ হইতে বাঁচা যায় যেমন বাঁচা যায় চক্ষুলজ্জায় করা অন্য কতকগুলি খরচ হইতে।

পরিবারে না থাকিয়া ঘর ভাড়া লইয়া নিজের মত থাকা স্থির করিলাম। আরও ঠিক করিলাম যে যখন যে পাড়ায় থাকিলে কাজের স্থবিধা হইবে তখন সেই পাড়ায় থাকিব। অভিজ্ঞতা তাতে বাড়িবে। আধ ঘণ্টা হাঁটিয়া কাজের জায়গায় যাওয়া যায় ও গাড়ী ভাড়া বাঁচে এমন জায়গায় ঘর লইলাম। এতদিন কোথাও যাইতে গাড়ীতে চাপিতাম; পয়সা খরচ হইত আর ওদিকে বেড়াইবার জন্য আলাদা সময় বাহির করিতে হইত। এখন হইতে এক কাজে দুই কাজ হইতে লাগিল। এই সংযোগে পয়সা ত বাঁচিলই উপরন্তু অনায়াসে আট দশ মাইল বেড়ানো হইয়া যাইত। মুখ্যত এই অভ্যাসের কারণ বিলাতে আমি প্রায় কোন অসুখে ভুগি নাই, এবং দেহ আমার মোটামুটি শক্তপোক্ত হইয়াছিল।

দুইখানি ঘর ভাড়ায় লইলাম। একটা হইল বসার ঘর আর একটা শোয়ার। এটা ছিল হেরফেরের দ্বিতীয় পর্যায়। তৃতীয় অদলবদল ঘটিয়াছিল পরে।

এই পরিবর্তনে খরচ অর্ধেক হইয়া যায়। কিন্তু সময় কি কাজে লাগাই? জানিতাম, ব্যারিস্টারি পরীক্ষার জন্য বেশি খাটিতে হয় না। অতএব চাপ ছিল না, হাতে সময় ছিল। ইংরেজীতে কাঁচা ছিলাম। মন সদা খচখচ করিত। 'আগে বি. এ. পাস করো, তখন এসো' লেলী সাহেবের (পরে স্তর ফ্রেডরিক) এই কথা আমার অন্তরে কাঁটার মত বিঁধিত। মনে মনে ভাবিলাম ব্যারিস্টার ত হইবই, তা ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন পরীক্ষাও আমাকে পাস করিতে হইবে। ওকসফোর্ড ও কেম্ব্রিজ পরীক্ষার খবর লইলাম। কয়েক জন বন্ধুর সহিত এই সম্বন্ধে কথা হইল। দেখিতে পাইলাম, এই দুইয়ের

যেখানেই যাই, খরচ বেশি লাগিবে আর পড়িতেও হইবে অধিক দিন। তিন বছর বিলাতে থাকার বরাদ্দ আমার ছিল। কোন বন্ধু আমাকে বলে, 'কঠিন পরীক্ষা পাস করতে চাও ত লণ্ডনের ম্যাট্রিকুলেশন পাস করো। খুব খাটতে হবে। তা হোক, সাধারণ জ্ঞান বাড়বে। খরচ প্রায় বাড়বে না।' প্রস্তাবটি ভাল লাগে। কিন্তু পরীক্ষার বিষয় দেখিয়া ঘাবড়াইয়া গিয়াছিলাম। ল্যাটিন ও কোন একটি আধুনিক ভাষা অবশ্যপাঠ্য ছিল। চিন্তায় পড়িয়াছিলাম, ল্যাটিনের কি হইবে? কিন্তু বন্ধু জোর দিয়া বলেন, 'উকিলদের ল্যাটিন জানা নেহাত দরকার। তা ছাড়া 'রোমন ল'-এর এক প্রশ্নপত্র ত ল্যাটিনেই করা হয়। অধিকন্তু ল্যাটিনের জ্ঞান থাকলে ইংরেজীতে দখল জন্মে।' এই সকল যুক্তি মনে ক্রিয়া করিল। ঠিক করিলাম, কঠিন হোক বা না হোক ল্যাটিন শিখিবই, আর যে ফ্রেঞ্চের পড়া আরম্ভ করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছিলাম তাও পুরা করিব। অতএব ফ্রেঞ্চ হইল আমার পরীক্ষার দ্বিতীয় ভাষা। কোন এক প্রাইভেট ম্যাট্রিকুলেশন ক্লাসে ভরতি হইলাম। পরীক্ষা ছয় মাস পর পর হইত। আমার হাতে পাঁচ মাস মাত্র সময় ছিল। কাজটা প্রায় আমার শক্তির অতিরিক্ত ছিল। ফলে কোথায় হইব ভদ্রলোক না হইলাম একজন পরিশ্রমী ছাত্র। টাইমটেবল তৈরি করিলাম। প্রতিটি মিনিট কাজে লাগাইলাম। কিন্তু ওই সময় মধ্যে অন্যান্য বিষয়ের অতিরিক্ত ল্যাটিন ও ফ্রেঞ্চে তৈরি হওয়ার মত বুদ্ধি ও স্মরণশক্তি আমার ছিল না। পরীক্ষা দেই। ল্যাটিনে ফেল হই। দুঃখ হইয়াছিল। কিন্তু দমি নাই। ল্যাটিন ভাল লাগিতেছিল। আর এই কথাও মনে হয় যে ফের পরীক্ষা দিলে ফ্রেঞ্চ ভালরূপে শেখা যাইবে। পরীক্ষা-প্রয়োগের সুবিধা ছিল না বলিয়া রসায়ন ভাল লাগিত না, যদিও এখন মনে হয় ভাল লাগা উচিত ছিল। দেশে রসায়ন পড়িয়াছিলাম বলিয়া লণ্ডন ম্যাট্রিকুলেশনের জন্য তা বাছিয়া লইয়াছিলাম। কিন্তু এবার আলো ও উষ্ণতা (লাইট এণ্ড হীট্) লইলাম। শুনিয়াছিলাম বিষয়টা সোজা। আর দেখিলাম যে সোজাই।

দ্বিতীয় বার পরীক্ষা দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলাম। তার সঙ্গে সঙ্গে জীবন আরও অধিক সহজ সরল করার চেষ্টাও চলিতেছিল। মনে হইল যে আমার জীবনযাত্রা এখনও আমাদের গরীব পরিবারের মতন হয় নাই। টানাটানি সত্ত্বেও উদার বড়দা টাকা চাহিলেই টাকা পাঠাইতেন, এ কথা যখনই মনে হইত অন্তর ব্যথায় ভরিয়া যাইত। দেখিতে পাই যে যারা

মাসে আট হইতে পনর পাউণ্ড খরচ করিত প্রায় সকলেই তারা ছাত্রবৃত্তি-ধারী ছিল। আমা-অপেক্ষা গরীবের মত থাকে এমন দৃষ্টান্ত চোখের সামনেই ছিল। এমন ছাত্রের সঙ্গে আমার পরিচয়ও হইয়াছিল। একটি ছাত্র লণ্ডনের গরীব বস্তিতে সপ্তাহে এক শিলিং ভাড়ার ঘরে থাকিত ও লোকহার্টের সস্তা কোকো দোকানে দুই পেনীর কোকো-রুটিতে দিন চালাইত। তার সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার শক্তি আমার ছিল না। কিন্তু মনে হয় যে দুইটা ঘরের বদলে একটা ঘরে থাকিলে ও এক বেলা নিজে রান্না করিয়া খাইলে চার-পাঁচ পাউণ্ডে মাস চালানো যায়। ওই সময়ে সহজ সরল জীবন বিষয়ক বইও পড়ি। দুই কামরার ঘর ছাড়িয়া দেই ও সপ্তাহে আট শিলিং ভাড়ায় এক কামরা লই। উনুন কিনি ও সকাল বেলা রান্না করিতে শুরু করি। কুড়ি মিনিটের অধিক লাগিত না। ওটমীলের জাউ (পরিজ) রাঁধিতে ও কোকোর জল ফুটাইতে এর বেশি কি সময়ই বা লাগিতে পারে? দুপুরে বাইরে খাইতাম। নৈশ আহার রুটি ও কোকোতে সারিতাম। এভাবে এক হইতে সওয়া শিলিং-এ দিনের খাওয়া সমাধা করিতাম। এই সময়টাতেই আমি সব চাইতে বেশি পড়াশুনা করিয়াছিলাম। জীবন সাদাসিধা হওয়ার দরুন বিস্তর সময় আমার বাঁচিত। দ্বিতীয় বার পরীক্ষা দিলাম। পাস করিলাম।

এই পরিবর্তনে আমার জীবন আনন্দহীন হইয়াছিল এরূপ যেন পাঠক মনে করিবেন না। উল্টা, তার ফলে আমার জীবন ভিতরে বাহিরে একরূপ হয়, জীবনধারা পরিবারের জীবনধারার সমান হয়, জীবন অধিক সত্যময় হয়, আর অন্তরাত্মা আমার আনন্দে ভরিয়া ওঠে।

১৭

খাদ্যের পরীক্ষা-প্রয়োগ

জীবনের গভীরে যতই প্রবেশ করিতেছিলাম অন্তর-বাহিরে পরিবর্তনের তাগিদ ততই অধিক অনুভব করিতেছিলাম। জীবনধারার ও খরচের পরিবর্তন যে গতিতে ঘটিতেছিল সেই বা তারও অধিক গতিতে খাদ্যের অদলবদল শুরু হইয়াছিল। ধর্ম, বিজ্ঞান, ব্যবহার ও শরীরের দৃষ্টিতে নিরামিষ ভোজনের সূক্ষ্ম বিচার-বিবেচনা ইংরেজদের লিখিত নিরামিষ

আহার বিষয়ক গ্রন্থে দেখিতে পাই। নীতির দিক হইতে লেখকদের সিদ্ধান্ত এইরূপ: মানুষ পশুপক্ষীর প্রভু হইয়াছে ত হইয়াছে পশুপক্ষীকে রক্ষা করার নিমিত্তে, তাদের মারিয়া খাওয়ার জন্য নয়; অন্য কথায়, মানুষকে যেমন মানুষ কাজে লাগায়, মারিয়া খায় না, তেমন পশুপক্ষীকেও মানুষ কাজে লাগাইবে, বধ করিয়া খাইবে না। তা ছাড়া, এই সত্যের ওপরও তাঁরা জোর দিয়াছেন যে আহার ভোগের জন্য নয়, বাঁচিয়া থাকার জন্য। তাই তাঁদের কেউ কেঁউ মাংস ত বটেই ডিম ও দুধ পর্যন্ত ত্যাগ করিতে বলিয়াছেন, নিজেরাও ত্যাগ করিয়াছেন। বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে কেউ কেউ বলিয়াছেন যে কোন কিছু রাঁধিয়া খাওয়ার দরকার নাই, বন-পাকা ফল খাওয়ার উপযোগী করিয়া মানুষের শরীর গঠিত। মায়ের দুধ মাত্র খাওয়া যাইতে পারে এবং দাঁত ওঠার সঙ্গে সঙ্গে চিবাইয়া খাইতে হয় এরূপ জিনিস খাওয়া চাই। বৈদ্যক শাস্ত্রের দিক হইতে তাঁদের মত এই যে লঙ্কা-মশলা ইত্যাদি না খাওয়া ভাল। তাঁরা এ কথা বলেন যে, কি সুবিধার দিক হইতে কি খরচের দিক হইতে নিরামিষ আহার সর্বাপেক্ষা সুলভ। এই চার মতেরই ক্রিয়া আমার ওপর হইয়াছিল এবং এই চার মতের লোকদের সহিত আলাপ পরিচয় আমার নিরামিষ রেস্তোরাঁয় হয়। বিলাতে তাঁদের এক সমিতি ছিল এবং এক সাপ্তাহিক পত্রও। সাপ্তাহিকের গ্রাহক ও সমিতির সভ্য আমি হইয়াছিলাম। অল্প দিন মধ্যে সমিতি আমাকে উহার কার্যকরী কমিটীর সদস্য করিয়া লইয়াছিল। ওই সমিতিতেই নিরামিষাশী গোষ্ঠীর যাঁরা স্তম্ভ ছিলেন তাঁদের সম্পর্কে আসিয়াছিলাম।

দেশ হইতে মিঠাই মসলা ইত্যাদি যা আনাইয়াছিলাম তা তেমনই পড়িয়া থাকিল। মনের মোড় ঘুরিয়া গিয়াছিল, এই মসলার আগ্রহ আর ছিল না। মসলা ছাড়া যে শাক-সবজি রিচমণ্ড-এ বিস্বাদ লাগিত শুধু ভাপে সিদ্ধ সেই শাক-সবজিই এখন ভাল লাগিতে লাগিল। নানা অনুভব হইতে বুঝিতে পাইয়াছি যে স্বাদের স্থান আসলে জিব নয়, মন।

খরচ কমাইবার দিকে দৃষ্টি অনুক্ষণ ছিলই। তখনকার দিনে এক পন্থ ছিল যারা মনে করিত চা কফি ক্ষতিকারক আর কোকো লাভদায়ক। শরীরের পক্ষে আবশ্যক নয় এরূপ বস্তু খাইতে নাই এই জ্ঞান আমার জন্মিয়াছিল। তাই চা-কফি ছাড়ি ও কোকো ধরি।

যে সব রেস্তোরাঁয় আমি যাইতাম তা দুই ভাগে ভাগ করা যায়। এক

শ্রেণীর রেস্তোরাঁয় যত ইচ্ছা পদ খাইতে পাওয়া যাইত আর সেই অনুসারে পয়সা দিতে হইত। ওরূপ রেস্তোরাঁয় এক বেলায় শিলিং দুই শিলিং খরচ পড়িত। ওসব স্থানে ভাল অবস্থার লোকেরা যাইত। অন্য রকম রেস্তোরাঁয় ছয় পেনীতে তিন পদ ও এক টুকরা রুটি মিলিত। যখন আমি কড়াক্রান্তি হিসাব করিয়া চলিতাম তখন বেশির ভাগ দিন এই ছয়-পেনীর রেস্তোরাঁয় খাইতাম।

এই সকল মুখ্যপ্রয়োগের সাথে সাথে নানা ক্ষুদ্র প্রয়োগও চলিতেছিল যেমন এক সময়ে শ্বেতসার (স্টার্চ) জাতীয় খাদ্য খাইতাম না। কিছু দিন কেবল রুটি ও ফলে দিন কাটাইলাম আর কিছু দিন পনির, দুধ ও ডিমে দিন চলিত। শেষের প্রয়োগ সম্পর্কে দুই একটি কথা বলা দরকার। দুই সপ্তাহও এই প্রয়োগ চলে নাই। শ্বেতসার বর্জনের পক্ষপাতীরা ডিমের প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিলেন। ডিম মাংস নয় এই কথা বলিয়া তাঁরা বলিতেন যে ডিম খাইলে জীবনাশ হয় না। এই যুক্তির কুহকে ভুলিয়া মাকে দেওয়া কথা ভুলিলাম, ডিম খাইলাম। কিন্তু মোহ ভাঙ্গিতে দেরি হয় নাই। প্রতিজ্ঞার নূতন অর্থ করার অধিকার আমার নাই (আর আমি কি জানিতাম না যে মায়ের চোখে ডিম মাংসেরই সমান ছিল?) এ কথা বোঝামাত্র আমি ডিম ছাড়ি আর ওই প্রয়োগেও দাঁড়ি পড়ে।

এই যুক্তিতে (ডিম মাংস নয়) বিচার করিয়া দেখার মত এক সূক্ষ্ম বস্তু রহিয়াছে। বিলাতে মাংসের তিন ব্যাখ্যা চালু ছিল। একের কথা ছিল মাংস মানে পশুপক্ষীর মাংস। এই ব্যাখ্যাকারীরা মাংস খাইত না, মাছ খাইত; ডিম ত চলিতই। দ্বিতীয় পক্ষ বলিত জীবমাত্রের দেহই মাংস। সুতরাং তাদের কাছে মাছও অচল ছিল। কিন্তু ডিমে আপত্তি ছিল না। তৃতীয় দৃষ্টির মতে, জীবদেহের মত জীবদেহ হইতে উৎপন্ন বস্তুও মাংসই বটে। অতএব তাদের কাছে দুধ ও ডিম ত্যাজ্য ছিল। প্রথম ব্যাখ্যা মানিলে ডিম খাইতে আমার কোন বাধা ছিল না; মাছও চলিতে পারিত। কিন্তু মায়ের ব্যাখ্যা মানা যে আমার কর্তব্য এতে আমার কোন সংশয় ছিল না। অতএব মাকে দেওয়া কথা রক্ষা করিতে হইলে ডিম আমার ত্যাজ্য ছিল। ডিম ছাড়ি। তাতে সত্যই আমাকে অসুবিধায় পড়িতে হইয়াছিল, কারণ খুঁটিয়া-নাটিয়া খোঁজ লইয়া জানিতে পাইয়াছিলাম যে নিরামিষ ভোজনগৃহের কোন কোন খাদ্যেও ডিম থাকে। এই কারণ অসুবিধা হইয়াছিল। অসুবিধা না বলিয়া

একে ভাগ্যও বলা যাইতে পারে কেন না কোন্ খাদ্যে কি বস্তু আছে তার সঠিক জ্ঞান না হওয়া অবধি সংকোচ বোধ করিলেও 'এতে ডিম নেই ত?' এই প্রশ্ন পরিবেশনকারীকে আমার জিজ্ঞাসা করিতে হইত, কেন না কোন কোন রকমের পুডিং ও কেকেও ডিম থাকে। এক দিক দিয়া দেখিলে ইহার ফলে অনেক ঝঞ্ঝাট হইতে নিষ্কৃতি পাই; অনেক বস্তু আমার পক্ষে অখাদ্য হওয়ার দরুন আমার আহার সাদাসিধা হইয়া যায়। অন্য দিকে অসুবিধাও কিছু হইয়াছিল—রুচিকর কতকগুলি জিনিস ছাড়িতে হইয়াছিল। কষ্ট দিন কয়েক হইয়াছিল। প্রতিজ্ঞা ঠিক ঠিক পালন করার ফলে যে আত্মসন্তোষ ও নির্মল আনন্দ লাভ করিয়াছিলাম জিবের ক্ষণিক স্বাদের তুলনায় সেই আনন্দ অধিক মধুর ও স্থায়ী হয়।

কিন্তু আমার আসল পরীক্ষা হয় পরে, অন্য এক ব্রতের কষ্টিপাথরে। তবে রাখে কৃষ্ণ মারে কে?

এই প্রকরণ শেষ করার আগে ব্রত বা প্রতিজ্ঞার অর্থ সম্বন্ধে দুই একটি কথা না বলিলে নয়। আমি মাকে কথা দিয়াছিলাম। প্রতিজ্ঞার অর্থ লইয়া জগতে চিরকাল অনন্ত ঝগড়ার সৃষ্টি হইয়াছে। প্রতিজ্ঞার ভাষা যতই স্পষ্ট হোক, কাককে কোকিল বানাইতে ভাষাশাস্ত্রীর আটকায় না। এই ব্যাপারে ছোট বড়, পণ্ডিত মূর্খ সমান। স্বার্থে মানুষ অন্ধ হয়। আমির ফকির সকলেই প্রতিজ্ঞার অর্থ নিজের দিকে টানিয়া করে, নিজদের তারা ঠকায় এবং দুনিয়ার মালিককে ঠকাইতে চেষ্টা করে। শব্দের বা বাক্যের এরূপ পক্ষপাতী অর্থ করাকে ন্যায়শাস্ত্রে দ্বিঅর্থী মধ্যমপদ বলা হইয়াছে। প্রতিজ্ঞা যে করায় সে প্রতিজ্ঞার যে অর্থ করে তা মানিয়া লওয়া সর্বোত্তম ন্যায়। যেখানে দুই অর্থ হইতে পারে সেখানে দুর্বল পক্ষের অর্থকে গ্রহণ করা অন্য সার্বভৌম বিচার। এই দুই উত্তম পথ ত্যাগ করার হেতু বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ঝগড়া বাধে ও অধর্মের চক্র ঘোরে। অসত্য হইতে এই সব অন্যায়ের উৎপত্তি। সত্যের পথে যে চলিতে চায় সুবর্ণ মার্গ হাতছানি দিয়া তাকে ডাকিয়া লয়। শাস্ত্রের পাতা তাকে ঘাঁটিতে হয় না। মাংস বলিতে মা যা বুঝিতেন আর আমি নিজেও তখন যা বুঝিতাম সেই অর্থেই প্রতিজ্ঞা পালনীয় ছিল, অন্য অর্থে নয়, অনুভবের অথবা নিজের বিদ্যাবত্তার অভিমানে যে অর্থ আমার কাছে ঠিক বলিয়া মনে হইয়াছিল।

ব্যয়-সংকোচ ও স্বাস্থ্যের প্রেরণা হইতে ইংলণ্ডে ওই সব প্রয়োগ-পরীক্ষা

আমার চলিয়াছিল। ধার্মিক প্রেরণা তখন ছিল না। ধার্মিক প্রেরণা আসে পরে আর সে মতে কঠোর প্রয়োগ চলে দক্ষিণ আফ্রিকায়। সে কথা পরে বলিব। তবে এ কথা বলা যাইতে পারে যে তার পত্তন বিলাতেই হইয়াছিল।

নবদীক্ষিতে নূতন ধর্ম প্রচারের উৎসাহ সেই ধর্মে লালিত লোকের অপেক্ষা অধিক দেখা যায়। নিরামিষ আহার তখন বিলাতে নূতন ধর্ম, আর আমার বেলায়ও নূতন ধর্মই বলিতে হইবে কারণ বুদ্ধির দিক হইতে মাংস খাওয়ার ঘোর পক্ষপাতী হওয়ার পরেই না আমি বিলাত গিয়াছিলাম। নিরামিষ আহারের নীতি বুঝিয়া-সুঝিয়া বিলাতেই আমি গ্রহণ করি। তাই আমার অবস্থা নবদীক্ষিতের মতই হইয়াছিল; নবদীক্ষিতের আবেগ আমাতে আসিয়াছিল। সুতরাং যে পাড়ায় তখন আমি ছিলাম সেই বেঝওয়াটার-এ নিরামিষাশী সভার স্থাপনা করার কথা ভাবিলাম। স্যার এড্‌উইন আর্নল্ড ওই পাড়ায় থাকিতেন। তাঁকে উপসভাপতি হইতে অনুরোধ করি। তিনি রাজী হন। সভাপতি হন ডাঃ ওল্ডফিল্ড। আমি সম্পাদক হই। কিছু দিন সংস্থা ভালই চলে। কিন্তু কয়েক মাস পরে তা উঠিয়া যায়। কারণ পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কিছু সময়ের পরে অন্য পাড়ায় আমি চলিয়া যাই। তা হোক, এই ছোটখাটো ও দিন কয়েকের অনুভব হইতে সংস্থা গঠনের ও পরিচালনা করার কিছুটা অভিজ্ঞতা আমার জন্মে।

১৮

লাজুকতা আমার ঢাল

নিরামিষ সভার কার্যনির্বাহক সমিতি আমাকে সদস্য করিয়া লয়। উহার প্রত্যেক বৈঠকে আমি উপস্থিতও হইতাম, কিন্তু সেখানে মুখে কথা ফুটিত না। ডাঃ ওল্ডফিল্ড একদিন আমাকে বলেন, 'আমার সঙ্গে ত তুমি দিব্যি কথা বল। কিন্তু সমিতির বৈঠকে ভুলেও তুমি মুখটি খোল না, ব্যাপার কি? তোমাকে নর-মাছি বলব কি?' পরিহাসটা আমার বড়ই ভাল লাগিয়াছিল। মউমাছি বিশ্রাম জানে না, সতত কাজ করে, আর নর-মাছি খায়-দায় ও বসিয়া কাটায়। সমিতির অন্য সবে নিজ নিজ মতামত ব্যক্ত করিত; আমি বোবার মত বসিয়া থাকিতাম। এটা অদ্ভুত ছিল বই কি! বলার ইচ্ছা

বা আমা অপেক্ষা ঢের বেশি জানে। আবার এমনটাও ঘটিত : কোন বিষয়ে বলা দরকার মনে করিতাম আর বলিতে যাইতাম ত ততক্ষণে অন্য কোন বিষয়ের আলোচনা শুরু হইয়া যাইত। এইভাবে অনেক দিন চলে।

এর মধ্যে সমিতির সামনে এক গম্ভীর প্রশ্ন উপস্থিত হয়। আমার মনে হয় তাতে যোগ না দেওয়া অন্যায় হইবে ; প্রতিবাদ না করিয়া ভোট দেওয়া কাপুরুষতার কাজ হইবে। 'টেমজ আয়রন ওয়ার্কস'-এর মালিক মি. হিলস সমিতির সভাপতি ছিলেন। শুদ্ধাচারের তিনি কঠোর পক্ষপাতী ছিলেন অর্থাৎ পিউরিটান ছিলেন। বলা যায় যে তাঁর পয়সায় সমিতি চলিত। সমিতির বেশির ভাগ সভ্য তাঁর তাঁবে ছিল। খ্যাতনামা নিরামিষাশী ডা. এলিন্সনও সমিতির সভ্য ছিলেন। ওই সময়ে কৃত্রিম উপায়ে সন্ততি নিয়মনের আন্দোলনের পত্তন হয়। ডা. এলিন্সন উহার সমর্থক ছিলেন ও শ্রমিক মহলে উহার প্রচার করিতেন। মি. হিলসের মনে হয় যে এই পথে সমাজের নৈতিক বনিয়াদ ধ্বসিয়া যাইবে। আহারের সংস্কার সাধন নিরামিষ সভার একমাত্র কাম্য নয়, লোক-চরিত্রের উন্নয়নও উহার লক্ষ্য হওয়া চাই এই ছিল তাঁর দৃষ্টি। অতএব তিনি বলেন যে ডা. এলিন্সনের ন্যায় সমাজ-ঘাতক মতাবলম্বী ব্যক্তির স্থান নিরামিষ সভায় হইতে পারে না। সে অনুসারে তাঁহার সদস্যপদ খারিজ করিয়া দেওয়ার এক প্রস্তাব সভায় করা হয়।

বিষয়টিতে আমার আগ্রহ ছিল। ডা. এলিন্সন জন্মশাসন সম্বন্ধে যে মত পোষণ করিতেন তা আমার কাছে অতীব ভয়ঙ্কর মনে হয়। আর এ কথাও আমার মনে হয় যে ডা. এলিন্সনের মতের বিরোধ করার অধিকার শুচিপন্থী মি. হিলসের আছে। মি. হিলসের ওপর আমার খুব শ্রদ্ধা ছিল। তাঁর উদারতায় আমি মুগ্ধ ছিলাম। কিন্তু উগ্র শুচিবাদিতাকে নিরামিষ সমিতির লক্ষ্য না মানার কারণে কোন সদস্যকে সমিতি হইতে তাড়ানো আমার ঘোর অবিচার মনে হয়। আমি দেখিতে পাই যে অ-পিউরিটান কেহ সমিতিতে থাকিতে পারিবেন না ইহা সমিতির মত নয়। মি. হিলসের সেই মত নিজস্ব মত কেন না কোন নৈতিক মতবাদের প্রসারের জন্য নয়, নিরামিষ আহারের প্রচার ও প্রসারের নিমিত্তই সমিতি স্থাপিত হইয়াছিল। অতএব আমার মনে হয় যে অন্য নীতি বিষয়ে তাঁর মত যাহাই হোক নিরামিষাশী হইলে যে কোন ব্যক্তি এই সমিতির সদস্য হইতে পারে।

সমিতিতে এই দৃষ্টির লোক আরও ছিলেন। কিন্তু আমার মনে হয়

নিজ মত ব্যক্ত করা আমার কর্তব্য। কিন্তু ভাবিয়া পাইতেছিলাম না কি ভাবে তা করি। বলিতে পারিব এই ভরসা আমার ছিল না। তাই লিখিত বক্তব্য সভাপতির হাতে দেওয়া ঠিক করি। লেখা বয়ান সহ সভায় গেলাম। যতটা মনে আছে সেই বয়ান পড়ারও সাহস আমার হয় নাই। কোন সভ্যকে দিয়া সভাপতি তা পড়ান। ডা. এলিন্সনের পক্ষের হার হয়। অতএব এইরূপ যুদ্ধের প্রথম যুদ্ধেই আমি হারা-পক্ষে ছিলাম। কিন্তু আমি জানিতাম আমি ন্যায়ের পক্ষে ছিলাম তাই পূর্ণ সন্তোষ আমার ছিল। আবছা আবছা মনে পড়ে, ওই ঘটনার পরে সমিতি হইতে আমি পদত্যাগ করি।

এই লাজুকভাব বিলাতে বরাবর ছিল। কারও সঙ্গে দেখা করিতে গিয়া সেখানে যদি ছয় সাত জন লোক দেখিতাম ত বোবা বনিয়া যাইতাম।

একবার ভেণ্টনর-এ গিয়াছিলাম। মজমুদারও গিয়াছিলেন। এক নিরামিষাশী পরিবারের গৃহে আমরা উঠিয়াছিলাম। 'এথিকস অব ডায়েট'-এর লেখক মি. হাওয়ার্ড এই বন্দরে বাস করিতেন। তাঁহার সঙ্গে আমরা দেখা করি। নিরামিষ আহারের প্রচারের নিমিত্ত সেখানে এক সভার আয়োজন হয়। সেই সভায় বলার নিমন্ত্রণ আমরা পাই। উভয়ে আমন্ত্রণ স্বীকার করি। জানিয়া লইয়াছিলাম যে লিখিত ভাষণ পাঠ করা দোষের নয়। ইহাও আমার জানা ছিল যে অনেকে নিজের বক্তব্য অল্প কথায় গুছাইয়া বলার জন্য লিখিত বক্তৃতা পাঠ করিয়া থাকে। পায়ে দাঁড়াইলেই মুখে কথা জুয়াইবে আর অবাধে বলিয়া যাইব, জানিতাম তাহা হইবার নয়। তাই বক্তব্য লিখিয়া লইয়া যাই। তাহাও পড়িতে পারিলাম না। চোখে অন্ধকার দেখিলাম! হাত পা কাঁপিতে লাগিল। আমার বক্তব্য বড়জোর ফুলস্‌কেপের এক পৃষ্ঠা মতন ছিল। মজমুদার তাহা পড়িয়া শোনান। মজমুদারের বক্তৃতা খাসা হইয়াছিল। হাততালি দিয়া শ্রোতারা উহার অভিনন্দন করে। আমার লজ্জা হইল ও নিজের বলার অক্ষমতার জন্য দুঃখ অনুভব করিলাম।

বিলাতে প্রকাশ্য সভায় বলার শেষ চেষ্টা করি বিলাত ত্যাগ করার পূর্বে। বিদায় নেওয়ার উদ্দেশ্যে হোবর্ন ভোজনালয়ে নিরামিষাশী বন্ধুদের নিমন্ত্রণ করিয়াছিলাম। নিরামিষ ভোজনগৃহে নিরামিষ খাদ্য ত মিলেই, কিন্তু যে সব ভোজনগৃহে আমিষ পরিবেশন করা হয় সেখানে নিরামিষের প্রবেশ ঘটে ত বেশ হয় এই ছিল আমার ইচ্ছা। তদনুযায়ী ওই ভোজন-গৃহের ব্যবস্থাপকের সহিত বিশেষ ব্যবস্থা করিয়া খাঁটি নিরামিষ ভোজের

আয়োজন করি। এই ব্যবস্থা ও এই পরীক্ষা নিরামিষাশী বন্ধুদের খুব ভাল লাগিয়াছিল। কিন্তু আমার দুরবস্থার একশেষ হয়। ভোজ মানে ভোগ। কিন্তু পশ্চিমে এই ভোগও কলার রূপ পাইয়াছে। ভোজের কালে সে কি ঘটা ও সাজসজ্জার বহর! বাজনা বাজে : বক্তৃতা চলে। এই ছোট ভোজেও ওসব আড়ম্বরের আয়োজন ছিল। নিমন্ত্রিতেরা বক্তৃতা করিলেন। আমার পালা আসিল। দাঁড়াইলাম। খুব খাটিয়া অল্প শব্দে আমার বক্তব্য গুছাইয়া রাখিয়াছিলাম। কিন্তু একটি বাক্যেই আমার ভাষণের অন্ত ঘটে। অ্যাডিসন সম্বন্ধে পড়িয়াছিলাম যে পার্লামেণ্টে প্রথম বার বক্তৃতা করিতে উঠিয়া 'আই কন্‌সিভ' এই কথা তিনি তিন বার বলেন আর ওইখানেই আটকাইয়া যান! তখন পার্লামেণ্টের এক সদস্য ভাঁড়ামি করিয়া বলিয়াছিলেন, 'ভদ্র মহোদয় তিন তিন বার ধারণ করলেন কিন্তু প্রসব কিছুই করলেন না।' ইংরেজী 'কন্‌সিভ' শব্দের এক অর্থ 'ধারণা করা' আর এক 'উদরে ধরা'। এই কাহিনী অবলম্বনে সরস খুদে বক্তৃতা করার জন্য তৈরি হইয়া গিয়াছিলাম। আরম্ভও করিয়াছিলাম ওই কথা দিয়া আর আটকাইয়াও গিয়াছিলাম ওখানেই। কিছুই মনে পড়িল না। কোথায় মজাদার বক্তৃতা করিব, না হইলাম হদ্দ নাকাল। 'মহোদয়গণ, আমার আমন্ত্রণ স্বীকার করেছেন বলে আমি আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞ' কোনমতে এ কথা বলিয়া আচমকা বসিয়া পড়ি।

বলা যাইতে পারে দক্ষিণ আফ্রিকা যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এই লাজুক স্বভাব আমার দূর হয় নাই। একেবারে দূর হইয়াছে এ কথা আজও বলা চলে না। অবাধে বলিতে পারিতাম না। অচেনা লোকের সামনে বলিতে সংকোচ বোধ হইত। না বলিয়া পারিলে বলিতাম না। বন্ধুমহলে বসিয়া খোশগল্প করিয়া বা ব্যর্থ কথা বলিয়া আসর জমাইতে আজও পারি না; সে ইচ্ছাও নাই।

এই লাজুকতার কারণে লোকের কাছে আমি হাসির পাত্র হইয়াছি বটে, তার অধিক অসুবিধা বা ক্ষতি আমার হয় নাই, বরং এখন দেখিতেছি লাভই হইয়াছে। এই যে বলার সংকোচ তা এক সময়ে আমার দুঃখের কারণ ছিল, এখন তা হইয়াছে সুখের। মস্ত লাভ এই হইয়াছে যে, ইহা হইতে কম কথায় প্রকাশের শিক্ষা আমার হইয়াছে। এই শব্দসংযম হইতে ভাবসংযম সহজেই আমি শিখিয়াছি। নিজের সম্বন্ধে আজ এই কথা আমি বলিতে

পারি যে, বিচার না করিয়া, ওজন না করিয়া প্রায় কোন কথাই আমি বলি· না বা লিখি না। আমার মনে পড়ে না আমার কোন বক্তৃতার বা লেখার কোন উক্তি বা শব্দের জন্য পরে কখনও আমি লজ্জাবোধ বা আপসোস করিয়াছি। ইহার ফলে বহু ঝঞ্ঝাট হইতে আমি বাঁচিয়া গিয়াছি, তা বাদে উপরি লাভও হইয়াছে—সময় অনেক বাঁচিয়াছে।

অনুভব হইতে ইহাও বুঝিতে পারিয়াছি যে, মৌনসেবন সত্যের পূজারীর পক্ষে হিতকর। অনেক সময় মানুষ জ্ঞানত বা অজ্ঞানত অতিশয়োক্তি করে অথবা যা বলা দরকার তা চাপা দেয় বা ঘুরাইয়া বলে। ইহা তার স্বাভাবিক দুর্বলতা। এরূপ সংকট হইতে বাঁচার জন্যও অল্পভাষী হওয়া আবশ্যক। কম কথা যারা বলে তারা বাছ-বিচার না করিয়া কথা বলে না। প্রত্যেকটি শব্দ ওজন করিয়া বলে। অনেক সময় লোকে বলার জন্য অধীর হয়: আমার কিছু বলার আছে কাগজের টুকরায় এমন অনুরোধ কোন্ সভাপতির কাছে না আসে? আর পরে দেখা যায়, যে সময় তাকে দেওয়া হইয়াছে তাতে তার মন ওঠে না, আরও সময় চায়, আর শেষে বিনা অনুমতিতেই বলিতে থাকে! এরূপ সব বকবকানি হইতে জগতের আদৌ কোন লাভ হয় কিনা সন্দেহ। তবে এতে সংশয় নাই যে ততটা সময় বৃথা যায়। আমার লাজুকতা বরাবর আমায় ঢালের মত রক্ষা করিয়াছে। তাহা আমার বৃদ্ধির সহায় হইয়াছে, সত্যের পথে আমায় চালনা করিয়াছে।

১৯

অসত্যের কীট

এখন ভারত হইতে অনেক ছাত্র বিলাতে যায়। চল্লিশ বছর আগে এই তুলনায় খুব কম যাইত। বিবাহিত হইলেও কুমার বলিয়া তারা নিজেদের পরিচয় দিত। এটা দস্তুর বনিয়া গিয়াছিল। ইংলণ্ডের ছাত্রেরা স্কুল-কলেজে পড়ার সময়ে বিবাহ করে না: ছাত্রজীবন ও বিবাহিত জীবন সেখানে পরস্পরবিরুদ্ধ ধর্ম। সেকালে এ দেশেও অমনটাই ছিল; বিদ্যার্থীকে ব্রহ্মচারী বলা হইত। কিন্তু এখন এ দেশে বাল্যাবস্থায় বিবাহ হয়; ইংলণ্ডে এই বস্তু নাই বলিলেই চলে। তাই ভারতীয় ছাত্রেরা নিজেদের বিবাহিত বলিয়া পরিচয় দিতে সংকোচ বোধ করিত। কথাটা লুকানোর

আর এক কারণও ছিল—সে অবস্থায় যে গৃহে তারা থাকিত তাদের সেয়ানা মেয়েদের সঙ্গে চলা-ফেরার, ফষ্টিনষ্টি করার সুযোগ তাদের মিলিত না। এই ফষ্টিনষ্টি মোটামুটি নির্দোষ ছিল। মাবাপ এরূপ মেলামেশায় সায়ও দিত। সেখানে যুবকযুবতীর এরূপ মেলামেশার আবশ্যকতাও বুঝি-বা আছে কারণ ভাবী জীবনসঙ্গিনী যুবকদের নিজেদেরই পছন্দ করিয়া লইতে হয়। অতএব ইংরেজ যুবকের পক্ষে যা স্বাভাবিক, বিলাতে গিয়া ভারতের যুবক যদি সে সম্বন্ধ গড়িতে যায় তবে তার পরিণাম ভয়ঙ্কর হইতে পারে, আর দেখাও গিয়াছে অনেক ক্ষেত্রে তাহাই হইয়াছে। তবুও আমাদের যুবকেরা এই মোহিনী মায়ায় ভোলে। ইংরেজের চোখে তা যতই দোষ-রহিত হোক আমাদের পক্ষে তা ত্যাজ্য। তবুও আমাদের যুবকেরা ওই মিতালির জন্য অসত্যের আশ্রয় লয়। এই ছোঁয়াচ আমাতেও লাগিয়াছিল। পাঁচ-ছয় বছরের বিবাহিত, এক পুত্রের বাপ আমিও কুমার বলিয়া অসংকোচে নিজের পরিচয় দিয়াছিলাম। ডুবিতে ডুবিতে আমি বাঁচিয়া গিয়াছিলাম। লাজুক ছিলাম আর কম কথা বলিতাম বলিয়া ব্যাপারটা বেশি দূর গড়াইতে পায় নাই। মুখে যার কথা ফোটে না কোন্ তরুণীর দায় ঠেকিয়াছে তার সঙ্গে বেড়াইতে বাহির হইবে বা ভাব করিবে!

লাজুক যেমন ছিলাম ভীরুও তেমনি ছিলাম। ভেণ্টনর-এ কোন পরিবারে অতিথি হওয়ার কথা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। এরূপ পরিবারের রীতি, ঘরে মেয়ে থাকে ত ভদ্রতার খাতিরে অতিথিকে লইয়া তারা বেড়াইতে বাহির হয়। রেওয়াজ অনুসারে ঘরনীর মেয়ে আমাকে ভেণ্টনর-এর আশপাশের সুন্দর পাহাড়ে বেড়াইতে লইয়া যায়। আমার হাঁটার গতি ঠিক ঢিমে ছিল না তবে মেয়েটির গতি ছিল আরও দ্রুত। সুতরাং বলা চলে সে তার পিছনে আমাকে প্রায় হিঁচড়াইয়া লইয়া যাইতেছিল। যেমন চলিতেছিল তার পা তেমন চলিতেছিল তার জিব—কথার ফোয়ারা। আর জবাবে আমার মুখ হইতে বাহির হইতেছিল মিহি 'হাঁ', মিহি 'না' বা বড়জোর 'বা, কী সুন্দর!' সে মুক্ত-ডানা পাখীর মত আকাশে উড়িতেছিল, আর আমি ভাবিতেছিলাম কতক্ষণে ঘরে ফিরিব। কিন্তু 'চল, এবার ফেরা যাক' এ কথা সাহসে ভর করিয়া বলিতে পারিতেছিলাম না। এভাবে আমরা এক পাহাড়ের চূড়ায় পৌঁছিয়া গেলাম। এখন নামি কি করিয়া? থাকিলই বা পায়ে উঁচু-গোড়ালি জুতা, পঁচিশ বছরের এই চপলা তরুণী তড়াক করিয়া নীচে নামিয়া গেল।

আর লজ্জায় মুখচুন তখনও আমি ভাবিতেছিলাম কি করিয়া নামি। নীচে দাঁড়াইয়া সে হাসিতেছিল; সাহস দিতেছিল; বলিতেছিল, 'রসো, আসছি, হাত ধরে নামিয়ে দেব।' এতটা ভয়কাতুরে কি হওয়া যায়? ভয়ে ভয়ে পা ফেলিয়া, কোথাও বা চার হাতে-পায়ে ভর করিয়া নীচে নামিলাম। ঠাট্টার 'শা-বা-শ' বলিয়া লজ্জিত আমাকে সে আরও লজ্জা দিল। এরূপ ঠাট্টা, এমন লজ্জা ত আমার পাওনাই ছিল।

এরূপ বিনা আঁচড়ে কি সর্বত্র পার পাওয়া যায়! ঈশ্বর আমা হইতে অসত্যের কীট দূর করিতে চাহেন। ভেণ্টনর যেমন ব্রাইটনও তেমন সমুদ্র-কিনারে হাওয়া-বদলানোর স্থান। একবার সেখানে গিয়াছিলাম। তা ভেণ্টনর-এ যাওয়ার আগের কথা। যে হোটেলে উঠিয়াছিলাম সেখানে মোটামুটি ভাল অবস্থার এক বৃদ্ধা মহিলাও হাওয়া-পরিবর্তনের জন্য উঠিয়াছিলেন। ইংলণ্ডে যাওয়ার প্রথম বছরের কথা। খাদ্য-তালিকায় খাদ্যের সব নাম ফ্রেঞ্চ ভাষায় লিখা ছিল। তার কিছুই বুঝিতেছিলাম না। যে টেবিলে বসিয়াছিলাম ওই বৃদ্ধাও সেই টেবিলে বসিয়াছিলেন। তিনি বুঝিতে পারেন যে আমি নূতন লোক আর কিছু একটা ঠাহর করিয়া উঠিতে পারিতেছি না। কথা জুড়িয়া তিনি বলেন, 'মনে হচ্ছে এ দেশে তুমি সবে এসেছ, এই মুহূর্তে কোন অসুবিধা বোধ করছ। খাওয়ার কিছু এখনও চাওনি।' আমি তখন খাদ্য-তালিকা পড়িতেছিলাম আর ভাবিতেছিলাম পরিবেশনকারীকে জিজ্ঞাসা করিব কোন্ জিনিস কিসে তৈরী। কূল পাইলাম। কৃতজ্ঞতা জানাইয়া বলিলাম, 'এই খাদ্য-তালিকা বুঝছি না। আমি নিরামিষাশী। তাই আমার জানা আবশ্যক কোন্ বস্তু কিসে তৈরী।'

মহিলা বলিলেন, 'তা, এসো, কোন্ খাদ্যে কি আছে বুঝিয়ে দিচ্ছি, তোমার কি কি খাওয়া চলবে তাও বলছি।' কৃতজ্ঞচিত্তে তাঁর সহায়তা গ্রহণ করি। এই পরিচয় ইংলণ্ডে যত দিন ছিলাম তত দিন আর তার পরেও অনেক বছর পর্যন্ত বজায় ছিল। তিনি আমাকে তাঁর লণ্ডনের ঠিকানা দেন ও রবিবারে রবিবারে তাঁর ওখানে খাওয়ার নিমন্ত্রণ করেন। বিশেষ বিশেষ ব্যাপারেও আমায় ডাকিতেন, আমার লাজুকতা দূর করার চেষ্টা করিতেন, যুবতী মেয়েদের সহিত পরিচয় করিয়া দিতেন ও তাদের সহিত আলাপের সূত্র হইতেন। তাঁর বাড়ীতে একটি যুবতী থাকিত। তার সহিত আমার

আলাপ জমানোর বিশেষ যত্ন করিতেন। সময় সময় আমাদের একলা ঘরে রাখিয়া যাইতেন।

প্রথম প্রথম এই সব বিশ্রী লাগিত। রঙ্গরস ত দূরের কথা, কি যে বলিব তা-ই খুঁজিয়া পাইতাম না। কিন্তু বৃদ্ধা আমাকে ফুসলাইতে থাকেন। আমিও সেয়ানা হইতে থাকি। এভাবে এক সময় আসে যখন কবে রবিবার আসিবে সেই প্রতীক্ষায় থাকিতাম। ওই যুবতীর সঙ্গে কথা বলিতে তখন ভাল লাগিত।

বৃদ্ধা দিন দিন তাঁর জাল আরও ছড়াইতেছিলেন। আমাদের মিতালি জমিয়া উঠুক এই ছিল তাঁর ইচ্ছা। সম্ভবত আমাদের বিষয়ে তিনি কিছু একটা মতলব আঁটিয়াছিলেন।

মুশকিলে পড়িলাম। মনে হইল আমি যে বিবাহিত সে কথা ভদ্র-মহিলাকে বলিয়া দেওয়া উচিত ছিল। সে স্থলে আমাদের বিবাহের কথা তাঁর মনে স্থান পাইত না। ভুলটা ভাঙ্গাইবার এখনও সময় আছে। সত্য কথাটা জানাইয়া দেই ত আবার এমন ফ্যাসাদে পড়িতে হইবে না। ভদ্র-মহিলাকে এক পত্র লিখি। যতদূর মনে পড়ে উহার মর্ম এই ছিল :

'ব্রাইটন-এ আপনার সঙ্গে পরিচয় হওয়ার পর থেকে আপনি বরাবর আমার কল্যাণচিন্তা করে এসেছেন। মায়ের মত আমার দেখাশোনা করছেন। আমার বিয়ের সময় হয়েছে ভেবে যুবতী মেয়েদের সঙ্গে আপনি পরিচয় করে দিয়েছেন। জিনিসটা বেশি দূর না গড়ায় এজন্য আমার বলা কর্তব্য যে আমি আপনার স্নেহের অযোগ্য। আপনার বাড়ী যখন যেতে শুরু করি তখন আপনাকে আমার জানানো উচিত ছিল যে আমি বিবাহিত। আমি জানি যে ভারতের ছাত্রেরা এ দেশে এসে নিজেদের বিয়ের কথা লুকোয়। আমিও তাদের মতই করেছি। ভুলটা এখন বুঝতে পাচ্ছি। সঙ্গে এ কথাও বলা আবশ্যক যে বাল্য বয়সে আমার বিয়ে হয়েছে আর আমি এক ছেলের বাপ। কথাটা আপনাকে এতদিন লুকিয়েছি বলে লজ্জা বোধ করছি। ঈশ্বর আজ সত্য বলার সাহস দিয়েছেন তাই আনন্দও অনুভব করছি। আশা করি আপনি আমায় ক্ষমা করবেন। যে যুবতীর সঙ্গে আপনি অনুগ্রহ করে আমার পরিচয় করে দিয়েছেন সেই পরিচয়ের কোন অনুচিত সুযোগ আমি নিইনি এই আশ্বাস আপনাকে দিচ্ছি। অমনটা সুযোগ নেওয়া উচিত নয় সেদিকে আমি সদাসজাগ ছিলাম। আমি

অবিবাহিত এ কথা ভেবে আপনি চেয়েছিলেন কারো সঙ্গে আমার সম্বন্ধ গড়ে উঠুক। আবার তেমন চেষ্টা না করেন তার জন্যও কথাটা জানানো আমার উচিত।

'এই পত্র পাওয়ার পরে আপনার দ্বার যদি আমার পক্ষে রুদ্ধ হয়ে যায় ত আমি কিছুই মনে করব না। আপনার স্নেহ পেয়েছি চিরকাল আমি তার জন্য কৃতজ্ঞ থাকব। আপনি যদি আমায় দূর না করেন তবে যে আমি খুশী হব এ কথা বলতে আমার সংকোচ নেই। এর পরেও আপনি যদি আমাকে আপনার ওখানে যাওয়ার অযোগ্য মনে না করেন তবে তাকে আমি আপনার স্নেহের নূতন নিদর্শন মনে করব ও ওই স্নেহের যোগ্য হওয়ার জন্য সতত প্রযত্ন করব।'

পাঠক মনে করিবেন না যে সহসা আমি ওই পত্র লিখিয়া ফেলিয়াছিলাম। কত বার যে খসড়া করিয়াছিলাম তা আমিই জানি। তবে ওই পত্র পাঠানোর পরে আমার মন অতিশয় হালকা হইয়াছিল।

প্রায় ফেরত ডাকে ওই বিধবা ভগ্নীর পত্র পাই। তাতে তিনি জানান :

'তোমার দিলখোলা পত্র পেলাম। আমরা দুজনে খুব খুশী হয়েছি আর হেসেছিও খুব। যে অসত্য আচরণ করেছ বলে বলেছ তা ক্ষমা করা যায়। তবে তুমি যে তোমার প্রকৃত স্থিতি জানিয়েছ তা ঠিক-ই হয়েছে। আমার নিমন্ত্রণ বজায় থাকছে। আসছে রবিবার তোমার পথ চেয়ে থাকব, তোমার বাল-বিবাহের কথা শুনব আর হাসি-তামাশা করে আনন্দ উপভোগ করব। আমাদের বন্ধুত্ব যেমনটা ছিল তেমনটাই আছে এ কথা জেনো।'

নিজের ভিতরে অসত্যের যে কীট ঘর বাঁধিয়াছিল এভাবে ঝাঁটাইয়া বাহির করিয়া দিই। এর পরে নিজের বিবাহের কথা প্রয়োজনমত বিনা সংকোচে বলিতাম।

২০

ধর্মের পরিচয়

বিলাতে যাওয়ার দ্বিতীয় বছরের শেষ দিকে দুই থিয়োসফিস্ট বন্ধুর সহিত পরিচয় হয়। তাঁরা সহোদর ভাই ছিলেন। দুই জনই অবিবাহিত।

তাঁরা আমার সঙ্গে গীতার আলোচনা করেন। স্যর এডউইন আর্নল্ডের গীতার অনুবাদ *Song Celestial* তাঁরা পড়িয়াছিলেন। মূল সংস্কৃত গীতা তাঁরা আমার সহিত পড়িতে চান। লজ্জা বোধ করিলাম, কারণ গীতা আমার না পড়া ছিল সংস্কৃতে, না মাতৃভাষায়। সে কথা তাঁদের বলিলাম। ইহাও বলি যে তাঁদের সঙ্গে গীতা পড়িব ও সংস্কৃতের জ্ঞান অল্প হইলেও অনুবাদের ত্রুটি ধরিতে ও সংশোধন করিতে পারিব। এভাবে তাঁদের সঙ্গে আমার গীতাপাঠ আরম্ভ হয়। দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষের দিকের এই শ্লোকের—

> ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
> সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে॥
> ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
> স্মৃতিভ্রংশাদ্বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি॥

গভীর ছাপ আমার মনে পড়ে, উহার গুঞ্জন আজও কানে লাগিয়া আছে। তখন আমার মনে হয় যে ভগবদ্গীতা অমূল্য গ্রন্থ। আমার এই ধারণা দিন দিন দৃঢ় হইতে থাকে, আর আজ তত্ত্বজ্ঞান-গ্রন্থের মধ্যে ইহা আমার কাছে সর্বোত্তম গ্রন্থ। আমি যখন অন্ধকারে দিশাহারা হইয়াছি তখন ইহা আমায় পথ দেখাইয়াছে। গীতার প্রায় সব ইংরেজী অনুবাদ আমি পড়িয়াছি। আমার মতে এডউইন আর্নল্ডের অনুবাদ সব চাইতে ভাল। মূল গ্রন্থের ভাব অটুট আছে অথচ মনে হয় না ইহা অনুবাদ গ্রন্থ। বন্ধুদের সঙ্গে গীতা পড়ি বটে কিন্তু উহাকে অধ্যয়ন বলা যাইবে না। কয়েক বছর পরে এই গ্রন্থ আমার নিত্যপাঠ্য হয়।

এই বন্ধুদের কথামত আমি বুদ্ধচরিত পড়ি। এতদিন আমি স্যর এডউইন-এর গীতার অনুবাদের কথাই মাত্র জানিতাম। এই বই ভগবদ্গীতা অপেক্ষা অধিক আগ্রহে আমি পড়ি। পুস্তক পড়িতে আরম্ভ করিলাম ত শেষ করিয়া উঠিলাম। এই বন্ধুরা আমাকে এক বার ব্লেবেট্‌স্কী লজ-এ লইয়া যান ও মেডেম ব্লেবেট্‌স্কী ও মিসিস বেসান্টের সহিত পরিচয় করাইয়া দেন। মিসিস বেসান্ট তখন সবেমাত্র থিয়োসফিকল সোসাইটীতে যোগ দিয়াছিলেন। তাঁর এই ধর্মান্তর সম্বন্ধে সংবাদপত্রে যে আলোচনা চলিতে-ছিল তা আমি আগ্রহে পড়িতাম। এই বন্ধুরা আমাকে সোসাইটীতে যোগ দিতে বলেন। আমি সবিনয়ে অস্বীকার করি ও বলি, 'নিজের ধর্মের জ্ঞানই

আমার প্রায় নেই তাই কোন পন্থে ভিড়তে আমি চাইনে।' আমার মনে পড়ে তাঁদের কথায় আমি মেডেম ব্লেবেট্স্কীর 'কী টু থিয়োসফী' পড়িয়াছিলাম। ইহা হইতে হিন্দুধর্মের বই পড়ার আগ্রহ আমার জন্মে আর তখন হিন্দুধর্ম কুসংস্কারের আস্তাকুড় পাদরীদের মুখে শোনা এই কথা যে কত ভুয়া তা বুঝিতে পাই।

এই সময়েই এক নিরামিষ ছাত্রাবাসে মাঞ্চেস্টরের এক খ্রীস্টান সজ্জনের সহিত পরিচয় হয়। খ্রীস্টান ধর্ম সম্বন্ধে তিনি আমার সঙ্গে কথা বলেন। রাজকোটের ঘটনার কথা তাঁকে বলি। শুনিয়া তিনি দুঃখিত হন। তিনি বলেন, 'আমি নিজে নিরামিষাশী। মদও খাই না। সত্য বটে, বেশির ভাগ খ্রীস্টান মাংস খায়, মদ খায়। কিন্তু মদ কি মাংস খেতেই হবে এ কথা ধর্ম বলে না। আমি আপনাকে বাইবেল পড়তে অনুরোধ করি।' তাঁর পরামর্শ গ্রহণ করি। তাঁর কাছ হইতেই বাইবেল কিনি। আমার যেন মনে পড়ে তিনি নিজেই বাইবেল বেচিতেন। ওই বাইবেলে মানচিত্র, অনুক্রমণিকা ইত্যাদি সহায়ক বস্তু ছিল। পড়িতে আরম্ভ করিলাম। কিন্তু 'আদি বিধান' বা ওল্ড টেস্টামেণ্ট আমি পড়িয়া উঠিতে পারি নাই। 'জেনেসিস' বা সৃষ্টিপ্রকরণের পরে আর আগাইতে পারি নাই; পড়িতে গেলেই ঘুমে চোখের পাতা জুড়িয়া আসিত। তবুও বাইবেল পড়িয়াছি এ কথা যেন লোককে বলিতে পারি এজন্যই ভাল না লাগিলেও আর না বুঝিলেও অন্যান্য ভাগ কষ্টেসৃষ্টে পড়িয়াছিলাম। 'নম্বর্স' নামক প্রকরণ পড়িতে দম প্রায় আমার বাহির হইয়াছিল।

কিন্তু 'নব বিধান' বা নিউ টেস্টামেণ্ট-এর ছাপ মনে পড়ে: যীশুর 'গিরি-প্রবচন' মনে গভীর দাগ কাটে। মনে হয় তা যেন গীতারই বাণী। 'কিন্তু শোন, অন্যায়ের জবাব অন্যায়ে কখনও দেবে না, উল্টা যে তোমায় ডান গালে মেরেছে তাকে তোমার বাঁ গাল এগিয়ে দাও। যে তোমার কোট নিয়েছে তাকে তোমার কামিজও দিয়ে দাও' ইহা পড়িয়া আমার অপার আনন্দ হইয়াছিল আর শামল ভটের ষট্‌পদীর এই কথা—মন্দ পেয়েও ভাল যে জন করে সত্যিকার জীবন সে জীয়ে—মনে পড়িয়াছিল। আমার নবীন মন গীতায়, আর্নল্ড-রচিত বুদ্ধচরিতে ও গিরি-প্রবচনে একই তত্ত্বের সন্ধান পায়। ত্যাগই ধর্ম এই কথা আমার অন্তরে গাঁথিয়া যায়।

এই সব পড়ার দরুন ধর্মাচার্যদের জীবনকথা পড়ার সাধ জন্মে।

কার্লাইল-এর 'বিভূতি ও বিভূতিপূজা' বই কোন বন্ধু পড়িতে বলেন। এই বইয়ে আমি পয়গম্বরের প্রকরণ পড়ি। তাহা হইতে তাঁর মহানতার, বীরত্বের ও তপশ্চর্যার আভাস ও আন্দাজ আমি পাই।

ধর্মের এর বেশি পরিচয় লাভ করার অবসর তখন ছিল না। পরীক্ষার চাপ ছিল ; বাইরের পড়ার সময় ছিল না। তবে বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ পাঠ করার ও প্রধান প্রধান ধর্মের পরিচয় লাভ করার সংকল্প তখন মনে স্থির হইয়া যায়।

নাস্তিকতার বিষয়ে কিছু না জানিলে কি চলে? ব্রেডল-র নাম ও তাঁর নাস্তিকতার কথা (নাস্তিক যদি তাঁকে বলা যায়) কোন্ ভারতবাসী তখন না জানিত। অতএব নাস্তিকতা সম্বন্ধে খানকয়েক বই আমি পড়িয়াছিলাম। সেই সব বইয়ের নাম আমার মনে নাই। উহাদের কোন ছাপ আমার মনে পড়ে নাই কারণ নাস্তিকতার উষর সাহারা তার পূর্বেই আমি পাড়ি দিয়াছিলাম। মিসিস বেসান্টের তখন খুব খ্যাতি। নাস্তিকতা হইতে তিনি আস্তিকতায় ফিরিয়া আসেন এইজন্যও নাস্তিকতার ওপর আমার বিরাগ জন্মিয়াছিল। 'আমি কি করে থিয়োসফিস্ট হই' মিসিস বেসান্টের এই বই পূর্বেই আমি পড়িয়াছিলাম।

এই সময়েই ব্রেডল-র দেহান্ত হয়। ওকিঙ্গ গোরস্থানে তাঁর সৎকার হইয়াছিল। আমি সৎকারে উপস্থিত ছিলাম। সৎকারে যায় নাই এমন ভারতবাসী কেউ ছিল বলিয়া আমার মনে হয় না। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিতে কয়েকজন পাদরীও আসিয়াছিলেন। সৎকার হইতে ফেরার সময় কোন রেলস্টেশনে গাড়ীর প্রতীক্ষায় আমরা দাঁড়াইয়াছিলাম। এই ভিড়ের মধ্য হইতে নাস্তিকতার এক দিকৃপাল একজন পাদরীকে জেরা করিতে আরম্ভ করে:

'ভাল, আপনারা বলেন ঈশ্বর আছে?'

ওই সজ্জন ধীরকণ্ঠে বলেন, 'হাঁ, বলি বই কি।'

লোকটি হাসিল ও পাদরীকে যেন মাত করিতে যাইতেছে এই ভাবে বলিল, 'উত্তম, পৃথিবীর পরিধি আটাশ হাজার মাইল এ কথা আপনি মানেন ত?'

'অবশ্য।'

'এবার বলুন আপনাদের ঈশ্বরের আকার কতটা আর কোথায়ই বা তিনি থাকেন?'

'আমাদের দৃষ্টি খোলে ত আপনার ও আমার দুইয়ের অন্তরেই তিনি রয়েছেন।'

'শিশুকে ভোলাচ্ছেন', বলিয়া নাস্তিকতার পাণ্ডা-প্রবর আশপাশে দাঁড়ানো আমাদের দিকে বিজয়ীর দৃষ্টিতে তাকান।

পাদরী নম্র বিনয়ে চুপ করিয়া যান।

এই কথায়ও নাস্তিকতার প্রতি আমার অরুচি জন্মে।

২১

বলহীনের বল রাম

ধর্মশাস্ত্রের ও পৃথিবীর নানা ধর্মের কিছুটা পরিচয় আমার হইয়াছিল বটে কিন্তু সেই পরিচয় যে যথেষ্ট নয়, বিপদের সময়ে তা দিয়া যে পার পাওয়া যায় না, এই জ্ঞান আমার হওয়া উচিত ছিল। বিপদ্‌কালে যে বস্তু মানুষকে বাঁচায় তৎকালে সে তা অনুমান দিয়া ধরিতে কি জ্ঞান দিয়া বুঝিতে পায় না। নাস্তিক বাঁচে ত বলে ঘটনাক্রমে বাঁচিয়া গিয়াছি। আস্তিক দেখে তাতে ঈশ্বরের হাত। ঘটনার পরে সে ধরিয়া লয় (লইতেও পারে) যে ধর্মের অধ্যয়ন ও সংযমের ফলে ঈশ্বরের যে কৃপা তার লাভ হইয়াছে এ তারই ফল। কিন্তু বাঁচার সময়ে সে বুঝিতে পায় না তাকে তার সংযম রক্ষা করিয়াছে কি অন্য কিছু। এ কথা কে না জানে যে যখনই মানুষ আপন সংযমশক্তির বড়াই করে তখনই তার সংযম ধূলায় লুটায়? সংকটকালে জ্ঞানরহিত শাস্ত্রজ্ঞান শিটার মতই অকেজো।

শুধু ধর্মের জ্ঞান যে কিরূপ অকেজো তার প্রথম পরিচয় আমি বিলাতে পাই। এর পূর্বে বার কয়েক যে কিভাবে রক্ষা পাইয়াছিলাম তা বলিতে পারি না—হয়ত বা কাঁচা বয়স ছিল বলিয়া। কিন্তু এই ঘটনা যখন ঘটে তখন আমার বয়স কুড়ি; এক পুত্রের পিতা আমি গৃহস্থাশ্রমের ব্যাপারে একেবারে আনাড়ী ছিলাম এ কথা বলা যাইবে না।

খুব সম্ভব আমার বিলাতবাসের শেষ বছর, ১৮৯০ সনে, পোর্টস্‌মথ-এ নিরামিষাশীদের এক সম্মেলন হয়। সম্মেলনে যাওয়ার নিমন্ত্রণ পাইয়াছিলাম। অন্য এক ভারতবাসীও নিমন্ত্রণ পাইয়াছিলেন। আমরা গিয়াছিলাম। পোর্টস্‌মথ সামুদ্রিক বন্দর। অনেক জাহাজী লোকের সেখানে আনাগোনা ও

বসবাস। ঠিক বারবধূ না হইলেও ঢিলেঢালা চরিত্রের বহু স্ত্রীলোকের সেখানে বাস। এমন এক গৃহে আমাদের থাকার ব্যবস্থা হইয়াছিল। এর মানে এই নয় যে জানিয়া-শুনিয়া অভ্যর্থনা সমিতি ওই ব্যবস্থা করিয়াছিল। আমাদের মত উটকো যাত্রীর থাকার ব্যবস্থা করার ব্যাপারে কোন্ গৃহ ভাল আর কোন্ গৃহ মন্দ পোর্টস্‌মথ-এর মত শহরে তা ঠিক করিয়া ওঠা শক্ত।

রাত হইয়াছে। সভা হইতে ঘরে ফিরিয়াছি। খাওয়ার পরে তাঁস খেলিতে বসিয়াছি। বিলাতে ভাল ঘরের মেয়েরাও অতিথির সঙ্গে তাস খেলে। তাস খেলার সময় নির্দোষ ঠাট্টা-তামাশা সকলেই করে। কিন্তু এখানে আমার সহযাত্রী ও ঘরনীর মধ্যে অশ্লীল ঠাট্টা শুরু হইল। আমার জানা ছিল না যে আমার সাথী এ বিষয়ে ওস্তাদ। আমাতেও তার ছোঁয়া লাগে ও ঠাট্টায় যোগ দিই। তাস ও খেলা এক ধারে রাখিয়া সীমা ছাড়াইয়া যাইতে উদ্যত হইয়াছি ত আমার সুধী সঙ্গীর মুখ দিয়া যেন ঈশ্বর বলাইলেন: 'তোমাতে কলি ভর হয়েছে, বালক! এ কাজ তোমার নয়। পালাও।'

লজ্জা পাইলাম। সাবধান হইলাম। বন্ধুর মহা উপকারের জন্য মনে মনে তাকে কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিলাম। মাকে দেওয়া কথা মনে পড়িল। ভাগিলাম। কাঁপিতে কাঁপিতে নিজ ঘরে ঢুকিলাম। বুক ধড়ফড় করিতে-ছিল, যেমন করে ব্যাধের হাত হইতে রক্ষা পাওয়া শিকারের।

যতটা মনে পড়ে, পরস্ত্রী দেখিয়া এই আমি জীবনে প্রথম কামকাতর হইয়াছিলাম, রঙ্গরস করিতে গিয়াছিলাম। বিনা ঘুমে রাত কাটে; নানা চিন্তার আনাগোনা মনে চলে—ঘর ছাড়ব? পালাব? ভাগ্যিস সাবধান হয়েছিলাম নয়ত গেছিলাম! খুব সতর্ক হওয়ার সংকল্প করিলাম—ঘর নয়, যত তাড়াতাড়ি পারা যায় পোর্টস্‌মথ ছাড়িতে হইবে। দুই দিনের সম্মেলন ছিল। মনে আছে পরের দিন সন্ধ্যাবেলা পোর্টস্‌মথ হইতে আমি চলিয়া আসি। আমার সঙ্গী দিন কয়েক থাকে।

ধর্ম কি, ঈশ্বর কি, আর তিনি আমাদের ভিতরে কি ভাবে কাজ করেন এর কিছুই তখন জানিতাম না। অন্য দশ জনের মতন আমি ওপর-ওপর ধরিয়া লইয়াছিলাম ঈশ্বর আমাকে বাঁচাইয়াছেন। বরাবর সংকটকালে ঈশ্বর আমায় বাঁচাইয়াছেন। 'ঈশ্বর বাঁচাইয়াছেন' এই কথার গূঢ় অর্থ এখন আমি অনেকটা ধরিতে পারিয়াছি এ কথা আমি জানি, আবার ইহাও আমি জানি

যে উহার পূর্ণ মহিমা আজও আমার কাছে ধরা পড়ে নাই। অধিকতর অনুভব হইতেই কেবল তা সম্ভব। তবে এ কথা বলিতে পারি, কি আধ্যাত্মিক প্রসঙ্গে, কি ওকালতির ব্যাপারে, কি সংস্থা পরিচালনার বিষয়ে, কি রাজনৈতিক ডামাডোলে বহু সংকটে ঈশ্বর আমায় বাঁচাইয়াছেন। দেখিতে পাইয়াছি, যখন সব আশা ছাড়িয়াছি, বন্ধু ছাড়িয়াছে, ভরসা মিলাইয়াছে, তখন জানি না কোথা হইতে সহায়তা আসিয়াছে। স্তুতি, উপাসনা, প্রার্থনা —এসব কুসংস্কার নয় ; আমাদের খাওয়া পরা, চলা ফেরা যতটা সত্য তাহা অপেক্ষা এই সব অধিক সত্য। এইগুলিই সত্য, আর সবই মিথ্যা এ কথা বলিলে বেশি বলা হইবে না।

এই উপাসনা বা প্রার্থনার উপচার কথার বিনুনি নয়। কণ্ঠ হইতে তা উছলে না, উছলে হৃদয় হইতে। অতএব মলিনতা ধুইয়া গিয়া আমাদের হৃদয়ে যখন প্রেমের ধারা বহিবে, হৃদয়-তানপুরার তারগুলি যখন ঠিক ঠিক কানে বাঁধা হইবে তখন তা হইতে যে মধুর মূর্ছনা উঠিবে তা আকাশপানে ধাইবে। কথা প্রার্থনার বাহন নয়। তা স্বভাব-উচ্ছ্বসিত বস্তু। কামবিকার নাশ করার অব্যর্থ উপায় যে প্রার্থনা এই বিষয়ে আমার তিলমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু প্রার্থনা ধূলিসম নম্র হওয়া চাই।

২২

নারায়ণ হেমচন্দ্র

এই সময়ে ৺নারায়ণ হেমচন্দ্র বিলাতে আসেন। শুনিয়াছিলাম তিনি লেখক। ন্যাশনল ইণ্ডিয়ন এসোসিয়েশনের মিস মেনিঙ্গ-এর গৃহে তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। আমি সকলের সঙ্গে মিশিতে পারি না, কথায় না টানিলে কথা বলি না, তাঁর ওখানে যাই ত মুখ বুজিয়া বসিয়া থাকি এ কথা মিস মেনিঙ্গ জানিতেন। নারায়ণ হেমচন্দ্রের সহিত তিনি পরিচয় করিয়া দেন। তিনি ইংরেজী জানিতেন না। তাঁর পোশাক কিম্ভূতকিমাকার ছিল—পরনে বেঢপ পাতলুন ; গায়ে পারশী ঢং-এর বাদামী রঙের কোচকানো তেলচিটে-গলা কোট ; না নেকটাই, না কলর ; মাথায় ঝুটিদার পশমী টুপি ; চিবুকে লম্বা দাড়ি।

বলা চলে বেঁটে ধরনের একহারা চেহারা। গোলপানা মুখে বসন্তের

দাগ। নাক না চোখা, না চেপটা। দাড়িতে হাত বুলানো ছিল তাঁর অনুক্ষণের কাজ।

অদ্ভুতদর্শন ও সৃষ্টিছাড়া বেশভূষার কারণে ফ্যাশনদুরস্ত মহলে তাঁর অবস্থা 'হংসোমধ্যে বকোযথা' হইয়াছিল।

বলিলাম, 'আপনার নাম খুব শুনেছি। আপনার কিছু লেখাও পড়েছি। আমার ওখানে দয়া করে যদি এক বারটি আসেন।'

নারায়ণ হেমচন্দ্রের গলা একটু ধরা ছিল। মুচকি হাসিয়া বলিলেন:

'যাব বই কি, কোথায় থাকেন?'

'স্টোর স্ট্রীটে।'

'দেখছি আমরা পড়শী। ইংরেজী শিখতে চাই, শেখাবেন?'

বলিলাম, 'খুশী মনে, সাধ্যে যতটা কুলয়, বলেন ত আপনার ওখানে যাব।'

'না, না, আমিই আপনার ওখানে যাব। পাঠমালা আমার আছে। তা নিয়ে যাব।' সময় ঠিক করা হইল। ধীরে ধীরে আমাদের মধ্যে গাঢ় বন্ধুত্ব জমিল।

নারায়ণ হেমচন্দ্র ব্যাকরণ মোটেই জানিতেন না। 'ঘোড়া' ছিল তাঁর গণনায় ক্রিয়াপদ আর 'দৌড়ানো' বিশেষ্য পদ। মজার মজার এরূপ দৃষ্টান্তের কথা মনে পড়িতেছে। কিন্তু নারায়ণ হেমচন্দ্র এই দিকে বেপরোয়া ছিলেন। ব্যাকরণের সাধারণ জ্ঞান তাঁর কাছে পাত্তাই পাইত না।

পরম অবাধে তিনি বলিয়া গেলেন, 'তুমি স্কুলে পড়েছ। আমি কোন দিনও স্কুলে যাইনি। নিজের ভাব প্রকাশ করতে ব্যাকরণের আবশ্যকতা-বোধ আমি কখনও করিনি। দেখ, তুমি বাংলা জানো? আমি জানি। বাংলা দেশে ঘুরেছি। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা গুজরাটী জন-সাধারণের কাছে আমিই ধরেছি। অন্য নানা ভাষার সম্পদও আমি গুজরাটী পাঠকদের উপহার দিতে চাই। জানো, শব্দার্থ নিয়ে আমি মাথা ঘামাই না, ভাবার্থ দিয়েই আমি খালাস। ওসব ভাষায় যাঁদের অধিক জ্ঞান তাঁরা অধিক দেবেন। ব্যাকরণের ধার না ধেরে আমি যা করতে পেরেছি তাতে আমি পুরোপুরি সন্তুষ্ট। আমি মারাঠী জানি, হিন্দী জানি, বাংলা জানি, আর এখন ইংরেজী শিখছি। শব্দের ভাণ্ডার আমার পুরো হলেই হল। মনে করো না এইতেই আমার আকাঙ্ক্ষা মিটছে। জেনে রাখো,

ফ্রান্স-এ আমার যেতে হবে ও ফ্রেঞ্চ শিখতে হবে। শুনতে পাই ফ্রেঞ্চ সাহিত্য বিশাল। হয়ে ওঠে ত জর্মনীতেও যাব আর জর্মন শিখে নেব।'

এভাবে নারায়ণ হেমচন্দ্রের কথার তোড় তরতর করিয়া বহিত। ভাষা শেখার ও দেশভ্রমণের লোভের তাঁর অন্ত ছিল না।

'তা, আমেরিকায়ও নিশ্চয় যাচ্ছেন?'

'তা-ও বলতে! নূতন দুনিয়া না দেখে দেশে ফিরব সে কি হয়?'

'কিন্তু এত পয়সা কোথা পাবেন?'

'পয়সায় আমার কি কাজ? আমি কি তোমাদের মত ফিটফাট লোক? খাওয়া পরায় আমার কত আর লাগে? আমার বই থেকে অল্প যা আয় হয় আর বন্ধুরা যা দেয় তা-ই যথেষ্ট। সর্বত্র তৃতীয় শ্রেণীতে যাই। আমেরিকায়ও ডেকে যাব।'

নারায়ণ হেমচন্দ্রের সাদাসিধা ভাব একান্তই তাঁর নিজস্ব ছিল। তাঁর মনটাও তেমনই সাদা ছিল। অভিমান বলিয়া কোন বস্তু তাঁতে ছিল না। তবে লেখক হিসাবে নিজ শক্তির ওপর একটু মাত্রাছাড়া বিশ্বাস ছিল।

প্রতিদিন আমরা মিলিতাম। বিচারে ও আচারে আমাদের দুইয়ের বেশ খানিকটা সমতা ছিল। দুইজনেই নিরামিষাশী। প্রায়ই দুপুর বেলা এক সঙ্গে খাইতাম। সতের শিলিং-এ যখন সপ্তাহ কাটাইতাম ও নিজে রান্না করিতাম ইহা সেই সময়ের কথা। কোনদিন আমি তাঁর বাসায় যাইতাম; কোনদিন তিনি আমার ঠাঁইয়ে আসিতেন। আমি ইংরেজী ধরনে রাঁধিতাম। দেশী রান্না ছাড়া তাঁর মন উঠিত না। ডাল না হইলেই চলিত না। আমি গাজর ইত্যাদির সূপ বানাইতাম সেজন্য আমার ওপর তাঁর দয়া হইত। খুঁজিয়া-পাতিয়া কোথা হইতে তিনি মুগ লইয়া আসিতেন। একদিন আমার জন্য মুগ ডাল রাঁধিয়া লইয়া আসেন। খুব তৃপ্তি সহকারে তা খাইয়াছিলাম। এরূপে লেনদেন বাড়িয়া যায়। আমি যা রাঁধিতাম তাঁকে দিতাম, তিনি যা রাঁধিতেন আমাকে দিতেন।

কার্ডিনল ম্যানিঙ্গ-এর নাম সে সময়ে সকলের মুখে। ডক-মজুরেরা ধর্মঘট করিয়াছিল। জন বার্নস ও কার্ডিনল ম্যানিঙ্গ-এর চেষ্টায় অল্পেতে তা মিটিয়া যায়। কার্ডিনল ম্যানিঙ্গ-এর সরল জীবনযাত্রা সম্বন্ধে ডিজরেলি যে প্রশংসাবাদ করিয়াছিলেন সে কথা নারায়ণ হেমচন্দ্রকে আমি শুনাই।

'তবে ত এই সাধু ব্যক্তির সঙ্গে দেখা করতে হবে।'

'তিনি মস্ত বড় লোক। কি করে দেখা করবেন?'

'এসো, বাতলাচ্ছি। আমার নামে পত্র লেখ। লেখক বলে আমার পরিচয় দেবে। আর বলবে যে জনহিতকর কাজের জন্য আমি স্বয়ং গিয়ে তাঁকে অভিনন্দন জানাতে চাই। আরও লিখবে যে আমি ইংরেজী জানি না বলে দোভাষীর কাজ করার জন্য তুমি সঙ্গে যাবে।'

অমনটা পত্র লিখিলাম। দুই তিন দিন মধ্যে পোস্টকার্ডে জবাব আসে। কার্ডিনল মেনিঙ্গ দেখা করার সময় দেন। দুইজনে গেলাম। আমার পরনে দেখা করার পোশাক, নারায়ণ হেমচন্দ্রের অঙ্গে তাঁর সেই বেশ—সেই কোট ও সেই পাতলুন। এই লইয়া ঠাট্টা-তামাশা করিলাম। তা তিনি হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন ও বলিলেন:

'কেতা-দুরস্ত লোক তোমরা সব ভীরু। মহাপুরুষেরা মানুষের পোশাক দেখেন না, তাঁরা দেখেন মানুষের অন্তর।'

কার্ডিনল ভবনে (প্রাসাদ বলাই ঠিক হইবে) প্রবেশ করিলাম। আমরা বসিতেই এক পাতলা ছিপছিপে দীর্ঘবপু বৃদ্ধ ভদ্রলোক গৃহে প্রবেশ করিলেন ও আমাদের হাতে হাত মিলাইলেন। নারায়ণ হেমচন্দ্র এই কথায় কার্ডিনলের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন:

'আপনার সময় আমি নষ্ট করব না। আপনার কথা আমি অনেক শুনেছি। ধর্মঘটীদের আপনি মহৎ সেবা করেছেন। তাই আপনাকে ধন্যবাদ জানাতে এসেছি। মহৎ পুরুষের দর্শন করা আমার জীবনের এক ব্রত। এই কারণ আপনাকে কষ্ট দিলুম।'

'আপনি এসেছেন বলে আমি খুশী। আশা করি এ দেশ আপনার ভাল লাগবে ও এখানকার লোকদের সঙ্গে আপনি পরিচয় করবেন। ঈশ্বর আপনা-দের মঙ্গল করুন।' এই বলিয়া কার্ডিনল দাঁড়াইলেন ও অভিবাদন করিলেন।

একবার নারায়ণ হেমচন্দ্র আমার বাসায় ধুতি পিরান পরিয়া আসেন। বেচারী ঘরনী দরজা খোলেন ত ভয় পান। দৌড়িয়া আসিয়া আমায় (পাঠক জানেন, আমি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে লণ্ডনের ভিন্ন ভিন্ন পাড়ায় ছিলাম। এই ঘরনী নারায়ণ হেমচন্দ্রকে ওই প্রথম দেখেন) বলেন, 'একটি লোক, মনে হয় পাগল, আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে।' দরজায় গিয়া দেখি, নারায়ণ হেমচন্দ্র দাঁড়াইয়া আছেন। আমি থ হইয়া গেলাম। তাঁর মুখে কিন্তু বরাবরের সেই হাসি।

'ভাল, রাস্তায় ছেলেপিলেরা আপনার পিছনে লাগে নাই!' উত্তরে বলেন, 'পিছনে দৌড়াচ্ছিল। আমি গ্রাহ্য করিনি। তাই নিরস্ত হয়ে যায়।'

লণ্ডনে কয়েক মাস থাকার পরে নারায়ণ হেমচন্দ্র প্যারীস যান। ফ্রেঞ্চ শিখিতে ও ফ্রেঞ্চ পুস্তকের অনুবাদ করিতে থাকেন। তাঁর অনুবাদ সংশোধন করার মত ফ্রেঞ্চ আমি জানিতাম। তাই আমাকে তা তিনি দেখিতে বলেন। অনুবাদ তাকে বলা যাইবে না। ভাবার্থ বলা ঠিক হইবে।

শেষটায় তাঁর আমেরিকা যাওয়ার ইচ্ছা পূর্ণ হইয়াছিল। বহু কষ্টে তিনি ডেকের টিকিট যোগাড় করেন। আমেরিকায় ধুতি জামা পরিয়া রাস্তায় বাহির হওয়ায় 'অভব্য বেশ' ধারণের অভিযোগে গ্রেপ্তার হন। মনে পড়ে, পরে তিনি খালাস পান।

২৩
মহাপ্রদর্শনী

প্যারীস নগরে ১৮৯০ সনে এক বিরাট্ প্রদর্শনী হয়। উহার উদ্যোগ-আয়োজনের বিশদ বিবরণ সংবাদপত্রে পড়িয়াছিলাম। প্যারীস দেখারও প্রবল বাসনা ছিল। তাই মনে হইল যে প্রদর্শনী দেখিতে যাই ত এক কাজে দুই কাজ হইবে। এফিল টাওয়ার প্রদর্শনীর সব চাইতে বড় আকর্ষণ ছিল—হাজার ফুট উঁচু আর আগাগোড়া লোহায় তৈরী। দেখার বস্তু আরও অনেক ছিল তবে এফিল টাওয়ারের কাছে সবই ফিকা হইয়া গিয়াছিল, কারণ এতকাল লোকের ধারণা ছিল, হাজার ফুট উঁচু বাড়ী খাড়া থাকিতে পারে না।

প্যারীসের একটি নিরামিষ ভোজনগৃহের কথা শুনিয়াছিলাম। ওখানে একটি ঘর ভাড়ায় লইয়াছিলাম। সাত দিন ছিলাম। রাহা-খরচ থাকা-খাওয়া, ঘোরা-ফেরা, দেখার মত জায়গা দেখা ইত্যাদি অল্প পয়সায় গরিব চালে শেষ করিয়াছিলাম। পথঘাটে চলার সহায় ছিল প্যারীস নগরীর ম্যাপ আর প্রদর্শনী দেখিতাম প্রদর্শনীর গাইড বই সাহায্যে। বড় বড় রাস্তা ও প্রধান দ্রষ্টব্য স্থানগুলি খুঁজিয়া বাহির করিতে এইগুলিই যথেষ্ট ছিল।

প্রদর্শনীর বিশালতা ও বিবিধতা ভিন্ন তার অন্য কোন কথা আমার মনে নাই। এফিল টাওয়ারে দুই তিন বার চড়িয়াছিলাম বলিয়া উহার কথা বেশ মনে আছে। উহার প্রথম তলায় একটা রেস্তোরাঁ ছিল। এত উঁচুতে

খাইয়াছি লোককে এ কথা বলা যাইবে এই লোভে ওই রেস্তোরাঁয় খাইয়াছিলাম—সাড়ে সাত শিলিং হাওয়ায় উড়াইয়াছিলাম।

প্যারীসের নানা প্রাচীন দেউলের(গির্জাঘর) ছবি মনে গাঁথিয়া রহিয়াছে। উহাদের বাহিরের রূপ ও ভিতরের মনজুড়ানো শান্তি ভোলার উপায় নাই। নোত্রাদাম-এর অপূর্ব গঠনগরিমা ও উহার ভিতরকার স্থাপত্যশিল্পের সূক্ষ্ম দিব্য কারিগরি চিরদিনের মত মন কাড়িয়া লয়। দেখিতে দেখিতে মনে হইয়াছিল, যাঁদের এত অর্থব্যয়ে এই সকল দিব্য দেউল গড়িয়া উঠিয়াছিল তাঁদের অন্তরে যদি গভীর ঈশ্বরভক্তি না থাকিত তবে কি ওই অজস্র ব্যয় তাঁরা করিতে পারিতেন !

প্যারীসের ফ্যাশনের, প্যারীসের স্বেচ্ছাচারের, প্যারীসের বিলাস-ব্যসনের সম্পর্কে অনেক কিছু পড়িয়াছিলাম। অলিগলিতে তা দেখিতেও পাইয়াছিলাম। কিন্তু দেউলগুলি এইসব ভোগের ছোঁয়াচের বাইরে, আলগোছ। ভিতরে যাইতেই অশান্তি মিটিয়া যায়। লোকের আচরণ বদলিয়া যায়। মন ভাবগম্ভীর হয়। টু-শব্দ পর্যন্ত নাই। কুমারী মেরীর সামনে নতজানু হইয়া কেউ বা প্রার্থনা করিতেছে। এই হাঁটু-গাড়া, এই প্রার্থনা কুসংস্কার নহে এই কথা তখন মনে হইয়াছিল। ওই ভাব পরে দৃঢ় হইয়াছে। কুমারী মেরীর সামনে হাঁটু-গাড়িয়া যারা প্রার্থনা করে তারা মর্মর পাথরের পূজা করে না, পূজা করে তাতে নিজেদের আরোপ-করা শক্তির। এরূপ পূজায় ঈশ্বরের মহিমা কমে না, উল্টা বাড়ে, মনে পড়ে এই ভাব আমার মনে জাগিয়াছিল।

এফিল টাওয়ার সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলা দরকার। জানি না তা আজ কি কাজে আসিতেছে। এফিল টাওয়ারের স্তুতি নিন্দা দুইই তখন শোনা গিয়াছিল। মনে আছে নিন্দাকারীদের অগ্রণী ছিলেন টলস্টয়। তিনি বলিয়াছিলেন যে এফিল টাওয়ার মানুষের বোকামির সাক্ষ্য, জ্ঞানের নয়। তাঁর লেখাতে তিনি বলিয়াছিলেন যে, জগতে যত প্রকার নেশা রহিয়াছে তার মধ্যে তামাক সব চাইতে খারাপ নেশা, কারণ যে কুকর্ম করিতে মদখোরের আটকায় তামাকখোর তা অনায়াসে করে। মদে মানুষের বুদ্ধি লোপ পায়, তামাকে মানুষের মগজে ছাতলা জমে আর তাই সে আকাশে অট্টালিকা গড়িতে লাগিয়া যায়। এরূপ ব্যসনের পরিণাম এফিল টাওয়ার টলস্টয় এই কথা বলিয়াছিলেন।

সৌন্দর্যের নামমাত্র এফিল টাওয়ারে নাই। তাতে প্রদর্শনীর শোভা বাড়িয়াছিল এ কথা বলা যাইবে না। একটা নূতন জিনিস, প্রকাণ্ড বস্তু, তাই হাজারে হাজারে লোক উহার ওপরে উঠিয়াছিল। এই টাওয়ার প্রদর্শনীর এক খেলনা ছিল। খেলনায় শিশু ভোলে। টাওয়ার দেখিয়া আমরা মজিয়াছিলাম। ইহা হইতে প্রমাণ হয় আমরা শিশু। হাঁ, এই কাজটা এফিল টাওয়ার করিয়াছে বই কি!

২৪

ব্যারিস্টার ত হইলাম—তার পর?

ব্যারিস্টার হওয়ার জন্য বিলাতে গিয়াছিলাম। সেই সম্বন্ধে এখনও বলা হয় নাই। এখন সে বিষয়ে কিছু বলিতে হয়।

ব্যারিস্টার হওয়ার জন্য দুই জিনিস করার ছিল। এক ছিল 'টর্ম' পুরা করা অর্থাৎ সত্রে হাজির হওয়া। বছরে চার সত্র বা টর্ম ছিল। এরূপ বারো সত্রে উপস্থিত থাকিতে হইত। দ্বিতীয় জিনিস ছিল, আইনের পরীক্ষায় পাস হওয়া। টর্ম বা সত্রে হাজির হওয়া মানে 'ভোজ খাওয়া'। প্রতি টর্ম বা সত্রে মোটামুটি চব্বিশটি ভোজ হইত। অন্তত তার ছয়টাতে হাজিরা দিতেই হইত। ভোজে যোগ দিলে খাইতেই হইবে এমন কিছু কথা ছিল না, তবে ঠিক সময়ে ভোজে যোগ দিতে ও ভোজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত বসিয়া থাকিতে হইত। প্রায় সকলেই খাইত ও মদ্যপান করিত। ভাল খাদ্যের ও বাছা বাছা মদ্যের ব্যবস্থা ছিল। দাম আলবত দিতে হইত—আড়াই হইতে সাড়ে তিন শিলিং বা দুই তিন টাকা। তবে দামটা সকলেই সস্তা মনে করিত কারণ বাইরে হোটেলে গেলে মদের খরচই প্রায় অতটা পড়িত। মদ্যপায়ীদের আহারের খরচ অপেক্ষা পানের খরচ বেশি হয়। ভারতবাসীদের মধ্যে আমরা যারা 'সভ্য' হই নাই তাদের কানে এ কথা আশ্চর্য ঠেকিবে। প্রথম যখন ইহা শুনিয়াছিলাম ভয়ানক আঘাত লাগিয়াছিল। ভাবিয়া পাই নাই কোন্ প্রাণে লোকে মদের পিছনে এত পয়সা উড়ায়। পরে বুঝিতে পাই। প্রথম প্রথম এই সব ভোজে খাইতাম না। আমার চলে এমন তিন বস্তু—রুটি, আলু-সিদ্ধ ও কপি ছাড়া অন্যকিছু ভোজে মিলিত না। এই সব তখন রুচিত না। পরে যখন রুচি জন্মে তখন খাইতাম আর সাহসে ভর করিয়া অন্য জিনিসও চাহিয়া লইতাম।

ছাত্রদের অপেক্ষা 'বেন্‌চর'-দের বা গুরুদের অধিকতর ভাল খাদ্য দেওয়া হইত। এক পারসী সহপাঠী আমার মত নিরামিষাশী ছিল। নিরামিষের প্রচার উদ্দেশ্যে আমিষ বস্তুর অতিরিক্ত যে সব নিরামিষ বস্তু বেন্‌চরদের দেওয়া হইত তা আমাদের দেওয়া হোক এই আবেদন আমরা করি। আবেদন মঞ্জুর হয়। বেন্‌চরদের টেবিল হইতে নিরামিষ খাদ্য ও ফল আমরা পাইতে থাকি।

চার জনের জন্য দুই বোতল মদ নির্দিষ্ট ছিল। মদ আমি খাইতাম না। তাই আমাকে চার জনের এক জন করিতে সহপাঠীরা ব্যস্ত হইত, কারণ সেই অবস্থায় তিন জনে দুই বোতল মদ 'উড়াইতে' পারিত। তা ছাড়া, প্রত্যেক সত্রে এক মহাভোজ (গ্রাণ্ড নাইট) হইত। সেদিন 'পোর্ট' ও 'শেরী'র অতিরিক্ত 'শেম্পেন' মিলিত। স্বাদে নাকি শেম্পেনের জুড়ি নাই। তাই এই মহাভোজের দিনে আমার দাম বাড়িয়া যাইত; বিশেষ আমন্ত্রণ পাইতাম।

এই খানাপিনাতে ছাত্রদের কি যে লাভ হইত তখনও আমি বুঝি নাই, আজও বুঝি না। এক সময় ছিল যখন বেশি ছাত্র এই সব ভোজে যাইত না। বেন্‌চরদের সহিত তখন আলাপ-আলোচনা করার সুযোগ তারা পাইত। তা বাদে বক্তৃতাও হইত। তার ফলে ব্যবহার-জ্ঞান লাভ হইতে পারিত। আর ভাল হোক মন্দ হোক এক রকমের বাহ্য শিষ্টাচারের শিক্ষা লাভ হইত ও বক্তৃতার শক্তি বাড়িত। এই সবের সুযোগ আমার সময়ে ছিল না, কারণ বেন্‌চররা হরিজনের মত দূরে একধারে আলগোছে বসিতেন। কালে এই অনুষ্ঠান এভাবে অর্থহীন হইয়া যায়। কিন্তু প্রাচীনতার পূজারী ঢিমে চালের ইংলণ্ড আজও তা ধরিয়া আছে।

আইনের পড়া সহজ ছিল। ব্যারিস্টারকে লোকে ঠাট্টা করিয়া বলিত 'ডিনর' (খানাপিনা) ব্যারিস্টর'। পরীক্ষার মূল্য যে প্রায় কিছুই নয় এ কথা সকলেই জানিত। আমার সময়ে 'রোমন ল' ও ইংলণ্ডের আইন এই দুই বিষয়ে পরীক্ষা দিতে হইত। এই দুই পরীক্ষা দুই বারে দেওয়া চলিত। নির্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তক ছিল। কিন্তু ওই সব বই প্রায় কেহই পড়িত না। দেখিয়াছি রোমন ল-এর সংক্ষিপ্ত নোট পনের দিন পড়িয়া লোকে পাস করিয়া গিয়াছে। ইংলণ্ডের আইন পাসের বেলায়ও ঠিক ওই কথা। দুই তিন মাস উহার নোট পড়িয়া অনেককে পরীক্ষার জন্য তৈরি হইতে দেখিয়াছি।

পরীক্ষা সহজ ও পরীক্ষক উদার। রোমন ল-তে শতে পঁচানব্বই হইতে নিরানব্বই জন পাশ করিত আর শেষ পরীক্ষার পাসের হার ছিল পঁচাত্তর বা তারও বেশি। তাই ফেল হওয়ার ভয় খুবই কম ছিল। তা ছাড়া পরীক্ষা বছরে একবার নয় চার বার হইত। এরূপ সহজ পরীক্ষা পাস করা কারো পক্ষেই কঠিন নহে।

কিন্তু যা কঠিন নয় তাকেই আমি কঠিন করিয়া লইয়াছিলাম। আমার মনে হয় মূল পুস্তক পড়া উচিত আর তা না-পড়া ফাঁকিবাজি। তাই অনেক পয়সা খরচ করিয়া মূল বই কিনি। রোমন ল লাটিনে পড়া স্থির করি। লণ্ডনের মেট্রিক্যুলেশনে লাটিন পড়িয়াছিলাম। তা এখন কাজে লাগিল। দক্ষিণ আফ্রিকায় রোমন-ডচ ল-এর চলতি। জাস্টিনিয়ন পড়া ছিল বলিয়া তা বুঝিতে আমার খুব সহায়তা হয়।

নয় মাসের কঠোর পরিশ্রমে ইংলণ্ডের আইন শিখিয়াছিলাম। ব্রুম-এর 'কমন ল' বইটা মস্ত। সুখপাঠ্য হইলেও তা পড়িতে বেশ সময় লাগে। স্নেল-এর 'ইক্যুটি' কৌতূহলোদ্দীপক বই বটে কিন্তু বুঝিতে দম বাহির হইত। হোয়াইটও ট্যুডর-এর 'লীডিং কেসেস' (নজিরান মামলা)-এর কিছু অংশ পাঠ্য ছিল। খুব আগ্রহের সহিত পড়িয়াছিলাম আর তা হইতে লাভও হইয়াছিল খুব। উইলিয়ম ও এড্ওয়ার্ডস-এর 'রিয়েল প্রপার্টি' (স্থাবর সম্পত্তি) ও গুডিভ-এর 'পার্সোনাল প্রপার্টি' (অস্থাবর সম্পত্তি) অত্যন্ত আগ্রহে পড়িয়াছিলাম। উইলিয়মের বই পড়িতে পড়িতে মনে হইয়াছিল উপন্যাস পড়িতেছি। ভারতে ফেরার পরে এমনটা আগ্রহে একখানি বহি পড়িয়াছিলাম—মেইন-এর 'হিন্দু ল'। কিন্তু ভারতীয় আইনের বই-এর কথা বলার স্থান ইহা নয়।

পরীক্ষা পাস করিলাম। ১৮৯১ সনের ১০ই জুন ব্যারিস্টার শ্রেণীভুক্ত হইলাম। ১১ই জুন আড়াই শিলিং জমা দিয়া ইংলণ্ডের হাইকোর্টে নাম দাখিল করিলাম। ১২ই জুন ভারত রওনা হইলাম।

পড়াশুনা করিয়াছিলাম। তবু একান্ত অসহায় বোধ করিয়াছিলাম; অত্যন্ত ভয় পাইয়াছিলাম। মনে হইতেছিল কিছুই শেখা হয় নাই, কিসের জোরে ব্যারিস্টারি করিব!

এই অসহায় ভাবের কথা পরের প্রকরণে বলিব।

২৫

অসহায় ভাব

ব্যারিস্টার খেতাব পাওয়া সহজ, কোর্টে ব্যারিস্টারি করা সহজ নয়। আইন পড়িয়াছিলাম কিন্তু তাতেই আইন ব্যবসায় শেখা হয় না। ন্যায়ধর্ম ('লিগেল ম্যাকসিম্‌স') পড়িয়াছিলাম, ভালও লাগিয়াছিল, কিন্তু পেশায় তা কিরূপে কাজে লাগানো যায় তা ভাবিয়া পাইতেছিলাম না। ন্যায়ধর্মের একটা বিধি ছিল: 'অন্যের বিত্ত হানি না হয় এভাবে নিজ বিত্ত ভোগ করবে'। মক্কেলের ব্যাপারে এই বিধির উপযোগ কি করিয়া হইতে পারে এই প্রশ্নের উত্তর আমি খুঁজিয়া পাইতেছিলাম না। যে সব মামলায় এই বিধির উপযোগ হইয়াছিল তা পড়িয়াছিলাম। কিন্তু তাহা হইতে ওকালতিতে উহার প্রয়োগ করিতে আমি ভরসা পাই নাই।

তা ছাড়া ভারতীয় আইনের কোন কিছুই পাঠ্যক্রমে ছিল না। হিন্দু-শাস্ত্র ও মুসলিম কানুন যে কি তা জানিতাম না। আরজ্জিটা পর্যন্ত মুসাবিদা করিতে শেখা হয় নাই। কূলকিনারা আমি দেখিতেছিলাম না। ফিরোজ শা মেহতার নাম শুনিয়াছিলাম। আদালতে তিনি যে সিংহের মত গর্জন করেন সে কলা কি তিনি ইংলণ্ডে শিখিয়াছিলেন? তাঁর মত সূক্ষ্ম নিরূপণ-শক্তি জন্মেও আমার লাভ হইবে না তা আমি জানিতাম। ওকালতি করিয়া পেটের ভাত কামাইতে পারিব কিনা সেই বিষয়েও মনে ভয় ছিল।

আমার এই অসহায় ভাব আইন পড়ার সময় হইতেই চলিতেছিল। আমার এই অসোয়াস্তির কথা দুই চারজন বন্ধুকে বলিয়াছিলাম। তাদের একজন আমাকে দাদাভাই নওরোজীর কাছে যাইতে বলেন। পূর্বেই বলিয়াছি, দাদাভাইয়ের নামে আমার কাছে পরিচয়-পত্র ছিল। উহার ব্যবহার এতদিন আমি করি নাই। আমার মনে হইয়াছিল, এরূপ মহাপুরুষের সময় নেওয়ার কি অধিকার আমার আছে? কোথাও তাঁর বক্তৃতা হইত ত যাইতাম; এক কোণে বসিয়া তাঁকে দেখিয়া, তাঁর কথা শুনিয়া চোখ কান জুড়াইতাম, ঘরে ফিরিয়া আসিতাম। ছাত্রদের সম্পর্কে আসার জন্য তিনি এক সঙ্ঘ স্থাপন করিয়াছিলেন। সঙ্ঘে আমি যাইতাম। ছাত্রদের তিনি মঙ্গলকামনা করেন ও ছাত্রেরা তাঁকে ভালবাসে দেখিয়া আমার আনন্দ হইত। শেষটায় সাহসে ভর করিয়া তাঁহার সহিত দেখা

করি ও পরিচয়-পত্র দিই। তিনি বলেন, 'যখন ইচ্ছা আসবে, পরামর্শ করার থাকে করবে।' কিন্তু কখনও আমি তাঁকে কষ্ট দিই নাই। নেহাত ঝঞ্ঝাটে না পড়িলে তাঁর সময় নেওয়া আমার অনুচিত মনে হইত। তাই বন্ধুর পরামর্শ অনুসারে নিজের অসুবিধার কথা তাঁর কাছে বলার সাহস আমার হয় নাই।

এই বন্ধু বা অন্য কোন বন্ধু আমাকে ফ্রেডারিক পিঙ্কট-এর সহিত দেখা করিতে বলেন। মি. পিঙ্কট রক্ষণশীল দলের লোক ছিলেন। কিন্তু ভারতীয় ছাত্রদের প্রতি তাঁর স্বার্থশূন্য নির্মল ভালবাসা ছিল। অনেক ছাত্র তাঁর কাছে পরামর্শ লইতে যাইত। দেখা করিতে চাই বলিয়া তাঁকে পত্র দিই। সময় দেন। জীবনে কখনও সেই সাক্ষাৎকারের কথা ভুলিব না। বান্ধবের মত অভ্যর্থনা করেন। হাসিয়া আমার নিরাশা তিনি উড়াইয়া দেন। তিনি বলেন, 'সকলকেই ফিরোজ শা মেহতা হতে হবে এ কথাই কি তুমি মনে কর? ফিরোজ শা বা বদরুদ্দীন দুই-এক জনই হয়। নিশ্চয় জেনো, সাধারণ উকিল হতে চৌকশ হওয়ার দরকার করে না। সাধারণ সততা ও নিষ্ঠা থাকলে অনায়াসে করে খাওয়া যায়। সব মামলাই কিছু পেঁচালো নয়। ভাল, বল ত সাধারণ পড়াশুনা কতটা করেছ?'

দেখিলাম আমার পড়াশুনার কথা শুনিয়া তিনি নিরাশ হইলেন। পরক্ষণেই তা মিলাইয়া গেল। তাঁর মুখে হাসি ফিরিয়া আসিল। তিনি বলিলেন:

'তোমার অসুবিধা যে কোথায় বুঝতে পাচ্ছি। সাধারণ পড়াশুনা তোমার বড় কম। দুনিয়ার জ্ঞান তোমার নেই। উকিলের তা ছাড়া চলে না। ভারতবর্ষের ইতিহাসও তুমি পড় নাই। উকিলের মনুষ্য-স্বভাবের জ্ঞান থাকা আবশ্যক। কে কেমন লোক মুখ দেখে তা ধরা চাই। তা ছাড়া, ভারতবর্ষের ইতিহাস যে-কোন ভারতবাসীর জানা আবশ্যক। ওকালতির সঙ্গে এর সম্বন্ধ নেই, তা হলেও সে জ্ঞান থাকা চাই। দেখছি, কে' ও মেলেসন-এর ১৮৫৭-র বিদ্রোহের ইতিহাস পর্যন্ত তুমি পড়নি। বইটা কিনে এখনই পড়ে নেবে। আর মনুষ্য-স্বভাব বোঝার জন্য সামুদ্রিক বিদ্যার (ফিজিয়োগনমি-র) এই দুইখানি বইও পড়বে। এই বলিয়া লেভেটর ও শেমলপেণিক-এর বইয়ের নাম লিখিয়া দেন।

এই মিত্র গুরুজনের প্রতি শ্রদ্ধায় আমার অন্তর ভরিয়া গেল। তাঁর কাছে গিয়া ভয় দূর হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু বাহিরে আসিতেই আবার অসহায়

বোধ করিতে লাগিলাম। মুখ দেখিয়া লোক চেনার ও ওই দুই বই-এর কথা ভাবিতে ভাবিতে ঘরে ফিরিলাম। পরের দিন লেভেটর-এর বই কিনিলাম। শেমলপেনিক-এর বই দোকানে ছিল না। লেভেটর-এর বই পড়িলাম; দেখিলাম স্নেল-এর ইক্যুটি অপেক্ষা উহা আরও কঠিন। বইটাও প্রায় নিরস। শেক্‌সপিয়র-এর মুখাকৃতি ত পড়িলাম, কিন্তু লণ্ডনের রাজপথে যে সব শেক্‌সপিয়র চলাফেরা করে তাঁদের বাছিয়া বাহির করিতে পারিলাম কৈ!

লেভেটর পড়িয়া আমার কোন লাভ হয় নাই। মি. পিঙ্কট-এর উপদেশ হইতে সাক্ষাৎ লাভ আমার বিশেষ হয় নাই, তবে তাঁর স্নেহ আমায় বল যোগাইয়াছিল। তাঁর হাসিমুখ ও উদার প্রকৃতির ছাপ আমার মনে রহিয়া গিয়াছে। ওকালতিতে সফলতা লাভ করার জন্য ফিরোজ শার বিচক্ষণতা, স্মৃতিশক্তি ও দক্ষতার প্রয়োজন নাই, প্রয়োজন সততার ও নিষ্ঠার তাঁর এই উপদেশ আমার মনে গাঁথিয়া যায়। সততা ও নিষ্ঠা আমার যথেষ্ট ছিল সুতরাং অন্তরে কিছুটা বল পাইলাম।

কে' ও মেলেসন-এর বই বিলাতে পড়িতে পারি নাই। কিন্তু ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলাম প্রথম সুযোগে তা পড়িয়া ফেলিব। সেই ইচ্ছা দক্ষিণ আফ্রিকায় পূর্ণ হয়।

এরূপ নিরাশার আঁধারে আশার এই অতি ক্ষীণ কিরণ লইয়া 'আসাম' জাহাজ হইতে ভয়ে ভয়ে বোম্বাই বন্দরে নামিলাম। বন্দরের সমুদ্র অস্থির ছিল তাই লঞ্চে পারে আসিতে হয়।

আত্মকথা ঃ দ্বিতীয় ভাগ

১

রায়চন্দ ভাই

পূর্ব প্রকরণে বলিয়াছি যে বোম্বাই বন্দরে সমুদ্র অশান্ত ছিল। ব্যাপারটা কিছু নূতন ছিল না। জুন-জুলাই মাসে প্রতি বছর ভারত মহাসাগর এই রূপ ধরে। এডেন হইতেই এই তাণ্ডব চলিতেছিল। সকলেই অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিল ; এক আমি খোশ-তবিয়তে ছিলাম। ডেকে যাইতাম, সমুদ্রের তাণ্ডব দেখিতাম ; ঢেউয়ের ঝাপটা আসিয়া ভিজাইয়া দিত। সকালের জলযোগ করিতে আমি ও আর দুই একজন ছাড়া আর কেহ যাইত না। জোয়ারের লপসি পেটে না গিয়া পাছে জামাকাপড়ে যায় এই ভয়ে লপসির রেকাব কোলে সাবধানে ধরিয়া আমরা খাইতাম।

বাইরের এই ঝড় আমার অন্তরের ঝড়েরই যেন বহিঃপ্রকাশ ছিল। তবে এ কথা বলা যাইতে পারে যে বাইরের ঝড়ে যেমন আমি স্থির ছিলাম ভিতরের ঝড়েও তেমনই স্থির ছিলাম। একঘরে হওয়ার প্রশ্ন ছিল। আর ব্যবসায়ে কি হইবে সে ভাবনার কথা ত আগেই বলিয়াছি। তা ছাড়া, সংস্কারক আমার মনে কতকগুলি সংস্কারের সংকল্পও ছিল। কিভাবে সেগুলি আরম্ভ করা যায় সে উদ্‌বেগও মনে ছিল। কিন্তু ভাবি নাই এমন অনেক কিছুও কপালে লেখা ছিল।

আমাকে নেওয়ার জন্য বড়দা বন্দরে উপস্থিত ছিলেন। বড়দা তার আগে ডা. মেহতা ও তাঁর দাদার সঙ্গে দেখা করিয়াছিলেন। দাদাকে ডা. মেহতা আগ্রহ করিয়া বলেন, আমি যেন তাঁর বাড়ীতে উঠি। তাই আমরা তাঁর ওখানে উঠি। এরূপে যে পরিচয় বিলাতে হইয়াছিল তা বজায় থাকে ও দিন দিন বাড়িয়া দুই পরিবারে আত্মীয়তা জন্মে।

মাকে দেখার জন্য আকুল হইয়াছিলাম। চিবুক ছুঁইয়া আর যে তিনি আমায় আদর করিবেন না তা কি আমি জানিতাম! বাড়ী পৌঁছিলে বড়দা এই দুঃসংবাদ দেন ও স্নানাদি ক্রিয়া আমি সমাপন করি। বিদেশে আঘাতটা বেশি লাগিবে এই ভাব হইতে বড়দা ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন বোম্বাইয়ে পৌঁছিলে খবর দিবেন। কিন্তু তাতে আমার কম লাগিয়াছিল

তা নয়। সে কথা যাক। বাবার মৃত্যুতে যে বেদনা বোধ করিয়াছিলাম মায়ের মৃত্যুসংবাদে তাহা অপেক্ষা অধিক বেদনা পাই। মনে অনেক সাধ ছিল। সে সব ধূলায় মিলাইল। কিন্তু আমার মনে আছে আমি ডুকরিয়া কাঁদি নাই। চোখের জল পর্যন্ত রুখিয়াছিলাম ; মা যেন মরেন নাই এভাবে সব কাজ করিয়াছিলাম।

তাঁর বাড়ীর যে সব ব্যক্তির সহিত ডা. মেহতা আমার পরিচয় করিয়া দেন তাঁদের এক জনের কথা না বলিলে নয়। তাঁর দাদা রেবাশঙ্কর জগজীবনের সহিত চিরবন্ধুত্ব জন্মে। কিন্তু যাঁর কথা আমি বলিতে চাই তিনি কবি রায়চন্দ বা রাজচন্দ্র। রায়চন্দ ডা. মেহতার বড় ভাইয়ের জামাতা ও রেবাশঙ্কর জগজীবন নামক জহরতের কারবারের অংশীদার ও হর্তাকর্তা ছিলেন। তখন তাঁর বয়স পঁচিশ। তা হইলে কি হয়, প্রথম পরিচয়েই আমি ধরিতে পারিয়াছিলাম যে তিনি চরিত্রবান ও জ্ঞানী। লোকে জানিত তিনি শতাবধানী। শতাবধানী যে কি ডা. মেহতা তা আমায় চোখে দেখিতে বলেন। ইউরোপের বিবিধ ভাষার শব্দভাণ্ডার উজাড় করিয়া রামচন্দ ভাইকে আমি বলি, যেই ক্রমে বলিয়াছি আপনি সেই ক্রমে বলিয়া যান। তিনি ঠিক ঠিক সেই ক্রমে শব্দগুলি বলিয়া যান! তাঁর এই শক্তি দেখিয়া আমার হিংসা হইয়াছিল কিন্তু তাতে আমি মজি নাই। যে বস্তু দেখিয়া আমি মজিয়াছিলাম সে বস্তুর পরিচয় পরে পাই। সে বস্তু ছিল তাঁর গভীর শাস্ত্র-জ্ঞান, নির্মল চরিত্র ও আত্মদর্শনের তীব্র আকাঙ্ক্ষা। আত্মদর্শনের জন্যই তিনি জীবন ধারণ করিতেন এ কথা পরে আমি বুঝিতে পারিয়াছিলাম।

হসতাং রমতাং প্রগট হরি দেখুং রে,
মারুং জীব্যুং সকল তব লেখুং রে ;
মুক্তানন্দনো নাথ বিহারী রে,
ওধা জীবনদোরী অমারী রে।

মুক্তানন্দের এই বচন তাঁর মুখেই ছিল তা নয়, অন্তরেও গাঁথা ছিল।

হাজার হাজার টাকার কারবার তিনি করিতেন, হীরা মুক্তা পরখ করিতেন, ব্যবসায়ের জটিল সমস্যার সমাধান করিতেন। সবই তিনি করিতেন কিন্তু দৃষ্টি ছিল তাঁর আর কোথাও। আত্মদর্শন-হরিদর্শন ছিল তাঁর লক্ষ্য। তাঁর গদির ওপর চাই আর কিছু থাকিত কি না থাকিত, কোন না কোন ধর্ম-গ্রন্থ থাকিতই, আর থাকিত রোজনামচা। ব্যাপারের কথা যেই শেষ হইত

ধর্মপুস্তক খুলিতেন বা ওই রোজনামচা। তাঁর লেখার যে সংকলন প্রকাশ হইয়াছে উহার বেশির ভাগ বস্তু ওই নোটবুক হইতে লওয়া হইয়াছে। যে লাখো টাকার লেনদেনের পরমুহূর্তে আত্মজ্ঞানের গূঢ় কথা লিখিতে বসিয়া যায় সে জাতব্যাপারী নহে, সে জাতশুদ্ধজ্ঞানী। এই অবস্থায় তাঁকে এক-বার নয়, বহুবার আমি দেখিয়াছি। কোনদিনও তাঁকে আমি আত্মহারা হইতে দেখি নাই। ব্যবসার বা স্বার্থের সম্পর্ক আমার সহিত তাঁর ছিল না। আমি তখন পসারহীন ব্যারিস্টার। তবুও যখনই যাইতাম আমার সহিত তিনি ধর্মের গভীর আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেন। তখনও আমি আমার পথ পাই নাই, আর ধর্মের আলোচনায় যে তেমন রস পাইতাম তাও নয়, তা হইলেও তাঁর কথা ভাল লাগিত, আমার মন তা কাড়িয়া লইত। পরে বহু ধর্মাচার্যের সংসর্গে আমি আসিয়াছি, নানা ধর্মের আচার্যদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করার প্রযত্ন করিয়াছি, কিন্তু রায়চন্দ ভাই আমার মনে যে দাগ কাটিয়াছিলেন অন্য কেউ তা পারেন নাই। তাঁর বুদ্ধির ওপর আমার বিলক্ষণ আস্থা ছিল। তাঁর সততায়ও আমার ততটাই বিশ্বাস ছিল। তাই আমি ঠিক জানিতাম যে বুঝিয়া-সুঝিয়া তিনি কখনও আমায় ভুল পথে নিবেন না। আর মনে যা তিনি ভাবেন ঠিক তাহাই আমাকে বলিবেন এই বিশ্বাসও আমার ছিল। এইজন্যই না আমার আধ্যাত্মিক সংকটে আমি তাঁর শরণ লইতাম।

তাঁর ওপর এতটা গভীর বিশ্বাস থাকিলেও তাঁকে আমি নিজের গুরুরূপে হৃদয়-আসনে বসাইতে পারি নাই। সেই আসন আজও শূন্য রহিয়াছে; সেই খোঁজ আজও চলিতেছে।

হিন্দুধর্মে গুরুর মহৎ স্থান। আর আমি মনে করি তা ঠিকও বটে। 'গুরু বিন জ্ঞান ন হোয়' এই বচন অনেকটা সত্য। যে গুরু অক্ষরজ্ঞান দেন তিনি অপূর্ণ হইলে তবুও চলিতে পারে, কিন্তু যে গুরু আত্মদর্শন করাইবেন তিনি অপূর্ণ হন ত মোটেই চলে না। পূর্ণজ্ঞানীকেই মাত্র গুরুপদে বরণ করা যায়। গুরু খুঁজিতে খুঁজিতেই মানুষ ঠিক পথের সন্ধান পায়, কারণ যোগ্যতার মাপকাঠিতেই মানুষের গুরুলাভ হয়। এই কথার অর্থ এই যে সাধক যোগ্য হওয়ার চেষ্টাই মাত্র করিতে পারে। ফল ভগবানের হাতে।

যদিও রায়চন্দ ভাইকে নিজ হৃদয়ের স্বামী করিতে পারি নাই তবুও সময় সময় তাঁর শরণ লইয়াছি, তাঁর কাছ হইতে পথের ইঙ্গিত পাইয়াছি,

সহায়তা লাভ করিয়াছি। কিভাবে তা পাইয়াছি পরে সে কথা বলিব। এখানে এ কথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, বর্তমান যুগের তিন ব্যক্তি আমার জীবনে গভীর রেখাপাত করিয়াছেন—রায়চন্দ ভাই তাঁর সাক্ষাৎ সংসর্গ দ্বারা, টলস্টয় তাঁর 'বৈকুণ্ঠ তোর হৃদয়ে' বই দ্বারা, আর রাস্কিন 'আন টু দিস্ লাস্ট' (সর্বোদয়) নামক পুস্তক দ্বারা। কিন্তু এই সম্বন্ধে অন্য কথা পরে যথাস্থানে বলিব।

২

সংসার-প্রবেশ

আমা হইতে বড়দা অনেক আশা করিয়াছিলেন। পয়সা, কীর্তি ও প্রতিপত্তির লোভ তাঁর খুবই ছিল। তিনি দরাজদিল লোক ছিলেন। উদারতা মাত্রা ছাড়াইয়া যাইত। খোলা হাত ও আত্মভোলা স্বভাবের কারণ অনেক বন্ধু তাঁর জুটিয়াছিল। তিনি ভাবিয়াছিলেন, এই সব বন্ধুর দৌলতে আমার হাতে অনেক মামলা আসিবে। ইহাও তিনি ধরিয়া লইয়াছিলেন যে আমার পসার খুব জমিবে আর সেই ভরসায় আয় হইতে ব্যয় বাড়াইয়া রাখিয়াছিলেন। আমার ওকালতির ক্ষেত্র তৈরি করার জন্য যা করা দরকার তাও করিয়াছিলেন।

আমাকে একঘরে করার প্রশ্নটা চুকিয়া গিয়াছিল তা নয়। তবে তাতে ফাটল ধরিয়াছিল। এক পক্ষ আমাকে সঙ্গে সঙ্গে সমাজে তুলিয়া লইয়াছিল। অপর পক্ষ প্রতিকূল থাকিয়া যায়। সমাজে নেওয়ার পক্ষকে তুষ্ট করার জন্য বড়দা আমাকে বোম্বাই হইতে সোজা নাসিকে লইয়া যান ও সেখানে পুণ্যতোয়া নদীতে স্নান করান। পরে রাজকোটে গিয়া জাতি-ভোজ দেন। এই সব আমার ভাল লাগে নাই। বড়দা আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। তাঁর ইচ্ছা আমার কাছে আদেশই ছিল। তাই তাঁর ইচ্ছা অনুসারে এই সব কাজ আমি যন্ত্রের মত করিয়া গেলাম। জাতির প্রশ্ন প্রায় মিটিয়া গেল।

যে দল তখনও একঘরে করিয়া রাখিয়াছিল তাদের পাতে ওঠার চেষ্টা আমি কোনদিনও করি নাই। তবে তাদের প্রধানদের প্রতি আমার মনে কোন ক্রোধও ছিল না। তাদের কেউ কেউ আমাকে আড়চোখে দেখিতেন।

আমি নরম ব্যবহার করিতাম। একঘরের নিয়ম আমি ঠিক ঠিক মানিয়া চলিতাম। শ্বশুর-শাশুরীর ওখানে বা বোনের বাড়ীতে জল পর্যন্ত খাইতাম না। জাতির শাসন এড়াইয়া চুপিচুপি তাঁরা আমাকে খাওয়াইতে চাহিত, কিন্তু যা দশের সামনে করা যায় না তা লুকাইয়া করিতে আমার মন সরিত না।

আমার এই ব্যবহারের ফল এই হইয়াছিল যে, জাতির তরফ হইতে আমার ওপর কোন পীড়ন আসে নাই। যদ্যপি সমাজের এক ভাগ আজও আমাকে দূর রাখিয়াছে তথাপি তাদের কাছে আমি সম্মান ও উদার ব্যবহারই পাইয়াছি। আমা দ্বারা জাতির উপকার হইবে এরূপ কোন আশা না রাখিয়াও আমার কাজে তারা সহায়তা করিয়াছে। আমি মনে করি আমার অবিরোধেরই ইহা মধুর ফল। জাতিতে ওঠার জন্য যদি আন্দোলন করিতাম, বিরোধী দলে ভাঙ্গন সৃষ্টি করার চেষ্টা করিতাম, জাতভাইদের উস্কাইতাম-চটাইতাম তবে নিশ্চয় তারা বিরোধ করিত; বিলাত হইতে ফিরিবার পরে যদি উদাসীন ও অলিপ্ত না থাকিতাম তবে আন্দোলনের ঘূর্ণিপাকে পড়িতাম ও সম্ভবত মিথ্যাচারে জড়াইয়া পড়িতাম।

স্ত্রীর সঙ্গে আমার সম্পর্ক তখনও আশানুরূপ হয় নাই। বিলাত ঘুরিয়া আসার পরেও সেই সন্দেহ-বাই আমাকে ছাড়িয়া যায় নাই। তার প্রতি কাজে খুঁত ধরার ও সন্দেহ করার ভাব আগের মতই ছিল। তাই যে সব আকাঙ্ক্ষা মনে মনে পোষণ করিয়াছিলাম তা অপূর্ণ থাকিয়া যায়। পত্নীর অক্ষরজ্ঞান হওয়া আবশ্যক আর ওই কাজটা আমি নিজেই করিব এই ছিল এক আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু আমার বিষয়-আসক্তি এখানে বাধা হয়। নিজের এই দুর্বলতার সবটা কোপ উল্টা গিয়া পড়ে পত্নীর ওপর। একসময় ব্যাপার এতদূর গড়ায় যে তাকে তার বাপের বাড়ী পাঠাইয়া দেই এবং অনেক কষ্ট দেওয়ার পরে আমার কাছে আসার অনুমতি দেই। বোকামির যে একশেষ হইয়াছিল পরে সে কথা বুঝিতে পারি।

বাল-শিক্ষার সংস্কার করার ইচ্ছাও ছিল। বড়দার ছেলেমেয়ে ছিল। বিলাত যাওয়ার সময় আমার ছেলে কোলের শিশু ছিল। এখন সে প্রায় চার বছরের হইয়াছিল। ছোটদের দৌড়-ঝাঁপ করাইব, তাদের দেহ শক্তপোক্ত করিয়া গড়িয়া তুলিব ও নিজের কাছে রাখিয়া তাদের মানুষ করিব এই স্বপ্নও মনে ছিল। বড়দার এদিকে আগ্রহ ছিল। এতে

আমি অল্পস্বল্প সফল হইয়াছিলাম। ছোটদের সঙ্গ আমার বড়ই ভাল লাগিত এবং তাদের সঙ্গে ঠাট্টাতামাশা করার অভ্যাস আজও আমার থাকিয়া গিয়াছে। সেই সময়েই আমি বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে উত্তম শিশু-শিক্ষক হওয়ার শক্তি আমাতে আছে।

খাদ্যেও 'সংস্কার' করার ছিল। চা-কফি আগেই ঘরে ঢুকিয়াছিল। বিলাত হইতে আমার দেশে ফিরিবার আগেই বড়দা মনে করেন যে গৃহের চালচলন কিছুটা বিলিতি ধরনের করা আবশ্যক। তাই চীনামাটির বাসন ঢুকিল। চা ইত্যাদি যা অসুখ-বিসুখের বা পদস্থ অতিথিদের জন্য তোলা থাকিত তা এখন সকলের ব্যবহারে আসিল। কমতি যা ছিল আমার 'সংস্কার'-এ তা পুরতি হইল। ওটমিল পরিজ (জোয়ারের জাউ) ঘরে ঢুকিল। চা-কফির স্থান লইল কোকো; লইল না বলিয়া আর এক উপসর্গ যুক্ত হইল বলাই ঠিক হইবে। জুতা-মোজা ঘরে আগেই ঢুকিয়াছিল। আমার কোট-পাতলুনে ঘর এখন পবিত্র হইল!

এভাবে খরচ বাড়িয়া চলিল। নিত্য নূতন বস্তুর আমদানি হইতে লাগিল। দুয়ারে সাদা হাতি বাঁধা হইল। কিন্তু পয়সা আসে কোথা হইতে? রাজকোটে ওকালতি করার কথা ভাবিলাম। ভাবনাটা নিজের কাছে উপহাসের মত মনে হইল—মনে হইল একে ত রাজকোটের নামকরা উকিলদের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার মত জ্ঞান আমার নাই, তাতে আমার ফী তাদের ফীর দশগুণ। এমন মূর্খ কে আছে আমাকে মকদ্দমা দিবে? যদিই বা এমন কোন বোকা মিলে তা হইলেও কি নিজের অজ্ঞতার সহিত ধৃষ্টতা ও ছলনা মিশাইয়া দুনিয়ার কাছে নিজের ঋণভার আরও বাড়াইব?

বন্ধুরা বোম্বাইতে কিছুদিন থাকিয়া হাইকোর্টের অভিজ্ঞতা লাভ করিতে, ভারতীয় আইন অধ্যয়ন করিতে ও কেস পাওয়ার চেষ্টা করিতে পরামর্শ দেন। তাঁদের কথা ভাল লাগে। বোম্বাই গেলাম।

সংসার পাতিলাম। রাঁধুনী রাখিলাম। আমার মতই সে আনাড়ী ছিল। ব্রাহ্মণ ছিল। চাকরের দৃষ্টিতে তাকে দেখিতাম না। ঘরের একজন ভাবিতাম। স্নান সে করিত; গা রগড়াইত না। ধুতি ময়লা; পইতাও তথৈবচ। শাস্ত্রের ধারও ধারিত না। এর চাইতে ভাল রাঁধুনী আর আমার কোথা হইতে জুটিবে?

'উত্তম, রবিশঙ্কর (তার নাম ওই ছিল), রাঁধতে ত জান না। সন্ধ্যা-আহ্নিক অবশ্যই জান, নয় কি?'

'বলব কি ভাইসাহেব, লাঙ্গল আমার সন্ধ্যাহ্নিক, আর কোদাল আমার নিত্যকর্ম। এ হচ্ছে আপনার এই বামুন। এরূপ লোকে চলে ত চালিয়ে নিন। নয় ত খেতি ত আছেই।'

বুঝিলাম রবিশঙ্করের মাস্টারি করিতে হইবে। সময় হাতে ছিলই। আধা রবিশঙ্কর রাঁধিত, আধা আমি রাঁধিতাম। বিলাতী নিরামিষ খাদ্যের পরীক্ষা এখানে শুরু হইল। একটা স্টোভ কিনিলাম। হেঁসেলের সব কিছু দুইজনে করিতাম। পঙ্‌ক্তি-ভেদের বালাই আমার ছিল না। রবিশঙ্করেরও তাতে আগ্রহ ছিল না। তাই আমাদের বনিবনাও দিব্যি হইয়াছিল। তবে একটা গরমিল ছিল। রবিশঙ্কর কিছুতেই নোংরাপনা ছাড়িবে না, খাওয়ার জিনিস পরিষ্কার রাখিবে না।

কিন্তু বোম্বাইয়ে চার-পাঁচ মাসের অধিক থাকা সম্ভব হয় নাই, কারণ খরচ বাড়িয়া চলিয়াছিল, আয় কিছুই ছিল না।

সংসারজীবন এইভাবে আমার আরম্ভ হইয়াছিল। ব্যারিস্টারি ব্যবসা আমার বিশ্রী মনে হইতেছিল—আড়ম্বর অধিক, জ্ঞান কম। দায়িত্বের চাপ খুবই বেশি মনে হইতেছিল।

প্রথম কেস

বোম্বাইয়ে যখন ছিলাম তখন এক সঙ্গে দুই কাজ চলিতেছিল—ভারতীয় আইনের অধ্যয়ন ও খাদ্যের পরীক্ষা। বীরচাঁদ গান্ধী নামে এক বন্ধু এই পরীক্ষায় সাথী হইয়াছিল। ওদিকে বড়দা আমার জন্য মামলা যোগাড় করার সাধ্যমত চেষ্টা করিতেছিলেন।

আইনের পড়া ঢিমেতালে চলিতেছিল। সিভিল প্রোসীডিয়র কোড লইয়া হিমসিম খাইতেছিলাম। এভিডেন্স এ্যাক্ট-এর পড়া ঠিক চলিতেছিল। বীরচাঁদ গান্ধী সলিসিটর পরীক্ষার জন্য তৈরি হইতেছিল। স্বভাবতই ব্যারিস্টার ও উকিলদের কথা সে খুব বলিত। সে বলিত, 'ফিরোজশা মেহ্‌তার দক্ষতার মূলে তাঁর অগাধ আইন-জ্ঞান। এভিডেন্স এ্যাক্ট তাঁর

নখদর্পণে। বত্রিশ ধারার সব কেসের খুঁটিনাটি তিনি জানেন। বদরুদ্দীন তায়েবজীর যুক্তি এরূপ অত্যাশ্চর্য যে জজদেরও তাক লাগে।'

এই সব দিগ্‌গজদের কথা শুনিতাম আর আমার মনে হইত কোথায় এঁরা আর কোথায় আমি!

'ব্যারিস্টারদের পাঁচ-সাত বছর কোর্টে জুতা ক্ষয় করতে হয় এ কথা কে না জানে! তাই না আমি সলিসিটর হওয়া ঠিক করেছি। তিন বছরে নিজের খরচ রোজগার হয় ত বলব খুব হয়েছে'—এ কথা সে বলিত।

মাসে মাসে খরচ বাড়িতেছিল। বাইরে ব্যারিস্টারের বিজ্ঞাপন আর ঘরে ব্যারিস্টারির জন্য তৈরি হওয়া! এই দুইয়ের মিল কোনমতেই আমি করিতে পারিতেছিলাম না। অশান্ত মন তাই পড়ায় ঠিক বসিত না। এভিডেন্স এ্যাক্ট পড়িতে কিছুটা ভাল লাগিত। মেইন-এর 'হিন্দু ল' মহা-আনন্দে পড়িয়াছিলাম। কিন্তু মকদ্দমা চালানোর ভরসা জন্মিল না। আমার দুঃখ কাকে বলি? আমার ছিল শ্বশুরবাড়ীতে নববধূর অবস্থা!

এই সময়ে মমীবাই-এর কেস হাতে আসে। স্মল-কজ-কোর্টের মামলা। 'দালালকে কমিশন দিতে হবে' কথার জবাবে সাফ 'না' বলিয়া দিলাম।

'কিন্তু মাসে তিন চার হাজার কামায় ফৌজদারি আদালতের প্রবীণ উকিল অমুকে পর্যন্ত কমিশন দেন।'

'তাঁর মত কি আমার হতে হবে? মাসে তিনশ টাকা হলেই আমার বেশ চলবে। বাবা কি এর বেশি পেতেন?'

'কিন্তু সেই দিন গেছে। বোম্বাই-এ খরচ বেশি। ব্যবসায়ের দিকটা ভুললে চলবে কেন?'

টলিলাম না। কমিশন দিলাম না। তবু মমীবাই-এর কেস পাইলাম। মকদ্দমা সহজ ছিল। ত্রিশ টাকা ফী পাইলাম। এক দিনই কেসটার পক্ষে যথেষ্ট ছিল।

ছোট আদালতে ওই আমার প্রথম প্রবেশ! আমি প্রতিবাদী পক্ষের উকিল ছিলাম। তাই আমার জেরা করার ছিল। দাঁড়াইলাম। কিন্তু পা কাঁপিতেছিল, মাথা ঘুরিতেছিল। মনে হইতেছিল কোর্টটাই চক্কর খাইতেছে। প্রশ্ন জুয়াইল না। জজ হাসিয়া থাকিবেন। উকিলেরা তামাশা দেখিয়া থাকিবে। কিন্তু এই সব দেখার মত অবস্থা আমার থাকিলে

ত! বসিয়া পড়িলাম। দালালকে বলিলাম, 'মামলা আমা দ্বারা হবে না। পেটেলকে দিন। ফী এই ফেরত নিন।

একান্ন টাকায় ওই দিনের মত পেটেলকে নিযুক্ত করা হইল। মামলাটা তাঁর পক্ষে ছেলেখেলা ছিল।

কোর্ট হইতে সরিয়া পড়িলাম। মক্কেলের জিঁত হইল কি হার হইল সে খবরও নিলাম না। লজ্জা হইল। ঠিক করিলাম পুরা ভরসা না হওয়া পর্যন্ত মামলা হাতে লইব না। বস্তুত দক্ষিণ আফ্রিকা যাওয়ার আগে কোর্টে আর যাই নাই। সমর্থের সংকল্প তা ছিল না। তা ছিল নাচারের ভালোমানুষী। কার দায় পড়িয়াছিল যে আমাকে কেস দিবে? তাই নিশ্চয় না করিলেও আমাকে কোর্টে যাওয়ার জন্য মাথার দিব্যি দেওয়ার কেউ ছিল না।

আর একটা কেস বোম্বাইতে আমি পাইয়াছিলাম। দাবির আরজি লেখা ছিল কাজ। পোরবন্দরের কোন গরীব মুসলমানের জমি বেদখল হইয়াছিল। যোগ্য পিতার যোগ্য ব্যারিস্টার পুত্রের কাছে যাইতেছি মনে করিয়া সে আমার কাছে আসিয়াছিল। আমার কাছে কেসটা কমজোর মনে হয়। তবুও আরজি লিখিয়া দিতে রাজী হই। ছাপার খরচ মক্কেলের। দাবির আরজি তৈয়ার করিলাম। বন্ধুদের পড়িয়া শুনাইলাম। তারা তা পাস করিল। আমার কতকটা বিশ্বাস জন্মিল যে দাবিনামা লেখার যোগ্যতা লাভ করিতে পারিব,—বস্তুত সেই যোগ্যতা আমার ছিলই।

বিনা পয়সায় আরজি লিখিলে কাজের অভাব হইত না। কিন্তু পেটে পড়িলে তবে পা চলে। তাই মনে হয় শিক্ষকতার কাজ করিলে হয়। ইংরেজী ভালই জানিতাম। কোন স্কুলে মেট্রিক্যুলেশন ক্লাসে ইংরেজী পড়াইবার কাজ মিলে ত বেশ হয়, খরচের কিছুটা অংশ ত তাতে মিটিবে! 'চাই ইংরেজীর শিক্ষক; দিনে এক ঘণ্টা। বেতন ৭৫ টাকা।'—কোন বিখ্যাত স্কুলের এই বিজ্ঞাপন কাগজে দেখিলাম। দরখাস্ত করিলাম। দেখা করার অনুরোধ আসিল। অনেক আশা করিয়া গেলাম। কিন্তু আচার্য যখন শুনিলেন আমি বি. এ. নই সখেদে আমায় বিদায় দিলেন।

'কিন্তু আমি লণ্ডনের মেট্রিক্যুলেশন পাস করেছি। লাটিন দ্বিতীয় ভাষা ছিল।'

'সে ত হল, কিন্তু আমাদের যে গ্রেজুয়েটই চাই।'

কি আর করা! হতাশায় হাত কামড়াইতে ইচ্ছা হইল। বড়দাও ভাবনায় পড়িলেন। দুইয়ে মিলিয়া ঠিক করিলাম বোম্বাই-এ আর থাকিয়া লাভ নাই। রাজকোটে বসাই ভাল। বড়দা সেখানকার একজন ছোটখাট উকিল। আরজি, দাবিনামা লেখার কাজ কিছু না কিছু নিশ্চয়ই দিতে পারিবেন। তা ছাড়া রাজকোটে ত সংসার ছিলই। তাই বোম্বাই-এর পাট তুলিয়া দিলে খরচ অনেকটা বাঁচিবে। প্রস্তাবটা ভাল মনে হইল। এইভাবে বোম্বাই-এ মাস ছয়েক থাকিবার পর সেখানকার খুদে পাট গুটাইলাম।

বোম্বাই-এ যখন ছিলাম প্রত্যহ হাইকোর্টে যাইতাম। কিন্তু সেখানে কিছু শিখিয়াছিলাম এ কথা বলিতে পারি না। শেখার জন্য যে জ্ঞান দরকার তা আমার ছিল না। অনেক সময় কেস বুঝিতাম না আর তাই রস পাইতাম না। ফলে ঝিমাইতাম। ঢোলার সাথীও মিলিত। তাই লজ্জার ভাবটা অনেকটা কাটিয়া গিয়াছিল। শেষাশেষি ধরিয়া লইয়াছিলাম যে হাইকোর্টে বসিয়া ঢোলাকে ফ্যাসান মনে করাতে বাধা নাই। তাই লজ্জারও কোন কারণ নাই।

আজও যদি বোম্বাই-তে আমার মত বেকার ব্যারিস্টার কেউ থাকে ত তার কাছে নিজ জীবনের এক ক্ষুদ্র অনুভব তুলিয়া ধরিতেছি। গিরগাঁও-এ থাকিতাম তবুও গাড়ী বা ট্রামে চড়িতাম না বলিলেই হয়। গিরগাঁও হইতে হাইকোর্টে হাঁটিয়া যাইতাম। পুরা ৪৫ মিনিট লাগিত। ফেরার সময় ত হাঁটিয়া ফিরিতামই; ভুলেও ইহার অন্যথা হইত না। হাইকোর্টে যাওয়ার বেলায় রোদ লাগিত। অভ্যাসে রোদ সহ্য হইয়া গিয়াছিল। এতে আমার অনেক পয়সা ত বাঁচিয়াছিলই, অধিকন্তু বন্ধুদের অনেকে অসুখে পড়িলেও বোম্বাইতে আমার মনে পড়ে না আমি কোনদিন কোন অসুখে ভুগিয়াছি। যখন আমি পয়সা রোজগার করিতাম তখনও আমি হাঁটিয়া আপিসে যাইতাম। এই অভ্যাস বরাবর ছিল। তার উত্তম ফল আজও আমি ভোগ করিতেছি।

প্রথম আঘাত

বোম্বাই ছাড়িলাম। রাজকোটে গেলাম। নিজের আপিস খুলিলাম। আরজি লেখার কাজ পাইতে লাগিলাম; মাসিক আয় মোটামুটি তিনশ'য় দাঁড়াইল। নিজের যোগ্যতার গুণে কাজ জুটিতেছিল তা নয়, জুটিতেছিল সহায়তা বলে।

বড়দার অংশীদারের পসার ভাল ছিল। তাঁর কাছে যে সকল দরখাস্ত মুসাবিদার কাজ আসিত সে সবের যেগুলি সত্যই গুরু ছিল বা তাঁর দৃষ্টিতে গুরু মনে হইত সেগুলি তিনি বড় ব্যারিস্টারদের কাছে পাঠাইতেন। আমার ভাগ্যে জুটিত তাঁর গরীব মক্কেলদের আরজি লেখার কাজ।

বোম্বাইতে কমিশন দিতাম না। সেই নিষ্ঠায় এখানে খাদ মিশিল। আমাকে বলা হয় যে দুই জায়গার অবস্থা এক নয়; বোম্বাইয়ে পয়সা দেওয়ার ছিল দালালকে, এখানে দেওয়ার কথা উকিলকে। আরও বলা হয় যে, বোম্বাইতে যেমন এখানেও তেমন সব ব্যারিস্টারদেরই (একজনও এই হিসাব হইতে বাদ পড়ে না) শতে অত টাকা কমিশন দিতে হয়। বড়দার এই যুক্তির কোন উত্তর আমার ছিল না: 'তুমি জান, এই উকিলের আমি ভাগীদার। আমাদের হাতে যেসব কেস আসে তার মধ্যে যেগুলি তোমাকে দেওয়া চলে সেগুলি তোমাকেই দেওয়ার আগ্রহ আমার আছে। কিন্তু আমার ভাগীদারের পাওনা কমিশন তুমি যদি না দাও ত আমার অবস্থাটা কিরূপ বিশ্রী দাঁড়ায়? আমরা একান্নবর্তী পরিবারের লোক অতএব তোমার ফী-র লাভ ত আমি পাইই। কিন্তু আমার ভাগীদার? ওসব কেস সে যদি অন্য কাউকে দেয় ত তার ফী-র অংশ সে পাবেই।' এই যুক্তির টোপ গিলিলাম আর মনে মনে বলিলাম, ব্যারিস্টারি যদি করিতেই হয় তবে এরূপ কেসে কমিশন না দেওয়ার জিদ করিলে চলিবে না। আঁটুনি ঢিলা হইল; মনকে সান্ত্বনা দিলাম বা সোজা কথায় মনকে ধোঁকা দিলাম। তবে এ কথাও বলা দরকার যে অন্য কোন কেসে কমিশন দিয়াছি বলিয়া আমার মনে পড়ে না।

পেটের ভাতের ব্যবস্থা ত কোনরকম হইল, কিন্তু ঠিক এই সময়েই জীবনের প্রথম আঘাত পাইলাম। ব্রিটিশ আমলাতন্ত্রের স্বরূপ যে কি তা কানে শুনিয়াছিলাম। তা চোখে দেখার পালা উপস্থিত হইল।

পোরবন্দরের আগের রাণাসাহেব তখনও গদিতে বসেন নাই। সেই সময়ে বড়দা তাঁর সেক্রেটারী ও পরামর্শদাতা ছিলেন। সেই প্রসঙ্গে তিনি রাণাসাহেবকে কুপরামর্শ দিয়াছিলেন এই বদনাম তাঁর দেওয়া হয়। এই নালিশ সেই সময়কার পলিটিকেল এজেন্টের কাছে যায় ও বড়দার ওপর তাঁর খারাপ ধারণা জন্মে। এই অফিসারের সঙ্গে বিলাতে আমার পরিচয় হইয়াছিল। বলা চলে আমার সঙ্গে তাঁর সখ্যতাও খানিকটা জন্মিয়াছিল। বড়দার মনে হয় এই পরিচয়ের সুযোগে তাঁর পক্ষে দুই একটি কথা বলিয়া

পলিটিকেল এজেণ্টের ভুল ধারণা দূর করার চেষ্টা করা আমার কর্তব্য। প্রস্তাবটা আমার মোটেই ভাল লাগিল না। আমার মনে হইল: বিলাতের এই সামান্য পরিচয়ের সুবিধা নেওয়া ঠিক হইবে না। বড়দা কোন দোষ করিয়া থাকেন ত সুপারিশে কি হইবে? আর কোন দোষ না করিয়া থাকেন ত নিয়মমাফিক আরজি করা অথবা নিজের নির্দোষিতার ওপর বিশ্বাস রাখিয়া নিশ্চিন্ত থাকা উচিত। এই যুক্তি বড়দার ভাল মনে হইল না। তিনি বলিলেন, 'কাঠিয়াওয়াড় তুমি চেন না, জগতের পরিচয় পেতে তোমার এখনও বাকী আছে। বিনা প্রভাবে এখানে কাজ হয় না। তুমি আমার ভাই। তোমার পরিচিত কোন অফিসারকে আমার হয়ে দুটি কথা বলতে তোমার আপত্তি করা উচিত নয়।'

বড়দাকে 'না' বলিতে পারিলাম না। অনিচ্ছায় গেলাম। অফিসারের কাছে যাওয়ার কোন অধিকার আমার ছিল না। গেলে আত্মসম্মান নষ্ট হইবে ইহাও জানিতাম। তবু তাঁর সঙ্গে দেখা করিতে চাহিলাম। সময় পাইলাম। গেলাম। পুরানো পরিচয়ের কথা উল্লেখ করিলাম। কিন্তু বুঝিতে দেরি হইল না যে বিলাত আর কাঠিয়াওয়াড় দুই পৃথক্ জায়গা; চেয়ারে-বসা আর ছুটিতে-যাওয়া অফিসার এক বস্তু নহে। পলিটিকেল এজেণ্ট পরিচয় স্বীকার করিলেন, কিন্তু তাতে যেন আরও বেশি আড় হইলেন। তাঁর ওই আড় ভাব দেখিলাম, তাঁর চোখের চাউনিতে পড়িলাম 'ও, সে পরিচয়ের সুবিধা তুমি নিতে এসেছ?' তবু নিজের কথা পাড়িলাম। সাহেব অধীর হইলেন। বলিলেন, 'তোমার ভাই কুচক্রী। তোমার কাছ থেকে অধিক কথা শুনতে চাই না। তার কিছু বলার থাকে ত সে নিয়মমাফিক আরজি করুক।' উত্তর স্পষ্ট ছিল আর সম্ভবত আমার মুখের মতই। কিন্তু গরজ বড় বালাই। আমার কথা আমি বলিতে থাকিলাম। সাহেব দাঁড়াইলেন ও বলিলেন, 'এবার পথ দেখুন।'

বলিলাম, 'আমার সবটা কথা ত শুনুন।' ইহাতে সাহেব চটিয়া আগুন হইলেন। চাপরাসীকে হাঁক দিলেন ও বলিলেন, 'একে বের করে দাও।' তখনও আমি ইতস্তত করিতেছিলাম। এর মধ্যে চাপরাসী আসিয়া কাঁধে হাত দিয়া আমাকে ঘরের বাহির করিয়া দিল।

সাহেব গেলেন। চাপরাসী গেল। আর আমি রাগে গরগর করিতে করিতে ফিরিলাম। এই মর্মে পত্র লিখিলাম: 'আপনি আমাকে অপমান

করেছেন। চাপরাসীর হাতে আমাকে মেরেছেন। ক্ষমা না চাইলে যথাবিধি আদালতে যাব।'

অল্প সময়ে সওয়ারের মারফত জবাব মিলিল: 'আপনি আমার সঙ্গে অসভ্য ব্যবহার করেছেন। আমি আপনাকে চলে যেতে বলি। কিন্তু আপনি যাননি। এ অবস্থায় আমি আর কি করতে পারতাম! চাপরাসীকে পথ দেখাতে বলি। সে আপনাকে আপিস থেকে যেতে বলে। তবুও আপনি যাননি। তাই আপনাকে বের করে দেওয়ার মত বলপ্রয়োগ তাকে করতে হয়েছে। আপনার যা করার করতে পারেন।'

এই জবাব পকেটে পুরিয়া মুখ নীচু করিয়া বাড়ী ফিরিলাম। বড়দাকে সব বলিলাম। তিনি ব্যথা পাইলেন। কিন্তু আমাকে কি সান্ত্বনা তাঁর দেওয়ার ছিল? উকিল বন্ধুদের সঙ্গে তিনি কথা বলেন। কারণ সাহেবের বিরুদ্ধে কি ভাবে মামলা দায়ের করা যায় তা আমি জানিতাম না। এই সময়ে কোন মকদ্দমা সম্পর্কে ফিরোজশা মেহতা রাজকোটে আসিয়াছিলেন। আমার মত নূতন ব্যারিস্টার তাঁর সঙ্গে দেখা করে কোন্ সাহসে? যে উকিল তাঁকে আনিয়াছিলেন তাঁর শরণ লইলাম; তাঁর মারফতে আমার কেস জানাইয়া তাঁর পরামর্শ ভিক্ষা করিলাম। উকিলের জবানীতে তিনি বলিয়া পাঠাইলেন, 'গান্ধীকে বলবেন, এরূপ অভিজ্ঞতা বহু উকিল ব্যারিস্টারের জীবনে সচরাচর ঘটে থাকে। বিলেত থেকে সবে ফিরেছে, রক্ত গরম। ব্রিটিশ অফিসার যে কি পদার্থ তা সে জানে না। সুখে সোয়াস্তিতে যদি থাকতে চায়, দুই পয়সা কামাতে চায়, তবে পত্রটা তাকে ছিঁড়ে ফেলতে ও অপমানটা গিলতে বলবেন। সাহেবের বিরুদ্ধে মামলা করে কোন লাভই হবে না, উল্টা হয়ত সর্বনাশ হবে। বলবেন, জীবনের পরিচয় তার হয়নি, পেতে হবে।'

এই উপদেশ বিষের মত লাগিয়াছিল। কিন্তু ওই বিষ না গিলিয়া উপায় ছিল না। অপমান ভুলিতে পারি নাই, কিন্তু তাতে আমার উপকারও হইয়াছিল। আর কোনদিন এমন অবস্থায় নিজকে ফেলিব না, কোনদিন পরিচয়ের সুযোগ লইতে যাইব না, এই প্রতিজ্ঞা করি। এই নিয়ম কোনদিন ভাঙ্গি নাই। এই ধাক্কাতে আমার জীবনের মোড় ঘুরিয়া যায়।

৫

দক্ষিণ আফ্রিকার প্রস্তুতি

অফিসারের কাছে যাওয়া ভুল হইয়াছিল সন্দেহ নাই। কিন্তু আমার তিলসমান দোষের কাছে তাঁর অধীরতা, ক্রোধ ও ঔদ্ধত্য ছিল তালসমান। গলাধাক্কা ওই দোষের সাজা হইতে পারে না। পাঁচ মিনিটও তাঁর ওখানে আমি বসি নাই। আমার কথাই তাঁর কাছে অসহ্য ছিল। ভদ্রভাবে তিনি আমাকে চলিয়া আসিতে বলিতে পারিতেন। কিন্তু ক্ষমতার নেশা তাঁর মাত্রাছাড়া ছিল। পরে জানিয়াছিলাম ধৈর্যের বালাই তাঁর ছিল না। তাঁর কাছে যারা যাইত তাদের অপমান করা ছিল তাঁর কাছে সাধারণ ব্যাপার। তাঁর মর্জির উল্টা বলিলেই তিনি তেলেবেগুনে জ্বলিয়া উঠিতেন।

তাঁর কোর্টেই আমার বেশির ভাগ কাজ ছিল। তোষামোদ করা আমার ধাতে ছিল না। এই অফিসারকে তুষ্ট করিতে আমি প্রস্তুত ছিলাম না। বস্তুত নালিশের হুমকি দিয়া কিছু না করিয়া চুপ করিয়া যাওয়া আমার বিশ্রী লাগিতেছিল।

ইতিমধ্যে কাঠিয়াওয়াড়ের কদর্য রাজনীতির কিছু কিছু পরিচয় পাইতেছিলাম। অনেক খুদে খুদে রাজ্যে বিভক্ত কাঠিয়াওয়াড় যত সব এজেণ্ট বা মুৎসুদ্দীদের খেলার ক্ষেত্র হইয়া উঠিয়াছিল। রাজ্যের বিরুদ্ধে রাজ্যের কু-চাল কু-ফন্দি, ক্ষমতার জন্য অফিসারদের একের বিরুদ্ধে অন্যের চক্রান্ত, কান-পাতলা পরবশ রাজা—এই ছিল ওখানকার ছবি। সাহেবের পেয়াদাও কেউ-কেটা ছিল; তার শরণ লোকের লইতে হইত। আর সাহেবের সেরেস্তাদার ত ছিল সাহেবের বাড়া, বাঁশের চাইতে কঞ্চি যেমন দড়, কেন না সে ছিল সাহেবের চোখ, সাহেবের কান ও সাহেবের দোভাষী। তার মর্জিই ছিল আইন। লোকে বলিত তার আয় সাহেবের আয়েরও অধিক। হয়ত বা কিছুটা বাড়াইয়া বলিত। তবে এ কথা ঠিক যে তার অল্প মাহিনার তুলনায় তার খরচ বেশি ছিল।

এই আবহাওয়ায় আমি একদম হাঁফাইয়া উঠিয়াছিলাম। ইহা হইতে কিরূপে রক্ষা পাওয়া যায় এই ছিল আমার সর্বক্ষণের ভাবনা।

একেবারে দমিয়া গিয়াছিলাম। বড়দা তা লক্ষ্য করেন। দুই জনেরই মনের ভাব কোথাও চাকরি পাইলে এই কুচক্র হইতে বাঁচা যাইত। কিন্তু

ফিকির-ফন্দি ছাড়া দেওয়ানি বা জজিয়তি পাওয়ার পথ ছিল কি? আর ওকালতির বাধা ছিল সাহেবের সঙ্গে আমার ঝগড়া।

পোরবন্দরে সে সময়ে প্রশাসকের অধীনে ছিল। রাণাসাহেবের জন্য কিছু ক্ষমতা আদায় করার আমার ছিল। মের জাতের লোকদের কাছ হইতে অন্যায্যভাবে অধিক খাজানা আদায় করা হইত। উহার প্রতিকারের জন্যও প্রশাসকের কাছে যাওয়ার ছিল। দেখিতে পাইলাম ভারতীয় হইলেও এই প্রশাসকের দাপট সাহেবের দাপট হইতে এক কাঠি বেশি ছিল। কর্মদক্ষতা তাঁর ছিল কিন্তু তাঁর কর্মদক্ষতার লাভ প্রজা পায় নাই ইহাও লক্ষ্য করিয়াছিলাম। রাণাসাহেব কিছু ক্ষমতা লাভ করেন। মের-দের কষ্ট দূর করার ব্যাপারে প্রায় কিছুই করা গেল না। আমার ধারণা হইয়াছিল, তাদের অভিযোগ ঠিকমত যাচাই করিয়াও দেখা হয় নাই।

অতএব এই ব্যাপারেও আমি কতকটা নিরাশ হইয়াছিলাম। আমার মনে হইয়াছিল, আমার মক্কেলের প্রতি সুবিচার করা হয় নাই। সুবিচার আদায় করারও কোন উপায় ছিল না। বড়জোর পলিটিকেল এজেন্ট বা গবর্নর-এর কাছে আপীল করিতে পারিতাম। উহার জবাব মিলিত: 'এতে আমার হাত নেই।' রায় আইনের ধার ধারিলে না চেষ্টা করা যাইত। ওখানে সাহেবের মর্জিই ছিল আইন। অতিষ্ঠ হইয়া উঠিলাম।

ইহার মধ্যে পোরবন্দরের এক শেঠের নিকট হইতে বড়দা আমার কাজের এক প্রস্তাব পাইলেন: 'আমাদের ব্যবসা দক্ষিণ আফ্রিকায়। আমাদের গদি বেশ বড়। অনেকদিন ধরে চল্লিশ হাজার পাউণ্ড দাবির বড় একটা কেস আমাদের চলছে। সেরা সেরা উকিল ব্যারিস্টার আমাদের পক্ষে কেস চালাচ্ছেন। আপনার ভাইকে সেখানে পাঠালে আমাদের সাহায্য করতে পারবেন আর তাঁরও সুবিধা হবে। আমাদের অপেক্ষা আমাদের কেস আমাদের কৌসুঁলিদের তিনি ভাল বোঝাতে পারবেন। তা ছাড়া দেশ দেখতে পাবেন আর নতুন মানুষের সঙ্গেও পরিচয় হবে।'

দাদা প্রস্তাবের কথা আমাকে বলিলেন। প্রস্তাবের অর্থ ঠিক ঠিক ধরিতে পারিলাম না। উকিলদের কেসই মাত্র বুঝাইতে হইবে কি তা বাদে কোর্টেও যাইতে হইবে? কিন্তু লোভ হইল।

দাদা অবদুল্লা এণ্ড কো-র দক্ষিণ আফ্রিকার ওই ফার্ম-এর অংশীদার স্ব শেঠ অবদুল করীম ঝবেরীর সঙ্গে বড়দা আমার পরিচয় করিয়া দিলেন।

আশ্বাস দিয়া শেঠ আমায় বলেন, 'কাজ শক্ত নয়। বড় বড় সাহেবদের সঙ্গে আমাদের বন্ধুত্ব রয়েছে। তাঁদের সঙ্গে আপনার পরিচয় হবে। গদির কাজেও সহায়তা করতে পারবেন। বেশির ভাগ পত্র ইংরেজীতে লিখতে হয়। সে দিকেও আপনি সহায়তা করতে পারবেন। আপনি আমাদের বাড়ীতেই থাকবেন। সব খরচ আমরাই বইব।'

'কত দিন আমার থাকতে হবে? আর আমায় কি দেবেন?' জিজ্ঞাসা করিলাম।

'এক বছরের বেশি নয়। প্রথম শ্রেণীতে যাতায়াতের ভাড়া দেব। আর থাকা খাওয়ার খরচ বাদে ১০৫ পাউণ্ড।'

ইহাকে ওকালতি বলা চলে না। ছিল তা ফার্মের চাকরি। কিন্তু আমি চাহিতেছিলাম যে-কোন ভাবে ভারতবর্ষ হইতে বাইরে যাইতে। নূতন দেশ দেখার ও নূতন অভিজ্ঞতা লাভের লোভও ছিল। বড়দাকে ১০৫ পাউণ্ড পাঠাইতে পারিব ও তাতে সংসারখরচের সহায়তা হইবে এই ভাবও ছিল। তাই বেতন সম্বন্ধে কথা কাটাকাটি না করিয়া শেঠ অবদুল করীমের প্রস্তাবে রাজী হইলাম ও দক্ষিণ আফ্রিকা যাওয়ার জন্য তৈরি হইলাম।

৬

নাতালে পৌঁছিলাম

বিলাত যাওয়ার সময় যতটা বিয়োগ-বেদনা অনুভব করিয়াছিলাম দক্ষিণ আফ্রিকা যাওয়ার বেলায় ততটা অনুভব করি নাই। মা ত চলিয়াই গিয়াছিলেন। দুনিয়ার ও বিদেশ যাত্রার অভিজ্ঞতা কতকটা হইয়াছিল। আর রাজকোট ও বোম্বাই-এর মধ্যে আনাগোনা ত হামেশা চলিতই।

এবার কেবল পত্নীর সহিত ছাড়াছাড়ির বেদনাটাই বাজিয়াছিল। বিলাত হইতে আসার পরে আর এক পুত্র হয়। তখনও বিষয়ভোগ আমাদের ভালবাসার সহিত জড়িত ছিল। তবে দিন দিন ভালবাসা নির্মল হইতেছিল। বিলাত হইতে ফিরিবার পরে খুব কম দিন আমরা একত্র ছিলাম ও তেমন যোগ্যতা না থাকিলেও পত্নীর শিক্ষক হইয়াছিলাম। এই কারণে এবং সর্বোপরি আমার সাহায্যে সে নিজের যে পরিমাণ সংস্কার করিয়াছিল তাকে আরও সমৃদ্ধ করার জন্য আরও বেশি একত্র থাকার আবশ্যকতা আমরা

উভয়ে অনুভব করিতেছিলাম। কিন্তু আফ্রিকা আমায় টানিতেছিল। তাই বিয়োগ-বেদনা অসহ্য হয় নাই। 'একটা বছর বই ত নয়, তার পরই ত আমরা মিলছি' এই সান্ত্বনা দিয়া রাজকোট ছাড়িলাম ও বোম্বাই পৌঁছিলাম।

দাদা অবদুল্লা এণ্ড কো-র বোম্বাই এজেন্টের মারফত আমার টিকেট পাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু স্টীমারে কোন কেবিন খালি ছিল না। ওই জাহাজ ছাড়িয়া দিলে এক মাস বোম্বাইতে খামকা বসিয়া থাকিত হইত। এজেন্ট বলেন, 'অনেক চেষ্টা করেও ফার্স্ট ক্লাসের টিকেট পাইনি। ডেকে আপত্তি না থাকে ত যেতে পারেন। খাওয়ার ব্যবস্থা সেলুনে করা যাবে।' তখন আমি প্রথম শ্রেণীতে যাতায়াত করিতাম। ব্যারিস্টার ডেকে যাইবে তাও কি হয়? ডেকে যাইতে অস্বীকার করিলাম। এজেন্টের ওপর সন্দেহ হইল। ফার্স্ট ক্লাসের টিকেট পাওয়া যায় নাই ইহা বিশ্বাস করিতে পারি নাই! এজেন্টের অনুমতি লইয়া নিজে টিকেটের চেষ্টায় বাহির হইলাম। স্টীমারে গেলাম। চীফ অফিসারের সঙ্গে দেখা করিলাম। তিনি সরলমনে বলিলেন, 'আমাদের জাহাজে সচরাচর এমন ভিড় হয় না। মোজাম্বিকের গবর্নর-জেনারেল এই জাহাজে যাচ্ছেন তাই সব বার্থ পুরো হয়ে গেছে।'

'কোনমতে কোথাও একটু জায়গা মিলবে না?'

পা হইতে মাথা পর্যন্ত দেখিয়া হাসিয়া তিনি বলিলেন, 'একটা উপায় হতে পারে। আমার কেবিনে একটা ফালতো বার্থ আছে। সাধারণত তাতে আমরা যাত্রী নিই না। তবে আপনাকে সে জায়গা দিতে পারি।' রাজী হইলাম। তাঁকে ধন্যবাদ জানাইলাম। এজেন্টকে টিকেট কাটিতে বলিলাম। ১৮৯৩ সনের এপ্রেল মাসে উৎসাহভরে দক্ষিণ আফ্রিকায় ভাগ্য পরীক্ষা করিতে রওনা হইলাম।

প্রায় তের দিনে প্রথম বন্দর লামুতে জাহাজ ধরিল। ইতিমধ্যে কাপ্তানের সহিত বেশ বন্ধুত্ব জন্মিয়াছিল। তাঁর দাবা খেলার শখ ছিল। সবে তিনি খেলিতে শিখিয়াছিলেন। নিজের অপেক্ষা আনাড়ী খেলুড়ের দরকার তাঁর ছিল। তাই আমাকে খেলিতে ডাকেন। এই খেলার সম্বন্ধে খুব শুনিয়াছিলাম কিন্তু কোনদিন নিজে খেলি নাই। এই খেলায় খুব বুদ্ধি খাটাইতে হয় খেলুড়েদের এই কথা বলিতে শুনিয়াছিলাম। কাপ্তান বলেন তিনি আমাকে খেলা শিখাইবেন। আমি তাঁর ভাল শিষ্য ছিলাম, কারণ আমার

ধৈর্যের অভাব ছিল না। কেবলই হারিতাম। শেখানোর উৎসাহ কাপ্তানের তাতে আরও বাড়িত। দাবা খেলাটা ভাল লাগিয়াছিল। কিন্তু জাহাজেই হাতেখড়ি হইয়াছিল আর জাহাজেই তার সমাপ্তি। রাজা-রাণীর চাল শিখিয়াছিলাম বস্ ওই পর্যন্ত।

জাহাজ লামু বন্দরে ভিড়িল। জাহাজ তিন চার ঘণ্টা সেখানে থাকার কথা। বন্দর দেখার জন্য নীচে নামিলাম। কাপ্তানও ডাঙ্গায় গিয়াছিলেন। তিনি আমায় বলেন, 'বন্দরে বড় জোয়ার ভাঁটা খেলে। আগেভাগে জাহাজে ফিরবেন।'

স্থানটা নেহাতই ছোট। পোস্টাপিসে গেলাম। ভারতীয় কেরানী দেখিলাম। মন খুশী হইল। তাদের সঙ্গে কথা বলিলাম। কাফ্রীদের দেখিলাম। তাদের চালচলন ভাল লাগে। পরিচয় লওয়ার চেষ্টা করি। এতে খানিকটা সময় ব্যয় হয়।

কিছু ডেকযাত্রী নিরিবিলি রান্নাবান্না করিয়া খাওয়ার জন্য ডাঙায় নামিয়াছিল। তাদের সঙ্গে জাহাজেই আমার পরিচয় হইয়াছিল। দেখিলাম জাহাজে যাওয়ার জন্য তারা নৌকায় উঠিতেছে। তাদের নৌকায় উঠিলাম। বন্দরে জোয়ারের টান খুব জোর ছিল। আমাদের নৌকাটা ছিল বেশি বোঝাই। জলের তোড় এত অধিক ছিল যে আমাদের নৌকার দড়ি সিঁড়িতে বাঁধা যাইতেছিল না, নৌকা গিয়া সিঁড়িতে ঠেকিতেছিল আর সটকিয়া আসিতেছিল। জাহাজ ছাড়ার প্রথম ভোঁ পড়িল। আমি ঘাবড়াইলাম। ওপর হইতে কাপ্তান আমাদের অবস্থা দেখিতেছিলেন। জাহাজ পাঁচ মিনিট রুখিলেন। স্টীমারের কাছে একটা জেলে নৌকা ছিল। আমার জন্য এক বন্ধু দশ টাকায় তা ভাড়া করেন, বোঝাই নৌকা হইতে ওই নৌকা আমায় তুলিয়া লয়। ইতিমধ্যে সিঁড়ি তুলিয়া ফেলা হইয়াছিল। দড়ির সাহায্যে আমাকে জাহাজে তুলিয়া লয়। জাহাজ ছাড়িয়া দেয়। অন্য যাত্রীরা পড়িয়া থাকে। তখন বুঝিলাম কেন যে হাতে সময় রাখিয়া কাপ্তান জাহাজে ফিরিতে বলিয়াছিলেন।

লামু হইতে জাহাজ মোম্বাসা হইয়া জাঞ্জীবারে পৌঁছায়। জাঞ্জীবারে জাহাজ দিন কয়েক—আট দশ দিন ছিল। ওখানে আমরা জাহাজ বদলাই।

কাপ্তান আমাকে যারপরনাই ভালবাসিতেন। কিন্তু আমার পক্ষে ভালবাসা উল্টা রূপ নেয়। তিনি আমাকে তাঁর সঙ্গে বেড়াইতে যাইতে

বলেন। এক ইংরেজ বন্ধুকেও বলেন। কাপ্তানের ডিঙ্গিতে আমরা পারে যাই। বেড়ানোর অর্থ যে কি তা আমি তখন মোটেই বুঝিতে পারি নাই। কাপ্তান কি করিয়া জানিবেন এই দিকে আমি কতবড় আনাড়ী। এক দালাল আমাদের নিগ্রো মেয়েদের পাড়ায় লইয়া যায় ও প্রত্যেককে এক একটা ঘর দেখাইয়া দেয়। লজ্জায় বোবা হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিলাম। বেচারী মেয়েটি আমার সম্বন্ধে কি ভাবিয়াছিল তা কেবল সেই বলিতে পারিত। কাপ্তান ডাকিলেন। যেমন ঘরে গিয়াছিলাম তেমন বাহির হইয়া আসিলাম। আমি যে অপাপ তা কাপ্তান বুঝিতে পান। প্রথমে অত্যন্ত লজ্জা বোধ হইতেছিল। কিন্তু যখন মনে হইল যে ব্যাপারটাকে ঘৃণা ছাড়া অন্য কোন দৃষ্টিতে দেখি নাই তখন আস্তে আস্তে লজ্জা দূর হইয়া যায় এবং ওই বোনকে দেখিয়া মনে যে কোনই বিকার জন্মে নাই তাতে ঈশ্বরের কৃপা দেখিতে পাই। ঘরে ঢুকিব না বলার মত সাহস হয় নাই বলিয়া নিজের দুর্বলতাকে ধিক্কার দিই।

এইটা ছিল আমার জীবনে এই ধরনের তৃতীয় পরীক্ষা। মিথ্যা লজ্জার দরুন কত না নিষ্পাপ যুবক পাপে ডুবিয়া থাকিবে। নিজের পুরুষার্থের বলে বাঁচিয়াছিলাম তা নয়। সেই ঘরে যদি না ঢুকিতাম তবে পুরুষার্থের দোহাই দেওয়া চলিত। ঈশ্বর কৃপা করিয়াছিলেন তাই বাঁচিয়াছিলাম এ কথা আমার বলিতেই হইবে। এই ঘটনায় আমার ঈশ্বরবিশ্বাস দৃঢ় হয় এবং মিথ্যা লজ্জা দূর করার কিছুটা শিক্ষা আমি লাভ করি।

এই বন্দরে এক সপ্তাহ থাকিতে হয় বলিয়া ঘরভাড়া করিয়া শহরে ছিলাম। ঘুরিয়া ঘুরিয়া আশপাশ খুব ভাল করিয়া দেখিয়াছিলাম। জাঞ্জীবারের শ্যামল শোভা যে কী মালাবারের সবুজ শোভা যারা দেখিয়াছে তারাই মাত্র তার ধারণা করিতে পারিবে। ওখানকার বিশাল গাছ ও ফল ইত্যাদির বৃহৎ আকার দেখিয়া আমি অবাক্ হইয়াছিলাম।

জাঞ্জীবার হইতে মোজাম্বিকে ও সেখান হইতে মে মাসের শেষ দিকে নাতালে পৌঁছি।

৭

অভিজ্ঞতার নমুনা

নাতালের বন্দরের নাম ডারবন, অপর নাম পোর্ট নাতাল। আমাকে নেওয়ার জন্য অবদুল্লা শেঠ আসিয়াছিলেন। স্টীমার ডকে ভিড়িলে নাতালের লোকেরা তাদের বন্ধুদের নেওয়ার জন্য স্টীমারে যখন আসে তখনই বুঝিতে পাই যে ভারতীয়দের সেখানে বড় একটা মান-মর্যাদা নাই। দেখিতে পাই অবদুল্লা শেঠের সহিত তাঁর জানাশোনা লোকেরা কেমন যেন নাক-সিঁটকানো ব্যবহার করিতেছিল; জিনিসটা আমার খুব লাগে। এইরূপ উপেক্ষা অবদুল্লা শেঠের গা-সহা হইয়া গিয়াছিল। আমাকে যারা দেখিতেছিল তাদের দৃষ্টিতে কুতূহলের ভাব লক্ষ্য করিয়াছিলাম। পোশাকের দরুন অন্য ভারতীয়দের মত ঠিক আমি দেখাইতেছিলাম না। তখন আমি 'ফ্রক-কোট' ও বাঙ্গালী ধরনের পাগড়ি পরিতাম।

অবদুল্লা শেঠ আমাকে তাঁদের বাসস্থানে লইয়া গেলেন। তাঁর ঘরের পাশের ঘরে আমার থাকার ব্যবস্থা হইল। না বুঝিতে পারিতেছিলাম আমি তাঁকে আর না বুঝিতে পারিতেছিলেন তিনি আমাকে। তাঁর ভাই আমার সঙ্গে যে পত্র দিয়াছিলেন তা পড়িয়া তিনি আরও বেশি ঘাবড়াইয়া গেলেন। তাঁর মনে হইল দাদা কোথা হইতে এই শ্বেতহস্তী পাঠাইলেন। আমার সাহেবি পোশাক ও চালচলন দেখিয়া তাঁর মনে হয় একে পোষা সাহেব পোষার মতই খরচান্ত ব্যাপার হইবে। আমাকে দেওয়ার মত বিশেষ কোন কাজও তখন ছিল না। তাঁদের কেস ট্রান্সভালে চলিতেছিল। তখনই আমাকে সেখানে পাঠানোর কোন প্রয়োজন ছিল না। তা ছাড়া, আমার যোগ্যতার ও সততার ওপর কতটা নির্ভর করা যায় এই প্রশ্নও ছিল। প্রিটোরিয়ায় ত তিনি আমার সঙ্গে থাকিবেন না। প্রতিবাদীরা প্রিটোরিয়ায়ই থাকেন। কে বলিবে তাঁরা আমার ওপর অনুচিত প্রভাব বিস্তার করিবেন কিনা। আমাকে যদি কেসের কাজ না দেওয়া হয় তবে কি কাজ দেওয়া যায়? অন্য কাজ কেরানীরা আমা অপেক্ষা ভাল করিবে। আর ভুল করিলে তাদের দোষী করা যাইবে। আমি যদি ভুল করি ত? হয় কেসের কাজ, নয় কেরানীর কাজ এ বাদে আর কোন কাজ ছিল না। তাই কেসের কাজে না লাগাইলে আমাকে বিনা কাজে পুষিতে হয়।

অবতুল্লা শেঠের পুঁথি-বিদ্যা খুবই কম ছিল কিন্তু অনুভবজ্ঞান বিস্তর ছিল। তাঁর বুদ্ধি তীক্ষ্ণ ছিল আর সে কথা তিনি নিজেও জানিতেন। চর্চার ফলে কথাবার্তা বলার মত ইংরেজীর জ্ঞান তিনি আহরণ করিয়া লইয়াছিলেন, কিন্তু তাহা দ্বারাই তিনি নিজের সব কাজ—ব্যাঙ্কের ম্যানেজারের সহিত কথাবার্তা ও ইউরোপীয় ব্যবসায়ীদের সহিত সওদা করা হইতে উকিল, ব্যারিস্টারদের নিজের মামলা বোঝানো পর্যন্ত—চালাইতেন। ভারতীয় সওদাগরির মধ্যে অবতুল্লা এণ্ড কো-র সওদাগরি সবসেরা না হইলেও সেরা সবার মধ্যে একটি ছিল। এই সব গুণের মধ্যে একটা দোষও তাঁর ছিল—লোককে সন্দেহের চোখে দেখিতেন।

তাঁর ইসলামের গর্ব ছিল। ইসলামী তত্ত্বজ্ঞানের আলোচনায় আগ্রহ ছিল। আরবী জানিতেন না। তা হইলেও কোরান ও ইসলামী ধর্মগ্রন্থের জ্ঞান ভালই ছিল। কথায় কথায় দৃষ্টান্ত দিতেন। তাঁর সঙ্গে থাকার ফলে ইসলামের ভাল ব্যবহারিক জ্ঞান আমার হইয়াছিল। পরিচয় ঘনিষ্ঠ হওয়ার পরে আমার সঙ্গে তিনি ধর্মের চর্চা খুব করিতেন।

দ্বিতীয় কি তৃতীয় দিনে তিনি আমাকে ডারবনের কোর্টে লইয়া যান। সেখানে কিছু লোকের সহিত পরিচয় করিয়া দেন। কোর্টে তাঁদের এটর্নির পাশে বসাইয়া দেন। ম্যাজিস্ট্রেট বারবার আমার দিকে তাকাইতেছিলেন। অবশেষে আমাকে তিনি আমার মাথার পাগড়ি খুলিয়া ফেলিতে বলেন। আদেশ মানিতে পারিলাম না। আদালত হইতে বাহির হইয়া আসিলাম।

তাই এখানেও আমার কপালে লড়াই ছিল।

কতক ভারতীয়ের কেন যে পাগড়ি খুলিতে হয় সে কথা অবতুল্লা শেঠ আমায় বলেন। মুসলমানী পোশাক যারা পরে তারা পাগড়ি রাখিতে পারে। অন্য ভারতীয়দের কোর্টে প্রবেশ করার পরে পাগড়ি খুলিতে হয়।

কিছুটা বিবরণ না দিলে এই ব্যবহারভেদের কথা বোঝা যাইবে না। দুই-তিন দিন মধ্যেই বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে আফ্রিকাবাসী ভারতীয়েরা নিজের নিজের গোষ্ঠী সৃষ্টি করিয়া লইয়াছে। তার এক গোষ্ঠী ছিল মুসলমান ব্যবসায়ীদের; তারা নিজেদের 'আরব' বলিয়া পরিচয় দিত। আর এক গোষ্ঠী ছিল হিন্দু কেরানীদের। পারসী কেরানীদের পৃথক্ গোষ্ঠী ছিল। হিন্দু কেরানীরা না ছিল ঘরের না ছিল ঘাটের যদি-না তারা নিজেদের পরিচয় 'আরব' বলিয়া দিত। পারসীরা নিজেদের পারস্যের লোক বলিয়া

পরিচয় দিত। বিষয় ব্যাপারের বাইরেও এই তিন গোষ্ঠীর মধ্যে কতকটা সামাজিক মেলামেশা ছিল। আর চতুর্থ বা সর্বাপেক্ষা বড় গোষ্ঠী ছিল তামিল, তেলেগু ও উত্তরের গিরমিটিয়া বা গিরমিট-মুক্ত ভারতীয়দের। পাঁচ বছর মজুরি করার একরারনামায় রাজী হইয়া যে সব গরীব ভারতীয় নাতালে যাইত তাদের চুক্তিনামাকে 'গিরমিট' বলা হইত। 'গিরমিট' ইংরেজী 'এগ্রিমেণ্ট' শব্দের অপভ্রংশ আর তা হইতে গিরমিটিয়া শব্দ সৃষ্টি হইয়াছিল। এই শ্রেণীর সহিত অন্য সকলের কেবল কাজের সম্পর্ক ছিল। ইংরেজেরা গিরমিটিয়াদের 'কুলি' বলিত আর তারাই সংখ্যায় বেশি ছিল বলিয়া অন্য ভারতীয়দেরও তারা 'কুলি' বলিত। 'কুলি'র বদলে 'সামী'ও বলিত। 'সামী' এক তামিল প্রত্যয়; অনেক তামিল নামের শেষে এই প্রত্যয় যুক্ত হয়। সামী মানে স্বামী বা প্রভু। তাই সামী বলিয়া ডাকিলে কোন ভারতীয় যদি চটিত আর তার হিম্মতে কুলাইত ত অপমানের শোধ তুলিয়া সে সাহেবকে বলিত, 'সামী ত বললে, কিন্তু সামীর অর্থ যে প্রভু তা জান কি? আমি কি তোমার প্রভু?' ইহা শুনিয়া কোন কোন ইংরেজ লজ্জা পাইত, অন্য কেউ বা রাগিয়া গিয়া আরও গালি দিত ও সুযোগ পাইলে মারিত, কারণ সামী কথাটা সে তাচ্ছিল্যে ব্যবহার করিত। উহার অর্থ স্বামী বা প্রভু করা তাকে অপমান করা।

তাই আমি 'কুলি ব্যারিস্টার' উপাধি পাইলাম। ব্যাপারীদের বলা হইত 'কুলি ব্যাপারী'। কুলির মূল অর্থ চাপা পড়িয়া যায় আর ভারতীয়মাত্র কুলি খেতাব পায়। মুসলমান ব্যবসায়ী রাগ করিয়া বলিত, 'আমি কুলি নই, আমি আরব'; অথবা বলিত 'আমি ব্যবসায়ী।' নম্র স্বভাবের কোন কোন ইংরেজ এ কথা শুনিয়া ক্ষমাও চাহিত।

এই অবস্থায় পাগড়ি পরার কথাটা বড় হইয়া দাঁড়ায়। পাগড়ি খোলার অর্থ অপমান গেলা। মনে হইল, হিন্দুস্থানী পাগড়ি ছাড়িয়া ইংরেজের টুপি ধরিলে ত হয়; তাতে অপমান ও ঝগড়া-বিবাদ দুই হইতেই বাঁচা যায়।

অবদুল্লা শেঠ এই প্রস্তাবে সায় দিলেন না। তিনি বলিলেন, 'এখন আপনি এমনটা রদবদল করেন ত তার ফল খুব মন্দ হবে। অন্য যারা দেশের পাগড়ি পরতে চায় তাদের মুশকিল হবে। তা ছাড়া, দেশী পাগড়িই আপনাকে মানায়। ইংরেজের টুপি পরলে লোকে আপনাকে খানসামা (waiter) মনে করবে।'

এই উক্তিতে ব্যবহারিক জ্ঞান ও দেশাভিমান ছিল আর তার সঙ্গে কিছুটা সংকীর্ণতাও। ব্যবহারিক জ্ঞান ত স্পষ্টই ছিল। দেশাভিমান না থাকিলে পাগড়ির আগ্রহ করিতেন না। আর সংকীর্ণতা বিনা খানসামার তুলনা দিতেন না। ভারতীয় গিরমিটিয়াদের মধ্যে হিন্দু, মুসলমান ও খ্রীস্টান তিনই ছিল। খ্রীস্টানেরা ভারতীয় গিরমিটিয়া খ্রীস্টানদের বংশধর ছিল। ১৮৯৩ সনেও ইহারা সংখ্যায় বেশি ছিল। সকলেই তারা সাহেবী পোশাক পরিত। তাদের বেশির ভাগ লোকে হোটেলে খানসামার কাজ করিত। ইহাদের লক্ষ্য করিয়াই অবদুল্লা শেঠ বিলাতি টুপি সম্বন্ধে বিরূপ মন্তব্য করিয়াছিলেন। হোটেলের খানসামার কাজকে লোকে ছোট মনে করিত। আজও অনেকে তাহাই মনে করে।

অবদুল্লা শেঠের কথা মোটামুটি আমার ভাল লাগে। পাগড়ির ঘটনা সম্বন্ধে খবরের কাগজে আমি এক পত্র লিখি ও তাতে বলি যে কোর্টে পাগড়ি পরার অধিকার আমার আছে। খবরের কাগজে আমার পাগড়ির খুব আলোচনা হয়—'অনভিপ্রেত আগন্তুক' সংজ্ঞা পাই। এইরূপে দক্ষিণ আফ্রিকায় যাওয়ার দিনকয়েক মধ্যেই যা কল্পনাও করা যায় নাই তা ঘটে, আমার নাম ছড়াইয়া পড়ে। কিছু লোক আমার পক্ষে বলে ত কিছু লোকে ঘোর বিরোধ করে।

দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রায় শেষ দিন পর্যন্ত পাগড়ি আমার ছিল। দক্ষিণ আফ্রিকায় কখন ও কেন যে খালি মাথায় থাকার সংকল্প করি তা পরে বলিব।

প্রিটোরিয়ার পথে

দিন কয়েকের মধ্যে ডারবনের ভারতীয় খ্রীস্টানদের সঙ্গে পরিচয় হয়। ডারবন কোর্টের দোভাষী মি. পলের সহিত পরিচয় করি। তিনি রোমন ক্যাথলিক ছিলেন। প্রোটেস্টান্ট মিশনের শিক্ষক মি. জেমস গডফ্রে (ইনি দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয় প্রতিনিধি মণ্ডলের সদস্যরূপে ১৯২৪ সনে ভারতে আসিয়াছিলেন)-র পিতা স্ব. সুভান গডফ্রের সহিতও পরিচয় করি। আর সেই সময়েই স্ব. পারসী রুস্তমজী ও স্ব. আদমজী মিঞাখানের সহিত পরিচয়

হয়। এই সব বন্ধুরা বিনা কাজে একে অন্যের সঙ্গে মেলামেশা করিতেন না। এঁরা শেষে কিভাবে পরস্পরের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসিয়াছিলেন সে কথা পরে বলিব।

এইভাবে আমার পরিচয়ের গণ্ডি বাড়িতেছিল। এমন সময় গদির উকিল লিখেন যে কেসের জন্য এবার তৈরি হওয়া আবশ্যক আর তাই অবদুল্লা শেঠের বা তাঁর কোন প্রতিনিধির প্রিটোরিয়ায় যাওয়া দরকার।

অবদুল্লা শেঠ পত্রটা আমাকে দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন আমি যাইতে পারি কিনা। জবাবে বলিলাম, 'কেসটা বুঝলে তবে এ কথার জবাব দিতে পারি। এখন ত কিছুই জানি না সেখানে আমার কি করতে হবে।' অবদুল্লা শেঠ তাঁর কেরানীদের আমাকে কেস বুঝাইতে বলিলেন।

কেসটা বুঝিতে গিয়া দেখিতে পাইলাম যে অ-আ-ক-খ হইতে আমার শুরু করিতে হইবে। যে কয়দিন জাঞ্জীবরে ছিলাম, কোর্টের কাজ দেখিবার জন্য প্রতিদিন কোর্টে যাইতাম। সেখানে এক পারসী উকিলকে কোন সাক্ষীকে জমা-খরচ সম্বন্ধে জেরা করিতে দেখিয়াছিলাম। তার কিছুই আমার মাথায় ঢুকিতেছিল না। হিসাব কিভাবে রাখিতে হয় তা না শিখিয়াছিলাম স্কুলে না শিখিয়াছিলাম বিলাতে। আর যে কেস সম্পর্কে দক্ষিণ আফ্রিকায় গিয়াছিলাম তার গোড়ার কথাই ছিল হিসাব। হিসাবের জ্ঞান ছাড়া কেস বোঝার বা বোঝানোর উপায় ছিল না। কেরানী কথায় কথায় অমুক জমা আর অমুক খরচের কথা বলিতেছিল আর আমি হাবুডুবু খাইতেছিলাম। পী. নোট যে কি জানিতাম না। অভিধানে এই শব্দ পাইলাম না। কেরানীকে জিজ্ঞাসা করিলাম পী. নোট কাকে বলে। সে বলিয়া দেয় পী. নোট মানে প্রমিসরি নোট। জমা-খরচের বই কিনিলাম ও পড়িলাম। কিছুটা আত্মবিশ্বাস জন্মিলে। কেস ধরিতে পারিলাম। দেখিতে পাইলাম যে হিসাব কিভাবে রাখিতে হয় তা না জানিলেও অবদুল্লা শেঠের ব্যবহারিক জ্ঞান এত ছিল যে হিসাবের জটিল প্রশ্নও ঝট্ করিয়া তিনি সোজা করিয়া দিতে পারিতেন। তাঁকে বলিলাম প্রিটোরিয়া যেতে আমি তৈরি।

শেঠ জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কোথা উঠবেন?'

বলিলাম, 'যেখানে বলবেন।'

'ভাল, আমাদের উকিলকে লিখব। তিনি আপনার থাকার ব্যবস্থা

করবেন। প্রিটোরিয়াতে আমাদের মেমন বন্ধুদেরও অবশ্য লিখব। তবে তাঁদের ওখানে না ওঠাই ভাল হবে। আমাদের বিরোধী পক্ষের প্রভাব-প্রতিপত্তি সেখানে খুব। আপনার নামে পাঠানো আমাদের গোপন কাগজ-পত্র তাঁদের হাতে পড়ে ত আমাদের কেসের ক্ষতি হবে। তাঁদের থেকে যতটা দূরে থাকা যায় ততই ভাল।'

আমি বলিলাম, 'আপনাদের উকিল যেখানে রাখবেন সেখানেই থাকব। অথবা নিজের পছন্দমত কোন পৃথক্ ঘর খুঁজে নেব। নিশ্চিন্ত থাকুন, আপনাদের গোপন কোন কিছু কেউ ঘুণাক্ষরেও জানতে পারবে না। কিন্তু সকলের সঙ্গেই আমি মেলামেশা করব। বিপক্ষের সঙ্গেও আমায় বন্ধুত্ব করতে হবে। পারি ত এই ঘরোয়া বিবাদের ঘরোয়া মিটমাটের চেষ্টা আমি করব। শত হলেও তৈয়ব শেঠ ত আপনাদের আত্মীয়ই।'

প্রতিপক্ষ স্ব. তৈয়ব হাজী খান মহম্মদ অবদুল্লা শেঠের নিকট আত্মীয় ছিলেন।

দেখিলাম আমার এই কথায় অবদুল্লা শেঠ যেন একটু চমকিয়া উঠিলেন। কিন্তু এই কথা হইয়াছিল আমার ডারবনে যাওয়ার ছয়-সাত দিন পরে। এই সময় মধ্যে আমরা একে অন্যকে বুঝিতে পারিয়াছিলাম। শেঠ তখন আর আমাকে শ্বেতহস্তী মনে করিতেন না!

'হাঁ···তা বই···তা বই কি, যদি আপসে মিটে ত তা থেকে ভাল কি হতে পারে। কিন্তু আমরা ত কুটুম, তাই একে অন্যকে ভাল করেই জানি। তৈয়ব শেঠ সহজে আপস স্বীকার করার পাত্র নন। সামান্য অসাবধান হলে আমাদের পেটের কথা জেনে নেবেন আর আমাদের ফাঁসাবেন। তাই যা-ই করেন সাবধান হয়ে করবেন।'

বলিলাম, 'মোটেই ভাববেন না। কেসের কোন কথা তৈয়ব শেঠ কি কাউকে বলব না। এই কথাই মাত্র বলব যে আপনারা আপসে বিবাদ মিটিয়ে নিন; অকারণ উকিলের টেঁক ভারী করতে যান কেন!'

সাত কি আট দিনের দিন ডারবন হইতে আমি রওনা হইলাম। শেঠ অবদুল্লা আমার জন্য প্রথম শ্রেণীর টিকেট কাটাইয়াছিলেন। রেলে শোয়ার বিছানা চাহিলে পাঁচ শিলিং দিয়া পৃথক্ টিকেট নিতে হইত। অবদুল্লা শেঠ ওই টিকেট কাটাইবার জন্য পীড়াপীড়ি করেন কিন্তু জিদ, অভিমান ও পাঁচ শিলিং বাঁচাইবার আগ্রহে বিছানার টিকেট কাটিতে অস্বীকার করি।

অবহুল্লা শেঠ এই কথায় আমাকে সাবধান করেন : 'মনে রাখবেন, এটা বিদেশ, ভারত নয়। ঈশ্বরের কৃপায় পয়সার অভাব আমাদের নেই। পয়সার কথা ভাববেন না, যে সুবিধা দরকার করে নিন।'

তাঁকে ধন্যবাদ জানাইয়া বলিলাম, 'কিছু ভাববেন না।'

রাত নয়টার কাছাকাছি ট্রেন নাতাল-এর রাজধানী মেরিৎস্‌বর্গ-এ পৌঁছে। বিছানা যারা চাহিত এই স্টেশনে তাদের বিছানা দেওয়া হইত। রেলের এক কর্মচারী আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'বিছানা চাই কি?' বলি, 'না, সঙ্গে আছে।' সে চলিয়া যায়। এর মধ্যে এক যাত্রী ওঠে। আমার দিকে তাকায়। কালো চামড়া দেখিয়া অসোয়াস্তি বোধ করে। বাহির হইয়া যায়। দুই একজন কর্মচারীকে সঙ্গে লইয়া ফিরিয়া আসে। কেউ কিছু বলে না। শেষে এক কর্মচারী আসে। সে বলে, 'এসো, তোমায় ভ্যান-এ * যেতে হবে।'

বলি, 'আমার যে প্রথম শ্রেণীর টিকেট।'

কর্মচারী বলে, 'হলই বা। বলছি, ভ্যান গাড়ীতেই যেতে হবে।'

'শুনুন, ডারবনে আমাকে এই কামরায় বসতে দেওয়া হয়েছে। আমি এই কামরাতেই যাব।'

কর্মচারী বলে, 'সে কখনই নয়। তোমায় নাবতেই হবে। না নাবো ত সিপাহী এসে নাবাবে।'

বলি, 'সেপাই নাবায় নাবাবে, নিজে নাবব না।'

সেপাই আসে। হাত ধরিয়া নীচে নামায়। জিনিসপত্রও আমার নামাইয়া লয়। অন্য কামরায় যাইতে অস্বীকার করি। ট্রেন চলিয়া যায়। ওয়েটিং রুমে গিয়া বসি। হাতব্যাগটা নিজের কাছে রাখি। অন্য মালপত্র পড়িয়া থাকে। রেলের লোকেরা সে সব কোথাও রাখিয়া দেয়।

শীতের দিন ছিল। দক্ষিণ আফ্রিকার উঁচুতে বলিয়া সেখানে দারুন শীত। ওভারকোট মালপত্র মধ্যে ছিল। পাছে আবার অপমান হইতে হয় তাই মালপত্র চাইতে ভরসা হইল না। শীতে কাঁপিতেছিলাম। ঘরে বাতি ছিল না। তখন মাঝরাত হবে, একজন যাত্রী আসে। বুঝিতে পাই সে কথা বলিতে চায়। কিন্তু আমার মনের অবস্থা কথা বলার মত ছিল না।

---

* ভ্যান ছাদ-ঢাকা আসবাব বহনের বড় কামরা

এখন আমার কর্তব্য কি এই ভাবনায় মগ্ন ছিলাম: ‘আপন অধিকারের জন্য লড়ব কি ভারতে ফিরব অথবা অপমান হজম করে প্রিটোরিয়ায় গিয়ে কেস শেষ করে দেশে যাব? কর্তব্য না করে পালিয়ে যাওয়া ত ভীরুর কাজ হবে। আমার ওপর যে আঘাত এসেছে তা বাইরের লক্ষণ নয়, ভিতরের কঠিন রোগ। বর্ণবিদ্বেষের তা বাহ্য উপসর্গ-মাত্র। পারি ত এই রোগ দূর করার চেষ্টা করা ও তার দরুন যে যাতনা আসবে তা ভোগ করা আমার উচিত। তবে বর্ণবিদ্বেষ দূর করার জন্য যতটা প্রয়োজন ততটাই মাত্র করা উচিত হবে।’

পরদিন ভোরে রেলের জেনারেল ম্যানেজারকে লম্বা তার করি। অবদুল্লা শেঠকেও খবর দিই। অবদুল্লা শেঠ সঙ্গে সঙ্গে জেনারেল ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করেন। জেনারেল ম্যানেজার রেলকর্মচারীদের কার্যের সমর্থন করেন, তবে আমি যাতে নিরাপদে গন্তব্যে পৌঁছিতে পারি সে ব্যবস্থা করার নির্দেশ স্টেশন মাস্টারকে দিয়াছেন এ কথাও শেঠকে জানান। মেরিৎস্‌বর্গের ভারতীয় ব্যবসায়ীদের ও অন্যান্য জায়গার বন্ধুদেরও আমার সহিত দেখা করিতে ও আমার সুখ-সুবিধার ব্যবস্থা করিবার জন্য অবদুল্লা শেঠ তার করিয়াছিলেন। ব্যবসায়ীরা স্টেশনে আসিয়া আমার সহিত দেখা করেন, নিজেদের দুঃখের কথা বলিয়া আমাকে এই বলিয়া সান্ত্বনা দেন যে আমার ওপর যে জুলুম হইয়াছে তা কিছু নূতন নয়। এ কথাও তাঁরা আমাকে বলেন যে ফার্স্ট ও সেকেণ্ড ক্লাসে চড়িতে গেলে রেলকর্মচারী ও গোরা যাত্রীদের হাতে লাঞ্ছনা-ভোগের জন্য ভারতীয়দের তৈরি থাকিতে হয়। এরূপ কথা শুনিতে শুনিতে দিন শেষ হইল, রাত আসিল। ট্রেন আসিয়া গেল। আমার জন্য জায়গা ঠিক করা ছিল; যে বিছানার টিকেট ডারবনে লইতে অস্বীকার করিয়াছিলাম এখানে কিনিলাম। ট্রেন চার্লস্‌টাউন অভিমুখে ছুটিল।

আরও দুর্ভোগ

চার্লস্‌টাউনে ট্রেন সকালে পৌঁছিল। সেকালে চার্লস্‌টাউন হইতে জোহানিসবর্গ তক ট্রেন ছিল না। সিগরাম বা ঘোড়ার ডাক-গাড়ী ছিল। রাস্তায় স্টেণ্ডারটনে এক রাত কাটাইতে হইত। ডাক-গাড়ীর টিকেট আমার

ছিল। এক দিন বাদে পৌঁছানোতে তা রদ হওয়ার কথা নয়। তা ছাড়া অবদুল্লা শেঠ চার্লস্‌টাউনের কোচ-এজেন্টের কাছে তারও করিয়াছিলেন।

কিন্তু এজেন্ট ছুতোর খোঁজে ছিল। তাই যখন সে দেখিল আমি নূতন লোক বলিল, 'আপনার টিকেট যে বাতিল হয়ে গেছে।' সমুচিত উত্তর দিলাম। গাড়ীতে জায়গা ছিল না তা নয়। ওরূপ বলার কারণ ছিল ভিন্ন। যাত্রীদের গাড়ীর ভিতরে বসাইতে হইবে এই ছিল নিয়ম। কিন্তু আমি যে কুলি পর্যায়ের ছিলাম। তার ওপর অজানা নূতন লোক। তাই কোচের 'লীডর' বা অধিনায়কের মনে হয় যে গোরা যাত্রীদের সঙ্গে আমাকে না বসাইতে পারিলে ভাল হয়। কোচোয়ানের বসার জায়গার তুই ধারে বসার জায়গা ছিল। তার একটা ছিল লীডর-এর বসার স্থান। সেদিন সে ভিতরে গিয়া বসে ও তার জায়গা আমাকে দেয়। জানিতাম সে নেহাত অন্যায় করিয়াছিল, অপমান করিয়াছিল। কিন্তু ভাবিলাম এই অপমান সহিয়া লওয়া বুদ্ধিমানের কাজ হইবে। জোরজার করিয়া ভিতরে বসিতে পাওয়া যাইবে না তা বুঝিয়াছিলাম। তর্ক জুড়িলে গাড়ী আমায় ফেলিয়া চলিয়া যাইবে ও আমার আর এক দিন নষ্ট হইবে আর তার পর দিনই যে কি হইবে তাই বা কে বলিবে? এই সব ভাবিয়া মনে মনে গুমরাইতে থাকিলেও কোচোয়ানের পাশে বসিলাম।

তিনটার কাছাকাছি সিগরাম পারডীকোপে পৌঁছে। গোরা নায়ক এবার আমার জায়গায় বসিতে চায়, উদ্দেশ্য খোলা হাওয়ায় বসিবে, সিগারেট খাইবে। কোচোয়ানের পাশে ময়লামত একটা চট ছিল। পা-দানিতে তা বিছাইয়া সে আমাকে বলে, 'সামী, এখানে বসো। কোচোয়ানের কাছে আমি বসব।' এই অপমান অসহ্য হইল। ভয়ে ভয়ে বলিলাম, 'আপনি আমাকে এখানে বসিয়েছেন, বসানো উচিত ছিল ভিতরে। সে অপমান সয়েছি। এখন আপনি বাইরে বসে সিগারেট খাবেন আর আমার আপনার পায়ের তলায় বসতে হবে। ওখানে আমি বসব না। ভিতরে বসতে রাজী আছি।'

আর যাই কোথা! লোকটা আমার কানে দমাদম চড় বসাইতে ও ফেলিয়া দেওয়ার জন্য হাত ধরিয়া টানিতে থাকে। কোচবাক্সের পিতলের গরাদে প্রাণপণ শক্তিতে ধরিয়া থাকি আর মনে মনে বলি কবজি ভাঙ্গিয়া যায় যাক গরাদ ছাড়িব না। লোকটার ওই বকাবকি, টানাটানি, মারধোর

আর আমার টুঁ-শব্দটি না-করা—সবটা ব্যাপার যাত্রীরা লক্ষ্য করিতেছিল। লোকটা তাগড়া ষণ্ডা, আর আমি রোগা-পাতলা। যাত্রীদের কারো কারো প্রাণে লাগিল। তারা বলিল, 'এ কি করছ, থামো, মেরো না। এর ত দোষ নেই। সঙ্গত কথা এ বলেছে। ওখানে বসতে না দাও, ভিতরে আসতে দাও। আমাদের সঙ্গে বসবে।' লোকটা হুঙ্কার ছাড়িয়া বলিল, 'কখনই নয়!' তবে দর্পটা তার অনেকটা খর্ব হইয়া গিয়াছিল। মারধোর বন্ধ করিল, হাত ছাড়িয়া দিল। আরও দুইচারিটা গালি দিল। কোচোয়ানের আর এক দিকে এক হোটেণ্টট চাকর বসা ছিল। তাকে পা-দানিতে বসিতে বলিয়া নিজে সেই জায়গায় বসিল।

যাত্রীরা যে যার জায়গায় বসিল। শিটি বাজিল। গাড়ী চলিল। আমার বুক ধড়ফড় করিতেছিল। ভাবিতেছিলাম গন্তব্যে জ্যান্ত পৌঁছিতে পারিব কি! লোকটা রাঙা চোখে আমার দিকে কখন কখন তাকাইতেছিল ও আঙ্গুল নাড়াইয়া শাসাইতেছিল: 'স্টেণ্ডারটনে গাড়ী যাক ত। দেখবে খন কি দশা তোমার হয়।' কথাটি না বলিয়া ঈশ্বরের কাছে মিনতি করিতেছিলাম—রক্ষা করো।

সন্ধ্যায় স্টেণ্ডারটনে পৌঁছিলাম। কয়েকজন ভারতীয়ের মুখ দেখিলাম। হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। কোচ হইতে নামিতেই বন্ধুরা বলিলেন, 'আপনাকে ঈশা শেঠের দোকানে নিয়ে যাওয়ার জন্য এসেছি। দাদা অবদুল্লা তার করেছেন।' খুব খুশী হইলাম। তাঁদের সঙ্গে শেঠ ঈশা হাজী সুমারের দোকানে গেলাম। শেঠ ও তাঁর আমলা-গোমস্তারা আমাকে ঘেঁষিয়া বসিলেন। রাস্তার দুর্ভোগের কথা বলিলাম। তাঁরা বেদনা বোধ করিলেন; এমনটা বিষ তাঁদের গিলিতে হয় সে কথা বলিলেন ও সান্ত্বনা দিলেন।

মনে হইল সিগরাম কোম্পানীর এজেণ্টকে ব্যাপারটা জানানো দরকার। পত্র দিলাম। যা যা ঘটিয়াছিল সব লিখিলাম আর তাদের কর্মচারী যে শাসাইয়াছে তাও জানাইলাম। বাকী পথ যাওয়ার কালে আগামী দিন অন্য যাত্রীদের সঙ্গে ভিতরে বসিতে পাইব এই আশ্বাস চাহিলাম। এজেণ্ট উত্তরে জানান, 'স্টেণ্ডারটন থেকে বড় সিগরাম যায় আর কোচমান প্রভৃতি বদল হয়। যার বিরুদ্ধে আপনি নালিশ করেছেন সে কাল থাকবে না। অন্য যাত্রীদের সঙ্গে আপনি বসতে পাবেন।' এই খবরে কিছুটা সোয়াস্তি

বোধ করিলাম। যে আমাকে মারিয়াছিল তার বিরুদ্ধে মামলা করার ইচ্ছা আমার ছিল না। তাই মারধোরের এই প্রকরণের শেষ এখানেই হয়।

ঈশা শেঠের লোকেরা ভোরবেলা আমাকে সিগরামে পৌঁছাইয়া দেয়। ঠিক জায়গা মিলে। বিনা ঝঞ্ঝাটে জোহানিসবর্গে পৌঁছি।

স্টেণ্ডারটন ছোট গাঁ। জোহানিসবর্গ বিশাল শহর। অবদুল্লা শেঠ জোহানিসবর্গেও তার করিয়াছিলেন। মহম্মদ কাসেম কমরুদ্দিনের দোকানের নামধামও দিয়াছিলেন। তাঁর লোক সিগরামে আমার জায়গায় আসিয়াছিল, কিন্তু তাকে আমি দেখিতে পাই নাই আর সেও আমাকে চিনিতে পারে নাই। হোটেলের কথা ভাবিলাম। দুই-চারিটি নাম জানিয়া লইয়াছিলাম। গাড়ী করিলাম। গাড়োয়ানকে গ্রাণ্ড নেশনাল হোটেলে লইয়া যাইতে বলিলাম। হোটেলে পৌঁছিয়া ম্যানেজারের কাছে থাকার জায়গা চাহিলাম। ম্যানেজার একবার আমাকে দেখিয়া লইল। পরে ভদ্রভাবে 'খুব দুঃখিত, ঘর খালি নেই' বলিয়া আমাকে বিদায় করিল। গাড়ীতে চড়িয়া বলিলাম, 'মহম্মদ কাসেম কমরুদ্দিনের দোকানে নিয়ে চল।' সেখানে অবদুল গনী শেঠ আমার অপেক্ষায় ছিলেন। সাদরে তিনি আমাকে গ্রহণ করিলেন। হোটেলে গিয়াছিলাম, জায়গা পাই নাই এ কথা শুনিয়া তিনি খিল খিল করিয়া হাসিলেন। 'হোটেলে জায়গা পাবেন এটা আপনি কি করে আশা করেছিলেন?'

জিজ্ঞাসা করি, 'কেন নয়?'

'দিন কয়েক থাকলে তা বুঝতে পাবেন। আমাদেরই কেবল এদেশে থাকা সাজে। টাকা রোজগারের জন্য যে-কোন অপমান আমরা সয়ে নি।' এই বলিয়া ট্রান্সভালে ভারতীয়দের যে লাঞ্ছনা ভুগিতে হয় তা শুনাইলেন।

পরে এই অবদুল গনী শেঠের কথা অনেকবার আসিবে।

তিনি বলিলেন, 'এ দেশ আপনার মতন লোকের জন্য নয়। শুনুন, কাল আপনি প্রিটোরিয়া যাচ্ছেন। ওখানে আপনাকে তৃতীয় শ্রেণীতে যেতে হবে। নাতাল থেকে ট্রান্সভালে দুঃখ বেশি। এখানে ভারতীয়দের প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকেট দেওয়া হয় না।'

আমি বলি, 'সেদিকে আপনারা তেমনটা চেষ্টা হয়ত করেননি।'

অবদুল গনী শেঠ বলেন, 'পত্র লেখালেখি করা হয়েছে। তবে এ কথা

স্বীকার করতেই হবে যে আমাদের বেশির ভাগ লোক প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণীতে যেতেই চায় না।'

রেলওয়ে আইন যোগাড় করিলাম। পড়িলাম। একটা ফাঁক চোখে পড়িল। ট্রান্সভালের পুরানো আইনের ভাষা আঁটসাট বা নিখুঁত স্পষ্ট ছিল না। রেলওয়ে আইনে খুঁত আরও বেশি ছিল।

শেঠকে বলিলাম, 'ফার্স্ট ক্লাসে যেতে না পাই ত ঘোড়ার গাড়ী করে যাব। এখান থেকে সাইত্রিশ মাইল বই ত নয়।'

তাতে সময় ও খরচ বেশি লাগিবে এ কথা অবদুল গনী বলেন। কিন্তু আমার প্রস্তাবে রাজী হন। সেইমত স্টেশন মাস্টারের কাছে আমরা চিঠি লিখি। তাকে জানাই যে আমি ব্যারিস্টার। প্রথম শ্রেণীতে যাতায়াত করিয়া থাকি। প্রিটোরিয়ায় তাড়াতাড়ি যাওয়া আবশ্যক এ কথাও লিখি। ইহাও বলি যে জবাবের অপেক্ষা না করিয়া জবাবের জন্য নিজেই যাইব কারণ হাতে আমার ততটা সময় নাই; আশা করি প্রথম শ্রেণীর টিকেট পাইব।

পত্রের জবাব নিজে গিয়া জানিব এই কথায় একটু প্যাঁচ ছিল। আমি ধরিয়া লইয়াছিলাম যে লিখিত জবাব 'না'-ই আসিবে। তা ছাড়া 'কুলি ব্যারিস্টার' কিভাবে থাকে, কিভাবে চলে তাও সে বুঝিবে না। পুরা সাহেবী ঠাটে তার সামনে দাঁড়াইলে ও কথা বলিলে তা সে বুঝিতে পাইবে ও খুব সম্ভব টিকেট দিবে। ফ্রককোট নেকটাই ইত্যাদি পরিয়া স্টেশনে গেলাম ও স্টেশন মাস্টারের দিকে গিনি বাড়াইয়া দিয়া প্রথম শ্রেণীর টিকেট চাহিলাম।

সে বলিল, 'আপনিই আমাকে চিঠি পাঠিয়েছিলেন কি?'

উত্তরে বলিলাম, 'হাঁ, তাই। টিকেট দেন ত আপনার কাছে কৃতজ্ঞ থাকব। আজই আমাকে প্রিটোরিয়ায় পৌঁছাতে হবে।'

স্টেশন মাস্টার হাসিল। তার দয়া হইল। সে বলিল, 'আমি ট্রান্সভালার নই। আমি হলেণ্ডার। আপনার কথা আমি বুঝতে পারছি। সহানুভূতি অনুভব করছি। আপনাকে আমি টিকেট দিতে ইচ্ছুক। তবে একটা কথা—রাস্তায় যদি গার্ড আপনাকে নামিয়ে দেয় ও তৃতীয় শ্রেণীতে বসায় ত আমায় যেন বিপদে ফেলবেন না, তার মানে রেল কোম্পানীর বিরুদ্ধে মামলা করবেন না। বিনা ঝঞ্ঝাটে আপনি গন্তব্যে পৌঁছুন, ইহা আমার অন্তরের কামনা। দেখতে পাচ্ছি আপনি ভদ্রলোক, সজ্জন ব্যক্তি।'

এই কথা বলিয়া তিনি আমায় টিকেট দেন। তাঁকে ধন্যবাদ জানাইলাম ও আশ্বস্ত করিলাম।

শেঠ অবদুল গনী বিদায় দিতে স্টেশনে আসিয়াছিলেন। মজাটা দেখিয়া তিনি খুশী ও অবাক্ হইলেন। কিন্তু সাবধান করিয়া বলিলেন, 'ঈশ্বর করুন, ভালোয় ভালোয় আপনি প্রিটোরিয়া গিয়ে পৌঁছুন। আমার ভয় গার্ড আপনাকে প্রথম শ্রেণীতে বসতে দেবে না। যদি বা সে দেয়, যাত্রীরা দেবে না।'

প্রথম শ্রেণীর বগিতে গিয়া বসিলাম। ট্রেন ছাড়িল। জর্মিস্টনে পৌঁছিলে গার্ড টিকেট দেখিতে আসিল। আমাকে দেখিয়াই সে চটিয়া গেল। আঙ্গুল ইশারা করিয়া বলিল, 'তিন নম্বরে যা।' আমার প্রথম শ্রেণীর টিকেট দেখাইলাম। সে বলিল, 'হলই বা, যা বলছি তিন নম্বরে।'

এই বগিতে একজন ইংরেজ যাত্রী ছিলেন। সে গার্ডকে ধমকাইয়া বলিলেন, 'ভদ্রলোককে জ্বালাতন করছ কেন? দেখছ না এঁর ফার্স্ট ক্লাসের টিকেট। ওঁর এখানে বসাতে আমার কোনই অসুবিধা হচ্ছে না।' আর আমার দিকে ফিরিয়া বলিল, 'যেখানে বসেছেন, নিশ্চিন্তে বসে থাকুন।'

'কুলির সাথে বসতে চান ত আমার কি' এই কথা বিড় বিড় করিতে করিতে গার্ড চলিয়া যায়।

রাত আটটার কাছাকাছি ট্রেন প্রিটোরিয়ায় পৌঁছে।

১০

প্রিটোরিয়ায় প্রথম দিন

মনে করিয়াছিলাম দাদা অবদুল্লার এটর্নির কোন লোক আমাকে নিতে স্টেশনে আসিবে। জানিতাম কোন ভারতীয় আসিবে না কেন না কোন ভারতীয়ের বাড়ী উঠিব না এই কথা অবদুল্লা শেঠকে বলিয়া আসিয়াছিলাম। এটর্নির কোন লোক স্টেশনে ছিল না। পরে বুঝিতে পারিয়াছিলাম কেন কোন লোক স্টেশনে ছিল না; যেদিন আমি পৌঁছিয়াছিলাম সেদিন রবিবার ছিল। কিছুটা অসুবিধায় না পড়িয়া কোন লোক পাঠানো সেদিন সম্ভব ছিল না। ভাবনায় পড়িলাম, কোথায় যাই? কোন হোটেলে ঠাঁই পাওয়ার ভরসা ছিল না।

১৮৯৩ সনের প্রিটোরিয়া স্টেশন ১৯১৪ সনের প্রিটোরিয়া স্টেশনের মত ছিল না, ছিল একেবারে অন্যরূপ। বাতিগুলি টিম টিম করিতেছিল। যাত্রীও কম ছিল। ভাবিলাম, যাত্রীরা চলিয়া গেলে টিকেট-কালেকটারের যখন কিছুটা ফুরসত মিলিবে তখন তাকে টিকেট দিয়া জিজ্ঞাসা করিব কোথায় গেলে কোন ছোট মেস, হোটেল বা নিবাসে আশ্রয় পাইব ; তার কোন হদিস না হয় ত স্টেশনেই রাত কাটাইব। পাছে অপমান হইতে হয় তাই এই কথা জিজ্ঞাসা করিতে ভয় পাইতেছিলাম।

স্টেশন খালি হইল। টিকেট-কালেকটারকে টিকেট দিয়া আমার কথা পাড়িলাম। সে ভদ্রভাবে কথা বলে, কিন্তু দেখিতে পাই এই দিকে বিশেষ কোন সহায়তা মিলিবার নয়। পাশেই এক আমেরিকান নিগ্রো দাঁড়াইয়া ছিল। সে আমার সঙ্গে কথা জুড়িল :

'দেখতে পাচ্ছি আপনি এখানে এই প্রথম এসেছেন ; কোন পরিচিত লোক নেই। আমার সঙ্গে আসেন ত এক ছোটখাটো হোটেলে নিয়ে যেতে পারি। হোটেলের মালিক আমেরিকান, আমার বিলক্ষণ পরিচিত লোক। আশা করি সে আপনাকে আশ্রয় দেবে।'

কতটা কি হইবে এই বিষয়ে খানিকটা সন্দেহ থাকিলেও ধন্যবাদ সহকারে তার কথায় রাজী হইলাম। লোকটি আমাকে জনস্টন ফেমিলি হোটেলে লইয়া গেল। জনস্টনকে একপাশে লইয়া গিয়া কথা বলিল। জনস্টন এক রাতের মত আমাকে রাখিতে স্বীকার করে, তবে এই শর্তে যে আমার ঘরে বসিয়া আমায় আহার করিতে হইবে।

সে আমাকে বলে, 'বিশ্বাস করুন, কালো-গোরার ভেদভাব আমার মোটেই নেই। তবে আমার সব গ্রাহকই গোরা। আপনাকে আমি যদি খাওয়ার ঘরে খেতে দিই ত আমার গ্রাহকেরা বিরক্ত হবে, চাইকি চলেও যেতে পারে।'

জবাবে আমি বলি, 'আপনি এক রাতের মত আশ্রয় দিয়েছেন তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ। এই দেশের কতকটা পরিচয় আমি পেয়েছি। আপনার অসুবিধার কথা বুঝতে পারছি। অসোয়াস্তি বোধ করবেন না ; ঘরে খাবার পাঠিয়ে দিন। আশা করি কাল একটা ব্যবস্থা করে নিতে পারব।'

ঘর পাইলাম। ঘরে গেলাম। হোটেলে বাসিন্দা বেশি ছিল না। একাকী বসিয়া এটা-সেটা ভাবিতেছিলাম আর দেখিতেছিলাম বাবুর্চী কখন আসে।

খানিক পরে দেখি খানা-হাতে বাবুর্চী নয় আসিলেন মি. জনস্টন। তিনি বলেন, 'বলেছিলাম আপনার খাওয়া ঘরে পাঠাব। কিন্তু অসোয়াস্তি বোধ হচ্ছিল। গ্রাহকদের আপনার কথা বলি ; আপনি খাওয়ার ঘরে বসে খেলে তাঁদের আপত্তি আছে কিনা জিজ্ঞাসা করি। তাঁরা বলেছেন তাঁদের আপত্তি নেই। আর এক কথা, যতদিন ইচ্ছা আপনি এখানে থাকতে পারেন। তাতেও তাঁদের আপত্তি হবে না। আপনি খাওয়ার ঘরে আসুন।'

আবার তাকে ধন্যবাদ জানাইলাম। খাওয়ার ঘরে গেলাম। নিশ্চিন্ত মনে খাইলাম।

পরের দিন সকালে এটর্নি মি. এ. ডব্লু. বেকরের সহিত দেখা করি। তাঁর সম্বন্ধে অবদুল্লা শেঠের কাছে কিছু শুনিয়াছিলাম সুতরাং যেভাবে তিনি আমায় গ্রহণ করেন তাতে আশ্চর্য হই নাই। অভ্যর্থনায় প্রাণের পরশ ছিল। কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করেন। তাঁর সেই সব স্নেহকোমল প্রশ্নের উত্তর দিই। তখন তিনি বলেন, 'ব্যারিস্টার হিসাবে এখানে আপনার কোন কাজ নেই। সেরা ব্যারিস্টার আমাদের মকদ্দমা চালাবেন। কেসটা অনেকদিন চলবে। আর জটিলও। অতএব আবশ্যক তথ্যাদির সহায়তাই কেবল আপনার কাছ থেকে নেব। আপনার আসাতে মক্কেলের সঙ্গে পত্রের আদান-প্রদানে অবশ্যই সাহায্য হবে। যে সব বিবরণ আমার দরকার হবে সে সব এখন আপনার মারফত চেয়ে পাঠাব। এতে সুবিধা হবে সংশয় নেই। আপনার থাকার জায়গা এখনও খুঁজি নাই। ঠিক করে রেখেছি আপনাকে দেখার পর সে চেষ্টা করব। কালো-গোরা ভেদভাব এখানে খুবই উৎকট। তাই আপনার মত লোকের থাকার জায়গা খুঁজে বের করা সহজ হবে না। তবে একটি মহিলাকে/জানি। সে গরীব। তার স্বামী রুটিওয়ালা। আমার মনে হয় সে আপনাকে রাখবে। তাতে তারও সাহায্য হবে। চলুন তাদের ওখানে যাই।'

আমাকে তাদের বাড়ী লইয়া গেলেন। মি. বেকর মহিলার সঙ্গে একান্তে কথা বলেন। খাওয়া-থাকা বাবদ সপ্তাহে ৩৫ শিলিং দিতে হইবে এই কড়ারে সেখানে থাকার ব্যবস্থা হয়।

আইন ব্যবসায় করিলেও মি. বেকর নিষ্ঠাবান গৃহী-প্রচারক ছিলেন। তিনি জীবিত আছেন। এখন তিনি কেবল পাদরীর কাজই করেন। ওকালতি ব্যবসা ছাড়িয়া দিয়াছেন। টাকা-পয়সা বেশ আছে। আজও তিনি আমার

কাছে পত্রাদি লিখেন। তাঁর সকল পত্রের কথা সেই একই : 'যে-কোন দিক হইতেই দেখ না কেন, খ্রীস্টধর্ম শ্রেষ্ঠ ধর্ম এবং যীশুকে ঈশ্বরের একমাত্র পুত্র ও ত্রাণকর্তা বলিয়া না মানিলে মানুষের মুক্তি নাই।'

প্রথম সাক্ষাতেই মি· বেকর ধর্ম সম্বন্ধে আমার মনের গতি জানিয়া নেন। তাঁকে আমি বলিয়াছিলাম, 'হিন্দুর ঘরে আমার জন্ম। তা হলেও হিন্দুধর্মের জ্ঞান আমার কম। অন্য সব ধর্মের জ্ঞান আরও কম। বস্তুত আমি কোথায় আছি, আমার ধর্মবিশ্বাস কি ও তা কি হওয়া উচিত, কিছুই জানি না। নিজ ধর্মের গভীর অধ্যয়নের ইচ্ছা আমার রয়েছে। অন্য সব ধর্মের অধ্যয়নও যথাশক্তি করতে চাই।'

আমার কথা শুনিয়া মি· বেকর খুশী হন ও বলেন, 'দক্ষিণ আফ্রিকার জেনরল মিশনের ডিরেকটরদের আমি একজন। নিজ ব্যয়ে এক গির্জা তৈরি করিয়েছি। সেখানে নিয়মিত ধর্মের ব্যাখ্যা করি। গোরা-কালো ভেদবুদ্ধি আমার নেই। আমার কয়েকজন সহকর্মী আছেন। একটার সময় আমরা একত্র মিলিত হই ; মিনিট কয়েক প্রার্থনা করি—শান্তি ও জ্ঞান যাজ্ঞা করি। এই প্রার্থনায় আপনি আসেন ত খুব খুশী হব। তখন আমার সহকর্মীদের সঙ্গে আপনার পরিচয় করিয়ে দেব। তাঁরা খুশী হবেন, আর আমার বিশ্বাস তাঁদের পরিচয় লাভে আপনিও সুখী হবেন। কয়েকখানি ধর্মপুস্তক আপনাকে পড়তে দেব। তবে সকল ধর্মগ্রন্থের শ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থ বাইবেল। তা অবশ্যই পড়বেন।'

মি· বেকরকে ধন্যবাদ জানাইলাম ও বলিলাম যে সম্ভব হইলে তাঁদের একটার প্রার্থনায় নিয়মিত যাইব।

'তা হলে কাল একটার সময় এখানে আসুন। একসঙ্গে প্রার্থনা-মন্দিরে যাওয়া যাবে।' মি· বেকরের এই কথার পরে চলিয়া আসিলাম।

চিন্তা করার অবসর তখন ছিল না।

মি· জনস্টনের কাছে গেলাম। বিল চুকাইলাম। নূতন আবাসে গেলাম। খাইলাম। ঘরনী ভাল লোক ছিলেন। আমার জন্য নিরামিষ রাঁধিয়াছিলেন। অল্পদিনে বাড়ীর একজন হইয়া গেলাম।

খাওয়ার পরে যে বন্ধুর কাছে দাদা অবদুল্লা পত্র দিয়াছিলেন তাঁর সহিত দেখা করিলাম। তিনি ভারতীয়দের দুর্দশার কথা বলেন। তাঁর ওখানে বার বার থাকিতে বলেন। ধন্যবাদ জানাইলাম। ব্যবস্থা হইয়াছে বলিলাম।

যখন যা দরকার তা তাঁর কাছ হইতে লওয়ার জন্য সাগ্রহ অনুরোধ করিলেন।

সন্ধ্যা হইল। ঘরে ফিরিলাম। খাইলাম। নিজের ঘরে গেলাম। নানা চিন্তা ঘিরিয়া ধরিল। কোন কাজ তখন আমার ছিল না। অবদুল্লা শেঠকে সে কথা লিখিলাম মনে প্রশ্ন জাগিল—মি. বেকরের বন্ধুত্বের মানে কি? তাঁর ধর্মবন্ধুদের কাছ হইতে আমার কি পাওয়ার আছে? খ্রীস্টান ধর্মের অধ্যয়ন কতটা করা সঙ্গত? হিন্দুধর্মের পুস্তক কোথা পাওয়া যাইবে? তা জানা না থাকিলে খ্রীস্টধর্মের স্বরূপ কি করিয়া বোঝা যাইবে? যাহাই পড়ি খোলা মনে পড়িব; মি. বেকরের গোষ্ঠীর লোকদের সঙ্গে ভগবান যখন যেমন মতি দেন সেমতে চলিব; নিজ ধর্ম ভাল করিয়া বোঝার আগে অন্য ধর্ম গ্রহণের কথা মনে ঠাঁই দিব না—এই নির্ণয় করিলাম, অন্য কিই বা করিতে পারিতাম! এইসব ভাবিতে ভাবিতে কখন ঘুমাইয়া পড়িলাম।

১১

খ্রীস্টানদের সংস্পর্শে

পরের দিন একটায় মি. বেকরের প্রার্থনা-সমাজে গেলাম। সেখানে মিস হেরিস, মিস গেব, মি. কোটস প্রভৃতির সঙ্গে পরিচয় হয়। সকলে হাঁটু গাড়িয়া প্রার্থনা করিল। আমি তাঁদের অনুকরণ করিলাম। যার যেমন রুচি সে তেমন যাচ্ঞা ঈশ্বরের নিকট করিল—দিন শান্তিতে কাটুক, ঈশ্বর আমাদের হৃদয়ের দরজা খুলিয়া দাও, ইত্যাদি।

আমার কল্যাণের জন্যও প্রার্থনায় দুইটি কথা জোড়া হইল: 'যে নতুন বন্ধু এসেছেন তাঁকে তুমি পথ দেখাও। প্রভো, যে শান্তি আমাদের দিয়েছ সে শান্তি এঁকে দাও। যে বিভু যীশু আমাদের উদ্ধার করেছেন সে বিভু এঁকেও উদ্ধার করুন। যীশুর নামে এই যাচ্ঞা আমরা করছি।' ভজন-কীর্তন হইত না। প্রত্যহ বিশেষ কোন যাচ্ঞা আমরা করিতাম। সময়টা দুপুরের খাওয়ার সময় ছিল বলিয়া তারপর আমরা যে যার মত খাইতে চলিয়া যাইতাম। প্রার্থনায় পাঁচ মিনিটের বেশি লাগিত না।

মিস হেরিস ও মিস গেব আধাবয়সী কুমারী ছিলেন। মি. কোটস কোয়েকর ছিলেন। এই দুই মহিলা একসঙ্গে থাকিতেন। প্রতি রবিবার

চারটার চা তাঁদের গৃহে পান করার নিমন্ত্রণ জানান। রবিবারে যখন দেখা হইত মি· কোটসকে আমি আমার সপ্তাহের ধর্মীয় রোজনামচা পড়িতে দিতাম। কি কি বই পড়িয়াছি ও কোন্ বই কেমন লাগিয়াছে সেই আলোচনাও তাঁর সঙ্গে হইত। মহিলারা নিজ নিজ দিব্য অনুভবের কথা, তাঁদের মহান্ শান্তি লাভের কথা আমাকে বলিতেন।

মি· কোটস খোলাদিল ধার্মিক যুবক ছিলেন। তাঁর সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব গাঢ় হয়। অনেক সময় আমরা একসঙ্গে বেড়াইতে বাহির হইতাম। তিনি নূতন নূতন খ্রীস্টান গৃহে আমাকে লইয়া যাইতেন।

ভাব যতই ঘন হইতেছিল ততই তিনি আমাকে বই দিতেছিলেন। বইয়ে বইয়ে আমার তাকগুলি ভরিয়া গেল, বলিব কি তাঁর বইয়ে আমি চাপা পড়িলাম। তাঁর ওপর আমার অখণ্ড বিশ্বাস ছিল তাই তাঁর দেওয়া বই পড়িতে স্বীকার করি। বই পড়িতাম আর সেই বই সম্বন্ধে তাঁর সহিত আলোচনা হইত।

১৮৯৩ সনে এরূপ কতকগুলি বই আমি পড়িয়াছিলাম। সব বইয়ের নাম আমার মনে নাই। তবে ডা· পার্কারের 'সিটি টেম্পল'-এর টীকা, পিয়ার্সনের 'মেনি ইন্‌ফলিবল প্রুফস্', বাটলারের 'এনালজী' ইত্যাদি বই পড়িয়াছিলাম। এই সব বইয়ের কতক অংশ বুঝি নাই, কতক অংশ ভাল লাগিয়াছিল আর কতক অংশ ভাল লাগে নাই। 'মেনি ইনফলিবল প্রুফস্' মানে বহু অব্যর্থ প্রমাণ অর্থাৎ লেখকের দৃষ্টিমতে বাইবেলের ধর্মের প্রমাণ। এই বইয়ের কোন ছাপ আমার মনে পড়ে নাই। পার্কারের টীকা নীতিবর্ধক এ কথা বলা যায়, তবে প্রচলিত খ্রীস্টান ধর্মের ওপর যাদের বিশ্বাস নাই তাদের পক্ষে তা কোন কাজের নয়। বাটলারের 'এনালজী' অতি গম্ভীর ও কঠিন বই। পাঁচ সাত বার না পড়িলে তা ঠিক বোঝা যায় না। মনে হইয়াছিল নাস্তিককে আস্তিক করার জন্য লেখক এই বই লিখিয়াছিলেন। ঈশ্বর আছে এই কথা প্রমাণ করার জন্য যে যুক্তি দেওয়া হইয়াছে তা আমার কাজে লাগে নাই, কারণ নাস্তিকতার স্তর আমি পার হইয়া গিয়াছিলাম। কিন্তু যীশুই একমাত্র অবতার আর মানুষ ও ঈশ্বরের মধ্যেকার বৈতরণী পার করানোর কাণ্ডারীও তিনি এ কথার স্বপক্ষে যে যুক্তি দেওয়া হইয়াছে তাতে আমি কোন সার খুঁজিয়া পাই নাই।

কিন্তু মি· কোটস সহজে হাল ছাড়ার পাত্র ছিলেন না। আমাকে

তিনি খুব ভালবাসিতেন। তিনি দেখেন আমার গলায় তুলসীমালা। তাঁর দৃষ্টিতে উহা কুসংস্কার মনে হয়। তিনি দুঃখ পান। 'এটা তোমায় মানায় না, এসো, ছিঁড়ে ফেলি।'

'না, ছিঁড়বেন না। এটা মায়ের প্রসাদ।'

'কিন্তু এতে কি তুমি বিশ্বাস করো?'

'এর গূঢ়ার্থ কি আমি জানি না। এ না পরলে ক্ষতি হবে এ কথাও আমি মনে করি না। কিন্তু মা আদর করে যে মালা পরিয়েছিলেন ও ভেবেছিলেন এতে আমার কল্যাণ হবে বিনা কারণে সে মালা ফেলে দিতে পারি না। কালক্রমে জীর্ণ হয়ে আপনা থেকে যখন ছিঁড়ে যাবে তখন আর একটা ধারণ করার লোভ আমার হবে না।'

আমার কথা মি. কোটসের ভাল লাগে নাই, কারণ আমার ধর্মের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধার ভাব ছিল না। তাঁর আগ্রহ ছিল আমাকে অজ্ঞান অন্ধকার হইতে বাঁচাইবেন। থাকিলই বা অন্য ধর্মে অল্পস্বল্প সত্য, সত্যের পূর্ণ ভাণ্ডার খ্রীস্টধর্ম আশ্রয় না করিলে মুক্তি নাই, যীশুর শরণ না লইলে পাপ ক্ষয় হয় না, শত পুণ্য কর্ম করিলেও সবই বৃথা যায় এই কথা তিনি আমার কানে জপিতেন।

বইয়ের সঙ্গে যেমন মি. কোটস আমার পরিচয় ঘটান তেমন তাঁর দৃষ্টিতে যাঁরা খাঁটি খ্রীস্টান তাঁদের অনেকের সহিতও পরিচয় করাইয়া দেন। এই দৃষ্টি হইতে প্লীমথ ব্রিদ্রেন নামক খ্রীস্টান সম্প্রদায়ভুক্ত এক পরিবারের সহিত তিনি আমার যোগাযোগ করিয়া দেন।

মি. কোটসের মারফতে যাদের সঙ্গে পরিচয় হইয়াছিল তাদের অনেকে ভাল ছিল। আমার ধারণা তাদের অনেকে ঈশ্বরভীরু ছিল। কিন্তু এই পরিবারের এক ব্যক্তি কওয়া-নাই বলা-নাই এই বলিয়া তর্ক জুড়িয়াছিল:

'আমাদের ধর্মের বিশেষত্ব যে কোথায় তা আপনি ধরতে পাচ্ছেন না। আপনার কথা হতে দেখতে পাচ্ছি নিজেদের ভুলের কথা আপনারা সদাসর্বদা ভাবেন, তা দূর করার চেষ্টা করেন, দূর করতে না পারলে অনুতাপ করেন, প্রায়শ্চিত্ত করেন। এই সব ক্রিয়াকাণ্ড দ্বারা কবে আপনাদের মুক্তি মিলবে? শান্তি আপনারা কোন কালেও পাবেন না। আপনি অবশ্যই স্বীকার করবেন যে মানুষ আমরা সকলেই পাপী। এবার দেখুন, আমাদের ধর্মবিশ্বাস কেমন নিখুঁত সুন্দর। আমাদের প্রযত্ন নিষ্ফল, আমাদের প্রায়শ্চিত্ত অর্থহীন

কিন্তু মুক্তি ত আমাদের চাই-ই। আমাদের পাপের বোঝার তা হলে কি হবে? আমরা তা যীশুর ওপর চাপিয়ে দিই। ঈশ্বরের তিনি একমাত্র অপাপ পুত্র। 'যে আমার শরণ নেবে তার পাপ আমি ধুয়ে ফেলব'—তিনিই ত এই আশ্বাস আমাদের দিয়েছেন। এখানেই না ঈশ্বরের অসীম মহানতা। ঈশ্বরের এই মুক্তিপথ আমরা আশ্রয় করি তাই পাপ আমাদের স্পর্শে না। পাপ হবেই। জগতে পাপ না করে চারা নেই। আর তাই ত যীশু আপন জীবন দিয়ে সমস্ত জগতের পাপমোচন করে গেছেন। এই মহান্ প্রায়শ্চিত্তের শরণ যে নেয় সে তরে যায়। দেখুন কেমন আপনাদের অশান্তি আর কেমন আমাদের শান্তি।'

এই যুক্তি আমার কাছে একেবারেই অসার মনে হয়। নম্রভাবে আমি বলি:

'খ্রীস্টান মাত্রেরই যদি এই দৃষ্টি হয় ত সেই খ্রীস্টধর্মে আমার কাজ নেই। পাপের ফল থেকে আমি বাঁচতে চাই না; আমি বাঁচতে চাই পাপ থেকে, পাপ-ভাবনা থেকে। যতদিন সেই মুক্তি না মিলছে ততদিন এই অশান্তিকেই আমি শান্তি বলে মানব।'

এই কথার জবাবে প্লীমথ ব্রাদার বলে, 'নিশ্চিত জেনে রাখুন, আপনার প্রযত্ন বৃথা। আমার কথা আর একবার ভেবে দেখবেন।'

আর এই বন্ধু যেমন কথা তেমন কাজও করিয়াছিল। ভাবিয়া-চিন্তিয়া সে অন্যায় করিয়াছিল এবং বলিয়াছিল যে অন্যায় করিয়াছে বলিয়া তার অনুতাপ হয় নাই।

কিন্তু এই সব বন্ধুদের সহিত পরিচয় হওয়ার আগেই আমি জানিতাম যে সকল খ্রীস্টানের দৃষ্টি এই নয়। মি. কোটস নিজে পাপ হইতে বাঁচার চেষ্টা করিতেন, তাঁর হৃদয় ছিল পবিত্র এবং আত্মশুদ্ধির সম্ভাবনায় তাঁর বিশ্বাস ছিল। মহিলা দুইজনও এইরূপ বিশ্বাসের বশবর্তিনী ছিলেন। যে সব বই আমি পড়িতে পাইয়াছিলাম তার কতকগুলি ভক্তিরসে ভরা ছিল। অতএব এই পরিচয়ের কথা শুনিয়া মি. কোটসের যে ভয় হইয়াছিল তাহা এই বলিয়া আমি দূর করিয়াছিলাম যে কোন এক প্লীমথ ব্রাদারের অনুচিত মতের কারণ খ্রীস্টধর্ম সম্বন্ধে মন্দ ধারণা করা আমার সাজে না।

আমার খটকা ছিল অন্যত্র—বাইবেল ও বাইবেলের সচরাচর যে অর্থ করা হয় তাতে।

১২

ভারতীয়দের সঙ্গে পরিচয়

খ্রীস্টানদের বিষয়ে আরও বলার আগে সেই সময়কার অন্য সব অনুভবের কথা বলা দরকার।

নাতালে দাদা অবদুল্লার যে স্থান ছিল প্রিটোরিয়ার তৈয়ব হাজী খান মহম্মদের সেই স্থান ছিল। তাঁকে বাদ দিয়া দশের কোন কাজ করা সেখানে সম্ভব ছিল না। প্রথম সপ্তাহেই তাঁর সহিত দেখাশোনা করিয়া প্রিটোরিয়ার প্রত্যেক ভারতবাসীর সহিত পরিচয় করার আগ্রহ জানাই এবং প্রবাসী ভারতীয়দের অবস্থা জানার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া এই বিষয়ে তাঁর সহায়তা চাই। এই প্রস্তাবে তিনি আনন্দে সম্মত হন।

আমার প্রথম কাজ হয় প্রিটোরিয়ার সকল ভারতীয়দের এক সভায় একত্র করিয়া ট্রান্সভালে তাদের অবস্থা যে কি সেই ছবি তাদের সামনে তুলিয়া ধরা। শেঠ হাজী মহম্মদ হাজী জুসব-এর নামে এক পরিচয়-পত্র আমার ছিল। তাঁর গৃহে সভা ডাকা হয়। মেমন ব্যবসায়ীরা সভায় অধিক আসিয়াছিল। অল্প সংখ্যক হিন্দুও আসিয়াছিল। বস্তুত প্রিটোরিয়ায় হিন্দু খুব কমই ছিল।

বলা যাইতে পারে ওই সভাতেই জীবনে আমি প্রথম ভাষণ দিয়াছিলাম। আমি ঠিকমত প্রস্তুত হইয়া গিয়াছিলাম। 'ব্যবসায়ে সত্য' এই ছিল আমার বক্তৃতার বিষয়। বরাবর শুনিয়া আসিয়াছি, ব্যবসায়ে সত্য চলে না। আজও কোন কোন ব্যাপারীর মুখে এই কথা শুনিতে পাই। ব্যবসায়কে তারা ব্যবহার বলে আর সত্যকে বলে ধর্ম কারণ তাদের মতে ব্যবসায় এক বস্তু আর ধর্ম অন্য এক বস্তু। তারা মনে করে, ব্যবসায়ে নির্জলা সত্য একেবারেই অচল; একটা মাত্রা পর্যন্ত কেবল সত্য বলা ও সত্য চলা সম্ভব। আমি আমার ভাষণে এই ধারণার ঘোর বিরোধ করি ও নিজেদের কর্তব্য সম্বন্ধে তাদের সজাগ হইতে বলি। কর্তব্য তাদের দুই দিকে ছিল। বিদেশে বসবাস করিতেছে বলিয়া সত্য পথে চলার দায়িত্ব তাদের বাড়িয়া গিয়াছে; কেন না জনকয়েক ভারতীয়ের আচরণ দিয়া এ দেশের লোকে গোটা ভারতের লোকের বিচার করিবে।

দেখিয়াছিলাম, ইংরেজেরা যেমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে ভারতীয়দের

অভ্যাস তার উল্টা। এই দিকে আমি ব্যবসায়ীদের দৃষ্টি দিতে বলি। হিন্দু, মুসলমান, পারসী, খ্রীস্টান বা গুজরাটী, মাদ্রাজী, পাঞ্জাবী, সিন্ধী, কচ্ছী, সুরতী ইত্যাদি ভেদ দূর করার আবশ্যকতার ওপর জোর দিই।

অবশেষে ভারতীয়েরা যে কষ্ট ও অসুবিধা ভোগ করে তার প্রতিকারের নিমিত্ত আমলাদের কাছে যাওয়ার ও দরখাস্ত ইত্যাদি করার জন্য একটি সংস্থা গঠনের কথা বলিয়া বলি যে, বিনা বেতনে সময় ও সাধ্যমত উহার কাজে আমি সাহায্য করিব।

লক্ষ্য করিয়াছিলাম আমার ভাষণের বেশ ভাল প্রভাব সভার ওপর হইয়াছিল।

আমার বক্তৃতার পরে আলোচনা চলে। কয়েক জন বলেন যে তাঁরা আমাকে তথ্য দিবেন। উৎসাহ পাইলাম। দেখিতে পাই সভায় যারা আসিয়াছিল তাদের খুব কম লোকই ইংরেজী জানে। এরূপ বিদেশে ইংরেজী জানা না থাকিলে অসুবিধা হয়। তাই বলি, আপনাদের যাদের ফুরসত আছে ইংরেজী শিখুন। তাদের আশ্বাস দিয়া বলি যে, বেশি বয়সেও অন্য ভাষা শেখা যায় আর উহার উদাহরণও দিই। আরও বলি যে, ক্লাস খোলা হয় ত ক্লাসে অথবা ছুটকো দুই-চার জন আমার কাছে পড়িতে চায় ত তাদের ইংরেজী পড়ানোর ভার আমি লইব।

ক্লাস বসে নাই। তাদের সুবিধামত ঘরে গিয়া পড়াইলে তিনটি যুবক পড়িতে রাজী হয়। এই তিনের দুইজন ছিল মুসলমান—একজন নাপিত ও অন্যজন কেরানী; তৃতীয় ছিল হিন্দু—ছোট দোকানদার। যে সময় যার পক্ষে অনকূল সে সময়ে তাকে পড়াইতে স্বীকার পাই। নিজের পড়াইবার শক্তিতে আমার কোনই সংশয় ছিল না। আমার ছাত্রেরা ক্লান্ত হইত কিন্তু আমি ক্লান্ত হইতাম না। কখন কখন তাদের ঘরে যাইয়া দেখিতাম তারা কাজে ব্যস্ত। ধৈর্য আমার নষ্ট হইত না। তাদের কারোর ইংরেজীর গভীর অধ্যয়নের সংকল্প ছিল না। তবুও বলা যাইতে পারে দুই-জন আট মাসে বেশ ভাল উন্নতি করিয়াছিল। দুইজনই হিসাব রাখিতে ও সাধারণ পত্র (ব্যবসা সংক্রান্ত) লিখিতে শিখিয়াছিল। নাপিতের লক্ষ্য ছিল তার গ্রাহকদের সঙ্গে ইংরেজীতে কথাবার্তা বলিতে পারিলেই হয়। এই শিক্ষার দৌলতে দুইজন মোটামুটি বেশ উপার্জক্ষম হইয়াছিল।

সভার ফল দেখিয়া আমি সন্তুষ্ট হইয়াছিলাম। এরূপ সভা প্রতি সপ্তাহে

বা মাসে একবার করা স্থির হইয়াছিল বলিয়া মনে পড়ে। কমবেশি নিয়মিতরূপেই সভা হইত ও খোলাখুলি আলোচনা চলিত। ইহার ফল এই হইয়াছিল যে, প্রিটোরিয়ায় এমন কোন ভারতীয় ছিল না যাকে আমি চিনিতাম না, যার কথা জানিতাম না। আর এই পরিচয়ের কারণ প্রিটোরিয়ায় যে ব্রিটিশ এজেণ্ট ছিল তার সহিত পরিচয় করার প্রেরণা জন্মে। মি. জেকবস ডি-ওয়েট-এর সহিত পরিচয় করি। ভারতীয়দের প্রতি তাঁর টান ছিল কিন্তু ক্ষমতা বিশেষ ছিল না। তবুও সাধ্যমত সহায়তা করার আশ্বাস দেন এবং যখনই দেখা করার প্রয়োজন বোধ করি দেখা করিতে বলেন।

ইহার পরে রেল কর্তৃপক্ষের সহিত লেখালেখি করি ও তাদের বলি যে রেলের বিধানমতেই উচ্চ শ্রেণীতে যাতায়াতের অধিকার ভারতীয়দের রহিয়াছে। রেল কর্তৃপক্ষ উহার উত্তরে জানায় যে, ভাল পোশাক-পরা লোকদের ফার্স্ট-সেকেণ্ড ক্লাসের টিকিট দেওয়া হইবে। ইহাতে পুরাপরি অধিকার মিলে নাই, কারণ 'ভাল পোশাক' যে কি তা নির্ণয় করার এখতিয়ার স্টেশন মাস্টারের হাতে থাকিয়া যায়।

ভারতীয়দের সম্পর্কে সরকারের সহিত ব্রিটিশ এজেন্টের যে সব পত্র ব্যবহার হইয়াছিল তার কিছুটা তিনি আমাকে দেখান। তৈয়ব শেঠের কাছ হইতেও তেমন কিছু নথিপত্র পাইয়াছিলাম। অরেঞ্জ ফ্রী স্টেট হইতে কিরূপ নিষ্ঠুরভাবে ভারতীয়দের তাড়ানো হইয়াছিল ওইসব নথিপত্র হইতে তা আমি দেখিতে পাই।

সংক্ষেপে, প্রিটোরিয়ায় থাকা কালে ট্রান্সভাল ও অরেঞ্জ ফ্রী স্টেটে ভারতীয়দের আর্থিক, সামাজিক ও রাজনীতিক অবস্থা যে কি ছিল তা গভীরভাবে অধ্যয়ন করিয়াছিলাম। এই অধ্যয়ন যে পরে এত বড় কাজে আসিবে তা তখন আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই। তখন কথা ছিল এক বছর পরে বা কেস শেষ হইলে ভারতে ফিরিয়া আসিব।

কিন্তু ঈশ্বর ভাবিয়া রাখিয়াছিলেন অন্যরূপ।

১৩

'কুলি' হওয়ার বিড়ম্বনা

ট্রান্সভাল ও অরেঞ্জ ফ্রী স্টেটে ভারতীয়দের অবস্থা যে কি ছিল তার পূর্ণ চিত্র দেওয়ার স্থান এই নয়। তার ধারণা যাঁরা পাইতে চান তাঁদের আমি 'দক্ষিণ আফ্রিকার সত্যাগ্রহের ইতিহাস' পড়িতে বলিব। কিন্তু এখানে তার রূপরেখা দেওয়া প্রয়োজন।

১৮৮৮ সনে বা তারও আগে এক বিশেষ আইন বলে অরেঞ্জ ফ্রী স্টেটে ভারতীয়দের সকল অধিকার কাড়িয়া লওয়া হইয়াছিল। হোটেলে বাবুর্চীর বা অমনটা ছোটখাটো কাজ ছাড়া কোন কাজ পাওয়ার পথ তাদের ছিল না। নামমাত্র খেসারত দিয়া ব্যবসায়ীদের সেখান হইতে তাড়ানো হইয়াছিল। ভারতীয় ব্যবসায়ীরা দরখাস্ত ইত্যাদি করিয়াছিল, কিন্তু দুর্বলের কাঁদুনি কে শোনে।

১৮৮৫ সনে ট্রান্সভালে অতি কঠোর এক আইন পাস হয়। ১৮৮৬ সনে তা একটু নরম করা হয়। এই সংশোধনের ফলে মাথা পিছু তিন পাউণ্ড দক্ষিণা দিয়া ট্রান্সভালে প্রবেশের অধিকার ভারতীয়রা লাভ করে। তাদের জন্য নির্দিষ্ট বসতি ভিন্ন অন্য কোথাও জমি খরিদ করার অধিকার ভারতীয়দের ছিল না। সেখানেও বাস্তবপক্ষে তারা জমির ঠিক মালিকানা পাইত না। ভোটের অধিকার ছিল না। এই সব ছিল এশিয়াবাসীদের জন্য বিশেষ আইন। তা ছাড়া কালো লোকের ওপর প্রযুক্ত আইনও এশিয়াবাসীদের ওপর প্রযোজ্য ছিল। তার ফলে ভারতীয়রা নিজ অধিকারে ফুটপাথ দিয়া চলিতে পাইত না, ছাড়পত্র বিনা রাত নয়টার পরে বাহিরে যাইতে পাইত না। ভারতীয়দের বেলায় শেষের এই আইনের কড়াকড়ি তেমন আঁট ছিল না। 'আরব' পরিচয় দিয়া কর্তৃপক্ষের দয়ায় কেউ কেউ এই আইনের হাত হইতে রেহাই পাইত। স্বভাবতই তাই এই রেহাই পুলিশের মর্জির ওপর নির্ভর করিত।

এই দুই প্রতিবন্ধেরই চোট আমায় ভুগিতে হইয়াছিল। কি ভাবে তা এখানে বলিয়া লই। প্রায়ই রাতে কোটসের সঙ্গে বেড়াইতে বাহির হইতাম, ঘরে ফিরিতে কখন কখন দশটাও হইত। পুলিশ আমাকে বাধা দিতে পারে এই ভয় আমার যতটা ছিল তার চাইতে বেশি ছিল মি. কোটসের। তাঁর

নিগ্রো নোকরদের তিনি নিজেই ছাড়পত্র দিতেন। কিন্তু আমাকে তা তিনি কি করিয়া দেন? মালিক কেবল চাকরকে পাস দিতে পারিত। আমি লইতে চাহিলে আর তিনি দিতে চাহিলেও তা দেওয়ার এখতিয়ার মি. কোটসের ছিল না। কারণ তা মিথ্যাচার হইত।

তাই মি. কোটস বা তাঁর কোন বন্ধু আমাকে সরকারী উকিল মি. ক্রাউজের কাছে লইয়া যান। আমরা দুইজন একই 'ইন'-এর ব্যারিস্টার ছিলাম। রাত নয়টার পরে বাহির হওয়ার জন্য আমার পাশ নিতে হইবে ইহা তাঁর নিকট অসহ্য বোধ হয়। পাস না দিয়া তিনি আমাকে এই মর্মে এক পত্র দেন: এই ব্যক্তি অবাধে চলাফেরা করতে পারবে, পুলিশ যেন বাধা না দেয়। বাহির হওয়ার সময় এই পত্র সঙ্গে লইয়া বাহির হইতাম। কোনদিন তা দেখাইতে হয় নাই। কিন্তু ওটা আকস্মিক ব্যাপারমাত্র ছিল।

মি. ক্রাউজ তাঁর বাড়ীতে আমাকে নিমন্ত্রণ করেন। আমাদের মধ্যে বন্ধুত্ব জন্মিয়াছিল এ কথা বলা যাইতে পারে। কখন কখন তাঁর বাড়ী যাইতাম। জোহানিসবর্গের পাবলিক প্রসিক্যুটর তাঁর ভাই তাঁর অপেক্ষা অধিক প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁর সহিত তিনি আমার পরিচয় করাইয়া দেন। বোয়র যুদ্ধের সময় কোন ইংরেজ অফিসারকে খুন করাইবার ষড়যন্ত্র করার অভিযোগে সামরিক বিচারে তাঁর সাত বছর জেল হইয়াছিল। বেঞ্চরেরা তাঁর সনদও কাড়িয়া লইয়াছিল। যুদ্ধ শেষ হইলে ডা. ক্রাউজ জেল হইতে মুক্তি পাইয়াছিলেন এবং সসম্মানে আবার ট্রান্সভাল কোর্টে ওকালতি আরম্ভ করিয়াছিলেন।

পরে সার্বজনিক কাজে এই ব্যক্তির সহিত পরিচয় খুব কাজে আসিয়াছিল, তার ফলে আমার কাজ সহজ হইয়াছিল।

ফুটপাথে চলার ব্যাপার আমার পক্ষে বিষম হইয়াছিল। প্রেসিডেন্ট রোড হইয়া একটা খোলা ময়দানে নিত্য আমি বেড়াইতে যাইতাম। প্রেসিডেন্ট ক্রুগর এই রাস্তায় থাকিতেন। বাড়ীটা জাঁকালো ছিল না, না ছিল ভিতরে গাছের সারি, না ছিল বাইরে উঁচু পাঁচিল। অন্য সব বাড়ী হইতে বিশেষ পার্থক্য ছিল না। প্রিটোরিয়ার অনেক লাখোপতি, ক্রোড়পতির বাগান-ঘেরা বাড়ী তাঁর বাড়ী অপেক্ষা অধিক জমকালো ছিল। প্রেসিডেন্ট ক্রুগর সাদাসিধা চালচলনের জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন। বাড়ীর সামনে সান্ত্রী থাকিত বলিয়া বোঝা যাইত উহা কোন পদস্থ রাজকর্মচারীর নিবাস। সান্ত্রীদের

কাছ দিয়া প্রায় প্রত্যহ এই ফুটপাথে চলিতাম। কোনদিন সিপাহী রোখে নাই, কিছু বলে নাই।

যেমনটা হয়, ওখানেও সান্ত্রী বদল হইত। একদিন কোন সান্ত্রী কওয়া-নাই বলা-নাই আমাকে ধাক্কা দিয়া, লাথি মারিয়া ফুটপাথ হইতে ফেলিয়া দেয়। ভ্যাবাচাকা খাইলাম। কেন লাথি মারিয়াছে সিপাহীকে এ কথা জিজ্ঞাসা করিতে যাইব তার আগেই মি· কোটস (তিনি ওই পথে ঘোড়ায় চড়িয়া যাইতেছিলেন) বলিলেন :

'গান্ধী, আমি সব দেখেছি। এই লোকের বিরুদ্ধে কেস করেন ত খুশী হয়ে আমি আপনার পক্ষে সাক্ষ্য দেব। আমি অতিশয় দুঃখিত, এভাবে আপনাকে মারধোর করলে।'

আমি বলি, 'দুঃখ পাচ্ছেন কেন! বেচারা সান্ত্রী কি করে বুঝবে? তার কাছে কালোমাত্রই কালো। সে নিগ্রোদের এই ভাবেই ফুটপাথ থেকে সরায়। আমাকেও তেমন সরিয়েছে। আমি ত স্থির করে রেখেছি যে আমার ওপর যা-ই ঘটুক, তা নিয়ে আমি আদালতে যাব না। তাই এর বিরুদ্ধেও কেস করব না।'

'এ ত আপনি আপনার স্বভাব-অনুরূপ কথা বললেন। তবু আর একবার ভেবে দেখবেন। এমন লোকের শিক্ষা হওয়া আবশ্যক।' এই কথার পরে তিনি সিপাহীর সঙ্গে কথা বলেন, তাকে ধমকান। তাদের কোন কথা আমি বুঝি নাই। সিপাহী ডচ ছিল, অতএব ডচ ভাষাতে তিনি তাঁর সঙ্গে কথা বলিয়াছিলেন। সিপাহী আমার কাছে ক্ষমা চায়, যদিও ক্ষমা চাওয়ার দরকার ছিল না। আগেই আমি তাকে ক্ষমা করিয়াছিলাম।

কিন্তু সেদিন হইতে এই ভয়ের রাস্তায় চলা আমি ছাড়িয়া দেই। অন্য প্রহরীরা এই ঘটনার কথা জানিতে পাইবে তার বিশ্বাস কি? সুতরাং সাধিয়া আবার লাথি খাইতে যাই কেন এই ভাবিয়া আর কোনদিন ওমুখো হই নাই। অন্য দিকে বেড়াইতে যাইতাম।

এই ঘটনায় প্রবাসী ভারতীয়দের প্রতি আমার সমবেদনা বাড়িয়া যায়। ব্রিটিশ এজেন্টের সহিত কথা বলিয়া কোন ফল না হইলে এই দুই নিয়মের বিরুদ্ধে 'টেস্ট কেস' চালানোর কথা ভারতীয়দের সহিত আলোচনা করি।

এইরূপে পড়িয়া শুনিয়া ও নিজের অভিজ্ঞতা হইতে প্রবাসী ভারতীয়দের দুর্দশার পুঙ্খানুপুঙ্খ পরিচয় লাভ করিয়াছিলাম। দেখিতে পাই যে আত্ম-

সম্মান বাঁচাইয়া কোন ভারতবাসীর পক্ষে দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকা চলে না। এই অবস্থার পরিবর্তন কিরূপে করা যায় এই ভাবনা আমার মনে দিন দিন প্রবল হইতে থাকে।

কিন্তু তখন আমার প্রধান কর্তব্য ছিল শেঠ অবদুল্লার কেসের ভাবনা ভাবা।

১৪

কেস তৈরি

প্রিটোরিয়ার এক বছর আমার জীবনের সর্বাপেক্ষা মূল্যবান বছর ছিল। এখানে দশের কাজে আমার হাতেখড়ি হয়, আর এখানেই দশের কাজ করার শক্তির আভাস আমি পাই। এখানে আমার ঘুমন্ত ধর্মভাব জাগ্রত হয়। আর এখানেই যথার্থ ওকালতির জ্ঞান আমি লাভ করি। নূতন ব্যারিস্টার পুরাতন ব্যারিস্টারের দপ্তরে যা শেখে এখানে তা আমি শিখি। আর এখানেই আমার বিশ্বাস জন্মে যে যাই হোক ওকালতিতে আমি ব্যর্থ হইব না। কি করিলে ওকালতিতে সফলতা লাভ হয় সে পথের সন্ধানও আমি এখানেই পাই।

দাদা অবদুল্লার কেস ছোট ছিল না। দাবি চল্লিশ হাজার পাউণ্ড বা ছয় লাখ টাকার ছিল। ব্যবসায়সংক্রান্ত মকদ্দমা বলিয়া কেসটাতে হিসাবের নানা ফ্যাকড়া ছিল। কেস অংশত প্রমিসরি নোট সম্পর্কে ও অংশত প্রমিসরি নোট লিখিয়া দেওয়ার কথা পালন সম্পর্কে ছিল। বিবাদীর কথা ছিল প্রমিসরি নোট ফাঁকি দিয়া নেওয়া হইয়াছে এবং যা করার কথা ছিল তা পুরাপুরি করা হয় নাই। কেসে তথ্যের ও আইনের বহু মারপ্যাঁচ ছিল।

দুই দিকেই সেরা সলিসিটর ও সেরা ব্যারিস্টার নিযুক্ত হইয়াছিল। এই হেতু তাঁদের উভয়ের কর্মধারার উত্তম অভিজ্ঞতা লাভ করার সুযোগ আমি পাইয়াছিলাম। সলিসিটরের জন্য বাদীর কেস তৈয়ার ও তথ্যের বাছবিচার করার গোটা কাজটা আমার ওপর পড়িয়াছিল। আমার খসড়ার কতটা বাদ দেন এবং সলিসিটরের খসড়ার কতটা ব্যারিস্টার রাখেন ও কতটা ছাঁটেন তা দেখিয়া আমার জ্ঞান বাড়িতেছিল। আমি বুঝিতে পারিয়াছিলাম

যে এই কেস তৈরির কাজ হইতে আমার বাছবিচার করার শক্তির ও সংগঠনশক্তির যাচাই হইবে।

কেসে আমি অন্তর ঢালিয়া দিলাম। তাতে আমি তন্ময় হইয়া গেলাম। লেনদেন সংক্রান্ত সকল কাগজপত্র পড়িলাম। আমার মক্কেল অতিশয় করিতকর্মা লোক ছিলেন এবং আমার ওপর তাঁর অসীম বিশ্বাস ছিল। তাতে আমার কাজ সহজ হইয়াছিল। একাউণ্ট বা গণিতকের সূক্ষ্ম অধ্যয়ন করিয়াছিলাম। বেশির ভাগ পত্র গুজরাটীতে ছিল। উহার অনুবাদ আমাকেই করিতে হইয়াছিল। ফলে অনুবাদ করার শক্তি আমার বাড়ে।

পূর্বে বলিয়াছি, ধর্মের আলোচনা করিতে আমার ভাল লাগিত ও দশের কাজের দিকে আমার খুব ঝোঁক ছিল, আর কিছু সময়ও আমি তাতে দিতাম। তবু সে সব তখন আমার মুখ্য কর্ম ছিল না। কেস তৈরি ছিল আমার মুখ্য কর্ম। তাই আইনের অধ্যয়ন, নজিরের সন্ধান ইত্যাদি প্রয়োজনীয় কাজ সকলের আগে করিতাম। ইহার ফলে মকদ্দমার তথ্যের ওপর আমার যে দখল জন্মিয়াছিল সে দখল বাদী কি বিবাদী কারোরই ছিল না, কারণ উভয় পক্ষেরই কাগজপত্র আমার কাছে ছিল।

'তথ্যই তিন-চতুর্থাংশ আইন' পরলোকগত মি. পিঙ্কটের এই কথা আমার মনে আসিল। পরে এক মকদ্দমা সম্পর্কে তথ্যের কথায় দক্ষিণ আফ্রিকার প্রসিদ্ধ ব্যারিস্টার পরলোকগত মি. লেনর্ড যে উক্তি করিয়াছিলেন তাতে এই কথার জোরালো প্রতিধ্বনি শুনিতে পাইয়াছিলাম। আমার এক কেসে দেখিতে পাই যে ন্যায় আমার মক্কেলের পক্ষে হইলেও আইন তার বিপক্ষে। হতাশ হইয়া মি. লেনর্ডের শরণ লই। তাঁরও মনে হয় যে কেস তথ্যে বলবান। তিনি বলিয়া ওঠেন, 'গান্ধী, আমি একটা জিনিস শিখেছি আর তা এই—তথ্য বাগ মানে ত আইন তার পিছু হাঁটে। এই কেসের তথ্যের গভীরে আমাদের যেতে হবে।' এই বলিয়া তিনি আবার আমাকে কেসের তথ্য বাছবিচার করিয়া দেখিতে বলেন এবং পরে তাঁর কাছে যাইতে বলেন। আবার যখন তথ্য বিচার করিলাম ও গভীর চিন্তা করিলাম তখন দেখিতে পাইলাম যে কেসটার রঙ একদম বদলাইয়া গিয়াছে: দক্ষিণ আফ্রিকার পুরানো এক কেসের নজিরও স্বপক্ষে মিলিয়া গেল। আনন্দ আমার ধরে না; মি. লেনর্ডের কাছে গেলাম, সব বৃত্তান্ত

তাঁকে বলিলাম। খুশী হইয়া তিনি বলিলেন, 'উত্তম, ও কেস আর নেয় কে! কেবল দেখতে হবে কোন্ জজের কাছে কেসটা হবে।'

তথ্যের স্থান যে এত বড় তার সম্যক্ ধারণা অবদুল্লা শেঠের কেস তৈরি করার সময়ে আমার ছিল না। তথ্য মানে সত্য; সত্য আশ্রয় করিয়াছেন ত আইন আপনার সাহায্যে দৌড়িয়া আসিবে। আমি বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে তথ্যে অবদুল্লার কেস সবল আর তাই আইন তাঁর পক্ষে আসিতে বাধ্য। কিন্তু ইহাও আমি দেখিতে পাই যে মকদ্দমা চলিলে একে অন্যের আত্মীয় ও একই শহরের নিবাসী বাদী-বিবাদী দুইয়েরই সর্বনাশ হইবে। কোর্টে গেলে কেস যে কত দিন চলিবে তারও কোন নিশ্চয়তা ছিল না। অনেক দিন চলিলে দুই পক্ষেরই ক্ষতি। অতএব দুই পক্ষই চাহিতেছিল যে সম্ভবপর হইলে কেস তাড়াতাড়ি শেষ হয় ত ভাল।

আমি তৈয়ব শেঠের কাছে গেলাম—আপসে কেস মিটাইয়া ফেলিতে অনুরোধ করিলাম, পরামর্শ দিলাম। তাঁকে তাঁর উকিলের সহিত কথা বলিতে বলিলাম। আরও বলিলাম যে দুই পক্ষেরই বিশ্বাস আছে এমন কোন ব্যক্তিকে সালিস মানিলে কেস ঝটপট মিটিয়া যাইতে পারে। দিন দিন বাড়িয়া-চলা উকিল-খরচার কথা বলিয়া বলিলাম, এভাবে কেস চলিলে হইলেনই বা আপনারা উভয় পক্ষ বড় ব্যবসায়ী তবু ইহার তাল সামলানো কারো পক্ষেই সহজ হইবে না। কেসের জন্য এত ভাবনা-চিন্তা তাঁদের করিতে হইতেছিল যে কোন কাজ নিশ্চিন্ত মনে তাঁরা করিতে পারিতেছিলেন না। দুই পক্ষের শত্রুতা বাড়িয়া চলিয়াছিল।

ওকালতির ওপর আমার বিতৃষ্ণা জন্মে। উভয় পক্ষের আইনজীবীরা উকিলের ধর্ম জ্ঞানে নিজ নিজ মক্কেলকে জয়ী করার জন্য তন্ন তন্ন করিয়া আইনের খুঁটিনাটি খুঁজিতেছিল। যত টাকা খরচ হয় তার সবটা যে জয়ী পক্ষ প্রতিপক্ষ হইতে খরচ-বাবদ পায় না সে কথা এই কেসের আগে আমার জানা ছিল না। খরচ যতই হোক কোর্ট ফি রেগুলেশন মতে খরচা মঞ্জুরির একটা বাঁধা-ধরা হার আছে। এটর্নি ও মক্কেলের মধ্যে প্রকৃত খরচের হার তার চাইতে অনেক বেশি। উহা আমার সহ্য হইল না। আমার মনে হয় দুই পক্ষের বন্ধুরূপে দুই পক্ষের মিলন ঘটানো আমার কর্তব্য: মিটমাটের আমি প্রাণপণ চেষ্টা করি। শেষটায় তৈয়ব শেঠ রাজী হন। সালিস মানা হয়। তাঁর সামনে সওয়াল-জবাব হয়। দাদা অবদুল্লার জয় হয়।

কিন্তু এতেই আমার সন্তোষ ছিল না। অবদুল্লা শেঠ সালিসের ধার্য সব টাকা যদি একবারে চাহিতেন ত তৈয়ব শেঠ খান মহম্মদের পক্ষে তা তখনই মিটানো অসম্ভব হইত। 'প্রাণ দেব, দেউলে হব না' এরূপ একটা অলিখিত ঘরোয়া নিয়ম দক্ষিণ আফ্রিকানিবাসী পোরবন্দরের মেমনরা মানিয়া চলিত। খরচা সমেত ৩৭০০০ হাজার পাউণ্ড এককালে দেওয়ার শক্তি তৈয়ব শেঠের ছিল না। তাঁর পণ ছিল দেউলে না হইয়াই পাওনার শেষ কড়িটি পর্যন্ত দিবেন। একটা মাত্র পথ ছিল। দাদা অবদুল্লা সহজ কিস্তিবন্দিতে টাকা লইতে স্বীকার করিলে সব দিক রক্ষা হইতে পারিত। দাদা অবদুল্লা সেই উদারতা দেখাইলেন, লম্বা কিস্তিবন্দিতে টাকা লইতে সম্মত হইলেন। সালিসিতে রাজী করাইতে যত-না কষ্ট হইয়াছিল তার অপেক্ষা অনেক বেশি কষ্ট হইয়াছিল এই সুবিধা আদায় করিতে। নিষ্পত্তি হওয়াতে দুই পক্ষই সন্তুষ্ট হয়; দুই পক্ষেরই প্রতিষ্ঠা বাড়ে। আমার সন্তোষের অবধি ছিল না। যথার্থ ওকালতি আমি শিখি: 'যার মধ্যে যে গুণ রহিয়াছে সেই গুণের সহায়ে মানুষের অন্তরে প্রবেশ করার শিক্ষা আমি লাভ করি। আমি দেখিতে পাই যে দুই পক্ষের টুকরা হৃদয় জোড়া দেওয়া উকিলের ধর্ম। এই শিক্ষা আমার গভীরে এতটা প্রবেশ করিয়াছিল যে আমার কুড়ি বছরের ওকালতির অধিকাংশ কাল আমি আপিসে বসিয়া শত শত কেস আপসে মিটাইতেই কাটাইয়াছি। তাতে আমি কিছুই খোয়াই নাই—টাকাও নয়, আর আত্মা ত নয়ই।

১৫

ধর্মীয় মন্থন

এখন আবার খ্রীস্টান বন্ধুদের কথায় ফিরিয়া যাইতে হয়।

আমার ভবিষ্যতের ভাবনা মি. বেকরের বাড়িয়াই চলিতেছিল। তিনি আমাকে ওয়েলিংটন কনভেনশনে লইয়া যান। ধর্মজাগৃতি বা আত্মশুদ্ধির নিমিত্তে প্রোটেস্টাণ্ট খ্রীস্টানেরা কয়েক বৎসর অন্তর অন্তর এইরূপ সম্মেলনের আয়োজন করিয়া থাকে। একে ধর্মের পুনঃস্থাপন বা পুনরুজ্জীবনও বলা চলে। ওয়েলিংটন সম্মেলন এই ধরনের ছিল। সেখানকার ধর্মপ্রাণ পাদরী রেভারেণ্ড এণ্ড মারে সম্মেলনের সভাপতি ছিলেন। মি. বেকরের বিশ্বাস

ছিল যে সম্মেলনের ধর্মজাগৃতির, সম্মেলনে উপস্থিত লোকদের ধর্মীয় উৎসাহের ও অকপট শুদ্ধভাবনার এমন পরশ আমাতে লাগিবে যে খ্রীস্টান না হইয়া আমার উপায় থাকিবে না।

কিন্তু তাঁর আসল ভরসা ছিল প্রার্থনার শক্তিতে। প্রার্থনায় তাঁর গভীর বিশ্বাস ছিল। তিনি মনে করিতেন অন্তরের প্রার্থনা ঈশ্বরের দরবারে না পৌঁছিয়া যায় না। ব্রিস্টল-এর মূলর ও তাঁর মত ব্যক্তিদের উদাহরণ দিয়া বলিতেন যে তাঁরা নিজেদের জাগতিক ব্যাপারেও প্রার্থনার শরণ লইতেন। তাঁর কথা আমি খোলা মনে শুনিতাম ও বলিতাম যে খ্রীস্টান হওয়ার তাগিদ অন্তরে অনুভব করিলে খ্রীস্টান হইতে আমার বাধিবে না। অন্তরের ডাক মত চলার অভ্যাস অনেক দিন আগেই আমার হইয়াছিল বলিয়া ওরূপ অবাধে আমি তাঁকে এই কথা দিয়াছিলাম। অন্তরের নির্দেশে চলা আমার পক্ষে আনন্দের ছিল ; উল্টা চলা দুঃখের ছিল, কঠিন ছিল।

আমরা ওয়েলিংটনে যাই। এই 'শ্যাম' সাথী সঙ্গে ছিল বলিয়া মি· বেকরের বেগ পাইতে হইয়াছিল। আমার নিমিত্তে অনেক বার তিনি অসুবিধায় পড়িয়াছিলেন। মি· বেকরের সংঘ রবিবারে পথ চলিত না। মধ্যে রবিবার পড়িয়াছিল বলিয়া পথে একদিন থামিতে হইয়াছিল। স্টেশন হোটেলের ম্যানেজার আমায় স্থান দিবে না। মি· বেকর সহজে ছাড়িবার পাত্র ছিলেন না। তাঁর পণ ছিল যাত্রীর দাবি আদায় করিবেনই। অনেক কথা-কাটাকাটির পর হোটেল ম্যানেজার আমাকে থাকিতে দেয় কিন্তু খাওয়ার ঘরে গিয়া খাইতে দিতে সাফ অস্বীকার করে। মি· বেকর আর কি করেন। তাঁর অসুবিধা আমি বুঝিয়াছিলাম। ওয়েলিংটনে আমি তাঁর সঙ্গে ছিলাম। এম্নিতর অসুবিধা আমার দরুন তাঁকে ভুগিতে হইয়াছিল। তা তিনি ঢাকিতে আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু তা আমার চক্ষু এড়াইয়া যায় নাই।

ভক্ত খ্রীস্টানেরা সম্মেলনে একত্র হইয়াছিল। তাদের বিশ্বাস দেখিয়া আমি মুগ্ধ হইয়াছিলাম। মি· মারের সহিত আমি দেখা করিয়াছিলাম। দেখিতে পাই অনেকে আমার নিমিত্তে নিবিড় প্রার্থনা করিতেছিল। তাদের কতকগুলি ভজন বেশ ভাল লাগিয়াছিল।

সম্মেলন তিন দিন চলে। সম্মেলনে যারা আসিয়াছিল, দেখিতে পাইলাম তারা ভক্তজন ; তাদের প্রতি মনে শ্রদ্ধাও জন্মিয়াছিল। কিন্তু আমার বিশ্বাস,

আমার ধর্ম পরিবর্তনের কোন হেতু আমি খুঁজিয়া পাই নাই। খ্রীস্টান হইলে আমার সামনে স্বর্গের দ্বার খুলিয়া যাইবে বা আমি মোক্ষ লাভ করিব এ কথা আমি মানিয়া লইতে পারি নাই। এই কথা যখন তাঁদের বলি তাঁরা ব্যথা পান। কিন্তু তা বলা ছাড়া আমার উপায় ছিল না।

আমার খটকা ইহা অপেক্ষাও গভীর ছিল। 'যীশু খ্রীস্টই একমাত্র ঈশ্বরের পুত্র : তারে যে ভজে সে তরে' এই কথা আমি গিলিতে পারিতেছিলাম না। ঈশ্বরের পুত্র হইতে পারে এ কথা মানি ত আমরা সকলেই তাঁর পুত্র। যীশুকে যদি ঈশ্বরতুল্য বা ঈশ্বর বলা হয় তবে মানুষমাত্রকেই ঈশ্বরতুল্য বা ঈশ্বর বলিতে হয়। যীশু নিজের জীবন দিয়া, রক্ত দিয়া জগতের পাপ মোচন করিয়াছিলেন এ কথা অক্ষরে অক্ষরে বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত ছিলাম না, থাকিলই বা রূপকের আবডালে উহাতে কিছুটা সত্য। তা ছাড়া খ্রীস্টানদের বিশ্বাস এই যে, কেবল মানুষেরই আত্মা আছে, অন্য জীবের নাই আর দেহের শেষেই উহাদের সব শেষ। কিন্তু আমি তার উল্টা মনে করিতাম আর আজও করি। এ কথা মানিতে প্রস্তুত আছি যে যীশু আত্মত্যাগী ছিলেন, মহাত্মা ছিলেন, দৈবী শিক্ষক ছিলেন, কিন্তু অদ্বিতীয় পুরুষ বলিয়া তাঁকে মানিতে আমি অক্ষম। যীশুর মৃত্যু জগতের কাছে এক মহান্ দৃষ্টান্ত ধরিয়াছে, কিন্তু তাঁর মৃত্যুতে অঘটন ঘটাইবার গুহ্য শক্তি ছিল এই কথা আমার হৃদয় মানিয়া লইতে পারে নাই। অন্য ধর্মের শুদ্ধ জীবনে মিলে না এমন বস্তু শুদ্ধ খ্রীস্টান জীবনে আমি দেখিতে পাই নাই। খ্রীস্টানদের জীবনে যে পরিবর্তন ঘটার কথা শোনা যায় অন্যের জীবনেও আমি তেমন পরিবর্তন ঘটিতে দেখিয়াছি। তত্ত্বের দিক হইতে খ্রীস্টান তত্ত্বে অপূর্ব কিছু দেখিতে পাই না। ত্যাগের দৃষ্টিতে দেখিলে আমি দেখিতে পাই খ্রীস্টানেরা এই বিষয়ে হিন্দুদের অনেক পিছনে পড়িয়া আছে। খ্রীস্ট ধর্মকে আমি পূর্ণ বা সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম বলিয়া গণ্য করিতে পারি নাই।

প্রসঙ্গ উঠিলেই খ্রীস্টান বন্ধুদের সঙ্গে আমার এই হৃদয়-মন্থনের আলোচনা করিতাম। ইহার কোন সন্তোষজনক উত্তর তাঁদের কাছ হইতে পাই নাই।

খ্রীস্ট ধর্মের পূর্ণতা বা শ্রেষ্ঠতা যেমন স্বীকার করিতে পারি নাই তেমন হিন্দু ধর্মের পূর্ণতা ও শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধেও তখন আমার সংশয় ছিল। হিন্দু-ধর্মের নানা ত্রুটি আমার চোখের ওপর ভাসিত। অস্পৃশ্যতা যদি হিন্দুধর্মের অঙ্গ হয় ত আমার দৃষ্টিতে তা ছিল উহার গলিত অঙ্গ বা বিষফোঁড়া। এত

সম্প্রদায় ও এত জাতপাত যে কেন তা আমি বুঝিতাম না। বেদ ঈশ্বরপ্রণীত হয় ত বাইবেল ও কোরান ঈশ্বরপ্রণীত নয় কেন, এই প্রশ্নের উত্তর আমি খুঁজিয়া পাইতাম না।

খ্রীস্টান বন্ধুদের মত মুসলমান বন্ধুরাও আমাকে তাঁদের ধর্মে টানিতে চেষ্টা করিতেন। অবদুল্লা শেঠ অনুক্ষণ ইসলামের গুণ কীর্তন করিতেন; ইসলামের অধ্যয়নে রুচি সৃষ্টি করিতে যত্ন করিতেন।

আমার সংশয়ের কথা রায়চাঁদ ভাইকে লিখি। ভারতের অন্য ধর্ম-শাস্ত্রীদের সহিতও পত্রব্যবহার চলে। সেই সব পত্রের জবাবও পাই। রায়চাঁদ ভাইয়ের পত্রে আমার সংশয় কিছুটা দূর হয়। তিনি আমাকে ধৈর্য ধরিতে ও হিন্দুধর্মের গভীর অধ্যয়ন করিতে পরামর্শ দেন। তাঁর একটি বাক্যের মর্ম এই ছিল: 'পক্ষপাতশূন্য বিচারের পরে আমার এই বিশ্বাস জন্মেছে যে হিন্দুধর্মে যে সূক্ষ্ম ও গূঢ় বিচার, আত্মার নিরীক্ষণ, দয়া রয়েছে তা অন্য ধর্মে দেখা যায় না।'

সেলের কোরান কিনিলাম ও পড়িতে আরম্ভ করিলাম। ইসলাম সম্পর্কে অন্য বইও সংগ্রহ করিলাম। বিলাতের খ্রীস্টান বন্ধুদের সঙ্গে পত্র-ব্যবহার চলিতে থাকে। তাঁদের একজন এডওয়ার্ড মেটলণ্ড-এর সহিত আমার পরিচয় করাইয়া দেন। তাঁর সঙ্গে পত্র-লেখালেখি চলে। এনা কিংস্-ফোর্ড ও তিনি উভয়ে মিলিয়া যে পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন সেই 'পারফেক্ট ওয়ে' পুস্তক আমাকে তিনি পাঠান। তাতে চলতি খ্রীস্টধর্মের খণ্ডন ছিল। 'বাইবেলের নয়া অর্থ' নামক আর একখানি বইও তিনি আমাকে পাঠাইয়া-ছিলেন। এই দুইখানি বইই আমার ভাল লাগিয়াছিল। হিন্দু মতের সমর্থন এই দুই পুস্তকে আমি দেখিতে পাইয়াছিলাম। টলস্টয়ের 'বৈকুণ্ঠ আমার হৃদয়ে' আমার মন কাড়িয়া লয়। উহা আমার মনে গভীর দাগ কাটে। এই বইয়ের স্বাধীন বিচার, পরিপক্ক নৈতিক দৃষ্টি ও সত্যানুরাগের কাছে কোটসের দেওয়া সবগুলি বই আমার কাছে নেহাত ফিকা, নেহাত ফেলনা মনে হয়।

খ্রীস্টান বন্ধুরা চাহিত না এমন এক দিকে এই সব অধ্যয়ন আমাকে টানিয়া নেয়। এডওয়ার্ড মেটলণ্ড-এর সহিত আমার অনেক দিন পত্রব্যবহার চলিয়াছিল আর কবি রায়চাঁদ ভাইয়ের সহিত তাঁর জীবনের শেষ দিন অবধি। 'পঞ্চীকরণ', 'মণিরত্নমালা', যোগবাসিষ্ঠ-এর 'মুমুক্ষু প্রকরণ',

হরিভদ্র সুরীর 'ষড়দর্শন সমুচ্চয়' ইত্যাদি অনেকগুলি বই তিনি আমাকে পাঠাইয়াছিলেন। আমি সেইসব বই পড়িয়াছিলাম।

খ্রীস্টান বন্ধুদের অভিপ্রেত পথ আশ্রয় না করিয়া যদিও অন্য পথ আশ্রয় করিয়াছি তবুও আমার অন্তরে তাঁরা যে ধর্মজিজ্ঞাসা জাগাইয়াছিলেন তার জন্য চিরকাল আমি তাঁদের নিকট ঋণী থাকিব। তাঁদের সংসর্গের কথা চিরদিন আমার মনে থাকিবে। পরে ওই মধুর শুদ্ধ সংসর্গের গণ্ডি দিন দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে, কমে নাই।

১৬

'কো জানে কল কী ?'

খবর নহী ইস জুগমেঁ পল কী
সমঝ মন! কো জানে কল কী ?

কেস শেষ হইল। প্রিটোরিয়ায় থাকার আর কারণ ছিল না। ডারবনে গেলাম। ভারতে ফিরিবার জন্য তৈরি হইলাম। বিনা সংবর্ধনায় অবদুল্লা শেঠ আমায় বিদায় দিবেন তা কি হয়! আমাকে বিদায় দেওয়ার জন্য সিডনহামে এক ভোজসভার আয়োজন করেন।

সেখানে সারা দিন থাকার কথা ছিল। পাশেই কতকগুলি খবরের কাগজ ছিল। আমি সেগুলি পাল্টাইতেছিলাম। একটা কাগজের এক কোণে 'ইণ্ডিয়ন ফ্র্যাঞ্চাইজ' শিরোনামায় ছাপা খবরের ওপর আমার চোখ পড়ে। খবরটার মর্ম এইরূপ ছিল: নাতাল বিধানসভার সদস্য নির্বাচনে ভারতীয়দের যে ভোটাধিকার ছিল তা বাতিল হইতে চলিয়াছে। সে উদ্দেশ্যে বিধানসভায় এক বিলের আলোচনা চলিতেছে। এই বিলের কথা আমি জানিতাম না। ভোজসভায় উপস্থিত লোকেরাও সে খবর রাখিতেন না।

অবদুল্লা শেঠকে বিলের কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন, 'এর আমরা বুঝি কি? ব্যবসায়ে হাত পড়ে ত সেই খবর আমরা পাই ও বুঝি। দেখুন না, অরেঞ্জ ফ্রী স্টেটে আমাদের ব্যবসা বিনষ্ট হয়ে গেছে। তার বিরুদ্ধে আমরা আন্দোলন করেছি কিন্তু ফল কিছুই হয় নাই। সংবাদপত্র নিই বটে কিন্তু তাতে দৈনিক বাজারদরটাই সাধারণত দেখি। আইনের

কথার আমরা কি জানি? আমাদের চোখ কান আমাদের গোরা উকিল।'

আমি বলি 'কেন! এখানে জন্মেছে, ইংরেজী লেখাপড়া করেছে এমন অনেক ভারতীয় যুবক ত এখানে আছে। তারা কি করে?'

কপালে হাত ঠেকাইয়া অবদুল্লা শেঠ বলেন, 'আরে ভাই, তাদের কাছ থেকে কি কিছু পাওয়ার আশা আছে? এর তারা কি বুঝবে? তারা আমাদের দিকে ফিরেও তাকায় না। আর সত্য বলি ত আমরাও তাদের ছায়া মাড়াই না। তারা খ্রীস্টান। তারা পাদরীদের মুঠোয় আর পাদরীরা সকলেই গোরা ও সরকারের তাঁবে।

আমার চোখ খুলিয়া গেল। বুঝিলাম তাদের নিজের করিয়া লইতে হইবে। খ্রীস্টধর্মের মানে কি এই? খ্রীস্টান হইয়াছে বলিয়া কি ভারতীয়ত্ব তাদের মুছিয়া গিয়াছে? তারা পরদেশী হইয়া গিয়াছে?

কিন্তু আমি ত দেশে ফিরিয়া যাইতেছি সুতরাং এই কথা বলিতে যাই কেন এ কথা মনে করিয়া মনের ভাব চাপিয়া গেলাম। অবদুল্লা শেঠকে কেবল বলিলাম, 'এই বিল পাস হলে আমাদের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হবে। এটা আমাদের উৎখাতের প্রথম কোপ। আমাদের আত্মসম্মান বলে কিছু থাকবে না।'

অবদুল্লা শেঠ বলিলেন, 'তা থাকবে না। তবে আমাদের 'ফরেন্‌-চাইজের' (এমনটা রূপ বদলাইয়া অনেক ইংরেজী শব্দ ভারতীয়দের মধ্যে চালু হইয়া গিয়াছিল। ভোটাধিকার বলিলে কেহ বুঝিত না।) কাহিনী আপনাকে বলি। এর কোন খবর আমরা রাখতাম না। আমাদের বড় এটর্নিদের একজন মি. এস্‌কম্ব (তাঁকে আপনি জানেন) এই জিনিসটা আমাদের শক্ত মাথায় ঢোকান। ইতিহাস এই, মি. এস্‌কম্ব বড় লড়িয়ে। এখানকার জেটি ইঞ্জিনিয়রের সঙ্গে তাঁর জোর ভোটযুদ্ধ চলে। এতে তাঁর বিধান সভায় যাওয়ার পক্ষে বাধা সৃষ্টি হয়। আমাদের ভোটাধিকারের কথা তিনি আমাদের বলেন। তাঁর কথায় আমরা ভোটর হই। আমাদের ভোটে তিনি জয়ী হন। এ থেকে আপনি দেখতে পাচ্ছেন আপনার চোখে ভোটের যে মূল্য আমাদের চোখে তার সে মূল্য নয়। কিন্তু আপনি যা বলছেন তা বুঝতে পারছি। বলুন আমাদের কি করা উচিত?'

অতিথিরা এই কথা মনোযোগ দিয়া শুনিতেছিলেন। তাঁদের একজন বলেন, 'মনের কথা বলব? এই স্টীমারে যদি না যান, মাস দুইমাস যদি থেকে যান ত আপনি যেমন বলবেন আমরা লড়ব।'

এক স্বরে সকলে তাঁর কথায় সায় দিয়া বলিলেন, 'ইনি ঠিক বলেছেন, ঠিক বলেছেন। অবদুল্লা শেঠ, গান্ধীভাইকে আপনি আটকান।'

শেঠ ঝানু লোক ছিলেন। তিনি বলেন, 'এঁকে এখন থেকে যেতে বলার অধিকার আমার নেই। অথবা আমার যতটা দাবি আপনাদেরও ততটাই দাবি রয়েছে। তবে আপনাদের কথা খুবই সঙ্গত। আসুন, সকলে মিলে আমরা এঁকে থাকতে বলি। কিন্তু ইনি ত ব্যারিস্টার। ওঁর ফী-র কি হবে?'

ফী-র প্রস্তাবে দুঃখ হইল। তাঁর কথায় বাধা দিয়া বলিলাম, 'অবদুল্লা শেঠ, এতে ফী-র কথা ওঠেই না। দশের কাজে ফী হতে পারে না। থাকি ত সেবকরূপে থাকতে পারি। আপনি জানেন যে এই সকল বন্ধুদের সঙ্গে আমার ঠিক পরিচয় নেই। তা হোক, আপনি যদি মনে করেন এঁরা সব আমার কাজে সহায় হবেন তবে আমি এক মাস থেকে যেতে প্রস্তুত আছি। তবে একটা কথা। আপনাদের আমাকে কিছু দিতে হবে না বটে, তা হলেও এ কাজ একেবারে বিনা পয়সায় হতে পারে না। আমাদের তার করতে হতে পারে, প্রচারপত্র ছাপতে হতে পারে, এখানে-ওখানে যেতে হতে পারে, এখানকার এটর্নিদের পরামর্শ নেওয়া দরকার হতে পারে, আর এখানকার আইনের পরিচয় নেই বলে নজির ইত্যাদির জন্য আইন-বই কেনা আবশ্যক হতে পারে। তা ছাড়া এ একার কাজ নয়। অনেককে আমার সাহায্যে এগিয়ে আসতে হবে।'

বহু কণ্ঠে আওয়াজ উঠিল: 'আল্লার মেহেরবানি। পয়সা এসে যাবে। লোকও যত চান পাবেন। আপনি দয়া করে থেকে যান ত ব্যস।'

বিদায়সভা এইভাবে কার্যকরী সমিতির রূপ পাইল। খাওয়া দাওয়া ঝটপট সারিয়া ঘরে ফিরিবার প্রস্তাব করিলাম। মনে মনে লড়াইয়ের একটা ছক কাটিয়া লইলাম। ভোটের অধিকার কত লোকের ছিল সেই সংখ্যা সংগ্রহ করিলাম। বলিলাম এক মাস থাকিব।

এইভাবে ঈশ্বর আমার দক্ষিণ আফ্রিকা প্রবাসের ভিত্তি রচনা করেন ও জাতির আত্মসম্মান রক্ষার লড়াইয়ের বীজ বোনেন।

১৭

নাতালে থাকিয়া গেলাম

তখন (১৮৯৩ সনে) নাতালের ভারতীয় সমাজের মুখ্য নেতা ছিলেন শেঠ হাজী মহম্মদ হাজী দাদা। বিষয়-আশয়ের দৃষ্টিতে শেঠ অবদুল্লা হাজী আদমের স্থান প্রথম ছিল, কিন্তু তিনি ও অন্য সবে দশের ব্যাপারে শেঠ হাজী মহম্মদকে অগ্রস্থান দিতেন। অতএব তাঁর সভাপতিত্বে অবদুল্লা শেঠের গৃহে সভা হয়। সভায় ফ্র্যান্চাইজ বিলের বিরোধ করা স্থির হয়। স্বেচ্ছা-সেবকও সংগ্রহ করা হয়।

এই সভায় নাতালে জন্ম হইয়াছে এমন ভারতীয়দের অর্থাৎ মোটামুটি বলিলে খ্রীস্টান ভারতীয় যুবকদেরও ডাকা হইয়াছিল। ডারবন কোর্টের দোভাষী মি. পল ও মিশন স্কুলের হেডমাস্টার মি. সুভান গডফ্রে সভায় আসিয়াছিলেন। আর তাঁদের চেষ্টায় অনেক খ্রীস্টান যুবকও আসিয়াছিল। স্বেচ্ছাসেবক হইতে বলিলে তারা সকলে স্বেচ্ছাসেবক হয়।

এ কথা না বলিলেও চলে যে শেঠ দাউদ মহম্মদ, কাসম কমরুদ্দীন, শেঠ আদমজী মিঞাখান, এ. কোলন্দাবেল্লু পীলে, সী. লছীরাম, রঙ্গসামী পডিয়াচী, আমদ জীবা প্রভৃতি অনেক ব্যবসায়ী স্বেচ্ছাসেবক হইয়াছিলেন। পারসী রুস্তমজী ত ছিলেনই। দাদা অবদুল্লা ও অন্য বড় বড় গদির কেরানীকুল হইতে যাঁহারা স্বেচ্ছাসেবক হইয়াছিলেন তাঁদের মধ্যে পারসী মানেকজী, জোশী, নরসীরাম প্রভৃতির নাম করা যাইতে পারে। দশের কাজে যোগ দিয়াছেন ইহা তাঁদের কাছে আশ্চর্যের ব্যাপার ছিল। দশের কাজে তাঁদের ডাকা হইবে আর তাঁরা তাতে যোগ দিবেন ইহা ছিল তাঁদের জীবনের এই প্রথম অনুভব। এই বিপদের মুখে লোকের মন হইতে উঁচু-নীচু, ছোট-বড়, মালিক-নোকর, হিন্দু-মুসলমান, পারসী-খ্রীস্টান-গুজরাটী-মাদ্রাজী-সিন্ধী ইত্যাদি ভেদভাব দূর হইয়া গিয়াছিল—তারা সকলেই তখন ভারতের সন্তান, ভারতের সেবক।

বিলের দ্বিতীয় শুনানী হইয়া গিয়াছিল বা হইবার ছিল। বিলের সমর্থনে বক্তৃতায় বলা হইয়াছিল যে, এত বড় কঠোর আইন পাস হইতে যাইতেছে তবু ভারতীয়দের পক্ষ হইতে উহার কোন প্রতিবাদ হয় নাই ইহা

হইতে পরিষ্কার দেখা যায় যে ভারতীয়রা ভোটাধিকার পাওয়ার যোগ্য নয়।

অবস্থাটা সভায় বুঝাইয়া বলিলাম। বিলের আলোচনা মুলতবী রাখার জন্য বিধান সভার স্পীকারের নিকট তারে অনুরোধ জানানো হইল। মুখ্য মন্ত্রী সার জন রবিনসনের কাছেও তেমন তার করা হয়। দাদা অবদুল্লার বন্ধু মি· এস্‌কম্বকেও তার দ্বারা সব জানানো হয়। বিধান সভার স্পীকার সঙ্গে সঙ্গে জানান যে বিধান সভার অধিবেশন দুই দিনের জন্য স্থগিত রাখা গেল। সকলে খুশী হইল।

বিধান সভায় পেশ করার জন্য আরজি মুসাবিদা করিলাম, তিন প্রস্থ নকল দরকার ছিল। তা বাদে সংবাদপত্রের জন্য আর এক প্রস্থ। যত পারা যায় তত স্বাক্ষর সংগ্রহ করার ছিল। হাতে ছিল এক রাত মাত্র। ইংরাজী জানা স্বেচ্ছাসেবকেরা ও অন্য স্বেচ্ছাসেবকেরা প্রায় সারারাত এই কাজ করেন। তাঁদের একজনের হাতের লেখা অতীব সুন্দর ছিল। সেই বৃদ্ধ মি· আর্থার মূল প্রতিলিপি করেন। অন্যান্য নকল আর সবে করেন। এক জনে বলিতেছিল আর পাঁচ জনে লিখিতেছিল। এইভাবে এক এক বারে পাঁচ-পাঁচটা প্রতিলিপি তৈয়ার হইতেছিল। নকল তৈরি হইলে ব্যবসায়ী স্বেচ্ছাসেবকগণ নিজেদের গাড়ীতে বা গাড়ী ভাড়া করিয়া স্বাক্ষর সংগ্রহের জন্য বাহির হইয়া পড়েন। অল্প সময় মধ্যে সব কাজ হইয়া যায়।

আরজি পাঠানো হইল। সংবাদপত্রে তা ছাপা হইল। তার অনুকূলে মন্তব্যও প্রকাশিত হইল। বিধান সভার উপরও আরজির প্রভাব হয়। সেখানে খুব আলোচনা চলে। আরজির যুক্তি খণ্ডনের চেষ্টা বিলের সমর্থকেরা করেন। কিন্তু তাঁদের যুক্তি ছিল পঙ্গু। তা হইলেও বিল পাস হইয়া যায়।

এইরূপ যে হইবে তা সকলেই আমরা জানিতাম। কিন্তু এর ফলে ভারতীয়দের মধ্যে নূতন জীবনের সঞ্চার হয়। সকলে বুঝিতে পায় যে আমরা এক জাতি ; কেবল ব্যবসায়ের স্বার্থে লড়াই আমাদের কর্তব্য তা নয়, জাতির স্বার্থে লড়াও আমাদের সকলের ধর্ম।

সেই সময়ে লর্ড রিপন উপনিবেশ মন্ত্রী ছিলেন। স্থির হয় হাজারো লোকের স্বাক্ষরে এক আরজি তাঁর নিকট পাঠানো হইবে। কাজটি সহজ

ছিল না, আর তা একদিনের কাজও ছিল না। স্বেচ্ছাসেবক করা হইল। তাঁরা সকলে আপন আপন কাজ ঠিকমত করিলেন।

দরখাস্ত মুসাবিদা করিতে আমায় বিস্তর খাটিতে হইয়াছিল। এই বিষয়ে যত পুঁথিপত্র সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলাম পড়িয়া লইয়াছিলাম। নীতি ও কৌশল এই দুই পায়ার ওপর আমি আরজি খাড়া করিয়াছিলাম। নিজেদের দেশে ভারতবাসীদের এক রকমের ভোটাধিকার আছে অতএব নাতালেও ভারতীয়দের ভোটে অধিকার আছে এই ছিল নৈতিক যুক্তি। আর ভোট দেওয়ার মত ভারতীয়ের সংখ্যা নাতালে অতি অল্প বলিয়া যে ভোটাধিকার তাদের আছে তা বহাল রাখিলে কোন হানি নাই এই ছিল কূট মিনতি।

আরজিতে দশ হাজার লোকের সই ছিল। এক পক্ষকাল মধ্যে ওই সহি যোগাড় করা হইয়াছিল। এটাকে পাঠক যেন ছোট ব্যাপার মনে না করেন। গোটা নাতাল হইতে সহি সংগ্রহ করা হইয়াছিল। এই কাজ কর্মীদের কাছে নূতন ছিল। তার ওপর নিশ্চয় করা গিয়াছিল যে স্বাক্ষরকারী যতক্ষণ জিনিসটা ঠিকমত না বুঝিবে ততক্ষণ তার সহি লওয়া হইবে না। সুতরাং বিশেষ যোগ্য স্বেচ্ছাসেবক সহি সংগ্রহের জন্য পাঠাইতে হইয়াছিল। তাতে গ্রামগুলি ছিল দূরে দূরে। অতএব বহু সংখ্যক সেবক মনপ্রাণ ঢালিয়া কাজ করিলেই কেবল অল্প সময়ে এই কাজ হইতে পারিত আর অমনটা মনপ্রাণ ঢালিয়াই তাঁরা কাজ করিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে শেঠ দউদ মহম্মদ, পারসী রুস্তমজী, আদমজী মিঞাখান ও আমদ জীবার মূর্তি আজও আমার চোখের সামনে ভাসে। এঁরাই সব চাইতে বেশি স্বাক্ষর সংগ্রহ করিয়াছিলেন। দাউদ শেঠ নিজের গাড়ীতে বাহির হইতেন, সারা দিন দ্বারে দ্বারে যাইতেন। প্রাণের টানে সকলে এই কাজ করিয়াছিলেন। হাতখরচা পর্যন্ত কেউ নেন নাই। দাদা অবদুল্লার বাড়ী একাধারে ধর্মশালা ও আপিস হইয়া গিয়াছিল। যে সব লেখাপড়া-জানা বন্ধুরা আমার কাজে সহায়তা করিতেন তাঁরা ও অন্য অনেকে ওখানেই খাইতেন। তাই কাণ্ডারীদের সকলেরই বেশ খরচ বহন করিতে হইয়াছিল।

অবশেষে আরজি পেশ করা হয়। উহার এক হাজার প্রতিলিপি ছাপানো হয়। এই আরজির দরুন ভারতের জনসাধারণ নাতালের কথা

জানিতে পায়। যত সংবাদপত্রের ও জননেতার নাম আমি জানিতাম তাদের কাছে আরজির নকল পাঠানো হয়।

'টাইমস অব ইণ্ডিয়া' ভারতীয়দের দাবি জোরালো ভাবে সমর্থন করে। ইংলণ্ডের পত্রসমূহে এবং বিভিন্ন দলের নেতাদের নিকটও আরজির নকল পাঠানো হইয়াছিল। লণ্ডন 'টাইমস'-এর সমর্থন আমরা পাইয়াছিলাম। তাই আমাদের আশা জন্মিয়াছিল যে বিল মঞ্জুর হইবে না।

এখন আর আমার নাতাল ছাড়ার উপায় ছিল না। চারিদিক হইতে লোকে আমাকে ঘিরিয়া ধরিল ও নাতালে বসিয়া যাওয়ার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিল। আমার অসুবিধার কথা তাদের বলিলাম। নিশ্চয় করিয়া ফেলিয়াছিলাম নিজ ব্যয়ের জন্য দশের দেওয়া পয়সা লইব না। ভাল বাড়ীতে ভাল পল্লীতে নিজের মত আলাদা থাকার আবশ্যকতা বোধ করি। অন্য ব্যারিস্টারদের মত থাকিলে ভারতীয়দের মানমর্যাদা বাড়িবে এরূপ তখন আমি মনে করিতাম, বছরে তিন শ পাউণ্ডের কমে অমনটা চালে থাকা সম্ভব ছিল না। তাই বন্ধুদের বলি যে ওই পরিমাণ টাকার ওকালতি কাজ ভারতীয়েরা আমাকে দেয় ত থাকা যাইতে পারে।

তাঁরা বলেন, 'আমাদের ইচ্ছা এই পরিমাণ টাকা আপনি দশের কাজের বদলে নিন। এ টাকা সহজেই এসে যাবে। তা বাদে মক্কেলের কাজ করে যা পাবেন তা ত আপনারই।'

এই কথায় আমি বলি, 'এভাবে পয়সা নেওয়া আমার সাজে না। আমি আমার দশের কাজের মূল্য এতটা দিই না। ব্যারিস্টার হিসাবে এতে বিশেষ কিছু করার নেই। আমার কাজ হবে মুখ্যত আপনাদের সকলের কাছ থেকে কাজ আদায় করে নেওয়া। এর বদলে পয়সা নেওয়া চলে না। তা ছাড়া দশের কাজের জন্য হামেশা আপনাদের কাছে আমার টাকা চাইতে হবে—বছরে ধরুন তিন শ পাউণ্ডের ওপরে। নিজের জন্য টাকা নিই ত দশের কাজের জন্য মোটা টাকা চাইতে আমার বাধবে। আর সে স্থলে আমাদের কাজ থমকে যাবে।'

'কিন্তু আপনাকে আমরা কিছু কাল দেখেছি, বুঝেছি। আপনি কি আপনার নিজের জন্য পয়সা চাইবেন? আপনাকে আমরা এখানে থাকতে বলি ত আপনার খরচ বহন আমাদের কর্তব্য নয় কি?'

'আপনারা আমাকে ভালবাসেন। সেই ভালবাসার টানে আর এই মুহূর্তের উৎসাহ বশে আপনারা এ কথা বলছেন। এই উৎসাহ আর এই ভালবাসা কখনও উবে যাবে না তা কি নিশ্চয় করে বলা যায়? আপনাদের বন্ধু ও সেবকরূপে সময় সময় আপনাদের আমার কড়া কথাও বলতে হবে। তখন আমার ওপর আপনাদের টান থাকবে কি থাকবে না ভগবানই জানেন। মোদ্দা কথা, দশের কাজের বদলে আমি কিছু নেব না। সকলে আপনারা আমাকে আপনাদের উকিল-কাজ দেবেন কথা দেন ত ব্যস। সম্ভবত তা-ও আপনাদের পক্ষে শক্ত হবে। আর যা-ই হই, আমি গোরা ব্যারিস্টার নই। কোর্ট আমার কথায় কান দেবে কি দেবে না কে জানে? আর ওকালতিতে কতটা উতরাব তা-ও জানি নে। অতএব আমাকে আগাম কাজ দেওয়াতে কিছুটা ঝুঁকি আপনাদের নিতে হচ্ছে। তা সত্ত্বেও আপনারা আমাকে যদি উকিল নিযুক্ত করেন তবে বলা যাবে, সার্বজনিক কাজের জন্যই আমাকে রাখছেন।'

এই কথাবার্তার ফলে জন বিশেক ব্যবসায়ী আমাকে এক বছরের জন্য উকিল নিযুক্ত করেন। তা বাদে, দাদা অবদুল্লা বিদায়-উপহার বাবদ যা দিবেন ঠিক করিয়াছিলেন তার বদলে আমার গৃহের আসবাব কিনিয়া দেন।

এইভাবে আমি নাতালে থাকিয়া যাই।

১৮

রঙের বাধা

আদালতের প্রতীক তুলাদণ্ড: এক বয়স্কা অন্ধ কিন্তু জ্ঞানী নারী তার অকম্পিত হাতে যেন তা ধরিয়া আছে। মুখ দেখিয়া কাউকে সে যেন বিচার না করে, গুণের ভিত্তিতে বিচার করে, এই উদ্দেশ্যে বিধি তাকে অন্ধ বানাইয়াছে। কিন্তু নাতালের আইন-পরিষদ নাতালের প্রধান বিচারালয়ের দ্বারা ঠিক ইহার উল্টাটি করাইয়া নেওয়ার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছিল।

কৌঁসিলীর সনদের জন্য সুপ্রীম কোর্টে আবেদন করি। বিলাতের প্রমাণ-পত্র বোম্বাই হাইকোর্টে জমা দিতে হইয়াছিল। তাই এই দরখাস্তের সহিত

বোম্বাই হাইকোর্টের প্রমাণ-পত্র পেশ করিয়াছিলাম। নিয়ম এই যে, সনদের দরখাস্তের সহিত দুইখানি চরিত্র-পত্র পেশ করিতে হয়। আমার মনে হইয়াছিল গোরার হাতের চরিত্র-পত্রের মূল্য বেশি হইবে। তাই অবদুল্লা শেঠের মারফতে পরিচয় হইয়াছিল এমন দুই জন প্রসিদ্ধ গোরা ব্যবসায়ীর নিকট হইতে চরিত্র-পত্র যোগাড় করিয়াছিলাম। দরখাস্ত কোন কৌঁসিলীর মারফতে করার নিয়ম আর এই কাজটা সাধারণত এটর্নি-জেনারল বিনা ফী-তে করিয়া থাকেন। মি. এস্‌কম্ব এটর্নি-জেনারল ছিলেন। আগেই বলিয়াছি, তিনি দাদা অবদুল্লার কৌঁসিলী ছিলেন। তাঁর কাছে গেলাম। তিনি খুশী মনে আমার দরখাস্ত পেশ করিতে রাজী হইলেন।

সনদের বিরোধ করিয়া আইন-সভা আচম্বিতে আমার ওপর এক নোটিশ জারি করে। দরখাস্তের সহিত মূল প্রমাণ-পত্র দেওয়া হয় নাই, এই কারণ আইন-সভা দেখায়। কিন্তু আপত্তির আসল কথা ছিল এই: আদালতে ওকালতি করার নিয়ম রচনাকালে ভাবা যায় নাই যে গোরা ভিন্ন অন্য লোক ওকালতি করার সনদ প্রার্থনা করিবে। গোরাদের সাহস ও উদ্যমে নাতাল বড় হইয়াছে অতএব নাতালে তাদের কর্তৃত্ব থাকা চাই। গোরা ভিন্ন অন্য রঙের লোক প্রবেশ করিলে আস্তে আস্তে গোরাদের কর্তৃত্ব ফুরাইবে; আত্মরক্ষার বেড়া ভাঙ্গিয়া ধসিয়া যাইবে।

আমার আরজির বিরোধ করার জন্য আইন-সভা এক বিখ্যাত কৌঁসিলী নিযুক্ত করিয়াছিল। দাদা অবদুল্লা কোম্পানীর সহিত তাঁরও সম্বন্ধ ছিল। দাদা আবদুল্লার মারফতে তিনি আমাকে ডাকিয়া পাঠান। তিনি খোলা-খুলি আমার সহিত কথা বলেন, আমার ইতিহাস জানিতে চান। আমার কথা শুনিয়া তিনি বলেন:

'আপনার বিরুদ্ধে আমার কিছু বলার নেই। আমার ভয় ছিল উপ-নিবেশে জন্ম হয়েছে এমন কোন ধড়িবাজ লোক হয়ত কেউ হবে! আপনার আবেদনের সঙ্গে মূল প্রমাণ-পত্র না থাকাতে আমার সন্দেহ বেড়েছিল। অন্যের সার্টিফিকেট (ডিপ্লোমা) নিজের বলে চালিয়েছে এমন লোকের কথাও জানি। গোরাদের যে প্রমাণ-পত্র আপনি পেশ করেছেন আমার কাছে তার মূল্য নেই। আপনাকে তারা কতটুকু জানে? আর আপনার সঙ্গে তাদের পরিচয়ই বা কত দিনের?'

'কিন্তু', আমি বলিলাম, 'এখানে সবাই আমার অপরিচিত। এমন কি অবদুল্লা শেঠের সঙ্গে যে পরিচয় তা-ও এখানেই হয়েছে।'

'ঠিক কথা। তবে আপনিই বলছেন যে আপনারা দুইয়ে একই জায়গার লোক। আপনার পিতা ওখানকার দেওয়ান থেকে থাকবেন ত অবদুল্লা শেঠের আপনাদের পরিবারকে জানার কথা। আপনি যদি তাঁর শপথ-পত্র (এফিডেবিট) পেশ করেন তবে আমার কোন আপত্তি থাকবে না। তখন আমি খুশীমনে আইন-সভাকে বলে দেব, এই কেস চালানো আমার পক্ষে সম্ভব হবে না।'

আমার রাগ হইল। মনে মনে বলিলাম, 'দাদা অবদুল্লার চরিত্র-পত্র দিতাম ত তা অগ্রাহ্য হত আর গোরার সার্টিফিকেট ওঁরা চাইতেন। তা ছাড়া, আমার জন্মের সঙ্গে ও পূর্ব ইতিহাসের সঙ্গে ওকালতির যোগ্যতার কি সম্পর্ক আছে! হলামই বা আমি দুষ্ট বা কাঙাল মা-বাপের বেটা কিন্তু সে কথা দিয়ে আমার যোগ্যতার বিচার করা কেন?' কিন্তু নিজকে সামলাইলাম ও শান্তভাবে বলিলাম:

'এই সব কথা জানতে চাওয়ার অধিকার আইন-সভার আছে এ আমি স্বীকার করি না, তবুও আপনার কথামত শপথ-নামা (এফিডেবিট) পেশ করতে রাজী আছি।'

অবদুল্লা শেঠের শপথ-নামা তৈরি হইল। উকিলকে তা দিলাম। তিনি খুশী হইলেন। কিন্তু আইন-সভা খুশী হইল না। আইন-সভা সুপ্রীম কোর্টে আমার সনদের বিরোধ করিল। কিন্তু মি. এস্‌কম্বের কিছু বলার আগেই কোর্ট আইন-সভার আপত্তি অগ্রাহ্য করে। প্রধান বিচারপতি বলেন:

'মূল প্রমাণ-পত্র পেশ করা হয়নি এই আপত্তি অসার। মিথ্যা এফিডেবিট পেশ করে থাকেন ত এঁকে ফৌজদারিতে সোপর্দ করা যেতে পারে, আর দোষী সাব্যস্ত হলে এঁর নাম কেটে দেওয়া যেতে পারে। আইনের চোখে কালো-গোরা ভেদ নাই। অতএব মি. গান্ধীকে এই আদালতের এডভোকেট না করার অধিকার আদালতের নাই। তাঁর আবেদন মঞ্জুর হল। মি. গান্ধী, আপনি শপথ গ্রহণ করতে পারেন।'

দাঁড়াইলাম। রেজিস্ট্রারের কাছে শপথ গ্রহণ করিলাম। শপথ গ্রহণ শেষ হইতেই প্রধান বিচারপতি বলিলেন:

'মি· গান্ধী, এবার আপনার পাগড়ী খুলতে হবে। ব্যারিস্টারি করার সময় আদালতের নির্দিষ্ট পোশাক আপনার পরতে হবে।'

জেদে কোথায় ছেদ টানিতে হইবে তা দেখিলাম। ডারবনের ম্যাজিস্ট্রেটের কাছারিতে যে পাগড়ী খুলি নাই প্রধান আদালতের প্রধান বিচারপতির কথায় তা খুলিলাম। এই আদেশ উপেক্ষা করা যাইত; তার পক্ষে যুক্তিও ছিল। কিন্তু ইহা অপেক্ষা বড় লড়াই লড়িবার আমার ছিল। পাগড়ীর জন্য লড়িয়া আমার লড়াইয়ের উদ্যম খতম করা আমার সঙ্গত মনে হয় নাই। আরও বৃহৎ ব্যাপারের জন্য তা তোলা থাকে।

আমার এই নতি (বলব কি দুর্বলতা) অবদুল্লা শেঠ ও অন্য বন্ধুদের ভাল লাগে নাই। উকিল হিসাবেও পাগড়ী পরার দাবি আঁকড়াইয়া থাকা আমার উচিত ছিল এই ছিল তাঁদের কথা। তাঁদের বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। 'যে দেশে যেই আচার' এই বচনের অর্থ বুঝাইয়া তাঁদের বলিয়াছিলাম, 'ভারতে যদি গোরা আমলা বা জজ পাগড়ী খুলতে বলে ত তা অমান্য করা চলে। নাতালে থেকে নাতালের আদালতের অঙ্গ হয়ে নাতাল আদালতের রেওয়াজ ভঙ্গ করা আমার অশোভন মনে হয়।'

এই যুক্তি ও এরূপ অন্য যুক্তি দিয়া বন্ধুদের আমি কতকটা শান্ত করিয়াছিলাম বটে, তবে একই বস্তুকে যে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন ভাবে নিতে হয় এ কথা তাঁদের আমি এই ব্যাপারে পুরাপুরি বুঝাইতে পারিয়াছিলাম বলিয়া মনে হয় না। তা যা-ই হোক, আগ্রহ ও অনাগ্রহ আমার জীবনে চিরকাল সাথ-সাথ চলিয়াছে। পরে বহুবার আমি অনুভব করিয়াছি যে এই দুই বস্তু যেন সত্যাগ্রহের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস। আপসের এই আগ্রহের দরুন অনেকবার আমার জীবন বিপন্ন হইয়াছে, বন্ধুরা বিরূপ হইয়াছেন। কিন্তু সত্য বজ্র সম কঠোর ও কুসুম সম কোমল।

আইন-সভার এই বিরোধিতায় আমার নাম আর একবার দক্ষিণ আফ্রিকায় ছড়াইয়া পড়িল। বেশির ভাগ সংবাদপত্র এই বিরোধের নিন্দা ও আইন-সভার ওপর হিংসার আরোপ করিয়াছিল। এই প্রচারে আমার কাজ বেশ কতকটা সহজ হইয়া যায়।

১৯

নাতাল ইণ্ডিয়ন কংগ্রেস

আইন-ব্যবসা আমার কাছে গৌণ বস্তু ছিল, আর চিরদিন গোণই থাকিয়া গিয়াছে। দশের কাজের জন্যই নাতালে থাকিয়া গিয়াছিলাম তাই মনে প্রাণে সে কাজে লাগিয়া যাই। ভারতীয়দের ভোটাধিকার কাড়িয়া লওয়ার প্রতিবাদে আরজি পেশ করা হইয়াছিল বটে কিন্তু তা-ই যথেষ্ট ছিল না। উপনিবেশ মন্ত্রীর টনক নড়াইবার জন্য আন্দোলন চালাইয়া যাওয়া দরকার ছিল। ওই কাজের জন্য এক সংস্থা খাড়া করার আবশ্যকতা বোধ হয়। এই সম্বন্ধে অবদুল্লা শেঠের সহিত আলোচনা করিলাম, অন্য বন্ধুদেরও কথাটা বলিলাম। স্থায়ী এক সার্বজনিক সংস্থা গঠন স্থির হইল।

সংস্থার নামকরণের প্রশ্নে আমি ফাঁপরে পড়িয়াছিলাম। পার্টি বা পক্ষ হইতে ইহার দূরে থাকা আবশ্যক ছিল। জানিতাম কংগ্রেস রক্ষণশীল (কনসরবেটিব) দলের চক্ষুশূল ছিল। অথচ কংগ্রেস ছিল ভারতের প্রাণ। আমি উহাকে নাতালে জনপ্রিয় করিতে চাহিলাম। এই নামটা এড়াইয়া যাইতাম বা নিতে ইতস্তত করিতাম ত তা ভীরুতাই হইত। অতএব সব দিক বিবেচনা করিয়া আমি প্রস্তাব করি যে সংস্থার নাম 'নাতাল ইণ্ডিয়ন কংগ্রেস' রাখা হউক। ১৮৯৪ সনের ২২শে মে 'নাতাল ইণ্ডিয়ন কংগ্রেস'-এর জন্ম হয়।

দাদা অবদুল্লার মস্ত ঘর লোকে ভরিয়া গিয়াছিল। লোকে সংস্থাকে উৎসাহে গ্রহণ করিল। ইহার গঠন-বিধান সরল ছিল। সদস্যের চাঁদা মোটারকম ধরা হইয়াছিল—প্রতি মাসে কমপক্ষে পাঁচ শিলিং। ধনীদের কাছ হইতে যত বেশি পারা গিয়াছিল আদায় করা হইয়াছিল। অবদুল্লা শেঠ মাসে দুই পাউণ্ড দিতে স্বীকার করেন, অন্য দুই বন্ধুও ওই চাঁদা দিতে রাজী হন। আমার মনে হইল, চাঁদার ব্যাপারে আমার কৃপণ হইলে চলিবে না। খাতায় মাসে এক পাউণ্ড লিখিয়া দিলাম। এক পাউণ্ড মাসে মাসে দেওয়া আমার পক্ষে সহজ ছিল না। তবে ভাবিয়া দেখিতে আমি দেখিতে পাইয়াছিলাম যে আমার সংসার চলে ত এও চলিবে। আর ঈশ্বর চালাইয়াও নিয়াছিলেন। এইভাবে মাসিক এক পাউণ্ড চাঁদা দেওয়ার সভ্য মোটা সংখ্যায়ই পাওয়া গিয়াছিল। দশ শিলিং-এর সভ্য আরও অধিক হইয়াছিল।

এ বাদে এককালীন দানও অনেক পাওয়া গিয়াছিল। ধন্যবাদ সহকারে তা গ্রহণ করা হয়।

অভিজ্ঞতা হইতে দেখা যায় যে বিনা তাগিদে কেউ চাঁদা দিত না। ডারবনের বাইরের লোকদের কাছে চাঁদা আদায়ের জন্য বারবার যাওয়া সম্ভব ছিল না। 'আরম্ভে শূর' কথাটার প্রমাণ পাওয়া গেল। এমন কি ডারবনের সভ্যদের কাছেও চাঁদার জন্য একের অধিক বার যাইতে হইত।

আমি সেক্রেটারী ছিলাম সুতরাং চাঁদা আদায়ের দায় আমার ছিল। এমন এক সময় আসে যখন সারা দিন মুহুরীকে এই কাজে লাগাইতে হইত। মুহুরীও হাঁফাইয়া উঠিল। বোঝা গেল যে মাসিক চাঁদা বার্ষিক ও আগাম দেয় না করিলে অবস্থার উন্নতি ঘটিবে না। সভা ডাকিলাম। আমার প্রস্তাব সকলে মানিয়া লইল। সর্বনিম্ন চাঁদা তিন পাউণ্ড ধার্য হইল। আদায়ের কাজ সহজ হইল।

ধার করিয়া দশের কাজ করিতে নাই শুরুতেই এই শিক্ষা আমার লাভ হইয়াছিল। অন্য ব্যাপারে লোকের কথায় বিশ্বাস করা যায়, কিন্তু পয়সার কড়ারে বিশ্বাস করা যায় না। লোকে কথামত ঠিক সময় চাঁদা দেয় না এই অভিজ্ঞতা আমার হইয়াছিল। ইহার ব্যতিক্রম নাতালের ভারতীয়দের বেলায়ও হইতে দেখি নাই। হাতে টাকা না থাকিলে কোন কাজে হাত দেওয়া হইত না বলিয়া 'নাতাল কংগ্রেস'-কে কোন দিনও দেনদার হইতে হয় নাই।

আমার সহকর্মীরা মহা উৎসাহে সভ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন। এই কাজ তাঁদের ভাল লাগিয়াছিল। অমূল্য অভিজ্ঞতাও ইহা হইতে তাঁরা লাভ করিয়াছিলেন। অনেকে আপনা হইতে চাঁদা দিয়া সভ্য হইয়াছিল। দূরের দূরের জায়গায় কখন কখন অসুবিধায় পড়িতে হইত। দশের কাজ যে কি সে কথা লোকে বুঝিত না। দূর দূর স্থানের লোকেরা আমাদের লইয়া যাইত ও স্থানীয় প্রধান ব্যাপারীদের গৃহে আমাদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করিত।

এইরূপ ঘোরা-ফেরার কালে এক জায়গায় আমাদের কিছুটা মুশকিল হইয়াছিল। যাঁর গৃহে আমরা অতিথি ছিলাম তিনি ছয় পাউণ্ড দিবেন এমনটা আমাদের আশা ছিল। কিন্তু তিন পাউণ্ডের বেশি দিতে তিনি

অস্বীকার করেন। তাঁর কাছ হইতে তিন পাউণ্ড লইলে অন্য লোকের নিকট হইতে আশানুরূপ পাওয়া যাইত না। রাত বেশ হইয়াছিল। ক্ষুধাও আমাদের পাইয়াছিল। কিন্তু যত টাকা চাহিয়াছিলাম তা না পাইলে খাই কি করিয়া। ভদ্রলোককে আমরা খুব বুঝাইলাম। তবু তিনি নড়িলেন না। গাঁয়ের অন্য ব্যাপারীরাও তাঁকে অনুরোধ করিলেন। রাত তখন তিন প্রহরেরও বেশি। কিন্তু না টলিলেন তিনি, না টলিলাম আমরা। সহকর্মীদের অনেকে রাগে ফুলিতেছিলেন কিন্তু নিজেদের তাঁরা সামলাইয়া নেন। অবশেষে ভোর হয় হয় এমন সময়ে ভদ্রলোক নরম হইলেন: ছয় পাউণ্ড দিলেন। আমরা খাইলাম। এই ঘটনা টোঙ্গাট-এ ঘটিয়াছিল। কিন্তু এর প্রভাব উত্তরে সমুদ্র কিনারাবর্তী স্টেঙ্গর তক্ ও ভিতরে চার্লস-টাউন পর্যন্ত ছড়াইয়া পড়ে। চাঁদা সংগ্রহের কাজ এর ফলে সহজ হয়।

পয়সা সংগ্রহের দিকেই কেবল আমাদের দৃষ্টি ছিল তা নয়। প্রয়োজনের অধিক পয়সা হাতে না রাখার তত্ত্ব ইতিপূর্বেই আমি ধর্মরূপে মানিয়া লইয়াছিলাম।

সভা মাসে একবার আর প্রয়োজন হইলে প্রতি সপ্তাহেও হইত। সভায় পূর্ব সভার বিবরণ পড়া হইত: নানা প্রশ্নেরও আলোচনা হইত। অভ্যাস ছিল না বলিয়া সভ্যরা আলোচনায় যোগ দিতে পারিত না; অল্প কথায় পর পর সাজাইয়া-গুছাইয়া কি ভাবে বলিতে হয় তা জানিত না। দাঁড়াইয়া নিজ মত ব্যক্ত করার সাহস কারো ছিল না। সভার নিয়ম-পদ্ধতি সকলকে বুঝাইয়া দিয়াছিলাম। সেই অনুসারে তারা চলিত। তাতে যে তাদেরই লাভ তা তারা বুঝিতে পারিয়াছিল। যাদের বলার অভ্যাস ছিল না এভাবে অল্প দিন মধ্যে তারা দশের বিষয়ে চিন্তা করিতে ও বলিতে শেখে।

সার্বজনিক কাজে ছোটখাটো নানা ব্যাপারে অনেক পয়সা ব্যয় হইয়া যায় এ কথা আমার জানা ছিল। তাই প্রথমে কিছু দিন রসিদ বই পর্যন্ত আমি ছাপাই নাই। আমার আপিসে সাইক্লোস্টাইল মেশিন ছিল। তাতে আমি রসিদ ছাপাইয়া লইতাম। রিপোর্টও ওভাবেই ছাপানো হইত। কংগ্রেসের তহবিলে যখন পয়সা বেশ জমে ও উহার সভ্য ও কাজ বাড়ে তখন ওসব আমি প্রেসে ছাপাইতে আরম্ভ করি। এরূপ টানাটানি করিয়া যে-কোন সংস্থার চলা কর্তব্য। কিন্তু আমি জানি এভাবে প্রায়ই চলা হয়

না। তাই এই উঠতি খুদে সংস্থার প্রথম দিককার কথা লোকের সামনে ধরা আমার কাছে কর্তব্য মনে হইয়াছে।

লোকে রসিদ চাহিত না। তবুও যাচিয়া রসিদ দেওয়া হইত। এর ফলে হিসাব কড়া-ক্রান্তিতে রাখার রীতি দাঁড়াইয়া যায়। আর তাই না আমি বলিতে পারিতেছি যে নাতাল কংগ্রেস আপিসে ১৮৯৪ সনের নিখুঁত হিসাবপত্র যে কেউ আজও দেখিতে পাইবেন। কড়া-ক্রান্তি হিসাব সংস্থার প্রাণস্বরূপ। তার অভাবে সংস্থার বদনাম হয়, পতন হয়। সঠিক হিসাব বিনা পূর্ণ সত্যের সাধনা অসম্ভব।

উপনিবেশে জন্মিয়াছে, লেখাপড়া শিখিয়াছে এরূপ ভারতীয়দের সেবা করা ছিল কংগ্রেসের আর এক কাজ। সে উদ্দেশ্যে কংগ্রেসের তরফ হইতে 'কলোনিয়ল ব্যর্ন ইণ্ডিয়ন এড্যুকেশনল এসোসিয়েশন' স্থাপন করা হইয়াছিল। মুখ্যত লেখাপড়া-জানা যুবক উহার সভ্য ছিল। চাঁদা খুব কম ছিল। তাদের অভাব-অভিযোগ লোকের কাছে ধরা, তাদের বিচারশক্তির বিকাশ করা, বণিক-সমাজের সহিত তাদের যোগাযোগ করিয়া দেওয়া এবং ভারতীয়দের সেবায় তাদের উদ্বুদ্ধ করা ছিল এই সংস্থার কাজ। বলা যাইতে পারে উহা এক প্রকারের বিতর্ক-মণ্ডলী ছিল। উহার সভা নিয়ম-মত হইত। সভায় নানা বিষয়ে বক্তৃতা হইত, রচনা পাঠ করা হইত। সভার সুবিধার জন্য উহার নিজস্ব একটি ছোট গ্রন্থাগারও ছিল।

কংগ্রেসের তৃতীয় কর্ম ছিল প্রচার। নাতালের যথার্থ চিত্র দক্ষিণ আফ্রিকার ও ইংলণ্ডের ইংরেজদের তথা ভারতবর্ষের লোকের কাছে তুলিয়া ধরা ছিল এই কর্মের লক্ষ্য। এই উদ্দেশ্যে আমি দুইখানি পুস্তিকা লিখিয়া-ছিলাম। একটার নাম ছিল 'দক্ষিণ আফ্রিকা বাসী ইংরেজের কাছে নিবেদন'। উহাতে নাতালবাসী ভারতীয়দের সাধারণ অবস্থা কি ছিল প্রমাণসহ তার চিত্র আঁকিয়াছিলাম। দ্বিতীয় পুস্তিকার শিরোনাম ছিল 'ভারতীয়দের ভোটাধিকার—এক আপীল'। অল্প কথায় ভারতীয়দের ভোটাধিকারের কথা এতে তথ্য ও সংখ্যা সমেত উপস্থিত করা হইয়াছিল। বহু পরিশ্রম ও বিস্তর পড়াশুনা করিয়া বই দুইখানি রচনা করিয়াছিলাম। দুইখানি বইয়েরই বহুল প্রচার হইয়াছিল আর ফলও তার তেমনি ফলিয়াছিল।

এই প্রচারের দৌলতে দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের বহু মিত্র লাভ হইয়াছিল। ইংলণ্ডের ও ভারতবর্ষের সকল পক্ষের সমর্থনও পাওয়া গিয়াছিল। এর ফলে দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়দের সামনে কাজের একটা পথ খুলিয়া যায়; কাজের সুস্পষ্ট রূপরেখা ফুটিয়া ওঠে।

২০

বালাসুন্দরম

'যেমন ভাব তেমন লাভ' দেখিতে পাইয়াছি আমার বেলায় এই বচন বহুবার সত্য হইয়াছে। গরীবের সেবার আগ্রহে সহজেই গরীবের সহিত আমার সম্পর্ক জুড়িয়া গিয়াছে।

'নাতাল ইণ্ডিয়ন কংগ্রেস'-এ উপনিবেশে জন্ম হইয়াছে এমন ভারতীয়রা ভিড়িয়াছিল, কেরানীকুল যোগ দিয়াছিল, কিন্তু মজুরেরা, গিরমীটিয়ারা উহার গণ্ডির বাইরেই থাকিয়া গিয়াছিল। চাঁদা দিয়া কংগ্রেসে ঢোকার সঙ্গতি তাদের ছিল না। সেবার মারফতেই মাত্র কংগ্রেস তাদের মন পাইতে পারিত। সেই সুযোগ আপনা-আপনি আসিয়া গেল, তাও এমন সময়ে যখন না ছিলাম আমি তৈরি আর না ছিল কংগ্রেস তৈরি। সবে আমি ওকালতি আরম্ভ করিয়াছিলাম; তখনও তিন-চার মাস পুরা হয় নাই, আর কংগ্রেস ছিল হামাগুড়ি-দেওয়া শিশু। সেই সময়ে একদিন ছেঁড়া-ধুতি পরনে, পাগড়ী হাতে, সামনের দুই দাঁত ভাঙ্গা, মুখ হইতে রক্তের ধারা, এক তামিল আমার সামনে আসিয়া দাঁড়ায়—শরীর তার কাঁপিতেছিল, চোখ হইতে জল গড়াইতেছিল। তার মালিক তাকে ভীষণ মারিয়াছিল। আমার মুহুরীর (সে তামিল ছিল) কাছে সব শুনিলাম। বালাসুন্দরম (আগন্তুকের নাম ওই ছিল) ডারবনের এক নামকরা গোরার গিরমীটিয়া ছিল। মালিক কেন জানি তার ওপর চটিয়া যায় ও রাগে বেহুঁশ হইয়া বেদম প্রহার করে, দুইটি দাঁত খসিয়া পড়ে। তাকে আমি ডাক্তারের কাছে পাঠাই। তখন ডাক্তার সকলেই গোরা ছিল। বালাসুন্দরমের আঘাতের স্বরূপ সম্বন্ধে ডাক্তারের সার্টিফিকেট দরকার ছিল। সার্টিফিকেট পাইলাম আর তখনই বালাসুন্দরমকে ম্যাজি-

স্ট্রেটের কাছে লইয়া গেলাম ও তার এফিডেবিট পেশ করিলাম। তা পড়িয়া ম্যাজিস্ট্রেট মালিকের ওপর চটেন ও সমন জারি করার আদেশ দেন।

মালিকের সাজা দেওয়া আমার লক্ষ্য ছিল না। বালাসুন্দরমকে তার মালিকের হাত হইতে ছাড়ানো ছিল আমার লক্ষ্য। গিরমীটিয়া আইন ভাল করিয়া পড়িয়া লইলাম। নোটিশ না দিয়া সাধারণ মজুর কাজ ছাড়িয়া গেলে মালিক তার বিরুদ্ধে দেওয়ানী মকদ্দমা করিতে পারে। গিরমীটিয়ার অবস্থা ছিল একদম ভিন্ন : গিরমীটিয়া মালিককে ছাড়িয়া গেলে তা ফৌজদারী অপরাধ বলিয়া গণ্য হইত আর দোষ প্রমাণ হইলে তার জেল ভোগ করিতে হইত। এইজন্যই সার উইলিয়ম হাণ্টার গিরমীটিয়া প্রথাকে গোলামিরই নামান্তর বলিয়াছেন। গোলামের মত গিরমীটিয়াও মালিকের সম্পত্তি ছিল।

বালাসুন্দরমকে ছাড়ানোর দুই পথ ছিল : এক, গিরমীটিয়াদের রক্ষক অফিসারকে দিয়া তার গিরমীট রদ করিয়া লওয়া বা অন্য মালিকের কাছে তাকে বদলি করিয়া দেওয়া ; অন্য উপায় ছিল বালাসুন্দরমের মালিক যাতে বালাসুন্দরমকে ছাড়িতে বাধ্য হয় তা করা। আমি মালিকের কাছে গেলাম। তাকে বলিলাম, 'সাজা আপনাকে দেওয়াতে চাই না। জানেন, আপনি এই লোককে ভয়ানক মেরেছেন। এর গিরমীট অন্য নামে করে দেন ত তাতেই আমি সন্তুষ্ট হব।' লোকটি সঙ্গে সঙ্গে আমার কথা মানিয়া লয়। পরে আমি রক্ষক বা প্রোটেক্টর-এর কাছে যাই। নূতন মালিক যোগাড় করার দায় আমার এই সর্তে তিনি আমার প্রস্তাবে রাজী হন।

নূতন মালিক খুঁজিতে বাহির হইলাম। গিরমীটিয়া রাখার অধিকার ভারতীয়দের ছিল না, একমাত্র গোরাদের ছিল। তখন কয়েকজন মাত্র ইংরেজের সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল। তাঁদের একজনের কাছে যাই। অনুগ্রহ করিয়া বালাসুন্দরমকে নিতে তিনি সম্মত হন। অনুগ্রহের জন্য ভদ্রলোককে ধন্যবাদ জানাই। ম্যাজিস্ট্রেট বালাসুন্দরমের মালিককে দোষী সাব্যস্ত করিলেন ও আদেশপত্রে মন্তব্য করিলেন যে অপরাধী বালাসুন্দরমের গিরমীট অন্য লোকের নামে বদলি করার কড়ার করিয়াছে।

বালাসুন্দরমের কেসের কথা চারদিকে গিরমীটিয়াদের মধ্যে ছড়াইয়া পড়ে। তারা আমাকে বন্ধুরূপে দেখিতে থাকে। আমি খুশী হই। গির-মীটিয়ারা কাতারে কাতারে আমার আপিসে আসিতে থাকে। তাদের সুখ-দুঃখের কথা জানার অপূর্ব সুযোগ আমার হয়।

বালাসুন্দরমের কেসের প্রতিধ্বনি সুদূর মাদ্রাজে গিয়া পৌঁছে। এই প্রদেশ হইতে যারা গিরমীটিয়া হইয়া নাতালে আসিয়াছিল তারা তাদের ভাই গিরিমীটিয়াদের মুখে এই কেসের কথা শোনে।

কেস হিসাবে এই কেসের তেমন কিছু গুরুত্ব ছিল না, কিন্তু ইহার ফলে গিরমীটিয়ারা অবাক হইয়া দেখিতে পায় যে তাদের কথা ভাবিবার ও তাদের জন্য লড়িবার মত এক ব্যক্তি নাতালে আগাইয়া আসিয়াছে; তাদের মনে ভরসার সঞ্চার হয়।

ওপরে বলিয়াছি যে বালাসুন্দরম আমার কাছে যখন আসে তখন তার ফেটা তার হাতে ছিল। সে এক অতি করুণ কথা আর আমাদের লজ্জারও ব্যাপার। আমার পাগড়ী খোলার কথা ওপরে বলিয়াছি। বাইরেও এমনতর জুলুম চলিত: কোন গোরার সহিত দেখা করার সময়ে গোরার সম্মানার্থে গিরমীটিয়াদের বা অচেনা ভারতীয়দের মাথার আবরণ—টুপিই হোক, পাগড়ীই হোক বা ফেটা—খুলিয়া হাতে লইয়া যাইতে হইত। দুই হাতে সেলাম করিলেও চলিত না। বালাসুন্দরমের মনে হয় যে আমার সামনেও তার ওভাবে আসা উচিত। ওই কথাটা আমার তার আগে জানা ছিল না। আমি লজ্জা পাই। বালাসুন্দরমকে ফেটা বাঁধিতে বলি। অতি সংকোচে সে ফেটা বাঁধে। কিন্তু তাতে যে তার আনন্দ হইয়াছিল তা দেখিতে পাই।

অন্যকে ছোট করিয়া মানুষ কিভাবে যে নিজকে বড় মনে করে ইহা আমার কাছে আজও হেঁয়ালিই থাকিয়া গিয়াছে।

২১

তিন পাউণ্ড কর

বালাসুন্দরমের ব্যাপারে গিরমীটিয়াদের সহিত আমার সম্বন্ধ জুড়িয়া যায়। কিন্তু তাদের অবস্থার পুঙ্খানুপুঙ্খ অধ্যয়ন আমার করিতে হয় তাদের ওপর ভারী কর বসানোর যে আন্দোলন চলিয়াছিল সেই প্রসঙ্গে।

ঠিক এই সময়ে, অর্থাৎ ১৮৯৪ সনে, নাতাল সরকার গিরমীটিয়াদের ওপর সালিয়ানা ২৫ পাউণ্ড বা ৩৭৫ টাকা কর বসানোর উদ্‌যোগ করে। বিলের খসড়া পড়িয়া আমি বিস্মিত হই। আলোচনার জন্য বিষয়টা আমি কংগ্রেসের সামনে রাখি। উহার বিরোধ করা স্থির হয়।

ইহার পূর্বকথা এখানে সংক্ষেপে বলিয়া লওয়া দরকার।

১৮৬০ সনের কাছাকাছি নাতালের গোরারা দেখিতে পায় যে নাতালে আখের ভাল চাষ হইতে পারে, আর তারা মজুরের খোঁজ করিতে থাকে। আখের চাষ বা চিনি তৈরি করার যোগ্যতা নাতালের জুলুদের ছিল না, সুতরাং মজুর আমদানি করা দরকার হয়। সরকার ভারত সরকারের সহিত কথা চালায় ও ভারতবর্ষ হইতে মজুর সংগ্রহ করার অনুমতি পায়। লোভ দেখানো হয় যে গিরমীটিয়ারূপে পাঁচ বছর কাজ করার পরে তারা নিজেদের মত নাতালে বসবাস করিতে পাইবে ও জমি খরিদ করার অবাধ অধিকারও লাভ করিবে। চুক্তি অন্তে নিজেদের শ্রম দ্বারা ভারতীয় মজুরেরা চাষের বিস্তর উন্নতি করিবে ও তাতে নাতালের লাভ হইবে এই ছিল তখন গোরাদের দৃষ্টি।

ভারতীয় মজুরেরা আশার অনেক বেশি দেয়। শাক-সবজির চাষ তারা খুব বাড়ায়, ভারত হইতে ভাল ভাল সবজি আমদানি করিয়া সে সব ফলায়। ওখানে যে সব জন্মিত সে সবের দাম সস্তা করিয়া দেয়। ভারত হইতে আম আনিয়া আমগাছ সৃষ্টি করে। সঙ্গে সঙ্গে তারা ব্যবসায়ও শুরু করে, বসবাসের জন্য জমি কেনে ও অনেকে মজুরি ছাড়িয়া জমির ও বাড়ীর মালিক হয়। এইভাবে একদিকে মজুর মালিক হইল; অন্যদিকে তাদের পিছু পিছু ভারত হইতে ব্যাপারীও গিয়া জুটিল। স্ব. শেঠ অবুবেকর আমদ সকলের আগে যান ও বিরাট ব্যবসায় ফাঁদেন।

গোরা ব্যাপারীরা ভয় পাইল। যখন তারা ভারতীয় মজুরদের আদর করিয়া ডাকিয়া আনিয়াছিল তখন তারা আন্দাজ করিতে পারে নাই যে ভারতীয়দের ব্যবসা-শক্তি এতটা। স্বাধীন কৃষকরূপে থাকিত ত গোরাদের আপত্তি ছিল না। কিন্তু ব্যবসায়ে তারা টেক্কা দিবে ইহা তাদের কাছে অসহ্য হইল।

ভারতীয়দের ওপর খাপ্পা হওয়ার ইহাই ছিল মূল কারণ। আমাদের ভিন্ন রকম চালচলন, সাদাসিধা জীবন, অল্প লাভে সন্তোষ, স্বাস্থ্যের নিয়মের উপেক্ষা, ঘর-দুয়ার সাফ রাখার দিকে নজরের অভাব, পয়সা খরচ হইবে বলিয়া বাড়ী মেরামত করিতে অনিচ্ছা ও আমাদের আলাদা ধর্ম—এই সব কারণে বিরূপ ভাব আরও জমাট হয়। এই বিরোধ ভোটাধিকার কাড়িয়া লওয়ার ও গিরমীটিয়াদের ওপর কর চাপানোর বিলের আকারে

আত্মপ্রকাশ করে। আইন সভার বাইরে খিটিমিটি ত অনেক আগেই শুরু হইয়াছিল।

প্রথমে ভারতে ফেরার পরে গিরমীট শেষ হয় এই ভাবে গিরমীট ফুরাইবার অল্প আগে গিরমীটিয়াদের জোর-জবরদস্তি ভারতে পাঠানোর কথা হয়। কিন্তু ভারত সরকার এই প্রস্তাব স্বীকার করিবে সেই সম্ভাবনা ছিল না। তাই প্রস্তাব করা হয়:

১. মজুরির কড়ার শেষ হইলে গিরমীটিয়া ভারতে ফিরিয়া যাইবে। অথবা,
২. দুই বছর পরে পরে নয়া গিরমীট লিখিয়া দিবে; নয়া গিরমীট দিলে প্রতিবার বেতন বাড়িবে;
৩. যদি নয়া গিরমীট না দেয় বা ভারতে ফিরিয়া যাইতে না চায় ত তাকে বছরে ২৫ পাউণ্ড টাকা দিতে হইবে।

ভারত সরকারকে এই প্রস্তাবে রাজী করাইবার জন্য সার হেনরী বীনস ও মি. মেসন-কে ভারতে ডেপুটেশনে পাঠানো হয়। লর্ড এলগিন তখন বড়লাট ছিলেন। ২৫ পাউণ্ড করের প্রস্তাব তিনি না-মঞ্জুর করেন, কিন্তু হরেক ভারতীয়ের ওপর তিন পাউণ্ড কর বসানোর প্রস্তাবে তিনি সায় দেন। তখন আমার মনে হইয়াছিল আর এখনও আমি মনে করি যে, বড়লাট মস্ত ভুল করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের ভালমন্দের কথা একবার তিনি ভাবিয়াও দেখিলেন না। গোরাদের এরূপ সুবিধা করিয়া দেওয়া তাঁর কর্তব্যের অঙ্গ ছিল না। তিন চার বছর পরে, প্রত্যেক গিরমীটিয়ার, তার স্ত্রীর ও তাদের ষোল বছরের অধিক বয়সের পুত্রের ও তের বছরের অধিক বয়সের কন্যার ওপর এই ভার চাপে। স্বামী স্ত্রী ও দুই পুত্রকন্যা এই চারের পরিবারের ওপর—স্বামীর আয় যেখানে মাসিক বড়জোর ১৪ শিলিং—সালিয়ানা ১২ পাউণ্ড বা ১৮০ টাকা কর চাপানো অমানুষিক ব্যাপার। গরীব লোকের ওপর এরূপ করভার চাপানোর নজির দুনিয়ার কোথাও মিলিবে না।

এই করের বিরুদ্ধে খুব জোর আন্দোলন আমরা চালাই। নাতাল কংগ্রেস যদি ইহার বিরোধ না করিত তবে হয়ত বড়লাট ২৫ পাউণ্ড করে রাজী হইয়া যাইতেন। ২৫ পাউণ্ড-এর জায়গায় ৩ পাউণ্ড হইয়াছিল; খুব সম্ভব কংগ্রেসের আন্দোলনের চাপেই তা হইয়াছিল। হয়ত বা

এখানে আমার ভুল হইতেছে। ইহাও হইতে পারে যে, ভারত সরকার আগেই ২৫ পাউণ্ড করে আপত্তি করিয়াছিল আর কংগ্রেসের চাপ বিনাই তিন পাউণ্ডে রাজী হইয়াছিল। সে যাই হোক, এ কথা স্পষ্ট যে ভারত সরকার তার কর্তব্য পালন করে নাই। ভারতের ভালমন্দের রক্ষক বড়লাট ওই অমানুষিক করে সায় দিয়া মহা অন্যায় করিয়াছিলেন।

২৫ পাউণ্ডের জায়গায় ৩ পাউণ্ড হইল ইহাকে কি কংগ্রেসের জয় মনে করা যাইতে পারে? কংগ্রেস গিরমীটিয়াদের স্বার্থ পুরাপুরি রক্ষা করিতে পারে নাই এই বেদনা তাকে শূলের মত বিঁধিতেছিল। তিন পাউণ্ড কর একদিন না একদিন রদ করাইবে এই পণ কংগ্রেস কোনদিনও ভোলে নাই। এই পণ পূর্ণ করিতে কুড়ি বছর লাগিয়াছিল। এই লড়াইয়ে কেবল নাতালের ভারতীয়েরা নয় গোটা দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতবাসীরা যোগ দিয়াছিল। গোখেলকে দেওয়া কথা ভঙ্গ করার কারণে এই শেষ লড়াই শুরু হয়। ইহাতে গিরমীটিয়ারা ষোল-আনা যোগ দেয়। গুলিতে তাদের কয়েকজন মরে। দশ হাজারের অধিক ভারতবাসীর জেল হয়।

কিন্তু অন্তে সত্যের জয় হয়। ভারতবাসীদের ত্যাগে সেই সত্য মূর্তিমন্ত হয়। অটল বিশ্বাস, অসীম ধৈর্য, অবিচল চেষ্টা বিনা এই জয় কখনই সম্ভব হইত না। ওখানকার ভারত সমাজ যদি দমিয়া যাইত, কংগ্রেস যদি নিরন্তর লড়াই না চালাইত, অনিবার্য মনে করিয়া এই করের সামনে মাথা নোয়াইত, তবে আজও গিরমীটিয়া ভারতীয়দের ওই মনুষ্যত্বনাশা কর গুনিতে হইত আর তার ফলে ভারতের মুখে চুনকালি লাগিত।

২২

ধর্মনিরীক্ষণ

এইভাবে যে আমি প্রবাসী ভারতীয়দের সেবায় ওতপ্রোত হইয়াছিলাম তার মূলে ছিল আত্মদর্শনের আকাঙ্ক্ষা। ঈশ্বরের দর্শন কেবল সেবার ভিতর দিয়াই পাওয়া যায় এই ভাব হইতে আমি সেবাধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলাম। ভারতের সেবা করিয়াছি কারণ সে সেবা আপনা-আপনি আমার কাছে আসিয়াছিল, খুঁজিয়া আমার লইতে হয় নাই, আর কাজটাও ছিল আমার মনের মত। দক্ষিণ আফ্রিকায় আমি গিয়াছিলাম বেড়াইতে,

কাঠিয়াওয়াড়ের কুচক্র হইতে বাঁচিতে ও পেটের ভাত কামাইতে। কিন্তু লাগিয়া যাই ঈশ্বরের খোঁজে, আত্মদর্শনের প্রযত্নে।

খ্রীস্টান বন্ধুদের আগ্রহে এই জিজ্ঞাসা তীব্র হয়। জিজ্ঞাসা কিছুতেই মিটিতেছিল না। আমি মিটাইতে চাহিলে কি হয়, খ্রীস্টান বন্ধুরা মিটিতে দিলে ত। দক্ষিণ আফ্রিকার মিশনমুখ্য মি· স্পেন্‌সর ওয়ালটন ডারবনে আমায় খুঁজিয়া বাহির করেন। তাঁদের পরিবারের লোকই যেন আমি হইয়া গিয়াছিলাম। প্রিটোরিয়ার খ্রীস্টান সম্মেলনে এই পরিচয়ের পত্তন হইয়াছিল। ওয়ালটনের রীতি-পদ্ধতি অন্যের হইতে আলাদা দিল। আমাকে খ্রীস্টান হইতে কখনও তিনি বলিয়াছেন বলিয়া আমার মনে পড়ে না। নিজের জীবন তিনি আমার সামনে খুলিয়া ধরিয়াছিলেন; তাঁর কার্যকলাপ তিনি আমায় দেখিতে দিতেন। তাঁর পত্নী অতি নম্র কিন্তু তেজস্বী ছিলেন। ওই দম্পতির চালচলন আমার ভাল লাগিত। আমাদের মূলগত ব্যবধানের কথা আমরা পরস্পর জানিতাম। এই দৃষ্টিভেদ আলোচনায় মিটিবার ছিল না। যেখানে উদারতা, সহিষ্ণুতা ও সত্য রহিয়াছে সেখানে ভেদও লাভদায়ক হয়। এই যুগলের নম্রতা, উদ্যম ও কর্মপরায়ণতা আমার ভাল লাগিত। প্রায়ই তাঁদের বাড়ী যাইতাম।

এঁদের সংসর্গ হেতু আমার ধর্মজিজ্ঞাসা জাগ্রত ছিল। ধর্মগ্রন্থ অধ্যয়নের যে অবসর প্রিটোরিয়ায় পাইয়াছিলাম সেই অবসর এখন ছিল না। অবসর যতটুকু পাইতাম কাজে লাগাইতাম। পত্র-ব্যবহার চলিতেই ছিল। রায়চন্দ ভাই আমাকে পথ দেখাইতেছিলেন। কোন বন্ধুর কাছ হইতে নর্মদাশঙ্করের 'ধর্মবিচার' বইখানা উপহার পাইয়াছিলাম। উহার প্রস্তাবনা আমার কাজে লাগিয়াছিল। তিনি বিলাসী ছিলেন এ কথা আমি শুনিয়াছিলাম। ধর্মগ্রন্থ পাঠে কিরূপে তাঁর জীবনে পরিবর্তন ঘটে সেই বর্ণনা প্রস্তাবনায় পড়িয়া আমি মুগ্ধ হইয়াছিলাম। বইটা আমি আগাগোড়া অতি আগ্রহে পড়িয়া ফেলি। ম্যাক্সমুলর-এর 'ভারত হইতে আমাদের কি কি শেখার আছে?' বইটা বড় ভাল লাগিয়াছিল। থিয়োসোফিকল সোসাইটীর প্রকাশিত উপনিষদের ভাষান্তরও পড়িয়াছিলাম। ইহার ফলে হিন্দুধর্মের ওপর আমার শ্রদ্ধা বাড়িয়া যায়; উহার মাধুর্য আমার কাছে ধরা পড়ে। কিন্তু অন্য ধর্মের ওপর আমার অনাদর জন্মে নাই। ওয়াশিংটন আরভিং-রচিত মহম্মদ চরিত ও কার্লাইল-কৃত পয়গম্বর-প্রশস্তি পড়ি।

তার ফলে পয়গম্বরের ওপর আমার ভক্তি বৃদ্ধি পায়। 'জরথুস্ত্র-র বচন' নামক পুস্তক আমি পড়িয়াছিলাম।

এভাবে নানা ধর্মের জ্ঞান আমার বাড়িতে থাকে। আত্মনিরীক্ষণ বাড়ে। যা পড়িতাম ভাল লাগিত ত সে অনুসারে চলার অভ্যাস দৃঢ় করিয়া লইতেছিলাম। এইভাবে হিন্দুধর্মের প্রাণায়াম আদি কতকগুলি যৌগিক ক্রিয়ার অভ্যাস পুঁথিদৃষ্টে যতটা সম্ভব করিতে শুরু করি। কিন্তু জিনিসটা পোষাইল না। অগ্রসর হওয়া গেল না। মনে মনে বলিলাম, ভারতে ফিরিয়া কোন শিক্ষকের নির্দেশে উহা অভ্যাস করিব। কিন্তু সেই বাসনা পূর্ণ হয় নাই।

টলস্টয়ের পুস্তক বেশি করিয়া পড়িতে থাকি। তাঁর 'গস্পেলস ইন ব্রীফ', 'হোয়াট টু ডু?' ও অন্যান্য পুস্তক আমার মনে গভীর দাগ কাটিয়াছিল। বিশ্বপ্রেম মানুষকে যে কোথায় লইয়া যাইতে পারে তা দিন দিন অধিক স্পষ্টরূপে বুঝিতেছিলাম।

এই সময়েই আর এক খ্রীস্টান পরিবারের সংসর্গে আমি আসিয়াছিলাম। তাঁদের কথায় রবিবার রবিবার আমি ওয়েসলিয়ন গির্জায় যাইতাম। অনেক সন্ধ্যায় তাঁদের বাড়ীতে যাইতাম: খাড়া নিমন্ত্রণ ছিল। ওয়েসলিয়ন গির্জা আমার ভাল লাগে নাই। প্রবচন নিরস মনে হইত। শ্রোতাদের মধ্যে আমি ভক্তি দেখিতে পাই নাই। সেখানে ভক্ত আসিত না, জুটিত সংসারী লোক আমোদ-আহ্লাদ করিতে, রীতি রক্ষা করিতে। কখন কখন ঝিমাইতাম, লজ্জা হইত। কিন্তু আশপাশের আরও অনেককে ঝিমাইতে দেখিতাম। তাতে আমার লজ্জা হাল্কা হইত। জিনিসটা ভাল লাগিত না। তাই কিছুদিন পরে যাওয়া বন্ধ করিয়া দেই।

রবিবার রবিবার যে পরিবারে যাইতাম হঠাৎ তাঁদের সঙ্গে সম্পর্ক ঘুচিয়া যায়। বস্তুত এ কথা বলাই ঠিক হইবে যে তাঁরা আমাকে তাঁদের গৃহে যাইতে নিষেধ করিয়াছিলেন। ঘটনাটা এই: ঘরনী সাদাসিধা ভাল লোক ছিলেন, কিন্তু তাঁর মন একটু সংকীর্ণ ছিল। প্রতি রবিবার তাঁর সঙ্গে এটা-ওটা ধর্মালোচনা হইতই। আর্নল্ড-এর 'লাইট অব এশিয়া' তখন আমি পড়িতেছিলাম। একদিন যীশু ও বুদ্ধের জীবনের আলোচনা কালে আমি বলি 'ধরুন গৌতমের করুণার কথা। তাঁর করুণা মনুষ্যজাতি ডিঙ্গিয়ে অন্য জীব পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল। ছাগছানা তাঁর কাঁধে দিব্য

আরামে বসে আছে এই ছবি দেখে কি আপনার মন গলে না? সর্বজীবে এই দয়া যীশু চরিত্রে আমি দেখতে পাই না।' বুঝিতে পারিলাম তুলনাটা বোনের অন্তরে বিঁধিয়াছে। প্রসঙ্গটা ওখানেই শেষ করিলাম। খাওয়ার ঘরে গেলাম। তাঁদের পাঁচ বছরের বালগোপাল সঙ্গে ছিল। শিশু পাইলে আমি মজিয়া যাই। ভাব তার সঙ্গে আগেই জমিয়া গিয়াছিল। তার থালায় মাংসের টুকরা আর আমার থালায় আপেল ছিল। মাংসের হাসি-তামাসা ও আপেলের গুণগান করিতেছিলাম। আমার কথায় বালকের মন ভিজে ও সে আমার সহিত আপেলের গুণগানে যোগ দেয়।

কিন্তু মা? সে বেচারা ভয় পায়।

আমি সাবধান হইলাম। নিজকে সামলাইয়া লইলাম। অন্য কথা পাড়িলাম।

পরের সপ্তাহে গেলাম বটে, কিন্তু পা যেন আমার চলিতেছিল না। ওখানে না যাওয়াই ভাল এ কথা আমার মনে হয় নাই; ববং না গেলে অন্যায় হইবে এরূপ মনে হইয়াছিল। কিন্তু ওই বোনই আমাকে আমার মুশকিল হইতে বাঁচান।

তিনি বলেন, 'মি. গান্ধী, মনে কিছু করবেন না। না বলে পারছিনে যে আপনার সংসর্গে আমার ছেলের ভাল হচ্ছে না। এখন প্রতিদিন তার মাংস খেতে বাধে, আর আপনার সেই যুক্তি দিয়ে ফল চায়। এটা বরদাস্ত করা চলে না। মাংস ছেড়ে দিলে রোগে যদি বা না পড়ে, দুর্বল ত হবেই। তা কি করে চোখে দেখি? আপনার এরূপ আলোচনা বয়স্ক আমাদের মধ্যে চলতে পারে। ছোটদের ওপর তার ফল মন্দ না হয়ে যায় না।'

'মিসিস···আমি দুঃখিত। মার বুক ছেলের অমঙ্গলের ভয়ে দুরদুর করবে এ কথা আমি বুঝতে পারি, কারণ আমিও সন্তানের বাপ। এই আপদ থেকে সহজেই বাঁচা যেতে পারে। আমি যা বলি তা শোনার প্রভাব অপেক্ষা আমি কি খাই বা না খাই তার প্রভাব বালকের ওপর বেশি না হয়ে যায় না। অতএব এখন থেকে এখানে আর না আসাই উত্তম পথ। এতে আমাদের বন্ধুত্বে ঘুণ ধরবে না।'

ভগিনী খুশী হইয়া বলেন, 'আমি আপনার নিকট কৃতজ্ঞ।'

২৩

ঘর-সংসার

সংসার পাতা এই আমার নূতন ছিল না। বোম্বাইতে সংসার পাতিয়াছিলাম আর তার আগে লণ্ডনে। কিন্তু ওই দুই হইতে নাতালের সংসার আলাদা ছিল। প্রতিষ্ঠার জন্যই ওখানে আমার কিছু বেশি খরচ করিতে হইত, কেন না আমি মনে করিতাম ভারতীয় ব্যারিস্টারের ও ভারতীয়দের প্রতিনিধির উপযুক্ত বাসগৃহে আমার থাকা কর্তব্য। তাই ভাল পাড়ায় ছোট হইলেও বেশ ভাল বাড়ী আমি লইয়াছিলাম। গৃহের সাজসজ্জাও উত্তম ছিল। খাওয়া সাদাসিধা ছিল, তবুও খাওয়া-খরচ বেশ মোটাই হইত কারণ ইংরেজ বন্ধুদের ও ভারতীয় সহকর্মীদের গৃহে ডাকা প্রয়োজন হইত।

ভাল চাকর ছাড়া সংসার চলে না। চাকর হিসাবে কাউকে রাখিতে আমার মন সরিত না। এক বন্ধু ছিল, সাথীতে সাথী, সাহায্যকারীতে সাহায্যকারী। এক পাচক রাখা হইয়াছিল; পরিবারেরই সে একজন হইয়া গিয়াছিল। আপিসের মুহুরিদের কয়েকজন আমার সঙ্গেই থাকিত।

আমার বিশ্বাস এই প্রয়োগে আমি অনেকটা সফল হইয়াছিলাম। তবে উহাতে সংসারের তিক্ত অভিজ্ঞতাও কিছুটা হইয়াছিল।

ওই সাথী বেশ কাজের লোক ছিল, আর আমি মনে করিতাম বিশ্বাসীও। এখানে আমার ভুল হইয়াছিল। আপিসের এক মুহুরি আমার বাড়ীতেই থাকিত। তাকে এই সাথী দেখিতে পারিত না। সাথী ফাঁদ পাতিল; আমি তাতে পা দিলাম; মুহুরিকে সন্দেহ করিলাম। এই কেরানী বন্ধুর মেজাজ ছিল একটু ভিন্ন রকমের। যাই সে বুঝিতে পারিল যে তাকে আমি সন্দেহের চোখে দেখি সে চাকরি ও ঘর দুইই ছাড়িয়া চলিয়া যায়। ব্যথা পাইলাম। তার ওপর অন্যায় করি নাই ত?, এই প্রশ্ন আমার অন্তরে বিঁধিতে থাকে।

এর মধ্যে রাঁধুনি দিন কয়েকের জন্য ছুটিতে বা কোন কাজে কোথাও যায়। বন্ধুর সহায়তার জন্য তাকে রাখিয়াছিলাম। তার জায়গায় অন্য রাঁধুনি রাখি। পরে জানিতে পারিয়াছিলাম লোকটি মহা ধড়িবাজ। কিন্তু যে প্রয়োজন সে আমার সাধন করিয়াছিল তা হইতে দেখা যায় যে অমন লোকেরই আমার প্রয়োজন ছিল। নূতন পাচক আসিয়াছে দুই

তিন দিন হয়, এর মধ্যেই আমার চোখের আড়ালে আমার গৃহে যে কদাচার চলিতেছিল তা সে দেখিতে পায় ও ঠিক করে আমাকে তা জানানো তার কর্তব্য; সহজ বিশ্বাসী সরল প্রকৃতির লোক বলিয়া আমার খ্যাতি ছিল। এমন লোকের গৃহে এমন অনাচার চলিতেছে এটা তাই রাঁধুনির কাছে ভয়ানক বিশ্রী লাগে। দুপুরে একটার সময় আমি আপিস হইতে বাড়ীতে খাইতে যাইতাম। সেদিন বারটার কাছাকাছি পাচক হাঁপাইতে হাঁপাইতে আপিসে আসিয়া হাজির হয় ও বলে, 'অবাক কাণ্ড দেখবেন ত শীগগির আসুন।'

বলি: 'ব্যাপারটা কি? কেন যাব তা ত বলবে? কাজ ফেলে ঘরে গিয়ে কি দেখতে হবে?'

পাচক: 'না যান ত পস্তাবেন! এর বেশি বলতে চাই না।'

তার দৃঢ়তা উপেক্ষা করা গেল না। মুহুরিকে সঙ্গে লইয়া বাড়ীর দিকে চলিলাম—পাচক আমাদের আগে আমরা তার পিছনে। সে আমাকে সোজা দোতলায় লইয়া গেল এবং যে ঘরে আমার সাথী থাকিত তা দেখাইয়া আমাকে বলিল, 'দরজা খুলে নিজের চোখে দেখুন।'

ব্যাপারটা বুঝিতে পাইলাম। কপাটে করাঘাত করিলাম। জবাব আসিবে কেন? জোরে দরজা ধাক্কা দিলাম। দেওয়াল কাঁপিয়া উঠিল। দরজা খুলিল, দেখিলাম ভিতরে এক বারবধূ। তাকে বলিলাম, 'বোন, চলে যাও, এদিকে আর কখনও আসবে না।'

সাথীকে বলিলাম, 'তোমার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ আজ চুকে গেল। আমি ভয়ানক ঠকেছি, বোকা বনেছি। এই বুঝি তোমার ওপর আমার বিশ্বাসের বদলা!'

সাথী রাগ করিল। আমার সব কিছু ফাঁস করিয়া দিবে বলিয়া ভয় দেখাইল।

বলি, 'আমার লুকানোর কিছু নেই। কিছু করে থাকি ত যত খুশী বলে বেড়াও গে। কিন্তু এখনই সরে পড়ো।'

সাথী আরও বেশি চটিল। মুহুরি নীচে দাঁড়াইয়াছিল। তাকে বলিলাম, 'পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেণ্টকে আমার নমস্কার জানিয়ে বল গে যে আমার এক সাথী আমাকে ঠকিয়েছে, তাকে আমি বাড়ীতে রাখতে চাই না। কিন্তু সে যাচ্ছে না। সহায়তা করা সম্ভব হলে আমি বিশেষ বাধিত হব।'

এতে সে বুঝিতে পায় যে আমার কথার নড়চড় হইবার নয়। দোষ করিলে লোকে কেঁচো বনে। সে নরম হইল। ক্ষমা চাহিল। সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের কাছে যেন লোক না পাঠাই এই কাকুতি-মিনতি করিয়া সে বলিল, তখনই সে চলিয়া যাইবে। সে চলিয়া যায়।

এই ঘটনা আমাকে সজাগ করিয়া দেয়। আর ঠিক ইহাই আমার দরকার ছিল। এই কুগ্রহ যে আমায় কতটা প্রতারিত করিয়াছিল তা এখন আমি স্পষ্ট বুঝিতে পাই। এই সঙ্গীকে রাখিয়াছিলাম না ত অনিষ্ট দিয়া ইষ্ট করিতে গিয়াছিলাম, বাবলা গাছ হইতে আম প্রত্যাশা করিয়াছিলাম। তার চরিত্র যে খারাপ তা আমি জানিতাম, তবুও ধরিয়া লইয়াছিলাম আমার সহিত সে বিশ্বাসঘাতকতা করিবে না। তাকে শোধরাইতে গিয়া আমি প্রায় ডুবিতে বসিয়াছিলাম। আমার হিতকামীদের পরামর্শ আমি উপেক্ষা করিয়াছিলাম। মোহে আমি একেবারে অন্ধ হইয়াছিলাম।

এই নূতন রাঁধুনি না আসিলে আমার চোখ খুলিত না, গৃহে যা চলিতেছিল তার সন্ধান আমি পাইতাম না। আর সম্ভবত এই লোকের প্রভাবে পড়িয়া যে আত্মোৎসর্গের পথে চলিতে শুরু করিয়াছিলাম সে পথে চলিতে পারিতাম না। খামকাই তার জন্য আমার কিছু সময় নষ্ট হইত। আমাকে অন্ধকারে রাখার ও বাঁকা পথে নেওয়ার শক্তি তার ছিল।

কিন্তু রাম রাখে ত নাশে কে? আমার উদ্দেশ্য মহৎ ছিল তাই ভুল করিয়াও আমি বাঁচিয়া গিয়াছিলাম, আর জীবনের প্রথম দিককার এই অভিজ্ঞতা হইতে পরবর্তী জীবনে সাবধান হইয়াছিলাম।

বুঝি বা ভগবানই এই রাঁধুনিকে পাঠাইয়াছিলেন। সে রাঁধিতে জানিত না। তাই সে আমার কাজে থাকিতে পারিত না। কিন্তু সে ছাড়া অন্য কেউ আমার চোখ খুলিতে পারিত না। পরে জানিয়াছিলাম, এই ঘটনার আগেও ওই স্ত্রীলোক আমার গৃহে অনেক বার আসিয়াছিল। কিন্তু রাঁধুনির মত সাহস করিয়া সেই কথা কেহ আমাকে বলে নাই। বলে নাই তার কারণ তারা জানিত এই সাথীকে আমি অন্ধের মত বিশ্বাস করিতাম। এই কাজ করার জন্যই যেন রাঁধুনি আমার কাছে আসিয়াছিল, কারণ তখনই সে এই বলিয়া চলিয়া যাইতে চায়:

'এখানে আমার থাকা পোষাবে না। আপনি লোকের কথায় বড় সহজে ভোলেন।'

আমি তাকে থাকিতে বলি নাই।

এখন আমি বুঝিতে পারিলাম যে ওই কেরানীর ওপর আমার সন্দেহ এই সাথীই সৃষ্টি করিয়াছিল। তার ওপর যে অন্যায় করিয়াছিলাম তা দূর করার বহু প্রযত্ন আমি করিয়াছিলাম। কিন্তু তাকে পুরাপুরি সন্তুষ্ট করিতে পারি নাই এই বেদনা আমার বরাবর থাকিয়া গিয়াছে। ভাঙ্গা শাঁখা জোড়া যায় না; শত চেষ্টাও সেখানে নিষ্ফল।

২৪

দেশ অভিমুখে

এতদিনে দক্ষিণ আফ্রিকায় আমার তিন বছর কাটিয়া গিয়াছিল। লোকদের আমি চিনিয়াছিলাম, আর তারাও আমাকে চিনিয়াছিল। ১৮৯৬ সনে ছয় মাসের জন্য দেশে যাওয়ার অনুমতি চাই। বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে দক্ষিণ আফ্রিকায় আমার অনেক দিন থাকিতে হইবে। বলা যাইতে পারে আমার ওকালতি ভালই জমিয়াছিল। দশের কাজের জন্য আমার প্রয়োজন লোকে অনুভব করে ইহাও দেখিতে পাইয়াছিলাম। তাই দেশে যাইয়া স্ত্রীপুত্রদের লইয়া আসিয়া দক্ষিণ আফ্রিকায় বসিয়া যাওয়া স্থির করি। তা ছাড়া এই কথাও মনে হয় যে দেশে গেলে কিছু সার্বজনিক কাজও করা যাইবে,—দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়েরা যে দুঃখ ভোগ করে তা লোকের কাছে ধরিয়া তাদের পক্ষে ভারতে লোকমত সৃষ্টি করা যাইবে। তিন পাউণ্ড কর গলার কাঁটা হইয়াছিল। যতদিন রদ না হয় ততদিন সোয়াস্তি ছিল না।

কিন্তু প্রশ্ন উঠিল, আমার না থাকা কালে কংগ্রেসের ও বিদ্যার্থীমণ্ডলের কাজ কে চালাইবে? দুই সহকর্মীর ওপর দৃষ্টি পড়ে: আদমজী মিঞাখাঁ ও পারসী রুস্তমজী। ব্যবসায়ী মহল হইতে বহু কর্মী বাহির হইয়াছিল। তবে নিয়মিতরূপে সেক্রেটারীর কাজ করার ও দক্ষিণ আফ্রিকায় জন্ম ভারতীয় তরুণদের মন জয় করার যোগ্যতা যাঁদের ছিল এঁরা দুই জন সেই মুখ্যদের পংক্তিতে ছিলেন। কাজ চালাইয়া লওয়ার মত ইংরেজীর জ্ঞান সেক্রেটারীর থাকা ত আবশ্যক ছিলই। কংগ্রেসের কাজে আমি স্ব. আদমজী মিঞাখাঁর নাম সুপারিশ করি, কংগ্রেস সে প্রস্তাব মঞ্জুর করে। দেখা গিয়াছিল যে

এই বাছাই খুবই ভাল হইয়াছিল। নিজের একাগ্রতা, উদারতা, মিষ্ট ব্যবহার ও বিচার-বিবেচনা গুণে তিনি সকলের মন পাইয়াছিলেন, আর ইহাও সপ্রমাণ করিয়াছিলেন যে উকিল-ব্যারিস্টারের ডিগ্রী অথবা ইংরেজীর উচ্চ শিক্ষা না থাকিলেও সেক্রেটারীর কাজ করা যায়।

১৮৯৬ সনের মাঝামাঝি 'পোঙ্গোলা' জাহাজে ভারত রওনা হই। জাহাজ কলিকাতাগামী ছিল।

স্টীমারে যাত্রী খুব কম* ছিল। দুইজন ইংরেজ রাজকর্মচারী ছিলেন। তাঁদের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব জন্মিয়াছিল। তাঁদের একজনের সঙ্গে দৈনিক এক ঘণ্টা দাবা খেলিতাম। স্টীমারের ডাক্তার আমাকে একখানি 'তামিল শিক্ষক' দিয়াছিলেন। তামিল আমি পড়িতে আরম্ভ করি। নাতালের অভিজ্ঞতা হইতে বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে মুসলমানদের মন পাইতে হইলে উর্দু জানা আবশ্যক, আর মাদ্রাজীদের সহিত নিকট-সম্বন্ধ পাতাইতে হইলে তামিল শেখা প্রয়োজন।

যে ইংরেজ বন্ধু আমার সঙ্গে উর্দু পড়িতেন তাঁর অনুরোধে ডেক যাত্রীদের মধ্য হইতে এক ভাল মুনশী খুঁজিয়া বাহির করি। আর তাঁর কাছে আমাদের পড়া বেশ চলিতে থাকে। ইংরেজ অফিসারের স্মরণশক্তি আমার অপেক্ষা ভাল ছিল। উর্দু অক্ষর মনে রাখিতে আমার বেগ পাইতে হইত, কিন্তু ওই অফিসারের একবার দেখিলেই মনে থাকিত। আমি অধিক পরিশ্রম করিতে থাকি, কিন্তু তাঁর মত হইতে পারি নাই।

তামিলে বেশ আগাইয়া গিয়াছিলাম। কোন সহায়তা মিলে নাই। বইখানা এমনভাবে লেখা ছিল যে বাইরের সাহায্যের দরকারও বিশেষ মনে হয় নাই।

মনে আশা ছিল, দেশে ফিরিয়া তামিলের আরও চর্চা করিব। কিন্তু তা ঘটিয়া ওঠে নাই। ১৮৯৩ সনের পরে জেলেই আমি বেশির ভাগ পড়াশুনা ও অধ্যয়ন করিয়াছি। এই দুই ভাষায় কিছুটা আগাইয়া গিয়াছিলাম বটে, তবে সে জেলে—তামিল দক্ষিণ আফ্রিকার জেলে আর উর্দু য়েরবডা জেলে। কিন্তু তামিল বলিতে পারিতাম না। পড়িতে পারিতাম, চর্চার অভাবে তাও ভুলিয়া যাইতেছি।

*ইংরেজীতে 'কম' শব্দ আছে; মূলে আছে 'বহু'। —অনুবাদক

তামিল-তেলেগু বলিতে পারি না, এই বেদনা আজও অন্তরে অনুভব করি। দক্ষিণ আফ্রিকার দ্রাবিড়দের ভালবাসা আমি কখনও ভুলিব না। সেই ভালবাসার কথা প্রায়ই আমার মনে হয়। কোন তামিল বা তেলেগুকে দেখিলে আজও আমার চোখের সামনে তাদের বিশ্বাসের, তাদের উদ্যমের ও তাদের অনেকের নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগের ছবি ভাসিয়া ওঠে। কি স্ত্রী কি পুরুষ প্রায় সকলেই তারা নিরক্ষর ছিল। দক্ষিণ আফ্রিকার লড়াই নিরক্ষরদের লড়াই ছিল সুতরাং যোদ্ধাও নিরক্ষর ছিল—উহা গরীবের যুদ্ধ ছিল সুতরাং যোদ্ধাও গরীব ছিল।

এই সব সরল সুজন দেশবাসীদের মন পাওয়ার পথে ভাষা কখনও অন্তরায় হয় নাই। তারা ভাঙ্গা ভাঙ্গা হিন্দুস্থানী বা টুটো-নুলো ইংরেজী বলিত; তাতেই আমাদের কাজ দিব্য চলিয়া যাইত। কিন্তু আমার আকাঙ্ক্ষা ছিল তাদের ভালবাসার পাল্টা জবাবে তাদের ভাষা তামিল-তেলেগু শিখিব। তামিল কিছুটা শিখিয়াছিলাম। তেলেগু শেখার চেষ্টা ভারতে করিয়াছিলাম, কিন্তু অ আ ক খ-র বেশি আগায় নাই। এই দুই ভাষা আমি শিখিতে পারি নাই, আর সেই ভরসাও নাই। তাই এই আশা পোষণ করি যে দ্রাবিড়-ভাষাভাষীরা হিন্দুস্থানী শিখিবে। দক্ষিণ আফ্রিকায় ইংরেজী-না-জানা দ্রাবিড়েরা কমবেশি হিন্দী বা হিন্দুস্থানী বলে। মুশকিল হয় ইংরেজী-জানা লোকদের লইয়া। ইংরেজীর জ্ঞান দেশের বিভিন্ন ভাষা শেখার পক্ষে বাধাস্বরূপ নয় ত!

কিন্তু এ ত হইল ধান ভান্‌তে শিবের গীত। জাহাজযাত্রার কথায় ফিরিয়া যাই। ‘পোঙ্গোলা’র কাপ্তেনের কথা বলি নাই। তা বলি। আমাদের মধ্যে মিত্রতা জন্মিয়াছিল। লোকটি ভাল ছিলেন, প্লীমথ ব্রাদার সম্প্রদায়ের ছিলেন। নৌবিদ্যা অপেক্ষা আমাদের মধ্যে অধ্যাত্মবিদ্যার কথা বেশি হইত। নীতি ও ধর্মবিশ্বাসকে তিনি ভিন্ন ভিন্ন ছকে ফেলিতেন। বাইবেলের শিক্ষা তাঁর মতে ছিল ছেলেখেলা। উহার সরলতাই উহার বিশেষত্ব: বাল বল, নারী বল, নর বল, যীশু ও যীশুর বলিদান মানিয়া লইলেই তার সব পাপ ধুইয়া-মুছিয়া যায়। এই প্লীমথ ব্রাদারের কথায় প্রিটোরিয়ার ব্রাদারদের কথা আমার মনে পড়িয়াছিল। তিনি মনে করিতেন, যে ধর্মে নীতির বালাই আছে সে ধর্ম ধর্মই নয়। আমি কেন নিরামিষ খাই এই প্রশ্ন হইতে আমাদের দুইয়ের ধর্মালোচনার শুরু হয়।

মাংস নয় কেন? গো-মাংসে কি দোষ? গাছপালার মত পশুপক্ষীও কি ঈশ্বর মানুষের আহার ও আনন্দের জন্য দেন নাই? এই সব প্রশ্নের কারণ আধ্যাত্মিক আলোচনা আসিয়া যাইত।

একে অন্যকে আমরা বুঝাইতে পারি নাই। ধর্ম ও নীতি একই বস্তুর দুই পৃথক্ নাম আমার এই বিশ্বাস হইতে আমি নড়ি নাই। নিজের বিশ্বাস বিষয়ে তাঁর অনুমাত্র সংশয় ছিল না।

চব্বিশ দিনে এই আনন্দদায়ক জাহাজযাত্রা শেষ হয়: হুগলী নদীর সৌন্দর্য দেখিতে দেখিতে কলিকাতা বন্দরে অবতরণ করি। সেই দিনই বোম্বাইর টিকিট কাটি।

২৫

ভারতবর্ষে

কলিকাতা হইতে বোম্বাই যাইতে তখন প্রয়াগ হইয়াই যাইতে হইত। সেখানে গাড়ী ৪৫ মিনিট দাঁড়াইত। মনে করিলাম এই সময় মধ্যে শহরটা যতটা পারা যায় ঘুরিয়া আসা যাক। ওষুধের দোকান হইতে ওষুধও কেনার ছিল। কেমিস্ট ঘুমের চোখে ওষুধ দিতে খামকা অনেকটা সময় নেয়। স্টেশনে পৌঁছিয়া দেখি গাড়ী চলিয়া যাইতেছে। সুজন স্টেশন মাস্টার আমার জন্য গাড়ী এক মিনিট বেশি রাখিয়াছিলেন। আমাকে ফিরিয়া আসিতে না দেখিয়া সাবধানতা পূর্বক আমার জিনিসপত্র নামাইয়া রাখার আদেশ দিয়াছিলেন।

কেলনরের হোটেলে উঠিলাম, আর ঠিক করিলাম প্রয়াগ হইতেই কাজ আরম্ভ করা যাক। ওখানকার 'পায়োনিয়র' পত্রের খ্যাতি আমি জানিতাম। উহা যে ভারতীয়দের আশা-আকাঙ্ক্ষার বিরোধী এ কথাও জানিতাম। মনে পড়ে মি. চেজনী (ছোট) তখন উহার সম্পাদক ছিলেন। আমার লক্ষ্য ছিল যেখান হইতে যে সাহায্য মিলে তার সুযোগ গ্রহণ করা। অতএব মি. চেজনীকে লিখি যে তাঁর সহিত দেখা করিতে চাই; এ কথাও তাঁকে বলি যে ট্রেন ফেল করিয়াছি ও কাল সে স্থান ত্যাগ করিব। তিনি সঙ্গে সঙ্গে দেখা করিতে বলেন। খুশী হইলাম। আমার কথা তিনি মনোযোগ দিয়া শুনিলেন। 'আপনি কিছু লিখে পাঠান ত তার ওপর যথাসম্ভব সত্বর

মন্তব্য করব', এই কথা বলিয়া তিনি আরও বলেন, 'তবে আপনাকে কথা দিতে পারি না যে আপনাদের সকল দাবি সমর্থন করতে পারব। ঔপনিবেশিকদের কি বলার আছে তাও আমাদের বুঝতে হবে ভাবতে হবে ত।'

বলিলাম, 'আপনি এই প্রশ্নটা তলিয়ে দেখবেন। আর মন্তব্য করেন ত মনে করব যথেষ্ট পেলাম। আমরা ন্যায়ের বেশি কিছু চাই না।'

বাকী দিনটা মনোরম ত্রিবেণী-সঙ্গম দেখিয়া ও ভাবী কর্মের ছক কাটিয়া কাটাইলাম।

যে সকল ঘটনার কারণ নাতালে আমার ওপর কিল-চড়-লাথি পড়িয়াছিল সেই সকল ঘটনার ভিত 'পায়োনিয়র'-এর সম্পাদকের সহিত এই আকস্মিক সাক্ষাৎকারে রচিত হয়।

কোথাও না থামিয়া বোম্বাই হইতে সোজা রাজকোটে যাই ও দক্ষিণ আফ্রিকার অবস্থা সম্পর্কে এক পুস্তিকা রচনার কাজে লাগিয়া যাই। পুস্তিকা লিখিতে ও ছাপাইতে প্রায় একমাস লাগে। উহার মলাট সবুজ ছিল। তার জন্য পরে উহা 'সবুজ-পত্র' আখ্যা পায়। দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতবাসীদের অবস্থার চিত্র উহাতে ভাবিয়া-চিন্তিয়াই হাল্কা তুলিতে আঁকিয়াছিলাম। পূর্বে নাতালে যে দুইখানি পুস্তিকা লিখিয়াছিলাম ও প্রচার করিয়াছিলাম তাহা হইতে এই পুস্তিকার সুর নরম ও ভাষা মোলায়েম ছিল, কারণ আমি জানিতাম দূর হইতে ছোট বস্তু বড় দেখায়।

সবুজ-পত্র দশ হাজার ছাপানো হইয়াছিল। ভারতের সকল সংবাদপত্রের ও সকল দলের নেতাদের কাছে উহা পাঠানো হইয়াছিল। উহার ওপর সর্বপ্রথম পায়োনিয়ার সম্পাদকীয় মন্তব্য বাহির করে। ওই মন্তব্যের মর্ম রয়টার বিলাতে পাঠায়। আর সেই মর্মের মর্ম রয়টারের লণ্ডন আপিস নাতালে পাঠায়। ছাপার তিন লাইন মাত্র তা ছিল। দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়দের দুর্ভোগের যে চিত্র আমি আঁকিয়াছিলাম তার রং-ফলানো সারসংক্ষেপ উহা ছিল, অতএব আমার শব্দেও নয়। নাতালে উহার যে প্রতিক্রিয়া হইয়াছিল সে কথা পরে বলিব। ইতিমধ্যে অন্য সব নামজাদা পত্রেও ওই সম্বন্ধে মন্তব্য বাহির হইয়াছিল।

পুস্তিকাগুলি ডাকে পাঠাইবার মত করা সহজ কাজ ছিল না। পয়সা দিয়া সে কাজ করাইতে গেলে খরচও কম হইত না। এক সহজ পথ

বাহির করিলাম ঃ পাড়ার বালকদের ডাকিলাম ও সকালবেলা দুই তিন ঘণ্টা—যে যতটা পারে—কাজ করিয়া দিতে বলিলাম। বালকেরা খুশী মনে রাজী হইল। আরও বলি যে আমার কাছে যত পুরানো ডাকটিকেট আছে সে সব তাদিগকে তাদের কাজের পুরস্কারস্বরূপ দিব আর তার ওপরে আশীর্বাদও। দেখিতে দেখিতে বালকেরা কাজটা করিয়া দিল। বালকদের কিভাবে স্বেচ্ছাসেবক বানাইতে হয় ওই বিদ্যায় সেই ছিল আমার হাতে খড়ি। সেই বালকদের দুইজন আজ আমার সহকর্মী।

এই সময়ে বোম্বাইতে প্রথম প্লেগের মরক লাগে। চারদিকে ভয়ের ছায়া পড়ে। রাজকোটেও মরক লাগার ভয় ছিল। আমার মনে হয় রাজ্যের স্বাস্থ্য-বিভাগকে আমি এই দিকে সহায়তা করিতে পারি। রাজ্যকে আমি আমার সেবা করার আগ্রহ জানাই। রাজ্য আমার প্রস্তাব গ্রহণ করে ও এক কমিটী গঠন করে। আমাকে উহার সভ্য করিয়া নেয়। আমি পায়খানা সাফাইর ওপর জোর দেই। কমিটী প্রতি গলিতে গিয়া পায়খানা দেখার ভার লইয়াছিল। গরীবেরা পায়খানা ত দেখিতে দিয়াছিলই, পায়খানার যে উন্নতি করিতে বলা হইয়াছিল তা-ও করিয়াছিল। কিন্তু হোমরা-চোমরাদের বাড়ীর অভিজ্ঞতা আমাদের অন্যরূপ ছিল। তাদের কেউ কেউ পায়খানা পর্যন্ত আমাদের দেখিতে দেয় নাই, আমাদের পরামর্শ মত উন্নতি করা ত দূরের কথা। আমরা লক্ষ্য করিয়াছিলাম যে, ধনিকবর্গের পায়খানা সাধারণত অধিক কদর্য ছিল—অন্ধকার, দুর্গন্ধ ও নোংরার একশেষ। বসার জায়গায় পোকা কিলবিল করিতে দেখিয়া মনে হইয়াছিল যে এরা পায়খানায় যায় না ত সশরীরে নিত্য নরকে প্রবেশ করে। মল ভুঁইয়ে পড়িয়া তলাটা নোংরা না হয়, প্রস্রাব ও শৌচের জল তলায় পড়িয়া তলায় না শোষে তার জন্য দুইটা বালতির ব্যবস্থা করার এবং পায়খানায় আলোবাতাস ঢুকিতে পায় ও মেথর পায়খানা ঠিকমত সাফ করিতে পারে তার জন্য বাইরের দেওয়াল ও পায়খানার মধ্যকার অনাবশ্যক ইটের পর্দা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া পায়খানা খোলামেলা করিয়া দেওয়ার মত অতি সাধারণ উন্নতির কথা আমরা বলিয়াছিলাম; সর্বশেষ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে হোমরা-চোমরারা এটা-ওটা ওজর-আপত্তি তুলিয়া কর্মটা অনেক স্থলে এড়াইয়া গিয়াছিল।

অচ্ছুতদের মহল্লায় ত কমিটীর যাওয়ার ছিলই। কমিটীর একজন সভ্য

কেবল সেখানে আমার সঙ্গী হইয়াছিলেন। কমিটীর অন্য সভ্যদের কাছে অস্পৃশ্যদের বস্তিতে যাওয়া, তা-ও আবার তাদের পায়খানা দেখার জন্য— এটা ছিল এক তাজ্জব কথা। কিন্তু অস্পৃশ্যদের বস্তি দেখিয়া আমি আনন্দে অবাক হইলাম। অচ্ছুত বস্তিতে তার আগে আমি কখনও যাই নাই। অচ্ছুত ভাইবোনেরা আমাদের দেখিয়া আশ্চর্য হইয়া যায়। আমি তাদের পায়খানা দেখিতে চাই।

'পায়খানা! আমাদের পায়খানা আছে নাকি? আমরা ত ফাঁকায় যাই। পায়খানা ত বড়মানুষ আপনাদের জন্য!'

'তবে আপনাদের ঘর আমাদের দেখতে দেবেন?'

'আসুন, ভাইসাহেব। যেখানে ইচ্ছা যান। এই আমাদের ঘর।'

ঘরে গেলাম। দেখিলাম—ভিতরটা লেপাপোছা তকতকে; আঙ্গন ঝাটপাটে ঝরঝরে; বাসনকোসন যে দুই চারটি ছিল, সব মাজাঘষায় চকচকে। মন আনন্দে ভরিয়া গেল। বুঝিলাম, এই বস্তিতে প্লেগ লাগার ভয় নাই। আশ্বস্ত হইয়া ফিরিলাম।

বড়োদের পাড়ার একটা পায়খানার কথা একটু না বলিলে চলে না। সব ঘরেই নালী ছিল। তাতে জল ফেলা হইত আর প্রস্রাবও করা হইত। অতএব প্রায় সব ঘরেই দুর্গন্ধ ছিল। এক বাড়ীর দোতলার শোয়ার ঘরেই নালী দেখিতে পাইয়াছিলাম। পায়খানা রূপেও তার ব্যবহার হইত। পাইপ দিয়া মল নীচে গিয়া পড়িত। কার সাধ্য সেখানে দাঁড়ায়! বাড়ীর লোকে কি করিয়া সেই ঘরে ঘুমাইত পাঠক সে কথা ভাবিয়া দেখুন।

কমিটী হবেলীতেও গিয়াছিল। হবেলীর পুরোহিতের সঙ্গে গান্ধী পরিবারের সম্পর্ক মধুর ছিল। পুরুত ঠাকুর আমাদের হবেলী দেখিতে দেন এবং যতটা সম্ভব আমাদের কথামত কাজ করিতে স্বীকার করেন। একটা জায়গা ছিল যা পুরুত ঠাকুর ইহার পূর্বে কখনও দেখেন নাই। হবেলীর এঁটো-ঝুটো, পাতা আবর্জনা ইত্যাদি খিড়কির দরজার ওপর দিয়া একটা জায়গায় ছুঁড়িয়া ফেলা হইত। সেই স্থানটা কাক চিলের আড্ডা বনিয়া গিয়াছিল। পায়খানা ত নোংরা ছিলই। এই সব ত্রুটি দূর করার দিকে কতটা কি করা হইয়াছিল তার খোঁজ করিতে পারি নাই কারণ রাজকোটে বেশিদিন থাকিতে পাই নাই।

দেবগৃহে অপরিচ্ছন্নতা দেখিয়া ব্যথা পাইয়াছিলাম। পাওয়ার কথা।

যে স্থানকে লোকে পবিত্র বলিয়া জানে সে স্থানে স্বাস্থ্যের নিয়ম অন্য স্থান হইতে অধিক নিষ্ঠার সহিত পালিত হইবে লোকে ইহা আশা করে। স্মৃতিকারেরা যে অন্তর্বাহ্য শুচিতার ওপর খুব জোর দিয়াছেন সে কথা তখনও আমি জানিতাম।

২৬

দুই আকৃতি

আমার রাজভক্তি অকৃত্রিম ছিল: তেমনটা বড় দেখা যায় না। এখন বুঝিতে পাই যে সত্যের প্রতি আমার স্বাভাবিক টান ওই রাজভক্তির মূলে ছিল। রাজভক্তির বা অন্য কিছুর ভান করা আমার ধাতে কোন কালেই ছিল না। নাতালে সভায় যাইতাম ত দেখিতাম সেখানে 'গড সেভ দি কিং' গাওয়া হইত। তাতে যোগ দেওয়া আমার কর্তব্য মনে হইত। ব্রিটিশ শাসনের দোষত্রুটি তখন আমার চোখে পড়িত না তা নয়, তবে মোটামুটি তা আমার ভাল লাগিত। সব দিক হইতে দেখিয়া আমার বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে প্রজার কল্যাণের দিকেই ব্রিটিশ শাসন ও শাসকদের দৃষ্টি।

দক্ষিণ আফ্রিকায় রথ উল্টা চলিতেছিল; তথায় বর্ণবিদ্বেষ ছিল। আমার মনে হইয়াছিল উহা ব্রিটিশ স্বভাবের উল্টা জিনিস—ক্ষণিক ও স্থানিক। তাই রাজভক্তিতে ইংরেজকেও ছাড়াইয়া যাইতে আমি চেষ্টা করিতাম। অনেক কষ্ট করিয়া ইংরেজের জাতীয় সঙ্গীত 'গড সেভ দি কিং'-এর সুর আমি শিখিয়াছিলাম। সভায় গাওয়া হইত ত তাতে যোগ দিতাম। বিনা আড়ম্বরে রাজভক্তি প্রদর্শন করার প্রসঙ্গ আসিলে রাজভক্তি প্রদর্শন করিতাম।

এই রাজভক্তি জীবনে কখনও আমি ভাঙ্গাই নাই। তাকে ব্যক্তিগত লাভের কড়ি করার কথা আমার মনে ঠাঁই পায় নাই। কর্জ শোধ করিতেছি এই দৃষ্টি হইতে আমি রাজভক্তি দেখাইতাম।

যখন ভারতে আসিয়াছিলাম তখন মহারাণীর ডায়মণ্ড জুবিলীর উদ্যোগ-আয়োজন চলিতেছিল। রাজকোটেও এক কমিটী গঠিত হইয়াছিল; আমাকে উহার সভ্য হইতে বলা হইয়াছিল। আমন্ত্রণ স্বীকার করিয়াছিলাম। কিন্তু

এ সন্দেহ ছিল যে আয়োজন প্রধানত আড়ম্বর-ঘেঁষা হইবে। আয়োজনে ছলের আভাস পাইলাম, কাজ অপেক্ষা লোক-দেখানোর ভাব বেশি দেখিলাম। ব্যথা বোধ করিলাম। কমিটীতে থাকিব কি থাকিব না এই প্রশ্ন মনে জাগিল। অন্তে ঠিক করিলাম আমার কর্তব্য আমি করিয়া যাইব"।

বৃক্ষরোপণ নানা কর্মের এক ছিল। এতেও ভান দেখা গিয়াছিল। সাহেবদের খুশী করার জন্যই তা করা হইতেছে এরূপ আমার মনে হইয়াছিল। লোকদের আমি বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিলাম যে, বৃক্ষরোপণ অবশ্য কর্ম নয়, ঐচ্ছিক কর্ম। মন চায় ত হৃদয় ঢালিয়া গাছ বসান, নয় ত আদৌ বসাইবেন না। আমার যেন মনে হয় আমার এই কথা তারা হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছিল; মনে আছে আমার যে গাছ বসানোর কথা ছিল তা আমি সযত্নে বসাইয়াছিলাম ও বাড়াইয়াছিলাম।

পরিবারের ছেলেমেয়েদের আমি 'গড সেভ দি কিং' শিখাইয়াছিলাম। ট্রেনিং কলেজের ছাত্রদেরও শিখাইয়াছিলাম, তবে এই প্রসঙ্গে কি সপ্তম এডওয়ার্ডের সিংহাসন-আরোহণ উপলক্ষ্যে তা আমার ঠিক মনে নাই। পরে এই গীত গাইতে আমার আটকাইত। অহিংসার ভাব মনে যত দৃঢ় হইতেছিল ততই আমি নিজের ভাব ও আচরণ সম্পর্কে অধিক সতর্ক হইতেছিলাম। গীতের দুই চরণে এই কথাও ছিল :

> তার শত্রুরা হউক নাশ,
> তাদের চক্রান্ত হউক ফাঁস।

এই কথা উচ্চারণ করিতে আমার অহিংসায় বাধিত। আমার অসুবিধার কথা ডা. বুথকে বলি। তিনি স্বীকার করেন যে অহিংসার সাধকের পক্ষে এই কথা বলা চলে না। শত্রু হইলেই ধোঁকাবাজ, আর খারাপ এ কথা কিরূপে বলা যায়? কেবল ন্যায়ই ঈশ্বরের কাছে যাচ্ঞা করা চলে—ডা. বুথ আমার এই কথা মানিয়া নেন। তাঁর যজমানদের জন্য তিনি এক নূতন জাতীয় সঙ্গীত রচনা করাইয়াছিলেন। ডা. বুথের বিশদ পরিচয় পরে দিব।

রাজভক্তির মত আর এক স্বাভাবিক বৃত্তি আমাতে ছিল—রোগীর শুশ্রূষাবৃত্তি। আপন পর যেই হোক রোগীর সেবা করিতে আমার ভাল লাগিত।

রাজকোটে যখন দক্ষিণ আফ্রিকার কাজ করিতেছিলাম (প্রচার পুস্তিকার) তখন একবার বোম্বাই ঘুরিয়া আসিয়াছিলাম—বড় বড় শহরে

সভা করিয়া লোকমত গঠন করা ছিল উদ্দেশ্য। এর জন্য বোম্বাইকে প্রথমে বাছিয়া লইয়াছিলাম। সকলের আগে ন্যায়মূর্তি রানাডের কাছে যাই। তিনি আমার কথা মন দিয়া শোনেন ও আমাকে ফিরোজশা মেহতার শরণ লইতে বলেন। এর পরে জস্টিস বদরুদ্দীন তৈয়বজীর কাছে যাই। তিনিও আমার কথা মনোযোগ দিয়া শোনেন এবং ন্যায়মূর্তি যে পরামর্শ দিয়াছিলেন সেই পরামর্শ দিয়া বলেন, 'জস্টিস রানাডে ও আমি আপনাকে বিশেষ পথ দেখাতে পারব না। আমাদের অবস্থা আপনি জানেন। দশের কাজে আমরা সাক্ষাৎ যোগ দিতে পারি না। কিন্তু আপনার কাজে আমাদের সমর্থন রয়েছেই। ঠিক পথ দেখাতে পারবেন ফিরোজশা।'

সার ফিরোজশার সহিত দেখা করার কথা ঠিকই করিয়া রাখিয়াছিলাম। কিন্তু যখন এই দুই গুরুজন ব্যক্তি তাঁর কথা মত কাজ করিতে বলেন, লোকের ওপর তাঁর প্রভাব যে কী তা বুঝিতে পাই। যথাসময়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করি। মনে হইয়াছিল যে সার ফিরোজশার তেজে আমার চমক লাগিবে। লোকে তাঁকে 'বোম্বাইর সিংহ', 'বোম্বাইর মুকুটহীন সম্রাট' বলিত এ কথা জানিতাম। কিন্তু বাদশাহ আমাতে ভয়ের সঞ্চার করেন নাই। সাবালক পুত্রকে বাবা যে আদরে গ্রহণ করে তিনি আমাকে সেই আদরে গ্রহণ করেন। তাঁর সঙ্গে আমি তাঁর চেম্বারে দেখা করিয়াছিলাম। তাঁর অনুযায়ীরা তখন তাঁকে ঘিরিয়া ছিল। ওয়াচা ছিলেন, কামা ছিলেন। তাঁদের সঙ্গে তিনি আমার পরিচয় করাইয়া দেন। ওয়াচার নাম আগেই শুনিয়াছিলাম। তাঁকে লোকে ফিরোজশার ডান হাত বলিত। বীরচাঁদ গান্ধীর কাছে শুনিয়াছিলাম যে ওয়াচা পরিসংখ্যানশাস্ত্রী। ওয়াচা আমায় বলেন, 'গান্ধী, আবার আসবেন।'

এই সব সাক্ষাৎ-পরিচয়ে মিনিট দুই লাগিয়াছিল। সার ফিরোজ আমার কথা মন দিয়া শুনিয়াছিলেন। ন্যায়মূর্তি রানাডে ও তৈয়বজীর সঙ্গে যে দেখা করিয়াছিলাম সে কথা আমি তাঁকে বলিয়াছিলাম। 'গান্ধী, দেখতে পাচ্ছি তোমাকে আমার সাহায্য করতেই হবে। এখানে জনসভা ডাকব'—এই বলিয়া তাঁর সেক্রেটারীকে সভার তারিখ ঠিক করিতে বলিলেন। সভার দিন ধার্য হইলে সভার আগের দিন তাঁর সঙ্গে দেখা করিতে বলিয়া আমায় বিদায় দিলেন। নিশ্চিন্ত হইলাম, খুশী মনে ঘরে ফিরিলাম।

এই অবসরে ভগ্নীপতিকে দেখিতে যাই। তিনি বোম্বাইতে থাকিতেন। অসুস্থ ছিলেন। গরীব ছিলেন। বোন একা তাঁর সেবা-শুশ্রূষা ঠিক ঠিক করিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না। রোগ কঠিন ছিল। আমি তাঁদের রাজকোটে আমার সঙ্গে আসিতে বলি। তাঁরা স্বীকার করেন। আমিও ভগিনীপতিকে রাজকোটে লইয়া আসি। যতদিন ভুগিবেন মনে হইয়াছিল তা অপেক্ষা বেশিদিন ভোগেন। আমার ঘরে তাঁকে রাখিয়াছিলাম। তাঁর কাছেই সারাদিন থাকিতাম। রাতও জাগিতে হইত। এক দিকে রোগীর শুশ্রূষা করিতাম অন্য দিকে দক্ষিণ আফ্রিকার কাজ করিতাম। ভগ্নীপতি মারা যান। তাঁর শেষ দশায় তাঁর সেবা করার সুযোগ আমার হইয়াছিল বলিয়া শোকের মাঝেও তুষ্টি লাভ করিয়াছিলাম।

সেবার এই আগ্রহ পরে অতি প্রবল হয়। এতটা যে সেবার জন্য আমি কাজ উপেক্ষা করিতাম এবং সময় বিশেষে সহধর্মিণীকে ও পরিবারের অন্য লোককে এই কাজে লাগাইতাম। লোকদেখানো বা লোকলজ্জা ভয়ে করা সেবায় সেবকের মনুষ্যত্ব খর্ব হয়, কোমল বৃত্তি শুকাইয়া যায়। আনন্দহীন সেবা রোগী ও সেবক উভয়ের কাছেই ভার বোধ হয়। আনন্দময় সেবার কাছে আরাম, আয়েশ, রোজগার তুচ্ছ হইয়া যায়।

২৭
বোম্বাইর সভা

ভগ্নীপতির দেহান্তের পরের দিনই সভার জন্য আমার বোম্বাই যাইতে হয়। জনসভায় কি বলিব তা ভাবিয়া-চিন্তিয়া লওয়ার অবসর আমার ছিল না। রাত্রিজাগরণের দরুন শরীর ক্লান্ত ছিল। গলা বসিয়া গিয়াছিল। যেমনই হোক ঈশ্বর কাজটা চালাইয়া লইবেন এই ভরসায় বোম্বাই গেলাম। বক্তৃতা লেখার কথা স্বপ্নেও মনে হয় নাই।

কথামত সভার আগের দিন সন্ধ্যা পাঁচটায় আমি ফিরোজশার আপিসে গেলাম।

তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'গান্ধী, তোমার বক্তৃতা লেখা হয়েছে?'

ভয়ে ভয়ে বলিলাম, 'আজ্ঞে, তৈরি করিনি। ঠিক করেছি এমনি বলব।'

'বোম্বাইয়ে তা চলবে না। এখানকার রিপোর্টিং ভাল নয়। তা ছাড়া,

সভা থেকে লাভ ওঠাতে হলে বক্তৃতা লিখে ছাপিয়ে নিতে হবে। লেখা ও ছাপা রাতারাতি শেষ করতে হবে। পারবে?'

ঘাবড়াইলাম। কিন্তু বলিলাম চেষ্টা করিব।

'বেশ বল, মি. মুন্সী লেখা আনতে তোমার কাছে কখন যাবেন?'

বলিলাম, 'এগারটার সময়।'

সার ফিরোজশা তাঁর সেক্রেটারীকে আমার কাছ হইতে ভাষণ নিয়া রাতারাতি ছাপানোর ব্যবস্থা করিতে বলিলেন। আমায় বিদায় দিলেন।

পরের দিন সভায় গিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলাম কেন তিনি ভাষণ লিখিতে বলিয়াছিলেন। সভা সার কওয়াসজী জাহাঙ্গীর ইনস্টিট্যুটের হলে হইয়াছিল। শুনিয়াছিলাম যে ফিরোজশা যে সভায় বলিতেন সে সভায় লোক ধরিত না, ছাত্রেরা বিপুল উৎসাহে যোগ দিত। এরূপ সভার অভিজ্ঞতা ওই আমার প্রথম। মনে হইল আমার কথা দূরের লোকে শুনিতে পাইবে না। ভয় পাইলাম। কাঁপিতে কাঁপিতে ভাষণ পড়িতে লাগিলাম। ফিরোজশা উৎসাহ দিয়া আমায় বলিতেছিলেন, 'আর একটু জোরে, আর একটু জোরে।' তিনি যত বেশি উৎসাহ দিতেছিলেন আমার স্বর যেন ততই খাদে নামিতেছিল।

পুরাতন বন্ধু শ্রীকেশবরাও দেশপাণ্ডে আমার সহায়তায় আগাইয়া আসিলেন। ভাষণ তাঁর হাতে দিলাম। তাঁর গলা বেশ দরাজ ছিল, কিন্তু শ্রোতাদের মন তাতে উঠিল না। 'ওয়াচা' 'ওয়াচা' শব্দে হল কাঁপিয়া উঠিল। ওয়াচা উঠিলেন। ভাষণ পড়িলেন। অদ্ভুত ফল হইল। সভায় টু শব্দটি ছিল না। উৎকর্ণ হইয়া সভা ভাষণ শুনিল, অনুমোদনে হাততালি বাজিল ও ধিক্কারে 'শেম' 'শেম' ধ্বনি উঠিল। অন্তর আমার আনন্দে নাচিল।

ভাষণটা সার ফিরোজশার ভাল লাগে। আমি অশেষ তৃপ্তি লাভ করি।

এই সভার ফলে দুই ব্যক্তির মনে আমার কাজের প্রতি আগ্রহ জন্মে—দেশপাণ্ডের ও এক পারসী ভদ্রলোকের। পারসী বন্ধুর নাম উল্লেখ করিতে ডরাইতেছি, কারণ তিনি এখন উচ্চ রাজপুরুষ। দুই জনেই কথা দিয়াছিলেন তাঁরা আমার সঙ্গে দক্ষিণ আফ্রিকায় যাইবেন। পারসী বন্ধুকে ভাঙাইয়াছিলেন তখনকার ছোট আদালতের জজ মি. সি. এম খরশেদজী। এক

পারসী বোনের সহিত তাঁর বিবাহের জাল তিনি পাতিয়াছিলেন। বন্ধু দোটানায় পড়েন—বিবাহ করিবেন কি দক্ষিণ আফ্রিকায় যাইবেন। বিবাহের টান জয়ী হয়। কিন্তু পারসী রুস্তমজী এই পারসী বন্ধুর কথাভঙ্গের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছেন। আর যে ভগ্নী পারসী বন্ধুর কথাভঙ্গের নিমিত্ত হইয়াছিলেন, তাঁর হইয়া অন্য পারসী ভগ্নীরা খাদি কার্যে আত্মনিয়োগ করিয়া আজ প্রায়শ্চিত্ত করিতেছেন। অতএব এই পারসী দম্পতিকে আমি সানন্দে ক্ষমা করিয়াছি। বিবাহের টান দেশপাণ্ডের ছিল না। তবুও তাঁর যাওয়া হয় নাই। কথা দিয়া কথা না রাখার প্রায়শ্চিত্ত এখন তিনি খুবই করিতেছেন। দক্ষিণ আফ্রিকার পথে জাঞ্জিবারে তৈয়বজী পরিবারের এক জনের সহিত পরিচয় হইয়াছিল। তিনি দক্ষিণ আফ্রিকায় যাইবেন বলিয়াছিলেন। কিন্তু যান নাই। তাঁর গুণাগারি অব্বাস তৈয়বজী দিতেছেন। তিন ব্যারিস্টার ভাইকে দক্ষিণ আফ্রিকায় নেওয়ার চেষ্টায় এভাবে আমি নিষ্ফল হই।

এই প্রসঙ্গে পেস্তনজী পাদশার কথা মনে পড়িতেছে। বিলাতেই তাঁর সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব জন্মে। নিরামিষ ভোজনালয়ে তাঁর সহিত আমার প্রথম আলাপ হয়। তাঁর ভাই বারজোরজী যে 'খেপা' খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন তা আমি জানিতাম। বন্ধুরা তাঁকে খেয়ালী বলিত। ঘোড়ার কষ্ট হইবে বলিয়া তিনি ট্রামে চড়িতেন না। শতাবধানীর স্মরণশক্তি তাঁর ছিল কিন্তু ডিগ্রীর পিছনে তিনি ছোটেন নাই। এমন স্বাধীনচেতা ছিলেন যে কাউকে তিনি পরোয়া করিতেন না। পারসী হইলেও তিনি নিরামিষাশী ছিলেন। পেস্তনজীর সম্বন্ধে ঠিক এই কথা বলা যাইবে না। তবে বিলাতে থাকিতেই পণ্ডিত বলিয়া তাঁর খ্যাতি ছিল। কিন্তু তাঁর পাণ্ডিত্য আমাকে টানে নাই, টানিয়াছিল তাঁর নিরামিষ আহার। তাঁর পাণ্ডিত্যের ধারে কাছেও ঘেঁষা আমার সাধ্যের বাইরে ছিল।

বোম্বাইতে পেস্তনজীকে খুঁজিয়া বাহির করিয়াছিলাম। বোম্বাই হাই-কোর্টের তিনি 'প্রোথোনোটরী' ছিলেন। যখন তাঁর সহিত দেখা করি তখন তিনি বৃহৎ গুজরাতী কোষের সংকলন করিতেছিলেন। দক্ষিণ আফ্রিকার কাজে সহায়তা না চাহিয়াছিলাম এমন কোন বন্ধু ছিল না। পেস্তনজী পাদশা আমাকে ত সহায়তা করেন নাই-ই বরং দক্ষিণ আফ্রিকায় ফিরিয়া না যাইতেই বলিয়াছিলেন।

তিনি বলিয়াছিলেন, 'আপনাকে সাহায্য করব? সে হয় না। উল্টা,

দক্ষিণ আফ্রিকায় আপনি ফিরে যান এটাই আমার ভাল লাগছে না। এখানে, নিজের দেশে কি কাজের অভাব আছে? দেখুন, মাতৃভাষার সেবাই কি তুচ্ছ কাজ? বিজ্ঞানের পরিভাষা আমার বার করতে হবে। এ ত গেল এক দিক। দেশের গরীবদের কথাই ধরুন। দক্ষিণ আফ্রিকায় আমাদের ভাইয়েরা কষ্ট ভুগছে সন্দেহ নেই, কিন্তু ও কাজে আপনার মতন লোক ক্ষয় হবে এটা আমি চাই না। নিজের দেশে রাজসত্তা আমাদের হাতে আসে ত তাদের সাহায্য আপনা-আপনি হবে। জানি আপনাকে আমি বোঝাতে পারব না। কিন্তু আপনার সঙ্গে কোন সেবক জোটে সে দিকে আমি সহায়তা করব না।'

তাঁর এই কথা আমার ভাল লাগে নাই। কিন্তু তাঁর ওপর আমার শ্রদ্ধা বাড়িয়া যায়। তাঁর দেশপ্রেমে ও মাতৃভাষার প্রতি টানে আমি মুগ্ধ হইয়াছিলাম। উহার ফলে আমাদের বন্ধুত্ব আরও গাঢ় হয়। তাঁর দৃষ্টি যে কি ছিল তা আমি পুরাপুরি ধরিতে পারিয়াছিলাম। কিন্তু আমার মনে হইয়াছিল যে দক্ষিণ আফ্রিকার কাজ ত ছাড়া চলেই না, উল্টা তাঁর দৃষ্টি হইতে দেখিলেও অধিকতর সংকল্প সহকারে করা কর্তব্য। দেশসেবার কোন ক্ষেত্রই দেশপ্রেমিকের উপেক্ষা করিতে নাই ; গীতাই না বলে :

শ্রেয়ান্ স্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ॥

উঁচু পরধর্ম অপেক্ষা নীচু স্বধর্ম ভাল। স্বধর্মে মৃত্যু হয় তাও ভাল, পরধর্ম ভয়াবহ।

২৮

পুণায় ও মাদ্রাজে

সার ফিরোজশা আমার পথ খুলিয়া দিয়াছিলেন। বোম্বাই হইতে আমি পুণা যাই। পুণায় যে দুই দল ছিল তা আমি জানিতাম। সকলের সহায়তাই আমার দরকার ছিল। লোকমান্য তিলকের সহিত দেখা করি। তিনি বলেন :

'সকল পক্ষের সহায়তা আপনি চাইছেন এ খুবই ভাল। দক্ষিণ আফ্রিকার কথায় কোন মতভেদ হতেই পারে না। তবে আপনার সভার

সভাপতি নিরপেক্ষ ব্যক্তি হওয়া প্রয়োজন। আপনি প্রোফেসর ভাণ্ডারকরের সঙ্গে দেখা করুন। আজকাল কোন আন্দোলনে তিনি যোগ দেন না। তা হলেও সম্ভবত এ কাজে তাঁকে পাবেন। তিনি কি বলেন আমাকে জানাবেন। আমি আপনাকে যতটা পারি সাহায্য করব। প্রোফেসর গোখেলের সঙ্গে ত দেখা করবেনই। যখনই দরকার মনে করবেন, বিনা সংকোচে আসবেন।'

ওই আমি লোকমান্যকে প্রথম দেখি। মুহূর্তে বুঝিলাম কেন লোকে তাঁকে এত ভালবাসে।

সেখান হইতে আমি গোখেলের কাছে যাই। তিনি ফরগুসন কলেজেই থাকিতেন। বড় আদরে গ্রহণ করিলেন, নিজের করিয়া লইলেন। তাঁর সঙ্গেও ওই আমার প্রথম সাক্ষাৎ ছিল। তবুও মনে হইয়াছিল যে তিনি আমার পুরাতন বান্ধব। সার ফিরোজশায় আমি দেখিয়াছিলাম হিমালয়, আর লোকমান্যে সমুদ্র। গোখেলে আমি পাইয়াছিলাম গঙ্গা। গঙ্গায় স্নান করা যায়। হিমালয়ে চড়া শক্ত। সমুদ্রে ডোবার ভয় আছে। গঙ্গা নিজ কোলে লোককে ডাকে। নৌকায় চড়িয়া বেড়ানো যায়। গোখেল আমাকে তন্ন তন্ন করিয়া পরীক্ষা করেন, যেমন শিক্ষক ভরতি হইতে চায় ছাত্রকে পরীক্ষা করেন। কার কার সঙ্গে দেখা করিতে হইবে ও কিভাবে, তা তিনি আমাকে বলেন ও আমার ভাষণ দেখিতে চান। কলেজের বিধি-ব্যবস্থা দেখান। দেখা করার দরকার হইলে দেখা করিতে বলেন। ডা. ভাণ্ডারকরের সহিত কথাবার্তার ফল জানাইতে বলিয়া আমায় বিদায় দেন। আমার আনন্দের অবধি ছিল না। রাজনৈতিক দৃষ্টিতে দেখিলে বেঁচে থাকা কালে আমার হৃদয়ে যে আসন গোখেলের ছিল, মরার পরেও তিনি সেই আসনেই আছেন। অন্য কেউ সে আসন দখল করিতে পারেন নাই।

বাবা ছেলেকে যে আদরে গ্রহণ করে রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকর আমাকে সেই আদরে গ্রহণ করেন। দুপুর বেলায় তাঁর ওখানে আমি গিয়াছিলাম। অমন অসময়েও আমাকে কাজ করিতে দেখিয়া ওই উদ্যোগী শাস্ত্রজ্ঞ অতীব খুশী হইয়াছিলেন। আর নিরপেক্ষ সভাপতি খোঁজার আমার আগ্রহ দেখিয়া 'দ্যাটস ইট' 'দ্যাটস ইট'—এই ত চাই, এই ত চাই মন্তব্য তাঁর মুখ হইতে বাহির হইয়াছিল।

কথার পরে তিনি বলেন, 'যাকেই জিজ্ঞাসা করবেন সেই বলবে যে আজকাল কোন রাজনৈতিক ব্যাপারে আমি যাই না। তবে আপনাকে আমি খালি হাতে যেতে দিতে পারি না। আপনার কেস যেমন জোরালো আপনার উদ্যম তেমন প্রশংসনীয়। তাই আপনার সভায় সভাপতি হওয়ার ডাক উপেক্ষা করার উপায় আমার নাই। শ্রীতিলক ও শ্রীগোখেলের সঙ্গে দেখা করেছেন, ভাল হয়েছে। তাঁদের বলবেন, তাঁরা উভয় পক্ষ মিলে যে সভা ডাকবেন তাতে সানন্দে আমি সভাপতি হব। তারিখ সম্বন্ধে আমাকে জিজ্ঞাসা করার দরকার নেই। দুই পক্ষের যে দিন সুবিধার হবে আমার পক্ষে সেই দিনই সুবিধার হবে।' এই বলিয়া তিনি প্রভূত শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদ সহ আমায় বিদায় দিলেন।

হইচই না করিয়া বিনা আড়ম্বরে পুণার এই দুই বিদ্বান ও ত্যাগী পক্ষ ছোট সাদাসিধা জায়গায় সভা করেন, আমাকে উৎসাহ দান করেন। আমার আত্মবিশ্বাস বাড়ে।

ওখান হইতে মাদ্রাজে যাই। মাদ্রাজে উৎসাহ উথলিয়া পড়িয়াছিল। বালাসুন্দরমের ঘটনার অতি গভীর ছাপ সভায় লক্ষ্য করা গিয়াছিল। আমার বিবেচনায় আমার ভাষণটা লম্বা ছিল। গোটাটাই ছাপার হরফে ছিল। তা হইলেও সভা প্রতিটি শব্দ মন দিয়া শুনিয়াছিল। সভার পরে 'সবুজ-পত্র' লোকে লুফিয়া লইয়াছিল। মাদ্রাজে উহার সংশোধিত বর্ধিত সংস্করণ প্রকাশ করা হইয়াছিল—দশ হাজার। লোকে আগ্রহে তা কিনিয়াছিল। তবুও দেখা গিয়াছিল যে দশ হাজারের চাহিদা ছিল না। চাহিদার অঙ্কটা উৎসাহভরে বেশি ধরা হইয়াছিল। আমার ভাষণের প্রভাব ত হইয়াছিল ইংরেজী-জানা লোকের ওপর। কেবল তাদের জন্য অতটা আবশ্যক ছিল না।

ওখানে স্বর্গীয় পরমেশ্বর পিল্লের নিকট হইতে সব চাইতে অধিক সাহায্য পাইয়াছিলাম। তিনি 'মাদ্রাজ স্ট্যাণ্ডার্ড'-এর সম্পাদক ছিলেন। প্রশ্নটা তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। সময় সময় তিনি আমাকে তাঁর আপিসে ডাকিয়া পাঠাইতেন। পথ প্রদর্শন করিতেন। 'হিন্দু'-র জি. সুব্রহ্মণ্যম-এর খুব সহানুভূতি আমি পাইয়াছিলাম। কিন্তু জি. পরমেশ্বর পিল্লে তাঁর সংবাদপত্রের অবাধ ব্যবহারের সুযোগ আমায় দিয়াছিলেন। বিনা দ্বিধায় সেই সুযোগ আমি লইয়াছিলাম। সভা পাচ্যাপ্পা হলে হইয়াছিল। ডা. সুব্রহ্মণ্যম সভাপতি হইয়াছিলেন বলিয়া মনে পড়ে।

সকলের সহিত মাদ্রাজে ইংরেজীতে কথা বলিতে হইয়াছিল। তাহা হইলেও এত লোকের এমন ভালবাসা ও উৎসাহ আমি সেখানে পাইয়াছিলাম যে আমার মনে হইয়াছিল যে আমি স্বজন মধ্যে রহিয়াছি। ভালবাসাকে কি কোন বেড়া রুখিতে পারে?

২৯
'জলদি ফিরে আসুন'

মাদ্রাজ হইতে কলিকাতা যাই। কলিকাতায় আমার অসুবিধার অন্ত ছিল না। 'গ্রেট ইস্টর্ন হোটেলে' উঠিয়াছিলাম। কারো সঙ্গে জানাশোনা ছিল না। হোটেলে 'ডেলি টেলিগ্রাফ'-এর প্রতিনিধি মি. এলারথ্যর্প-এর সহিত পরিচয় হয়। তিনি বেঙ্গল ক্লাবে থাকিতেন। তিনি আমাকে নিমন্ত্রণ করেন। তিনি জানিতেন না যে ওই হোটেলের বৈঠকখানায় কোন ভারতবাসীকে লইয়া যাওয়া নিষেধ ছিল। ওই বাধার কথা পরে তিনি জানিতে পান। তাই তিনি আমাকে তাঁর নিজ ঘরে লইয়া যান। ভারত-বাসীদের ওপর এখানকার ইংরেজদের এইরূপ অবজ্ঞার জন্য তিনি খেদ প্রকাশ করিয়াছিলেন। বৈঠকখানাতে আমাকে লইয়া যাইতে পারেন নাই বলিয়া ক্ষমা চাহিয়াছিলেন।

বাংলার আদরের সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জির সহিত দেখা করার কথা ভাবিয়া রাখিয়াছিলাম। তাঁর সঙ্গে দেখা করিতে যাই। অন্য জনকয়েক সাক্ষাৎ-কারীও ওখানে ছিল। তিনি বলেন:

'আপনার কাজে লোকে উৎসাহ বোধ করবে বলে মনে হচ্ছে না। দেখতেই পাচ্ছেন, আমাদের নিজেদেরই ঝঞ্ঝাটের শেষ নাই। তা হোক, যতটা পারেন চেষ্টা ত করুন। এই কাজের জন্য মহারাজাদের সহায়তা আপনার দরকার। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ন এসোসিয়েশনের প্রতিনিধিদের সঙ্গে অবশ্যই দেখা করবেন। রাজা সার প্যারীমোহন মুখুজ্যে ও মহারাজ টেগোরের সঙ্গে দেখা করবেন। তাঁরা উদার প্রকৃতির লোক ও দশের কাজে যোগ দেন।'

তাঁদের সঙ্গে দেখা করিয়াছিলাম। কোন কাজ হয় নাই। দেখা করিতে হয় বলিয়াই দেখা করিলেন। তাঁরা বলেন, কলিকাতায় জনসভা

করা সহজ কথা নয়। কিছু করিতে হয় ত সুরেন্দ্রনাথ বাঁড়ুজ্যের সাহায্য চাই-ই।

আমার অসুবিধা বাড়িয়াই চলিয়াছিল। 'অমৃতবাজার পত্রিকা' আপিসে গেলাম। সেখানে যে ব্যক্তির সহিত কথা হইয়াছিল তিনি হয়ত মনে মনে বলিতেছিলেন, 'কোথাকে এল এই ভবঘুরে।' ভবঘুরে! 'বঙ্গবাসী' একেবারে হদ্দ করিয়াছিল। সম্পাদক এক ঘণ্টা বসাইয়া রাখেন। অন্য কত লোকের সঙ্গে সম্পাদক কথা বলেন। কত লোক আসিল কত লোক গেল। সেই ফাঁকে আমার দিকে একবার তাকাইলেনও না। এক ঘণ্টা অপেক্ষা করার পরে আমি আমার কথা পাড়িলাম ত বলিলেন, 'দেখতে পাচ্ছেন না, হাতে কত কাজ! আপনার মত কত লোকই না আমার কাছে আসে। আপনি বরং আসুন। আপনার কথা শোনার অবসর আমার নেই।'

বড্ড লাগিয়াছিল। কিন্তু পরক্ষণেই সম্পাদকের অবস্থাটা বুঝিতে পাই। 'বঙ্গবাসী'র খ্যাতির কথা জানাই ছিল। চোখেও দেখিয়াছিলাম, পর পর লোক আসিতেছিল। তারা সকলেই তাঁর পরিচিত ছিল। আলোচনার বিষয়ের অভাব বঙ্গবাসীর ছিল না। দক্ষিণ আফ্রিকার কথা কয়জন লোক আর তখন জানিত। নিজেকে সান্ত্বনা দিয়া মনে মনে বলিলাম, 'দুঃখীর চোখে নিজের দুঃখ যতই বড় হোক তবু যে শত লোক নিজেদের দুঃখের কথা জানাতে সম্পাদকের কাছে আসে আমি ত তাদের একজন বই নই। সকলের সঙ্গে বেচারা সম্পাদক কি কথা বলতে পারেন! তা ছাড়া দুঃখীর দৃষ্টিতে সম্পাদকের ক্ষমতা প্রভূত মনে হলেও সম্পাদক নিজে জানেন যে তার ক্ষমতার দৌড় তার আপিসের চৌকাট পর্যন্ত, তার বাইরে নয়।'

কিন্তু হাল ছাড়িলাম না। অন্য সম্পাদকদের সহিত দেখা করিতে থাকিলাম। আমার স্বভাব মত অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান পত্রের সম্পাদকদের সহিতও দেখা করি। 'স্টেট্‌সম্যান' ও 'ইংলিসম্যান' দুইই দক্ষিণ আফিকার প্রশ্নের গুরুত্ব জানিত। তাঁদের সঙ্গে আমার যে কথাবার্তা হইয়াছিল তার বিস্তৃত বিবরণ উভয় পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল।

'ইংলিসম্যান'-এর সম্পাদক মি· স্যাণ্ডার্স আমাকে নিজের করিয়া লইয়াছিলেন। তাঁর আপিস ও পত্রের ইচ্ছামত ব্যবহারের সুযোগ তিনি

আমায় দিয়াছিলেন। তিনি যে সম্পাদকীয় লিখিয়াছিলেন তাতে আমার সংশোধন বা সংযোগ করার থাকিতে পারে এই জন্য তিনি আমাকে উহার প্রুফ আগাম পাঠাইয়াছিলেন। আমাদের মধ্যে সখ্যতা জন্মিয়াছিল এ কথা বলিলে বেশি বলা হইবে না। তিনি কথা দিয়াছিলেন সাধ্যমত সহায়তা করিবেন আর সেই কথা অক্ষরে অক্ষরে তিনি রক্ষা করিয়াছিলেন। ঘোরতর অসুস্থ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত বরাবর তিনি আমাকে পত্র লিখিতেন।

এরূপ অপ্রতাশিত বন্ধুত্ব লাভ আমার জীবনে অনেক বার ঘটিয়াছে। আমার অতিশয়োক্তির অভাব ও সত্যপরায়ণতার কারণ আমার প্রতি তিনি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। তন্ন তন্ন করিয়া তিনি আমাকে যাচাই করিয়া লইয়াছিলেন। তিনি দেখিতে পাইয়াছিলেন যে গোরাদের পক্ষে যা বলার ছিল নিরপেক্ষভাবে তা বলিতে আমার বাধে নাই আর তাদের দৃষ্টি দিয়া তাদের দেখিতেও আমার ভুল হয় নাই।

প্রতিপক্ষের প্রতি ন্যায় করিলে অতি সত্বর নিজ পক্ষে ন্যায় মিলে, জীবনের অভিজ্ঞতা হইতে এই শিক্ষা আমি লাভ করিয়াছি।

মি. স্যাণ্ডার্স-এর নিকট হইতে এরূপ অপ্রত্যাশিত সহায়তা লাভে আমার মনে আশা জন্মে যে কলিকাতায়ও জনসভা করা যাইবে। এমন সময় ডারবন হইতে তার পাইলাম: 'জানুয়ারীতে পার্লামেণ্ট বসছে। জলদি ফিরে আসুন।'

অতএব সত্বর ফিরিয়া যাওয়ার আবশ্যকতা সংবাদপত্র মারফত জানাইয়া আমি কলিকাতা হইতে বোম্বাই রওনা হই। আর প্রথম স্টীমারে যাওয়ার ব্যবস্থা করার জন্য দাদা অবদুল্লা কোম্পানীর এজেণ্টের কাছে তার করি। দাদা অবদুল্লা নিজে সদ্য তখন 'কুরল্যাণ্ড' নামক স্টীমার খরিদ করিয়াছিলেন। তাতে সপরিবারে আমাকে বিনা ভাড়ায় লইয়া যাওয়ার আগ্রহ জানান। ধন্যবাদ সহকারে তাঁর প্রস্তাবে রাজী হই। ডিসেম্বরের প্রথম দিকে আমার সহধর্মিণী, দুই পুত্র আর আমার স্বর্গগত ভগ্নীপতির একমাত্র পুত্রকে লইয়া 'কুরল্যাণ্ড' জাহাজে দ্বিতীয়বার দক্ষিণ আফ্রিকায় রওনা হই। এই স্টীমারের সঙ্গে 'নাদেরী' নামক আর একখানি জাহাজ ডারবনে রওনা হয়। এই জাহাজের এজেণ্ট ছিলেন দাদা অবদুল্লা। দুই জাহাজে প্রায় আট শত ভারতবাসী যাত্রী ছিল। উহাদের অর্ধেকের বেশির গন্তব্য ছিল ট্রান্সভাল।

আত্মকথা ঃ তৃতীয় ভাগ

১

ঝড়ের পূর্বাভাস

স্ত্রীপুত্র সহ ওই আমার প্রথম সমুদ্রযাত্রা। এই কথা প্রসঙ্গে কয়েকবার বলিয়াছি যে বালবিবাহের কারণে মধ্যবিত্ত হিন্দু পরিবারে বহু ক্ষেত্রে দেখা যায় যে স্বামী শিক্ষিত আর স্ত্রী নিরক্ষর। তাই পতি-পত্নীর মধ্যে এক গড়খাই সৃষ্টি হয় যা ভরাট করার জন্য স্বামীকে স্ত্রীর শিক্ষক হইতে হয়। সুতরাং স্ত্রীপুত্রের পোশাক, আহার ও নূতন পরিবেশে তাদের চালচলন কিরূপ হওয়া উচিত সে কথা আমার ভাবিয়া লইতে ও তাদের শিখাইতে হইয়াছিল। তার কোন কোন কথা মনে হইলে আজও আমি নিজে নিজে হাসি।

পতিপরায়ণতা হিন্দু পত্নীর দৃষ্টিতে ধর্মের পরাকাষ্ঠা। হিন্দু পতি নিজকে পত্নীর প্রভু মনে করে। অতএব পতির ইচ্ছামত পত্নীর উঠিতে বসিতে হয়।

যে সময়ের কথা বলিতেছি তখন আমি মনে করিতাম যে সভ্য বলিয়া গণ্য হইতে হইলে বাহ্য চালচলন যতটা সম্ভব ইউরোপীয়দের মত হওয়া চাই; কেন না আমার ধারণা ছিল যে প্রতিষ্ঠা বিনা ভারতীয়দের সেবা করা যাইবে না, আর সেই প্রতিষ্ঠা অর্জনের ওটাই পথ।

তাই স্ত্রীর ও বালকদের পোশাক কি হইবে তা আমিই ঠিক করিয়াছিলাম। বেশ দেখিয়া তাদের লোকে কাঠিয়াওয়াড়ী বেনিয়া বলিয়া চিনিবে তা কি আমার ভাল লাগিতে আরে? লোকে মনে করিত যে ভারতবাসীদের মধ্যে পারসীরা সর্বাপেক্ষা অধিক অগ্রসর। তাই যেখানে পুরাপুরি ইউরোপীয় রীতি গ্রহণ করিতে আটকাইয়াছিল সেখানে পারসী রেওয়াজের শরণ লইয়াছিলাম। স্ত্রীর জন্য পারসী শাড়ী বাছিলাম আর ছেলেদের দিলাম পারসী কোট পাতলুন। জুতা মোজা সকলেই পরিল। জুতায় গোড়ালি কাটিল, আঙুল টাটাইল: মোজায় গন্ধ হইত। এই সবের উত্তর তৈরিই ছিল। কিন্তু আমার মনে হয় যুক্তির ভারে যতটা নয়, প্রভুত্বের চাপে তারা এই সব মানিয়া লইয়াছিল। অনুপায় বলিয়া ততোধিক অনিচ্ছায়

তারা ছুরি-কাঁটা ধরিয়াছিল। সভ্যতার এই সব চিহ্নের মোহ যখন আমার দূর হইয়াছিল তখন তারা ছুরি-কাঁটা ইত্যাদি ত্যাগ করে। ওসব ধরিতে তাদের যেমন কষ্ট হইয়াছিল ধরার পরে ছাড়িতেও সম্ভবত তেমনই কষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু আজ আমি দেখিতে পাইতেছি যে 'সভ্যতার' এই সব খোলস ফেলিয়া দিয়া ডাকিয়া-আনা অসোয়াস্তির হাত হইতে আমরা বাঁচিয়াছি।

এই স্টীমারে আমাদের আত্মীয় ও জানাশোনা কয়েকজন লোক ছিল। তাদের সঙ্গে ও অন্য যাত্রীদের সহিত খুব মেলামেশা করিতাম। জাহাজটা মক্কেলের ছিল তাতে বন্ধুর। তাই মনে হইত যেন নিজ বাড়ীতে আছি। অবাধে যে-কোথাও যাইতাম।

কোন বন্দরে না থামিয়া জাহাজ সোজা নাতালে যাইতেছিল। সুতরাং আমাদের যাত্রা আঠার দিনের মাত্র ছিল। নাতাল হইতে যখন আমরা চার দিনের পথ দূরে তখন ভীষণ ঝড় আরম্ভ হয়, নাতালে যাইয়া যে ঝড়ের মুখে পড়িয়াছিলাম ওই তুফান ছিল তারই পূর্বাভাস। এই দক্ষিণ গোলার্ধে ডিসেম্বর মাস গরমী মরসুমের দিন, বর্ষাকাল। তাই এই সময়টায় ছোট বড় ঝড়-তুফান দক্ষিণ সমুদ্রে লাগিয়াই থাকে। ঝড় এত ভয়ানক ও এত সময় ধরিয়া চলিয়াছিল যে যাত্রীরা ভয় পাইয়াছিল।

অপূর্ব দৃশ্য দেখা গিয়াছিল। বিপদে সকলে ভেদ ভুলিয়া গিয়াছিল, এক হইয়া গিয়াছিল। অন্তর ঢালিয়া সকলে ঈশ্বরের শরণ লইয়াছিল। হিন্দু মুসলমান খ্রীস্টান সকলে এক সঙ্গে তাঁর নাম লইতে থাকে। কেউ কেউ মানত করে। প্রার্থনায় কাপ্তেনও যাত্রীদের সহিত যোগ দেন। যাত্রীদের সাহস দিয়া তিনি বলেন, 'ঝড় যে ভীষণ তা অস্বীকার করার উপায় নেই। তবে এর চাইতেও বিষম ঝড়ে এর আগে আমি পড়েছি। মজবুত গড়নের হলে প্রায় যে কোন ঝড় জাহাজ কাটিয়ে উঠতে পারে।' যাত্রীদের এভাবে তিনি খুব ভরসা দিতেন। তা হইলেও যাত্রীদের প্রাণে ভরসা ছিল না। সারাক্ষণ এমন শব্দ হইতেছিল যে মনে হইত এই বুঝি জাহাজ চৌ-চির হইয়া গেল, ফুটা হইয়া গেল। জাহাজ এপাশে-ওপাশে ও আগায়-পাছায় এমন ভয়ানক দুলিতেছিল যে এই মুহূর্তেই যেন তা ডুবিয়া যাইবে। ডেকে তিষ্ঠানোর সাধ্য ছিল না। 'ভগবান রক্ষে করেন ত রক্ষে' কারো মুখে এই কথা ছাড়া অন্য কথা ছিল না। যতদূর মনে পড়ে এরূপ দুশ্চিন্তায় চব্বিশ

ঘণ্টা কাটিয়াছিল। অবশেষে বাদল কাটে, সূর্য দেখা দেন। কাপ্তেন বলেন, 'ঝড় চলে গেছে।' লোকের মুখে স্বস্তি দেখা দিল, অন্তর হইতে ঈশ্বর সরিয়া গেল। মরণের ভয় দূর হইতে গানবাজনা, খানাপিনা শুরু হইল। আবার মায়ার ছায়ায় ঘিরিল। নামাজ থাকিল, ভজন থাকিল, কিন্তু তুফানের সময়ে তাতে যে আন্তরিকতা ছিল তা লোপ পাইল।

কিন্তু এই ঝড় যাত্রীদের সঙ্গে আমাকে ওতপ্রোত করিয়া দেয়। ঝড়ে আমি ভয় পাই নাই বা অতি অল্প পাইয়াছিলাম। ইহার পূর্বেও এরূপ ঝড়ে আমি পড়িয়াছিলাম। সমুদ্রে আমার গা বমিবমি করে না, মাথা ঘোরে না। তাই নির্ভয়ে আমি যাত্রীদের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতাম, তাদের সাহস দিতাম ও ঘণ্টায় ঘণ্টায় কাপ্তেনের রিপোর্ট তাদের শুনাইতাম। পরে দেখিতে পাইবেন, ভালবাসার এই বন্ধন খুব কাজে আসিয়াছিল।

আমাদের জাহাজ ১৮ই কি ১৯শে ডিসেম্বর বন্দরে নঙ্গর ফেলে। 'নাদেরী'ও ওই দিনই পৌঁছে।

আসল ঝড় আমার অপেক্ষায় ওত পাতিয়া ছিল।

২

ঝড়

আঠারই ডিসেম্বর কি তার পরের দিন জাহাজ দুইখানি বন্দরে নঙ্গর ফেলে সে কথা বলিয়াছি। কারো কোন অসুখ আছে কিনা তা পরীক্ষা না করিয়া দক্ষিণ আফ্রিকার কোন বন্দরে যাত্রীদের নামিতে দেওয়া হয় না। রাস্তায় কোন যাত্রীর ছোঁয়াচে রোগ হইলে সেই জাহাজ আঁতুড়ে— কোয়ারান্টিনে—রাখা হয়। জাহাজের বোম্বাই হইতে রওনা হওয়ার সময়ে সেখানে প্লেগ ছিল। তাই আমাদের ভয় ছিল আমাদের কিছু দিন আঁতুড়ে থাকিতে হইবে। নিয়ম, বন্দরে নঙ্গর করার পরে জাহাজে হলুদ পতাকা তুলিতে হয়। ডাক্তারী পরীক্ষার পরে ডাক্তার মুক্তি দিলে হলুদ পতাকা নামাইতে হয়। যাত্রীদের আত্মীয়-স্বজন তখন স্টীমারে আসিতে পায়।

সেইমত আমাদের স্টীমারেও হলুদ পতাকা উঠিল। ডাক্তার আসিলেন। পরীক্ষার পরে তিনি পাঁচ দিনের আঁতুড়ের আদেশ দেন, কেন না তাঁর মতে তেইশ দিন মধ্যেই প্লেগের জীবাণু আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে।

আর তাই আদেশ দেন, বোম্বাই হইতে ছাড়ার পরে তেইশ দিন তক জাহাজ আঁতুড়ে থাকিবে। কিন্তু এই কোয়ার‍্যান্টিনের আদেশের পিছনে স্বাস্থ্যের অতিরিক্ত অন্য কারণও ছিল।

আমাদের ফেরত পাঠানোর জন্য ডারবনের গোরারা আন্দোলন শুরু করিয়াছিল। এই ছিল সেই অন্য কারণ। শহরে ওই যে আন্দোলন চলিতেছিল তার খবর দৈনিক দাদা অবদুল্লার কাছ হইতে আমি পাইতাম। গোরারা পর পর বিরাট সভা করিতেছিল। দাদা অবদুল্লাকে নানা ভয় দেখাইতে হইতেছিল। আবার এই লোভও দেখানো হইতেছিল যে জাহাজ দুইটা ফেরত পাঠাইলে পুরা খেসারত দেওয়া হইবে। দাদা অবদুল্লা কোম্পানী ধমকে ডরাইবার লোক ছিল না। শেঠ অবদুল করীম হাজী আদম তখন ওই কোম্পানীর ম্যানেজিং পার্টনার ছিলেন। তিনি প্রতিজ্ঞা করেন যতই ক্ষতি হোক স্টীমার দুইখানি তিনি ঘাটে (জেটিতে) আনিবেন ও যাত্রীদের নামাইবেন। দৈনিক তিনি আমাকে বিস্তারিত বিবরণ পাঠাইতেন। আমার সহিত দেখা করার জন্য ভাগ্যক্রমে তখন স্ব. মনসুখ লাল নাজর ডারবনে আসিয়াছিলেন। তিনি করিতকর্মা সাহসী লোক ছিলেন। ভারতীয়দের তিনি ঠিক পথে চালাইয়াছিলেন। মি. ল্যটন কোম্পানীর উকিল ছিলেন। তিনিও তেমনই সাহসী ছিলেন। গোরাদের কাজের তিনি নিন্দা করিয়াছিলেন এবং এই ব্যাপারে ভারতীয়দের যে পরামর্শ দিয়াছিলেন কেবল পয়সার খাতিরে উকিল হিসাবে তা দিয়াছিলেন তা নয়, দিয়াছিলেন মিত্ররূপে।

এইরূপে ডারবনে দ্বন্দ্বযুদ্ধ শুরু হইল—এক দিকে মুঠভর গরীব ভারতবাসী ও আঙ্গুলে-গোণা তাদের ইংরেজ বন্ধু আর অন্য দিকে ধনবলে, বাহুবলে, বিদ্যাবলে ও সংখ্যাবলে বলবান ইংরেজ। এই বলবান প্রতিপক্ষের পশ্চাতে শাসকদের বলও ছিল। এই কথা বলিতেছি তার কারণ, নাতাল সরকার খোলাখুলিভাবেই তাদের সহায়তা করিয়াছিল। মন্ত্রিসভার প্রতিপত্তিশালী সদস্য মি. হ্যারী এস্কম্ব্ প্রকাশ্যভাবে গোরাদের ওই সভায় যোগ দিতেন।

বস্তুত কেবল স্বাস্থ্যের কারণেই আমাদের আঁতুড়ে রাখা হইয়াছিল তা নয়। আসল মতলব ছিল জাহাজের এজেণ্টকে অথবা যাত্রীদের ভয় দেখাইয়া যে কোন রকমে আমাদের ফেরত পাঠানো। এজেণ্টদের ত ধমকানো চলিতে ছিলই। এবার আমাদেরও ধমকাইতে আরম্ভ করিল: 'ভাল চাও,

ফিরে যাও। নয় ত ডুবিয়ে মারবো। ফিরে যাও ত জাহাজভাড়াও পাবে।' সতত আমি যাত্রীদের মধ্যে ঘুরিতাম, তাদের সাহস ও সান্ত্বনা দিতাম। তারা অটল ছিল। পত্রদ্বারা 'নাদেরী'র যাত্রীদেরও সাহস দিয়া শান্ত থাকিতে বলিতাম। যাত্রীরা শান্ত ছিল, সাহসের পরিচয় দিয়াছিল।

যাত্রীদের আনন্দের জন্য জাহাজে আমোদের ব্যবস্থা করা গিয়াছিল। বড়দিনের পর্ব আসিল। কাপ্তেন ওই উপলক্ষ্যে প্রথম শ্রেণীর যাত্রীদের আহারের নিমন্ত্রণ করেন। আমার পুত্র-পরিবার ও আমি নিমন্ত্রিতদের মধ্যে মুখ্য ছিলাম। আহারের পর ভাষণ দিতে হয়, এটা দস্তুর, পশ্চিমের সভ্যতার বিষয়ে আমি বলিয়াছিলাম। জানিতাম সময়টা গুরুগম্ভীর আলোচনার উপযুক্ত ছিল না। কিন্তু হাল্কা কিছু আমার জুয়াইল না। আমোদ-আহ্লাদে যোগ দিতাম বটে কিন্তু আমার মন পড়িয়া থাকিত ডাঙ্গায়, ডারবনে যে বিরোধ চলিতেছিল তাতে। তার কারণ আমিই ছিলাম ওই আক্রমণের নিশানা। আমার বিরুদ্ধে দুই অভিযোগ ছিল :

১। ভারতবর্ষে আমি নাতালবাসী ইংরেজদের মিছামিছি নিন্দা করিয়াছি।

২। ভারতবাসী দিয়া আমি নাতাল ভরিয়া ফেলিতে চাই এবং সেই উদ্দেশ্যেই খাস নাতালে বসানোর জন্য 'কুরল্যাণ্ড' ও 'নাদেরী'-তে ভারতীয়দের লইয়া আসিয়াছি।

আমার দায়িত্ব সম্বন্ধে আমি সচেতন ছিলাম। জানিতাম আমার জন্য দাদা অবদুল্লা কোম্পানী মস্ত লোকসানের ঝুঁকি লইয়াছে, যাত্রীদের জীবনের ভয় রহিয়াছে এবং স্ত্রীপুত্রদের সঙ্গে আনিয়া তাদের বিপদে ফেলিয়াছি।

কিন্তু আমার ত কোনই দোষ ছিল না। নাতালে আনিবার জন্য আমি কাউকে লোভ দেখাই নাই। 'নাদেরী'র যাত্রীদের সহিত আমার পরিচয় ছিল না। দুইতিন জন আত্মীয়ের নাম ছাড়া 'কুরল্যাণ্ড'-এর যাত্রীদের নামধাম আমি জানিতাম না। নাতালের ইংরেজদের সম্বন্ধে ভারতে এমন একটি কথাও বলি নাই যা তার আগে নাতালে বলি নাই। আর প্রমাণরহিত কোন কথাও বলি নাই।

তাই ত নাতালের ইংরেজরা যেই সভ্যতার সৃষ্টি, এবং যেই সভ্যতার তারা ধারক বাহক, সেই সভ্যতার ওপর আমার বিতৃষ্ণা জন্মিয়াছিল। সেই

সভ্যতার ছবি আমার চোখের ওপর ছিল এবং ওই ক্ষুদ্র সভায় সেই সম্বন্ধেই আমার মত ব্যক্ত করিয়াছিলাম। কাপ্তেন ও অফিসাররা ধীরভাবে তা শুনিয়াছিলেন। যে মনোভাব হইতে আমি তা বলিয়াছিলাম সেই ভাব হইতেই তাঁরা তা গ্রহণ করিয়াছিলেন, তার ফলে তাঁদের জীবনের গতি আদৌ মোড় ঘুরিয়াছিল কিনা তা আমি জানি না। সে যাই হোক, ওই ভাষণের পরে কাপ্তেন ও অন্য অফিসারদের সহিত আমার দীর্ঘ আলোচনা হইয়াছিল। পশ্চিমের সভ্যতা মোটামুটি হিংসক এবং পূর্বের সভ্যতা মোটামুটি অহিংসক এ কথা ভাষণে আমি বলিয়াছিলাম। প্রশ্নকারীরা আমার কথায়ই আমাকে চাপান দেন। তাঁদের কেউ—সম্ভবত কাপ্তেন নিজেই—প্রশ্ন করেন :

'ধরুন, গোরারা যে ভয় দেখিয়েছে কাজে যদি তারা তাই করে—আপনাকে মারে ধরে ত আপনার অহিংসার নীতি মতে আপনি কী করবেন?'

উত্তরে বলিয়াছিলাম, 'মনে হয় তাদের আমি ক্ষমা করতে পারব। তাদের বিরুদ্ধে মামলা না করার শক্তি ও বুদ্ধি ঈশ্বর আমায় দেবেন। তাদের ওপর এখনও আমার কোন রাগ নেই। তাদের অজ্ঞতা ও সংকুচিত দৃষ্টি দেখে অবশ্য আমার খেদ হচ্ছে। আমি মনে করি তারা যা কিছু বলছে ও করছে, ন্যায্য বোধে নিছক কর্তব্য জ্ঞানে বলছে ও করছে, তাই তাদের ওপর আমার কোন রাগ নেই।'

প্রশ্নকর্তা মৃদু হাসিয়াছিলেন, সম্ভবত অবিশ্বাসে।

এইভাবে আমাদের দিন কাটিতেছিল, শেষ যেন তার ছিল না। কবে যে আঁতুড় শেষ হইবে তার পাত্তা ছিল না। সূতক-অফিসারকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিয়াছিলেন, 'ব্যাপারটা আমার হাতে নেই। সরকারের হুকুম হলেই আমি নাবতে দেব।'

অবশেষে যাত্রীদের ও আমার ওপর অল্টিমেটম—চরমপত্র—জারী হইল : 'প্রাণে বাঁচতে চাও ত যা বলি তা করো।' তার জবাবে আমরা বলিয়া দেই যে নাতাল বন্দরে নামিবার অধিকার আমাদের আছে, আর যাই ঘটুক আমরা নামিবই।

শেষে তেইশ দিন পরে ১৮৯৭ সনের ১৩ই জানুয়ারী জাহাজের সূতক ঘোচে ও যাত্রীরা নামার অনুমতি পায়।

৩
পরীক্ষা

জাহাজ জেটিতে ভিড়িল। যাত্রীরা নামিল। কিন্তু আমার সম্বন্ধে মি. এস্কম্ব্ কাপ্তেনকে বলিয়া পাঠান, 'গান্ধী ও তাঁর স্ত্রীপুত্রের সন্ধ্যায় নাবা ভাল হবে। গোরারা তাঁর ওপর বড় খাপ্পা হয়ে আছে। তাঁর জীবনের ভয় রয়েছে। ডকের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মি. ট্যাটুম তাঁদের সঙ্গে করে নাবাবেন।' কাপ্তেন এই খবর আমাকে জানান। সে মতে চলিতে আমি স্বীকার করি। ইহার পর আধ-ঘণ্টা যাইতে না যাইতে মি. ল্যটন আসেন ও কাপ্তেনের সঙ্গে দেখা করিয়া তাঁকে বলেন, 'মি. গান্ধী আমার সঙ্গে যেতে প্রস্তুত থাকেন ত আমি নিজের ঝুঁকিতে তাঁকে পারে নিয়ে যেতে তৈরী আছি। স্টীমারের এজেণ্টের উকিলরূপে আমি বলছি, মি. গান্ধীর বিষয়ে মি. এস্কম্ব্ যে নির্দেশ আপনাকে পাঠিয়েছেন তা মানতে আপনি বাধ্য নন।' কাপ্তেনের সহিত এই কথার পরে তিনি আমার কাছে আসেন ও মোটামুটি এই কথা বলেন, 'আপনি যদি ভয় না পান ত আমি বলি যে মিসেস গান্ধী ও বালকেরা গাড়ীতে রুস্তমজী শেঠের ওখানে যান, আর আপনি ও আমি সদর রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাব। সন্ধ্যার আঁধারে গা-ঢাকা দিয়ে আপনি শহরে প্রবেশ করবেন তা আমার আদৌ ভাল লাগছে না। আমার বিশ্বাস কেউ আপনার কেশস্পর্শ পর্যন্ত করবে না। এখন কোন গোলমাল নেই। গোরারা সব সরে গেছে। সে যা হোক, আমি মনে করি চোরের মত শহরে ঢোকা আপনার ঠিক হবে না।' বিনা ওজরে আমি রাজী হইলাম। আমার সহ-ধর্মিণী ও ছেলেরা নিরাপদে রুস্তমজী শেঠের বাড়ীতে গিয়া পৌছিল। আমি কাপ্তেনের অনুমতি লইয়া মি. ল্যটনের সঙ্গে নামিলাম। রুস্তমজী শেঠের বাড়ী কমবেশি দুই মাইল দূরে ছিল।

জাহাজ হইতে নামিতেই কয়েকটি ছেলে আমাকে চিনিতে পারে ও 'গান্ধী' 'গান্ধী' বলিয়া চিৎকার করিতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে কয়েক জন লোক জড় হইল; শোর বাড়িল। মি. ল্যটন দেখিলেন ভিড় বাড়িয়া যাইবে। তিনি রিকসা ডাকিলেন। রিকসা চাপার কথাটাই আমার অরুচির ছিল। জীবনে এই প্রথম উঠিতে যাইতেছিলাম। কিন্তু ছোকরারা চাপিতে দিলে ত! তারা রিকসাওয়ালাকে ভয় দেখাইল; সে ভাগিয়া

গেল। আমরা আগাইয়া চলিলাম। ভিড় বাড়িতে লাগিল, মস্ত হইল। চলা অসম্ভব হইল। ভিড় প্রথমে আমাকে ল্যটন হইতে আলাদা করিয়া ফেলিল। পরে আমার ওপর ইট-পাটকেল ও পচা ডিম পড়িতে লাগিল। কেউ একজন আমার পাগড়ীটা ছিনাইয়া লইয়া ফেলিয়া দিল। অন্যেরা লাথি-কিল-গুঁতা মারিতে শুরু করিল। ভিরমি লাগিল, সামনের বাড়ীর গরাদে ধরিয়া শ্বাস লইলাম। সেখানেও দাঁড়াইয়া থাকার জো ছিল না। ঘুসি পড়িতে থাকিল। পুলিস সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টের স্ত্রী ওই পথ দিয়া যাইতেছিলেন। তিনি আমায় চিনিতেন। আমার অবস্থা দেখিয়া তিনি পাশে আসিলেন। রোদ না থাকিলেও বীর রমণী ছাতা খুলিয়া আমার ও ভিড়ের মধ্যে দাঁড়াইলেন। ভিড় একটু দমিল; কারণ মিসিস আলেকজেণ্ডারকে বাঁচাইয়া আমাকে মারার প্রশ্ন তাদের সামনে খাড়া হইল।

ইতিমধ্যে আমাকে মারধর করিতেছে দেখিয়া এক ভারতীয় যুবক দৌড়াইয়া থানায় যায়। আমাকে ঘিরিয়া আমার গন্তব্যে পৌঁছাইয়া দেওয়ার জন্য পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এক পুলিশ বাহিনী পাঠান। ঠিক সময়ে তারা আসিয়া পড়ে। আমার রাস্তা পুলিশ থানার পাশ দিয়া ছিল। সুপারি-ণ্টেণ্ডেণ্ট আমায় থানায় আশ্রয় লইতে বলেন। তাঁকে ধন্যবাদ দিয়া ওই প্রস্তাবে অসম্মত হই ও বলি, 'নিজের ভুল যখন বুঝবে এরা শান্ত হবে। এদের শুভবুদ্ধির ওপর আমার ভরসা আছে।' পুলিশ পাহারায় বিনা উৎপাতে পারসী রুস্তমজীর গৃহে পৌঁছিলাম। আঘাতে পিঠময় কাল দাগ হইয়াছিল, এক জায়গা ছিঁড়িয়া গিয়াছিল। স্টীমারের ডাক্তার দাদী বরজোর ওখানেই ছিলেন। যা করার অতি যত্নে তিনি করেন।

বাড়ীর ভিতরে কোন অশান্তি ছিল না। বাইরে গোরারা বাড়ী ঘেরিয়া লইয়াছিল। অন্ধকার হইয়া আসিতেছিল। ভিড় বিকট চিৎকার করিতে-ছিল: 'গান্ধীকে আমাদের হাতে সঁপে দাও'। প্রখরদৃষ্টি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ইহার মধ্যেই সেখানে আসিয়া যান ও ভিড়কে মানাইতে চেষ্টা করিতে থাকেন—ভয় দেখাইয়া নয়, মজা-তামাসা করিয়া। কিন্তু তাঁর মনে ভয় ছিল, ভিড় কখন কি করিয়া বসে। এই মর্মে তিনি আমায় খবর পাঠান: 'বন্ধুর বাড়ী ও বিত্ত ও আপনার স্ত্রীপুত্রের জীবন রক্ষা করতে চান ত আমি যেমন বলছি, ছদ্মবেশে সরে পড়ুন।'

একই দিনে একের ঠিক উল্টা আর এক কাজ করার প্রশ্ন সামনে খাড়া

হইল। প্রাণের ভয় যখন কাল্পনিক বলিয়া মনে হইয়াছিল তখন মি. ল্যটন আমাকে প্রকাশ্যে বাহির হইতে পরামর্শ দেন আর আমি সেইমত কাজ করি। সাক্ষাৎ বিপদ যখন সামনে আসিয়া খাড়া হইল তখন অন্য এক বন্ধু উল্টা এক পরামর্শ দেন আর সে পরামর্শও আমি মানিয়া লই। নিজের প্রাণের ভয়ে, অথবা বন্ধুর জানমাল হানির ভয়ে, অথবা স্ত্রীপুত্রের জীবনের ভয়ে, অথবা এই তিন ভয়েই আমি ওরূপ করিয়াছিলাম কিনা এই প্রশ্নের উত্তর কে দিবে? ভিড়ের মুখে আগাইয়া যাওয়া যা লোকের কাছে বীরের কর্ম মনে হইয়াছিল এবং পরে সেই ভিড় হইতেই সিপাহীর ভেকে খিড়কি দিয়া পালাইয়া যাওয়া এই দুই কার্যই সঙ্গত হইয়াছিল এ কথা নিঃসংশয়ে কে বলিবে?

অতীত ঘটনার এরূপ জল্পনা-কল্পনা বৃথা। যা ঘটিয়াছে তা বুঝিয়া লওয়া ও তা হইতে কিছু শেখার থাকিলে শিখিয়া লওয়াই কাজের কথা। অমুক অবস্থায় অমুকে কি করিবে তা আদৌ নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। তেমনি এ কথাও বলা যায় যে কোন লোককে তার বাহ্য আচরণ দিয়া বিচার করি ত সেই বিচার যথার্থ বিচার নহে, অনুমান মাত্র।

সে কথা যাক। পালাইবার তোড়জোড়ে শরীরের বেদনা ভুলিয়া গেলাম। সিপাহীর উর্দী পরিলাম। মাথা বাঁচাইবার জন্য মাথায় পিতলের মালসা চাপাইলাম ও মাদ্রাজীদের মোটা ফেটায় তা ঢাকিলাম। সঙ্গে দুইজন ভেকধারী ডিটেকটিব। তাদের একজন মুখে রঙ মাখিয়া, ভারতীয় পোশাক পরিয়া ভারতীয় ব্যবসায়ী সাজিয়াছিল। আর এক জনের ভেকের কথা মনে নাই। পাশের গলি দিয়া এক প্রতিবেশীর দোকানে যাই ও গুদামের গাদাকরা বস্তার ভিতর দিয়া রাস্তা করিয়া দোকানের দরজা দিয়া বাহির হইয়া ভিড়ে মিশিয়া যাই। রাস্তার মাথায় গাড়ী ছিল। তাতে বসাইয়া ডিটেকটিবরা আমায় সেই থানায় লইয়া যায় যেখানে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আমাকে আশ্রয় লইতে বলিয়াছিলেন। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আলেকজেণ্ডার ও ডিটেকটিব অফিসারদের আমি আমার কৃতজ্ঞতা জানাই।

আমাকে যখন ওদিকে লইয়া যাওয়া হইতেছিল এদিকে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আলেকজেণ্ডার তখন মজার এই গান গাহিয়া ভিড়কে ভুলাইতেছিলেন:

এসো গান্ধীকে দিই ঝুলিয়ে,
ওই তেঁতুল ডালে লটকিয়ে।

আমার ভালয় ভালয় থানায় পৌঁছিয়া যাওয়ার খবর যখন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট পাইলেন তখন তিনি ভিড়কে বলিলেন, 'তোমাদের শিকার ওই দোকান দিয়ে দিব্যি সটকে পড়েছে।' ভিড়ের কেউ রাগ করিল, কেউ হাসিল, আর অনেকে কথাটা অবিশ্বাস করিল।

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আলেকজেণ্ডার তখন বলেন, 'বেশ ত, আপনারা কোন লোককে প্রতিনিধি মানুন। তাঁকে আমি ভেতরে নিয়ে যাব।' খুঁজে পান ত গান্ধীকে আপনাদের হাতে দেব। না পান ত আপনারা চলে যাবেন। আপনারা পারসী রুস্তমজীর বাড়ী জালিয়ে দিতে বা গান্ধীর স্ত্রীপুত্রের ওপর হাত তুলতে যে চান না এই বিশ্বাস আমার আছে।'

ভিড় প্রতিনিধি মানিল। প্রতিনিধি নিরাশ হইয়া ফিরিলেন। ভিড়ের অধিকাংশ লোক সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের উপস্থিত বুদ্ধির ও কৌশলের প্রশংসা করিতে করিতে আর কিছু লোক রাগে গড় গড় করিতে করিতে চলিয়া গেল।

আমাকে যারা মারধর করিয়াছিল তাদের বিরুদ্ধে কেস চালাইবার জন্য ও আমি যাতে ন্যায় বিচার পাই তার জন্য উপনিবেশ মন্ত্রী স্ব. মি. চেম্বারলেন নাতাল সরকারকে তার করেন। মি. এস্কম্ব্ আমাকে ডাকিয়া পাঠান। আমার ওপর মারধর হইয়াছে বলিয়া তিনি খেদ প্রকাশ করিয়া বলেন, 'আমায় বিশ্বাস করুন, আপনার গায়ে এতটুকু আঁচড় লাগে তা আমার পক্ষে সুখের নয়। মি. ল্যটনের পরামর্শমত আপনি তাড়াতাড়ি নেবে এলেন, সাহসভরে ভিড়ের মুখে এগিয়ে গেলেন। সেই অধিকার আপনার আছেও। কিন্তু আমার পরামর্শ যদি আপনি নিতেন তবে এই দুঃখের ব্যাপার ঘটত না। আপনাকে যারা মারধর করেছে তাদের সনাক্ত করতে পারেন ত আমি তাদের গ্রেপ্তার করাব ও তাদের বিরুদ্ধে মকদ্দমা চালাব। মি. চেম্বারলেনও তাই চান।'

উত্তরে আমি বলি, 'কারো বিরুদ্ধে আমি মামলা চালাতে চাই না। যারা মারধর করেছে তাদের দুই এক জনকে সনাক্ত হয়ত করতে পারব। কিন্তু তাদের সাজা ভুগিয়ে আমার কি লাভ হবে? তা ছাড়া, মারধর যারা করেছে তাদের আমি দোষ দিই না। তাদের বলা হয়েছে, ভারতে গিয়ে রঙ ফলিয়ে নাতালের গোরাদের আমি নিন্দা করেছি। এ কথা যদি তারা সত্য মনে করে থাকে ও রাগ করে থাকে ত তাতে আশ্চর্যের কি আছে?

দোষ ত মাথাদের, আর মনে কিছু না করেন ত বলব আপনার। আপনারা লোককে ঠিক পথে চালাতে পারতেন। কিন্তু আপনারা পর্যন্ত রয়টরের তারকে সত্য মনে করেছেন এবং ধরে নিয়েছেন আমি অতিশয়োক্তি করেছি। কারো বিরুদ্ধে আমার মামলা করার নেই। খাঁটি বিবরণ যখন প্রকাশ পাবে ও লোকে জানবে তখন তারা অনুতাপ করবে।'

'এ কথা লিখে দেবেন কি? কারণ তদনুসারে মি· চেম্বারলেনকে আমার তার পাঠাতে হবে। এখনই লিখে দিতে বলছি না। মি· ল্যাটন ও অন্য বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলে যা ভাল মনে হয় করবেন এটা আমি চাই। তবে এ কথা বলব যে আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে আপনি মামলা না চালান ত গোলমাল শান্ত করার পক্ষে তা আমার খুব সহায়ক হবে। আর আপনার সুনামও তাতে বাড়বে।'

বলিলাম, 'ধন্যবাদ, এ বিষয়ে কারো সাথে আমার কথা বলার নেই। এখানে আসার পূর্বেই আমি মন স্থির করেছি যে কারো বিরুদ্ধে কেস চালাব না। এ কথা এখানে ও এখনই লিখে দিতে পারি।'

এই কথার পরে আমি আবশ্যক বক্তব্য লিখিয়া দেই।

৪

বাদল কাটিয়া গেল

আক্রমণের পরে আমি দিন দুই থানায় ছিলাম। সেই সময়েই দুই জন পুলিশ পাহারায় মি· এস্কম্বের সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলাম। বস্তুত আমার রক্ষার নিমিত্ত তখন আর সঙ্গে কন্স্টেবল দেওয়ার আবশ্যকতা ছিল না।

জাহাজ হইতে নামার দিন হলদে পতাকা নামাইবা মাত্র 'নেটাল এ্যাড্ভারটাইজর'-এর প্রতিনিধি জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য আমার কাছে আসেন। নানা প্রশ্ন তিনি আমায় করিয়াছিলেন। তাঁর প্রশ্নের উত্তরে আমার ওপর চাপানো সবগুলি আরোপ এক এক করিয়া আমি পুরাপুরি খণ্ডন করিয়াছিলাম। সার ফিরোজশার সতর্কতার কারণ সব সময় আমি ভারতবর্ষে ছাপানো ভাষণ দিয়াছিলাম। সেই সব ভাষণের ও অন্য লেখার প্রতিলিপি আমার কাছেই ছিল। তাঁকে আমি সেই সব দেই ও তার দ্বারা প্রমাণ করিয়া দেখাই যে ভারতে এমন কোন কথা আমি বলি নাই যা আমি

তাহা অপেক্ষা অধিক শক্ত ভাষায় পূর্বে নাতালে বলি নাই। এ কথাও প্রতিনিধিকে বুঝাইয়া বলি যে 'কুরল্যাণ্ড' ও 'নাদেরী'-তে যে সব যাত্রী গিয়াছিল তাদের যাওয়ার ব্যাপারে আমার হাত ছিল না। তাদের বেশির ভাগ নাতালেরই পুরাতন বাসিন্দা আর তাদের অনেকেই নাতালে থাকার জন্য যায় নাই, ট্রান্সভালে যাইবে বলিয়া গিয়াছিল। নাতাল অপেক্ষা ট্রান্সভাল তখন পয়সা রোজগারের ভাল ক্ষেত্র ছিল। তাই ভারতীয়রা ট্রান্সভালেই বেশি যাইত।

সবটা জিনিস স্পষ্ট করিয়া দেওয়ার এবং আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে মামলা করিতে অস্বীকার করার এতটা প্রভাব হয় যে গোরারা লজ্জা পায়। সংবাদপত্রসমূহ আমায় নির্দোষ বলে ও আক্রমণকারীদের নিন্দা করে। মারধরের পরিণাম এভাবে আমার পক্ষে অর্থাৎ আমার কাজের পক্ষে সহায় হয়। ভারতীয়দের প্রতিষ্ঠা বাড়ে ও আমার পথ সহজ হয়।

তিনচার দিন মধ্যে নিজের বাড়ীতে যাই ও অল্প সময়ে সব কিছু আবার গুছাইয়া লই। এই ঘটনায় আমার পসার বাড়িয়া যায়।

কিন্তু ভারতীয়দের প্রতিষ্ঠা যতটা বাড়িল তাদের প্রতি দ্বেষও ততটাই বাড়িল। তাদের দৃঢ়ভাবে লড়িবার শক্তি দেখিয়া গোরারা ভয় পাইল। নাতাল বিধান সভায় দুইটা বিল আনা হইল। একটার লক্ষ্য ছিল ভারতীয় ব্যবসায়ীদের ওপর শক্ত আঘাত হানা, আর অন্যটার উদ্দেশ্য ছিল নাতালে ভারতীয়দের প্রবেশে মস্ত বাধা সৃষ্টি করা। ভাগ্যের কথা, ভোটাধিকারের লড়াইয়ের ফলে সাব্যস্ত হইয়াছিল যে ভারতীয় বলিয়া ভারতীয়দের বিরুদ্ধে কোন আইন পাস করা চলিবে না অর্থাৎ আইনে বর্ণ ভেদ বা জাতি ভেদ করা যাইবে না। তাই, আসলে নাতাল প্রবাসী ভারতীয়দের স্বার্থে আরও অধিক বাগড়া দেওয়া উদ্দেশ্য হইলেও বিল দুইটাকে এভাবে রচনা করিতে হইয়াছিল যে তা যেন সকলেরই জন্য।

এই দুই বিলের কারণ আমার সার্বজনিক কাজ বাড়িয়া যায় ও ভারতীয়দের মধ্যে অধিক জাগৃতি আসে। কথার আড়ালে ঢাকা বিলের আসল উদ্দেশ্য আমি লোকের কাছে খুলিয়া ধরিলাম। বিল দুইটা ভারতের নানা ভাষায় অনুবাদ করিয়া প্রচার করা হইল। উপনিবেশ মন্ত্রীর নিকট বিলাতে আপীল করা হইল। কিন্তু তিনি বাধা দিলেন না। বিল আইন হইল।

আমার বেশির ভাগ সময় দশের কাজে ব্যয় হইতে লাগিল। মনসুখলাল নাজর (পূর্বে বলিয়াছি তিনি নাতালে আসিয়াছিলেন) আমার সঙ্গে থাকিয়া গেলেন। দশের কাজে তিনি আগাইয়া আসিলেন। আমার বোঝা তাতে কিছুটা হাল্কা হইল।

শেঠ আদমজী মিঞাখাঁ আমার অনুপস্থিতিতে অতীব যোগ্যতার সহিত সেক্রেটারীর কাজ চালাইয়াছিলেন। কংগ্রেসের সভ্য বাড়াইয়াছিলেন। প্রায় হাজার পাউণ্ড কংগ্রেস তহবিলে যোগ করিয়াছিলেন। যাত্রীদের বিরুদ্ধে লাগার দরুন ও এই দুই বিলের কারণ ভারতীয়দের মধ্যে যে চেতনার সঞ্চার হইয়াছিল তার ষোল-আনা উপযোগ আমি করিয়াছিলাম; লোককে কংগ্রেসের সভ্য হইতে ও কংগ্রেস ফণ্ডে চাঁদা দিতে বলিয়াছিলাম। কংগ্রেসের তহবিলে পাঁচ হাজার পাউণ্ড আসিয়া গিয়াছিল। আমার স্বপ্ন ছিল, কংগ্রেসের হাতে টাকা জমিলে তা দিয়া বাড়ী করা হইবে এবং বাড়ী ভাড়ার টাকায় কংগ্রেসের খরচ চলিবে। সার্বজনিক সংস্থা পরিচালনায় ওই আমার হাতে খড়ি হইল। সহকর্মীদের কাছে প্রস্তাব করিলাম। আগ্রহে তাঁরা তা অনুমোদন করিলেন। বাড়ী কেনা ও ভাড়া দেওয়া হইল। ভাড়া হইতে অনায়াসে কংগ্রেসের মাসিক খরচ চলিতে লাগিল। বিত্তের মালিকানা পোক্ত অছির হাতে ন্যস্ত করা হইল। আজও সেই বিত্ত আছে। কিন্তু তা হইয়াছে আভ্যন্তরীণ কলহের হেতু। ফলে বাড়ীভাড়া কোর্টে জমা হইতেছে।

এই দুঃখের ব্যাপার দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে আমার চলিয়া আসার পরে ঘটিয়াছে। কিন্তু মজুত টাকার ওপর সার্বজনিক সংস্থা দাঁড় করানোর দৃষ্টি দক্ষিণ আফ্রিকায়ই আমার বদলিয়া গিয়াছিল। অনেক সার্বজনিক সংস্থা সৃষ্টি ও পরিচালনা করার পরে আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে মজুত টাকার সহায়ে সার্বজনিক সংস্থা চালাইতে নাই। স্থায়ী ফণ্ডে নৈতিক পতনের কীট লুকানো থাকে। দশের সংস্থা মানে দশের সম্মতি ও অর্থে চালিত সংস্থা। এরূপ সংস্থা যখন লোকের সহায়তা হারায় তখন আর তার বাঁচিয়া থাকার দাবি থাকে না। দেখা গিয়াছে যে স্থায়ী বিত্তের ওপর চলা সংস্থা লোকমত উপেক্ষা করে এবং অনেক সময় উল্টা পথে চলে। আমাদের দেশে যেখানে-সেখানে এর দৃষ্টান্ত মিলে। ধর্মসংস্থা বলিয়া দাবিকারী কতকগুলি সংস্থা হিসাব-নিকাশ দেওয়ার ধার পর্যন্ত ধারে না। অছিরাই এই সব সংস্থার

মালিক হইয়া বসিয়াছে: কারো কাছে তারা জবাবদায়ী নয়। নিত্য সৃজন নিত্য পোষণ প্রকৃতির নিয়ম। সার্বজনিক সংস্থারও যে তেমন নিত্য ভিক্ষা তনুরক্ষা করা চাই এই কথায় আমার লেশমাত্র সংশয় নাই। যে সংস্থা লোকের সমর্থন হারাইয়াছে সার্বজনিক সংস্থারূপে তার বাঁচিয়া থাকার অধিকার নাই। কোন সংস্থা লোকপ্রিয় কিনা, উহার সঞ্চালকরা লোকের বিশ্বাসভাজন কিনা, তার পরীক্ষা হয় বার্ষিক চাঁদার হিসাব হইতে। আমি মনে করি এই কষ্টিপাথরে নিজেকে যাচাই করিয়া লওয়া যে কোন সংস্থার কর্তব্য। কেউ যেন আমায় ভুল না বোঝেন। নিজ বাড়ী না হইলে যে-সব সংস্থার কাজ চলে না সেই সব সংস্থার বেলায় আমার এই কথা প্রযোজ্য নহে। সার্বজনিক সংস্থার চলতি খরচ স্বেচ্ছায় দেওয়া চাঁদা হইতে আসা চাই।

আমার এই ধারণা দক্ষিণ আফ্রিকার সত্যাগ্রহের সময়ে দৃঢ় হয়। ছয় বৎসর ব্যাপী এই মহান্ সংগ্রাম স্থায়ী সম্ভার বিনা চলিয়াছিল, যদিও লাখ লাখ টাকা তাতে খরচ হইয়াছিল। মনে আছে, এমন দিনও তখন গিয়াছে যখন পরের দিন কি করিয়া চলিবে তার কিনারা পর্যন্ত দেখিতে পাই নাই। কিন্তু পরের কথা পরের জন্য থাক্। যে মত ব্যক্ত করিলাম তার সমর্থন এই কথায় বার বার পাঠক দেখিতে পাইবেন।

বালকদের শিক্ষা

১৮৯৭ সনের জানুয়ারী মাসে আমি যখন ডারবনে নামি তখন আমার সঙ্গে তিনটি ছেলে ছিল—দশ বছরের ভাগিনেয়, নয় ও পাঁচ বছরের দুই ছেলে। এদের কোথায় পড়াই?

গোরা-ছেলেদের স্কুলে এদের দিতে পারিতাম, কিন্তু তা হইত কৃপার দ্বার দিয়া প্রবেশ। অন্য ভারতীয় বালকদের পক্ষে সে দ্বার খোলা ছিল না। ভারতীয় বালকদের জন্য খ্রীস্টান মিশনারীদের স্কুল ছিল। সেই স্কুলে ছেলেদের দিতে মন সরে নাই। সেখানকার শিক্ষার ধারা আমার মনের মত ছিল না। গুজরাটীর মাধ্যমে শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল না। ইংরেজীর মাধ্যমে পড়ানো হইত, অনেক চেষ্টা-চরিত্র করিলে অশুদ্ধ তামিল বা হিন্দীর মাধ্যমে

ব্যবস্থা হইতে পারিত। এই ও অন্য সব অসুবিধা বরদাস্ত করা গেল না। এর মধ্যে বালকদের নিজেই একটু পড়াইতে শুরু করিয়াছিলাম। কিন্তু নিয়মমত পড়ানো হইত না। পছন্দসই গুজরাটী শিক্ষকও খুঁজিয়া পাইলাম না।

কি যে করি ভাবিয়া পাইতেছিলাম না। আমার নির্দেশ মত বালকদের পড়াইবে এরূপ ইংরেজ শিক্ষকের জন্য কাগজে বিজ্ঞাপন দেই। ভাবিয়া রাখিয়াছিলাম শিক্ষক পাওয়া যায় ত সে বালকদের নিয়মিতভাবে পড়াইবে, তা বাদে আমি যখন যতটা পারি নিজে পড়াইব। মাসিক সাত পাউণ্ড বেতনে এক ইংরেজ শিক্ষিকাকে নিযুক্ত করিলাম। কিছুদিন এই ভাবে চলিল। কিন্তু আমার সন্তোষ ছিল না।

বালকদের সহিত কেবল গুজরাটীতেই কথাবার্তা বলিতাম। তা হইতে গুজরাটীর জ্ঞান তাদের কিছুটা হইতেছিল। তাদের দেশে পাঠানোর কথা ভাল লাগিতেছিল না। কারণ সেই সময়েই আমি স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে ছোটদের মা-বাপের কাছ হইতে দূরে রাখিতে নাই। সদাচারী গৃহে বালক অনায়াসে যে শিক্ষা লাভ করে তা ছাত্রাবাসে অসম্ভব। তাই বালকদের নিজের কাছেই রাখিয়াছিলাম। ভাগনে ও বড় ছেলেকে ভারতের দুই আবাসিক বিদ্যালয়ে পড়ার জন্য পাঠাইয়াছিলাম। কিন্তু অল্প দিন পরেই তাদের আবার লইয়া আসি। সাবালক হওয়ার পরে আমার বড় ছেলে হাইস্কুলে পড়ার জন্য স্বেচ্ছায় আহমদাবাদে চলিয়া যায়। আমার মনে হয় আমি যতটুকু পড়াইতে পারিতাম ভাগনে তাতেই সন্তুষ্ট ছিল। দুর্ভাগ্যের কথা, ভরা যৌবনে দিন কতক ভুগিয়া সে চলিয়া যায়। অন্য তিন ছেলে কোন দিন কোন স্কুলে যায় নাই। সত্যাগ্রহীদের বালকবালিকাদের জন্য দক্ষিণ আফ্রিকায় যে স্কুল খুলিয়াছিলাম তাতে তারা নিয়মিতরূপে কিছুটা শিক্ষা লাভ করিয়াছিল।

আমার এই পরীক্ষায় ত্রুটী ছিল। যতটা সময় বালকদের পিছনে দিতে চাহিতাম ততটা সময় দিতে পারিতাম না। এই ও অন্য অনিবার্য অবস্থা বিধায় যে পরিমাণ পুঁথিজ্ঞান আমার দেওয়ার বাসনা ছিল তা আমি তাদের দিতে পারি নাই। এই ব্যাপারে আমার সকল ছেলেদেরই আমার বিরুদ্ধে কমবেশি অভিযোগ রহিয়া গিয়াছে। কারণ, যখনই তারা এম-এ, বি-এ অথবা এমনকি ম্যাট্রিকুলেশন-পাস লোকের সংস্পর্শে আসে তখনই তারা অনুভব করে স্কুলের শিক্ষা তারা পায় নাই।

তবুও আমার নিজের মত এই যে, অনুভব-জ্ঞান তাদের হইয়াছে; যে শিক্ষা মাতাপিতার কাছে থাকিয়া তারা পাইয়াছে, স্বাধীনতার যে হাতে-খড়ি তাদের হইয়াছে, তা তারা তাদের চাওয়া কেতাবী বিদ্যার স্কুলে গিয়া পাইত না। তাদের জন্য আজ আমার কোন ভাবনা ভাবিতে হয় না। তাদের জীবন সাদাসিধা হইয়াছে; সেবাবৃত্তি জাগ্রত হইয়াছে। আমার কাছ হইতে দূরে, বিলাতে বা দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকিয়া পড়াশুনা করিলে এই গুণ তারা লাভ করিত না। উল্টা, হয়ত তাদের কৃত্রিম জীবনযাত্রা আমার দেশসেবার পথে বাধাস্বরূপ হইত। অতএব যদিও তাদিগকে আমি আমার (আর তাদেরও) ইচ্ছানুরূপ পুঁথিজ্ঞান দিতে পারি নাই তা হইলেও অতীত দিনের দিকে যখন তাকাই তখন আমার মনে হয় না যে তাদের প্রতি আমি আমার কর্তব্যের অবহেলা করিয়াছি, আর তাই আমার কোন আপসোসও নাই। আমার বড় ছেলের বর্তমান মতিগতির কথা যখন ভাবি তখন আমি তাতে আমার অপক্ক ও অপরিণত জীবনেরই প্রতি-বিম্ব দেখিতে পাই। আমার জীবনের ওই ভোগের ও অজ্ঞানের দিনে আমার বড় ছেলের সেই বয়স ছিল যে বয়সে সহজে মনে ছাপ পড়ে আর তা কখনও ওঠে না। ওটা যে আমার নির্বুদ্ধিতার কাল, মোহের কাল ছিল, তা সে কেন মানিবে? সে কেন না মনে করিবে যে ওটাই ছিল আমার জ্ঞানকাল, আর পরে যে পরিবর্তন ঘটিয়াছিল তাই ছিল মোহজনিত অবাস্তব কাল? কেনই বা সে মনে করিবে না যে ওটাই ছিল আমার জীবনের গৌরবময় নিশ্চিন্ত কাল আর পরে যে অদলবদল করিয়াছিলাম তা ছিল আমার সূক্ষ্ম অভিমান ও মোহের পরিণাম? 'ছেলেদের স্কুল-কলেজে পড়াইলে ক্ষতি কি ছিল? ডানা কাটিয়া তাদের পঙ্গু করার কি অধিকার আপনার ছিল? ইচ্ছামত পড়িয়া উপাধি লাভ করিয়া তাদের নিজেদের পথ বাছিয়া লওয়ার পথে আপনি বাধা হইতে গেলেন কেন?'—এরূপ কত প্রশ্নই না বন্ধুরা আমাকে করিয়াছেন।

আমার মনে হয় না তাঁদের এই সকল প্রশ্নে কোন সার আছে। বহু ছাত্রের সংস্পর্শে আমি জীবনে আসিয়াছি। অন্য বালকদের বেলায় আমি নিজে অনুরূপ পরীক্ষা চালাইয়াছি বা আমার কথা মত অন্য লোকে তাদের বেলায় আমার 'খেয়াল'-এর পরীক্ষা চালাইয়াছেন। সেই সকল পরীক্ষার পরিণাম আমি বাছবিচার করিয়া দেখিয়াছি। সেই বালকেরা ও আমার

ছেলেরা এখন সমবয়সী যুবক। তারা আমার ছেলেদের তুলনায় মনুষ্যত্বে আগাইয়া গিয়াছে অথবা তাদের নিকট হইতে আমার ছেলেদের বিশেষ কিছু শেখার আছে এ কথা আমার মনে হয় না।

তা ছাড়া, আমার পরীক্ষা-প্রয়োগের ফলাফল ভবিষ্যতই কেবল বলিতে পারে। গৃহশিক্ষার ও বিদ্যালয়ের শিক্ষার মধ্যে তফাত কি ও কোথায় এবং মাতাপিতার জীবনধারা পরিবর্তনের প্রভাব সন্তানের ওপর কি হয় ক্রমবিকাশের গবেষকদের সামনে তার ইঙ্গিত উপস্থিত করার নিমিত্ত এই বিষয়ের আলোচনা এখানে করিতেছি। সত্যের সাধনা সত্যের সাধককে কোথা হইতে যে কোথায় লইয়া যায় এবং স্বাধীনতার দেবী স্বাধীনতার পূজারীর নিকট হইতে যে কিরূপ বলিদান চায় এই পরীক্ষা হইতে তা দেখা যাইবে : সে কথা লোকের সামনে ধরাও এই প্রকরণের আর এক উদ্দেশ্য। দেশের মর্যাদা যদি পায়ে দলিতাম, অন্য ভারতীয় বালকেরা যে স্কুলে পড়িতে পাইত না সেই স্কুলে যদি আমার ছেলেদের পাঠাইতাম ত তাদের আমি পুঁথিবিদ্যা দিতে পারিতাম ঠিক, কিন্তু প্রত্যক্ষ আত্মসম্মানের ও স্বাধীনতার যে সাক্ষাৎ শিক্ষা আমার ছেলেরা পাইয়াছে সেই স্থলে তারা কি তা পাইত? স্বাধীনতা ও কেতাবী শিক্ষার মধ্যে যেখানে একটি বাছিয়া লওয়ার প্রশ্ন সেখানে কে না স্বীকার করিবে যে পুঁথিবিদ্যা অপেক্ষা স্বাধীনতার পাঠ সহস্রগুণে শ্রেষ্ঠ?

১৯২০ সনে যুবকদের আমি গোলামখানা মানে স্কুল-কলেজ ছাড়িতে বলিয়াছিলাম, বলিয়াছিলাম যে গোলামখানায় পড়া অপেক্ষা নিরক্ষর থাকিয়া সদর রাস্তায় পাথর ভাঙ্গাও ভাল। এই পরামর্শ যে তখন কেন দিয়াছিলাম তার মর্ম হয়ত সেই যুবকেরা এখন বুঝিতে পারিবে।

সেবাবৃত্তি

আমার পসার আশানুরূপ বৃদ্ধি পাইতেছিল। কিন্তু তা হইলেও মনে শান্তি ছিল না। জীবন আরও সাদাসিদা হওয়া উচিত, সাক্ষাৎ সেবাকর্মও করা কর্তব্য এই অসোয়াস্তির ভাব মনে চলিতেছিল। ঠিক এমনি সময়ে একদিন এক গলিত কুষ্ঠরোগী আমাদের বাড়ী আসে। তাকে খাইতে দিলাম।

বিদায় করিতে মন সরিল না। আশ্রয় দিলাম। তার ঘা ধুইতাম, সেবা করিতাম। কিন্তু বরাবরের মত তাকে রাখার সুবিধা ছিল না, সাহসও ছিল না। তাই তাকে গিরমীটিয়াদের জন্য সরকারী হাসপাতালে পাঠাই।

স্থায়ী কোন সেবাশুশ্রূষার কাজ করিতে পাইলে খুব ভাল হয় মনে এমনটা উসখুসানি চলিতেছিল। ডাক্তার বূথ সেন্ট এ্যাডামস মিশনের প্রধান ছিলেন। রোগী আসিলে তিনি কখনও বিমুখ করিতেন না, ওষুধ দিতেন। তিনি অতিশয় দয়ালু লোক ছিলেন। পারসী রুস্তমজীর দানে ডাক্তার বূথ-এর দেখাশোনায় খুব ছোট একটি দাতব্য চিকিৎসালয় খুলিতেই হাস-পাতালে নার্সের কাজ করার প্রবল ইচ্ছা হয়। ঘণ্টা দুই সেখানে ওষুধ দিতে হইত। ওষুধ তৈরী করার জন্য মাইনে-করা কোন লোকের বা স্বেচ্ছাসেবকের আবশ্যক ছিল। ঠিক করিলাম এই কাজটা হাতে লইব এবং অন্য সব কাজ হইতে সেই পরিমাণ সময় বাঁচাইয়া এই কাজে লাগাইব। আফিসে বসিয়া পরামর্শ দেওয়া, দলিল ইত্যাদি মুসাবিদা করা অথবা আপসে বিবাদ মিটানো এই ছিল আমার ওকালতির মুখ্য কাজ। ম্যাজি-স্ট্রেটের কোর্টে কিছু কেস থাকিত, তা-ও তর্কের বিতর্কের নয়। আমি উপস্থিত হইতে না পারিলে সেসব কেস মি. খাঁ করিতেন। তিনি আমার পরে ওদেশে গিয়াছিলেন এবং সেই সময়ে আমার সঙ্গেই থাকিতেন। অতএব এই ছোট্ট চিকিৎসালয়ের কাজ করার সময় আমি পাইতাম। যাতায়াত সমেত হাসপাতালের কাজে সকালে আমার দুই ঘণ্টা লাগিত। এই কাজ হইতে আমি অনেকটা শান্তি পাই। রোগীর অসুখ নির্ণয় করিতাম, ডাক্তারকে তা বলিতাম ও তিনি যে ওষুধ ব্যবস্থা করিতেন তা তৈয়ার করিয়া দিতাম। এই কাজের সূত্রে দুঃখী ভারতীয়দের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসার সুযোগ আমার হইয়াছিল। তাদের বেশির ভাগ তামিল, তেলুগু অথবা উত্তর ভারতের গিরমীটিয়া ছিল।

ভবিষ্যতে এই অভিজ্ঞতা বোঅর যুদ্ধে জখমীদের শুশ্রূষায় ও অন্য অসুস্থ লোকের সেবায় খুব কাজে আসিয়াছিল।

বালকদের লালন-পালনের প্রশ্ন ত ছিলই। আমার দুই ছেলের জন্ম দক্ষিণ আফ্রিকায়। তাদের পালন-পোষণের কাজ হাসপাতালের অভিজ্ঞতার ফলে সহজ হইয়াছিল। আমার স্বাবলম্বন বৃত্তির কারণ অনেক ঝঞ্ঝাট আমার ভুগিতে হইত আর আজও ভুগিতে হয়। স্বামী-স্ত্রী আমরা

ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলাম যে প্রসবকালে সর্বোত্তম ডাক্তার ও নার্সের শরণ লইব। কিন্তু সময়কালে যদি ডাক্তার বা নার্স না মেলে তবে কি হইবে? তাছাড়া ভারতীয় নার্সের প্রয়োজন ছিল। ধাই-বিদ্যা জানা ধাই ভারতেই মেলা ভার, দক্ষিণ আফ্রিকার কথা ত দূরে। তাই সূতি বা আঁতুড় সম্বন্ধে পড়াশুনা করিয়াছিলাম। ডাক্তার ত্রিভুবন দাসের 'মা-নে শিখামন' নামক বই পড়িয়া লইয়াছিলাম। সেই জ্ঞানে এখান-ওখান হইতে পাওয়া এটা-ওটা যোগবিয়োগ করিয়া শেষের দুই শিশুকে আমি লালন-পালন করিয়াছিলাম। দুই বারই ধাইয়ের সহায়তা লইয়াছিলাম তবে কোন বারই দুই মাসের অধিক কালের জন্য নয়। মুখ্যত স্ত্রীর সেবার জন্যই সেই সেবা লইয়াছিলাম, প্রথম দিন হইতে শিশুদের স্নান আদি যাবতীয় কাজ আমি নিজেই করিতাম।

শেষ পুত্রের জন্মের সময়ে আমার পুরাপুরি পরীক্ষা হয়। স্ত্রীর হঠাৎ প্রসব-বেদনা দেখা দেয়। ডাক্তার বাড়ী ছিলেন না। ধাইকে ডাকিয়া পাঠানো হয়। কাছেই সে থাকিত। কিন্তু তার দ্বারা প্রসব-ক্রিয়া হওয়ার ছিল না। সবটা কাজ আমাকেই করিতে হইয়াছিল। ভাগ্যে 'শিখামন' হইতে বিষয়টা খুঁটিনাটি শিখিয়াছিলাম। সেই জ্ঞান খুব কাজে আসিয়াছিল। নির্ভয়ে কাজ সমাধা করিয়াছিলাম।

আমি দেখিয়াছি যে সন্তান ঠিক ঠিক মানুষ করিতে হইলে সন্তান পালন-পোষণের মোটামুটি জ্ঞান মা-বাপের থাকা চাই। এই জ্ঞান পদে পদে আমার কাজে আসিয়াছে। এই বিষয়ে যে জ্ঞান লাভ করিয়াছিলাম তা যদি আমি কাজে না লাগাইতাম তবে যে সুস্বাস্থ্য আমার ছেলেরা আজ ভোগ করিতেছে তা এরা ভোগ করিতে পাইত না। প্রথম পাঁচ বছরে শিশুর কিছু শেখার নাই এরূপ একটা ভুল ধারণা আমাদের রহিয়াছে। আসল কথা এই যে, প্রথম পাঁচ বছরে শিশু যা শেখে পরে সারা জীবনে সে ততটা শেখে না। শিশুর শিক্ষা মায়ের পেটে আরম্ভ হয় নিজ অনুভব হইতে এই কথা বলিতেছি। গর্ভাধানকালে মাতাপিতা যে শারীরিক ও মানসিক স্থিতিতে থাকে সন্তানে তার ছাপ না পড়িয়া যায় না। গর্ভাধান অবস্থায় মার প্রকৃতি ও রুচি-অরুচি সন্তান আহরণ করিতে থাকে। জন্মের পরে সে মা-বাপের অনুকরণ করিয়া চলে এবং অসহায় বলিয়া কয়েক বছর বিকাশের ব্যাপারে মা-বাপের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে।

যে দম্পতি এই কথাটা বুঝিবে তারা সহবাসকে কস্মিনকালেও উপভোগের বস্তু বানাইবে না : একমাত্র সন্তান কামনায়ই উপগত হইবে। রতিসুখ খাওয়া-শোয়ার মত এক স্বতন্ত্র ও আবশ্যক বস্তু এই ধারণা ঘোর অজ্ঞানতা বই আর কিছু নহে। সংসারের অস্তিত্বের মূলে জননক্রিয়া। সংসার ঈশ্বরের লীলাভূমি, তাঁর মহিমার প্রতিনিধি। সংসারের সুব্যবস্থিত বৃদ্ধির জন্যই রতি-প্রেরণার সৃষ্টি হইয়াছে এই বোধ যাদের হইবে তারা মহা প্রযত্নে বিষয়বাসনা সংযমে বাঁধিবে এবং রতি-ভোগের পরিণামে যে সন্তান আসিবে তার শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক কল্যাণের জন্য যে জ্ঞা ন আবশ্যক সেই জ্ঞান লাভ করিয়া সন্তানকে তা দিবে।

৭

ব্রহ্মচর্য—১

জীবনের যে স্তরে ব্রহ্মচর্য ব্রত লওয়ার বিষয়ে মনে তুমুল তোলপাড় শুরু হইয়াছিল আমার কথা এখন সেই স্তরে আসিয়া গিয়াছে। বিবাহ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একপত্নীত্বের সংকল্প আমার মনে দৃঢ় হইয়া গিয়াছিল। পত্নীর প্রতি সততা আমার সত্যব্রতের অঙ্গ ছিল। কিন্তু পত্নীর বেলায়ও ব্রহ্মচর্য পালন করা কর্তব্য এ কথা দক্ষিণ আফ্রিকায় আমি স্পষ্ট বুঝিতে পাই। কোন্ ঘটনায় বা কোন্ পুস্তকের প্রভাবে আমার মনে এই ভাবের উদয় হইয়াছিল সেই কথা আজ আমার ঠিক মনে নাই। তবে এইটুকু মনে আছে যে, এতে রায়চাঁদ ভাইয়ের—তাঁর কথা এর আগে বলিয়াছি—অনেকটা প্রভাব ছিল। তাঁর সঙ্গে আমার এক বারের কথাবার্তা মনে পড়িতেছে। মি· গ্লাডস্টোনের প্রতি মিসিস গ্লাডস্টোনের ভালবাসার প্রশংসা এক দিন আমি তাঁর কাছে করিয়াছিলাম। কোথাও পড়িয়াছিলাম যে পার্লামেণ্ট গৃহেও মিসিস গ্লাডস্টোন মি· গ্লাডস্টোনকে নিজ হাতে চা তৈরি করিয়া দিতেন। আর এই বস্তুটা এই নিয়মনিষ্ঠ দম্পতি-জীবনের নিত্যকর্ম হইয়া গিয়াছিল। তা আমি কবিকে পড়িয়া শুনাই ও প্রসঙ্গক্রমে দাম্পত্য প্রেমের স্তুতিগান করি। রায়চাঁদ ভাই আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, 'মিসিস গ্লাডস্টোনের পত্নীত্ব ও তাঁর সেবাভাব এই দুইয়ের কোন্‌টা আপনার বেশি ভাল লাগে? ওই মহিলা পত্নী না হয়ে যদি গ্লাডস্টোনের ভগ্নী বা তাঁর

কর্তব্যপরায়ণা পরিচারিকা হতেন ও অমনটা প্রেমে চা করে খাওয়াতেন ত আপনি কী বলতেন? এরূপ ভগ্নীর, এরূপ চাকরানীর দৃষ্টান্ত আজও মেলে না কি? ধরুন নরজাতিতে যদি এরূপ প্রেম দেখতে পেতেন তবে মিসিস গ্লাডস্টোনের বিষয়ে যতটা বিস্ময় অনুভব করেছিলেন তার বিষয়েও কি ততটাই বিস্ময় অনুভব করতেন?* আমার কথাটা ভেবে দেখবেন।'

রায়চাঁদ ভাই নিজে বিবাহিত ছিলেন। মনে পড়ে তাঁর কথা তখন আমার কঠোর মনে হইয়াছিল। তবুও চুম্বকের টানে তা আমার চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছিল। চাকরের এরূপ প্রভুনিষ্ঠার মূল্য পত্নীর পতিনিষ্ঠা অপেক্ষা আমার কাছে হাজারো গুণ প্রশংসার যোগ্য মনে হইয়াছিল। পতি-পত্নীর হৃদয় একই সূত্রে গাঁথা তাই তাদের একের প্রতি অন্যের টান হইবে এ আর বেশি কথা কি! নোকর-মনিবের মধ্যে এমন প্রেম অশেষ প্রযত্নেই মাত্র বিকশিত হয়। কবির কথার ছাপ আমার মনে দিন দিন দৃঢ় হইতেছিল।

তবে স্ত্রীর সহিত আমার সম্বন্ধ কি হওয়া উচিত? স্ত্রীকে বিষয়ভোগের বাহন বানানোটাই কি আমার পত্নীনিষ্ঠার পরিচয়? যতদিন বিষয়বাসনার অধীন থাকিব ততদিন আমার পত্নীনিষ্ঠার মূল্য কিছুই নয়—এই প্রশ্ন, এই ভাব আমার মনে জাগিল। এখানে এ কথা আমার বলিতেই হইবে যে, আমার পত্নী আমায় কোনদিনও ভোলায় নাই। অতএব ইচ্ছা করিলে অতি সহজেই আমি ব্রহ্মচর্য পালন করিতে পরিতাম। আমার অশক্তি বা আসক্তিই আমার পথে বাধা ছিল।

চৈতন্য হওয়ার পরেও আমি দুইবার ব্যর্থ হইয়াছিলাম। চেষ্টা করিয়াছিলাম তবুও পতন হইয়াছিল। হার হইয়াছিল তার কারণ আমার প্রযত্নের লক্ষ্য উচ্চ ছিল না। মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল সন্তান নিবারণ। ইংলণ্ডে থাকার সময়ে কৃত্রিম উপায়ের সম্বন্ধে কিছু পড়াশুনা করিয়াছিলাম। নিরামিষ প্রকরণে ডাক্তার এ্যালিসনের জন্মনিরোধ প্রচারের কথা বলিয়াছি। উহার খানিক প্রভাব ক্ষণকালের মত আমার ওপর হইয়াছিল। কিন্তু মি. হিলস্ উহার যে বিরোধ করিয়াছিলেন এবং যে মানসিক সংযমের কথা বলিয়াছিলেন তার গভীর ছাপ আমার মনে পড়িয়াছিল আর কালক্রমে তা স্থায়ী

* মূলে বাক্যটি একটু অন্যরূপ: আর, নারীজাতির বদলে এরূপ প্রেম যদি আপনি নরজাতিতে দেখতেন তা হলে কি আপনি আনন্দে আশ্চর্য হতেন না?

হইয়া গিয়াছিল। অতএব যখন আমি দেখিলাম আমার আর সন্তানের বাসনা নাই তখন সংযম সাধনার প্রযত্ন করিতে থাকি। সে যে কী শক্ত ব্যাপার ছিল বলিবার নয়। আমরা আলাদা খাটে শুইতাম। সারা দিন পরিশ্রমে শরীর যখন অবশ হইত তখন শুইতে যাইতাম। এই সব প্রযত্নের বিশেষ ফল হাতেহাতে পাই নাই। কিন্তু এখন যখন অতীতের দিকে তাকাই দেখিতে পাই যে আমার অন্তিম পণ এই সব প্রযত্নেরই ফল।

অন্তিম নিশ্চয় ১৯০৬ সনের পূর্বে করিয়া উঠিতে পারি নাই। সত্যাগ্রহ তখন আরম্ভ হয় নাই। উহার কল্পনাও মনে ছিল না। বোঅর যুদ্ধের পরে নাতালে জুলু 'বিদ্রোহ' হয়। তখন আমি জোহানিসবর্গে ওকালতি করিতাম। কিন্তু আমার মনে হইল এই 'বিদ্রোহ'-এর প্রসঙ্গে নাতাল সরকারকে আমার সেবা অর্পণ করা কর্তব্য। আমার প্রস্তাব সরকার স্বীকার করিল। সে কথা পরে বলিব। কিন্তু এই সেবার কথায় সংযম পালনের তীব্র ভাবনা মন জুড়িয়া বসে। আমার স্বভাবমত সঙ্গীদের সহিত এই বিষয় আলোচনা করিলাম। মনে হইল, সন্তানসৃষ্টি ও সন্তানপালন এবং দশের সেবা এক সঙ্গে চলিতে পারে না। 'বিদ্রোহ'-এ সেবাকার্য করার নিমিত্ত জোহানিসবর্গের পাট আমার তুলিতে হইল। সেবা অর্পণের একমাস মধ্যে গোছগাছ করা, ফিটফাট আসবাবে সাজানো গৃহ ছাড়িতে হইল। স্ত্রীপুত্রদের ফীনিক্সে রাখিয়া আসিলাম এবং নাতাল বাহিনীর অঙ্গরূপে ডুলিবাহক দল লইয়া বাহির হইয়া পড়িলাম। সেনাদলের সঙ্গে মার্চ করিয়া চলিতে চলিতে আমি বুঝিতে পাই যে লোকসেবায় তন্ময় হইতে হইলে পুত্রৈষণা ও বিত্তৈষণা ত্যাগ করিয়া আমার বাণপ্রস্থী হইতে হইবে।

দেড় মাসের অধিক 'বিদ্রোহ'-এর কাজে আমার থাকিতে হয় নাই। কিন্তু ছয় সপ্তাহ আমার জীবনের অতীব মূল্যবান সময় ছিল। নানা ব্রতের মাহাত্ম্যের কথা এই সময়ে আমার কাছে অধিক স্পষ্টরূপে ধরা পড়ে। দেখিতে পাই মুক্তির পথে ব্রত বাধক নয়, সাধক। এত দিন যে আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় নাই তার কারণ দৃঢ় সংকল্পের অভাব, নিজ শক্তিতে অবিশ্বাস এবং ভগবান আমার সহায় হইবেন কিনা এই সম্পর্কে অনাস্থা। আর তাই আমার মন নানা সংশয়ে দুলিতেছিল, বিকারের পাকে পাক খাইতেছিল। বুঝিতে পাইলাম যে, ব্রতে আমরা নিজেদের

বাঁধি না বলিয়া লোভে পড়ি। প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলে ব্যভিচারের দিকে লোকের মন ধায় না, একপত্নীব্রতে তা স্থির হয়। 'আমি প্রযত্নে বিশ্বাস করি, ব্রতের বন্ধনে পড়তে চাই না' এই কথা দুর্বলতার নিশানা, এতে ভোগের বাসনা সূক্ষ্মভাবে লুকাইয়া থাকে। তা যদি না হয় তবে যে বস্তু ত্যাজ্য তা সর্বথা ত্যাগ করিলে হানি কি? কোন সাপ কামড়াইবে বুঝিলে তা হইতে লোকে প্রাণপণে ভাগে, ভাগিবার চেষ্টামাত্র করে না। আধামনে চেষ্টা করা সেখানে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে যাওয়া। চেষ্টা মাত্রের অর্থ এখানে সাপে কামড়াইলে যে নির্ঘাত মৃত্যু এই বোধের অভাব। সুতরাং কোন কিছু ত্যাগ করার চেষ্টা মাত্র করিয়া নিশ্চিন্ত থাকি ত বলিতে হইবে যে সে বস্তু যে সর্বথা ত্যাজ্য এ কথা আমি স্পষ্ট বুঝি নাই। 'পরে যদি আমার মত বদলে যায়?'—এই সংশয় হইতে আমরা অনেক সময় ব্রত লইতে ভয় পাই। এরূপ সংশয় হইতে এ কথারই সাক্ষ্য মিলে যে এই বস্তু বা ওই বস্তু যে ত্যাজ্য তার সুস্পষ্ট বোধ আমার নাই। তাই না নিষ্কুলানন্দ বলিয়াছেন—

ত্যাগ ন টকে রে বৈরাগ্য বিনা।

অতএব যেখানে আসক্তি জড়ে-মূলে নষ্ট হইয়াছে সেখানে ত্যাগের ব্রত আপনা আপনিই আসিয়া যায়।

৮

ব্রহ্মচর্য—২

সব দিক আলোচনা করিয়া ও গভীরভাবে জিনিসটা ভাবিয়া দেখিয়া ১৯০৬ সনে ব্রত লই। ব্রত লওয়ার দিন পর্যন্ত এই বিষয়ে সহধর্মিণীর সহিত আলোচনা করি নাই। ব্রত লওয়ার সময় তাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। সে বিরোধ করে নাই। কিন্তু ব্রত গ্রহণ জিনিসটা সহজ ছিল না, অতীব কঠিন ছিল। শক্তি আমার কম ছিল। বিকারকে কিভাবে বাগ মানাইব? —মনে এই প্রশ্ন উঠিয়াছিল। মনে হইতেছিল স্ত্রীর সহিত যৌন সম্পর্ক ছিন্ন করা এক সৃষ্টিছাড়া ব্যাপার। ঈশ্বর সহায় হইবেন এই ভরসায় ঝাঁপ দিলাম।

আজ কুড়ি বছর পরে সেই ব্রতের কথা যখনই মনে হয় বিস্ময়ে ও

আনন্দে অন্তর ভরিয়া ওঠে। সংযম পালনের বৃত্তি ১৯০১ সন হইতে প্রবল হইতেছিল আর কমবেশি পালনও করিতেছিলাম। কিন্তু ব্রত লওয়ার পরে যে মুক্তির স্বাদ ও আনন্দ অনুভব করিয়াছি, ১৯০৬ সনের পূর্বে তেমন মুক্তির স্বতন্ত্রতা ও আনন্দ অনুভব করিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। কারণ তখনও আমার বাসনার বন্ধন কাটে নাই, যে-কোন মুহূর্তে কামবশ হওয়ার ভয় ছিল। ব্রতে বাসনার সেই প্রবেশপথ বন্ধ হইয়া গেল। ব্রহ্মচর্যের মহিমা দিন দিন আমার কাছে স্পষ্ট হইতে লাগিল। ব্রত ফীনিক্সে লইয়াছিলাম। আহতদের সেবা-শুশ্রূষার কাজ শেষ হইলে ফীনিক্সে ফিরি। সেখান হইতে তাড়াতাড়ি জোহানিসবর্গে যাইতে হয়। সেখানে যাওয়ার এক মাস মধ্যে সত্যাগ্রহ লড়াইয়ের ভিতপত্তন হয়। আমার অজানিতেই ব্রহ্মচর্য ব্রত যেন আমাকে উহার জন্য প্রস্তুত করিতেছিল। সত্যাগ্রহের কল্পনা আমার মনের আনাচে-কানাচেও ছিল না। আমার ইচ্ছা ব্যতিরেকেই আপনা হইতে তা আসিয়াছিল। কিন্তু দেখিতে পাই যে উহার আগেকার আমার সকল কর্ম—ফীনিক্সে যাওয়া, জোহানিসবর্গের সংসারখরচ কাটছাঁট করিয়া হাল্কা করা ও অন্তে ব্রহ্মচর্যের ব্রত গ্রহণ ইত্যাদি সবই যেন আমাকে পা পা করিয়া ওদিকে ঠেলিয়া দিতেছিল।

ব্রহ্মচর্যের সম্পূর্ণ পালন মানে ব্রহ্মদর্শন। এই জ্ঞান শাস্ত্র হইতে আমি লাভ করি নাই। অনুভব হইতে ধীরে ধীরে এই অর্থ আমার কাছে ধরা পড়িয়াছে। এই বিষয়ের শাস্ত্রবচন আমি পরে পড়িয়াছি। ব্রহ্মচর্য শরীররক্ষক, বুদ্ধিরক্ষক ও আত্মারক্ষক এ কথা ব্রত লওয়ার পরে দিন দিন অধিক স্পষ্টরূপে বুঝিতে পাইয়াছি। ব্রহ্মচর্য তখন আর ঘোর তপশ্চর্যা ছিল না, তখন তা সন্তোষ ও আনন্দের উৎস হইয়া গিয়াছিল। নিত্য নূতন মাধুর্যের বিকাশ তখন তাতে দেখিতে পাইতেছিলাম।

সত্য বটে দিন দিন অধিক আনন্দ লুটিতেছিলাম, তা বলিয়া কেউ যেন ধরিয়া লইবেন না যে ব্যাপারটা সহজ ছিল। ব্রহ্মচর্য যে কী কঠিন বস্তু জীবনের ছাপ্পান্ন বছর পার হওয়ার পরে আজও তা অনুভব করি। যত দিন গিয়াছে ততই আমি স্পষ্ট অনুভব করিয়াছি যে ব্রহ্মচর্য নয় ত ধারালো তলোয়ারের ফলার ওপর দিয়া হাঁটা। সতর্ক থাকার প্রয়োজনীয়তা সদা অনুভব করিয়াছি।

ব্রহ্মচর্যের জন্য সর্বাগ্রে দরকার স্বাদেন্দ্রিয়ের জয়। আমার অভিজ্ঞতা এই যে, জিভ পুরাপুরি বশে আসিলে ব্রহ্মচর্য অতি সহজ বস্তু হইয়া যায়। অতএব এখন হইতে আহার সম্বন্ধে আমার পরীক্ষা কেবল নিরামিশের দৃষ্টিতেই নয় পরন্তু ব্রহ্মচর্যের দৃষ্টিতেও চলিতে থাকে। ব্রহ্মচারীর আহার অল্প, সাদামাটা মসলা-রহিত ও সম্ভব হইলে অপক হওয়া উচিত। ইহা আমার নিজ অভিজ্ঞতার কথা।

ছয় বছরের পরীক্ষা-প্রয়োগের ফলস্বরূপ এ কথাও বলতে পারি যে, বনে-পাকা ফল ও বাদাম ব্রহ্মচারীর আদর্শ খাদ্য। ওই সময়ে যে বিকারশূন্যতা অনুভব করিয়াছিলাম খাদ্য পরিবর্তনের পরে সেই বিকারশূন্যতা অনুভব করি নাই। ফলাহারের সময়ে ব্রহ্মচর্য সহজ ছিল। দুধ ধরার পরে তাহা কষ্টসাধ্য হইয়াছিল। ফলাহার হইতে কেন যে দুধে ফিরিয়া যাইতে হইয়াছিল সে কথা যথাস্থানে বলিব। তবে এখানে বলা যাইতে পারে যে, দুধে যে ব্রহ্মচর্য পালন কঠিন হয় এতে সন্দেহ নাই। ইহা হইতে কেহ যেন ধরিয়া লইবেন না যে ব্রহ্মচারী মাত্রেরই দুধ ত্যাগ করা চাই। খাদ্যের পরিণাম ও প্রভাব ব্রহ্মচর্যের ওপর কি ও কতটা সে সম্বন্ধে বহু গবেষণা হওয়া আবশ্যক। দুধের সমান পুষ্টিকর ও সহজপাচ্য কোন ফলের সন্ধান আজও আমি পাই নাই। কোন বৈদ্য, হাকিম বা ডাক্তার তেমন কোন ফল বা অন্নের খোঁজ আমায় দিতে পারেন নাই। অতএব, দুধ উত্তেজক ইহা জানা সত্ত্বেও দুধ ত্যাগের পরামর্শ কাউকে দিতে পারি না।

কী খাইব আর কতটা খাইব এই বাছবিচারের মত উপবাসও ব্রহ্মচর্যের এক বাহ্য সহায়। ইন্দ্রিয় এত প্রবল যে ওপর-নীচ ও এদিক-ওদিক সব দিক হইতে না বাঁধিলে তাকে বশে রাখা যায় না। এ কথা কে না জানে যে আহার বিনা ইন্দ্রিয়ের চলে না। তাই এই বিষয়ে সংশয় নাই যে স্বেচ্ছাকৃত উপবাস ইন্দ্রিয়দমনের পক্ষে বিশেষ উপকারী। উপবাস করা সত্ত্বেও কেউ কেউ বিফল হয়। তার কারণ উপবাসে সব কিছু হইবে এ কথা ধরিয়া লইয়া তারা স্থূল উপবাসমাত্র করে আর মনে মনে বাহান্ন ভোগ উপভোগ করিতে থাকে—উপবাসের পরে কি কি খাইবে তার রসাল ফর্দ রচনা করে। এই-জাতীয় উপবাসে না হয় জিহ্বার সংযম, না জননেন্দ্রিয়ের। মন যখন দেহদমনে মানুষের সহায় হয় কেবল তখনই উপবাসের ফল ঠিকমত ফলে। তার অর্থ বিষয়ভোগের প্রতি মনে বিতৃষ্ণা জন্মা চাই।

বিষয়ের জড় মনে। উপবাসাদি সাধন হইতে অনেকটা সহায়তা মিলে বটে কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় তা যথেষ্ট নয়। এ কথা বলা যাইতে পারে যে, উপবাস করা সত্ত্বেও মানুষ খুব বিষয়াসক্ত হইতে পারে কিন্তু উপবাস বিনা বিষয়াসক্তিকে জড়ে-মূলে নাশ করা যায় না। তাই উপবাস ব্রহ্মচর্যের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। ব্রহ্মচর্যপ্রয়াসী অনেকে বিফল হয় তার হেতু আহারপান, দেখাশুনা ইত্যাদি ব্যাপারে অব্রহ্মচারীর মত চলিয়া তারা ব্রহ্মচর্য পালন করিতে চায়। এই প্রয়াসকে গরমের দিনে হিম পাওয়ার প্রয়াস বলিতে হইবে। সংযমী ও অসংযমীর, ভোগী ও ত্যাগীর জীবনে পার্থক্য অবশ্যই থাকা চাই। সমতা দেখা যায় ত সে ওপরের সমতা। ব্যবধান দিনের আলোর মত স্পষ্ট হওয়া দরকার। চোখ দিয়া দুইই দেখে: একের চোখ করে সর্বত্র হরিদর্শন; অন্যের চোখ ঘুরিয়া বেড়ায় নাটক-চটকের খোঁজে। কান দিয়া দুইই শোনে: একে শোনে ভজন-কীর্তন; অন্যে মজে খেউড়-খিস্তিতে। দুইই জাগে: এক জাগে হৃদয়ে যে রাম তার আরাধনায়; অন্যে রাত কাবার করে রঙ্গরসের মত্ততায়। দুইই খায়: একে দেহদেউল রক্ষার ভাড়া চুকায়; অন্যে জিভের লোভে শত জিনিস পেটে ঠুসিয়া আবর্জনায় দেহ ভরে। এইভাবে আচার-বিচারে দুইয়ের ভেদ আছেই; এই ব্যবধান কমে না, দিন দিন বাড়িয়া চলে।

ব্রহ্মচর্য মানে মন বচন কায়ায় সর্ব ইন্দ্রিয়ের সংযম। ওপরে যে সব ত্যাগের কথা বলিয়াছি তা যে এই সংযমের জন্য আবশ্যক এ কথা আমার কাছে দিন দিন অধিক স্পষ্ট হইয়াছে আর আজও হইতেছে। সংযমের কোন সীমারেখা নাই, যেমন নাই ব্রহ্মচর্যের মহিমার। যেমনতেমন চেষ্টায় এরূপ ব্রহ্মচর্য লাভ হয় না। কোটি কোটি লোকের পক্ষে তাহা আদর্শ মাত্রই থাকিয়া যাইবে; কেন না প্রযত্নশীল ব্রহ্মচারী দিন দিন নিজের ত্রুটি দেখিতে পাইবে, নিজের আনাচে কানাচে লুকাইয়া থাকা বিকারের খোঁজ পাইবে এবং সতত তাহা দূর করার চেষ্টা করিতে থাকিবে। যে পর্যন্ত চিন্তা এতটা বশে না আসিবে যে ইচ্ছা বিনা মনে কোন চিন্তাই আসিবে না ততদিন বুঝিতে হইবে যে ব্রহ্মচর্য অপূর্ণ রহিয়া গিয়াছে। অবাঞ্ছিত চিন্তামাত্রই বিকার। তাকে বশ মানানো মানে মনকে বশ মানানো। মনকে বাগ মানানো বায়ুকে বাগ মানানোর চাইতেও শক্ত। শক্ত হইলই বা, অন্তরে ত অন্তর্যামী আছেন তাই অসাধ্যও অসাধ্য নয়। কঠিন বলিয়াই ইহা অসাধ্য

এ কথা যেন কেউ মনে করিবেন না। ইহা পরম অর্থ। পরম অর্থের জন্য পরম প্রযত্ন করিতে হইবে এতে আর আশ্চর্য কি ?

কিন্তু এরূপ ব্রহ্মচর্য যে কেবল প্রযত্নে লাভ হয় না এ কথা দেশে ফেরার পরে আমি বুঝিতে পাইয়াছি। তার পূর্ব পর্যন্ত আমার বুদ্ধি মোহে আচ্ছন্ন ছিল : ধরিয়া লইয়াছিলাম যে ফলাহারে বিকার সমূলে নষ্ট হয় এবং অভিমানে মনে করিয়াছিলাম, এখন আমার আর কিছু করার নাই।

কিন্তু আমার সংগ্রামের কথা আগেই এখানে বলিতে যাই কেন! তবে এখানে ইহা স্পষ্ট করিয়া দেওয়া প্রয়োজন যে, ঈশ্বর দর্শনের নিমিত্ত কেউ যদি সর্বপ্রযত্নে ব্রহ্মচর্য পালনে ব্রতী হয় এবং তার ঈশ্বরের অনুগ্রহের ওপর আপন প্রযত্নের সমান ভরসা থাকে তবে তার নিরাশ হইবার কিছু নাই।

বিষয়া বিনিবর্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ।
রসবর্জ্যং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ততে॥ *

অতএব, রামনাম ও রামকৃপাই আত্মার্থীর অন্তিম আশ্রয় ; এই মহা বস্তুর খোঁজ ভারতে ফিরিয়া আমি পাইয়াছি।

৭

সরল জীবন

আরাম-আয়েশের জীবন শুরু করিয়াছিলাম। কিন্তু তা টিকিল না। ফিটফাট আসবাবে ঘর সাজাইয়াছিলাম। তাতে মোহ জন্মিয়াছিল তা নয়। তাই সংসার পাতার সঙ্গে সঙ্গেই খরচ কমাইতে আরম্ভ করিয়াছিলাম। ধোবী খরচ বেশি হইতেছিল। তা ছাড়া ধোবী সময়মত কাপড় দিত না বলিয়া দুই-তিন ডজন শার্টে ও ততগুলি কলর-এও আমার চলিত না। কলর প্রতিদিন বদলাইতাম। দৈনিক না হইলেও শার্ট এক দিন অন্তর বদলাইতাম। তাই দ্বিগুণ খরচ হইত। মনে হইল, এই খরচ অনাবশ্যক। তাই ধোলাইয়ের সরঞ্জাম কিনিলাম। ধোলাই কলা বিষয়ক বই সংগ্রহ করিলাম, পড়িলাম ও কৌশল শিখিয়া লইলাম। পত্নীকেও শিখাইলাম।

* নিরাহারীর বিষয় শান্ত হইয়া যায়, কিন্তু উহার রস শেষ হয় না ; রসও যায় ঈশ্বরের দর্শনলাভে। —গীতা, অধ্যায় ২. শ্লোক ৫৯

কাজ কিছুটা বাড়িয়াছিল, তবে জিনিসটা নূতন ছিল বলিয়া আনন্দও আমরা পাইতাম।

আপন হাতে কলর ধোয়ার প্রথম দিনের কথা জীবনে কোন দিন ভুলিব না। কলর-এ মাড় বেশি দিয়াছিলাম আর ইস্তিরি ছিল কম গরম। তার ওপর, পাছে কলর পুড়িয়া যায় এই ভয়ে ইস্তিরিতে যতটা চাপ দেওয়া দরকার ছিল ততটা চাপ দেই নাই। ফলে, কলর ত কড়া হইয়াছিল কিন্তু তা হইতে কলপ খসিয়া পড়িতেছিল। ওই কলর পরিয়া কোর্টে গিয়াছিলাম, সহ-ব্যারিস্টারদের তামাশার নিশানা হইয়াছিলাম। কিন্তু অমনটা ঠাট্টা গায় না মাখার শক্তি তখনই আমাতে ছিল।

কৈফিয়ত দিয়া বলিয়াছিলাম, 'কলর ধোয়ায় এই আমার হাতে খড়ি, তাই কলপ ঝরে পড়ছে। এতে কোন অসোয়াস্তি বোধ করছি না। তা ছাড়া, এতটা হাসির খোরাক আপনাদের যোগানো গেল, এটা হল বাড়তি লাভ।'

কোন বন্ধু বলেন, 'ধোবা কি মেলে না?'

বলিলাম, 'ধোলাই খরচ এখানে অসম্ভব রকম বেশি। কলর-এর দাম যত, ধোলাই খরচ প্রায় তত। তা দিয়েও ধোবীর ওপর নির্ভর করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। তার চাইতে নিজ হাতে ধুয়ে নেওয়া সুবিধার মনে হচ্ছে।'

কিন্তু স্বাবলম্বনের মাধুর্য বন্ধুদের আমি বুঝাইতে পারি নাই। বলা যাইতে পারে যে, ধোলাইয়ের চলনসই কলা পরে আমি আয়ত্ত করিয়া লইয়াছিলাম। ধোবীর ধোলাই অপেক্ষা আমার ধোলাই মোটেই খারাপ হইত না। বাড়ীর ধোয়া কলর ধোবার ধোয়া কলর-এর মত কড়া ও চকচকে হইত।

গোখেল দক্ষিণ আফ্রিকায় যখন আসিয়াছিলেন, সঙ্গে স্বর্গীয় মহাদেব গোবিন্দ রানাডের দেওয়া চাদর আনিয়াছিলেন। চাদরখানি বড়ই যত্নে রাখিতেন। বিশেষ বিশেষ উপলক্ষ্যেই কেবল তা ব্যবহার করিতেন। তাঁর সম্মানার্থে ভারতীয়েরা জোহানিসবর্গে এক ভোজের আয়োজন করিয়াছিল। ওটা বিশেষ উপলক্ষ্য ছিল। ঠিক করিয়াছিলেন, ওই উড়ানী ধারণ করিয়া ভোজে যাইবেন। কিন্তু দেখা গেল তা কোঁচকানো, ইস্তিরি করা প্রয়োজন। ধোবাকে দিয়া ইস্তিরি করানো যাইত কিন্তু সময়মত পাওয়া যাইবে কিনা এই নিশ্চয়তা ছিল না। বলেন ত উড়ানীটা আমি ইস্তিরি করিয়া দিতে

পারি বলিয়া তাঁর অনুমতি চাহিলাম এবং বলিলাম যে তাতে আমার কুশলতারও পরীক্ষা হইবে।

গোখেল বলিলেন, 'আপনার ওকালতির ওপর আমার বিশ্বাস আছে। কিন্তু এই উড়ানীতে আপনার ধোবী বিদ্যার পরীক্ষা চালাতে দিতে আমি প্রস্তুত নই। দাগ লাগিয়ে দেন ত কী হবে? জানেন না, এটা আমার কত বড় সম্পদ!' এই বলিয়া অতীব উল্লাসে উপহারের ইতিহাস আমাকে শুনাইয়াছিলেন। তবুও আমি অনুনয় করিয়া বলি যে দাগ না লাগে সেদিকে আমি সতর্ক হইব। অনুমতি পাই। আর তাঁর সার্টিফিকেটও! এর পর জগৎ আমায় সার্টিফিকেট দিলেই বা কি আর না দিলেই বা কি?

ধোবার মুখ তাকাইয়া থাকা হইতে রেহাই পাওয়ার মত নাপিতের কাছে কাকুতি করা হইতেও বাঁচার পালা আসে। বিলাতে যারা যায় তারা সকলেই নিজ হাতে কামায়। কিন্তু কেউ নিজ হাতে চুল কাটিতে শিখিয়াছে বলিয়া জানিতাম না। প্রেটোরিয়ায় তা-ও আমায় শিখিতে হয়। এক ইংরেজ নাপিতের দোকানে যাই। চুল ত সে কাটেই নাই, অধিকন্তু কিছু ফাউ দেয়—গালমন্দ। বাজারে যাই। চুল কাটার ক্লিপ কিনি। সামনের চুল ত যা-হোক কোন রকম হইল; মুশকিলে পড়িলাম পিছনের চুল লইয়া। পিছনটা হইল একেবারে যা-তা। কোর্টে হাসির রোল উঠিল।

'চুলের এ দশা কেন! ইঁদুর লেগেছিল বুঝি?'

'না, কালোর মাথা গোরা ছোঁবে তা কি হয়? তাই নিজ হাতেই কাটতে হয়েছে, যেমনই হোক। আমার কাছে তা-ই ভাল।'

আমার জবাবে তারা অবাক হয় নাই। ভাবিয়া দেখিলে, ওই নাপিতেরও কিছু দোষ ছিল না। কালো আদমীর চুল কাটিত ত তার রুজি খতম হইত। উচ্চ বর্ণের হিন্দু আমরা নাপিতদের কি অস্পৃশ্যদের চুল কাটিতে দেই? এর বদলী দক্ষিণ আফ্রিকায় এক বার নয় বহু বার আমার মিলিয়াছে। এটা আমাদের দোষেরই পরিণাম এ কথা মনে হইতেই আমার ক্ষোভ দূর হইয়া যায়।

সাদাসিধাপনা ও স্বাবলম্বন পরে যে কতদূর পর্যন্ত গিয়াছিল সে কথা যথাস্থানে বলিব। মনে তার বীজ আগে হইতেই লুকানো ছিল। অঙ্কুর উদ্গমের জন্য দরকার ছিল কেবল জল সিঞ্চনের। সেই সিঞ্চন আপনা আপনি আসিয়া গিয়াছিল।

১০

বোঅর যুদ্ধ

সন ১৮৯৭ হইতে ১৮৯৯ এই কয় বছরের জীবনের অনেক কথা, অনেক অনুভব ছাড়িয়া সোজা বোঅর যুদ্ধের কথায় আসিয়া যাইতেছি।

যুদ্ধের ঘোষণা হইয়াছে। আমার অন্তরের সবটা টান ছিল বোঅরদের ওপর। তবুও আমার মনে হইয়াছিল যে ওই প্রশ্নে নিজের দৃষ্টিমত কাজ করার অধিকার আজও আমার জন্মে নাই। ওই বিষয়ে আমার মনে তখন যে আলোড়ন চলিয়াছিল তার সূক্ষ্ম বিচার-বিশ্লেষণ দক্ষিণ আফ্রিকার সত্যাগ্রহের ইতিহাসে আমি করিয়াছি। তাই তার পুনরুল্লেখ এখানে করিব না। তা জানিতে যাঁরা চান তাঁদের ওই বই পড়িতে বলি। এখানে এ কথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, আমার রাজভক্তি এই যুদ্ধে আমাকে ব্রিটিশের পক্ষে টানিয়াছিল। আমার মনে হইয়াছিল যে ব্রিটিশ প্রজারূপে যদি আমি আমার অধিকার দাবি করি তবে ব্রিটিশ প্রজা হিসাবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের রক্ষার নিমিত্ত আমার কাজ করা কর্তব্য। তখন আমার বিশ্বাস ছিল যে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিতরে থাকিয়া তার মারফতেই ভারত পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করিবে। তাই যত সঙ্গী জুটাইতে পারিয়াছিলাম তাদের দিয়া আহতদের সেবার জন্য এক দল গঠন করিয়াছিলাম এবং অনেক কষ্টে সরকারকে এই দলের সেবা গ্রহণ করিতে রাজী করাইয়াছিলাম।

এরা ভীরু, ঝুঁকিতে যাইতে চায় না, নিজেদের স্বার্থ ছাড়া কিছু বোঝে না, এতকাল ভারতীয়দের সম্বন্ধে সাধারণ ইংরেজের এইরূপ ধারণা ছিল। অতএব অনেক ইংরেজ বন্ধু এই প্রশ্নে আমাকে উৎসাহ না দিয়া উল্টা আমার উৎসাহ ভঙ্গ করিয়াছিলেন। একমাত্র ডাক্তার বুথের কাছ হইতে খুব উৎসাহ পাইয়াছিলাম। আহত সৈনিকদের সেবা-শুশ্রূষা করার শিক্ষা তিনি আমাদের দেন। যোগ্যতার ডাক্তারী সার্টিফিকেট আমরা পাই। মি. ল্যাটন ও স্বর্গত এসকম্ব্‌ আমাদের প্রস্তাবের পক্ষে ছিলেন। অবশেষে যুদ্ধে সেবাকার্য করার অনুমতি চাহিয়া আবেদন করা হয়। আমাদের আবেদনের উত্তরে সরকার ধন্যবাদ জানায় কিন্তু বলে, এই মুহূর্তে সেবার প্রয়োজন নাই।

ওই না-জবাবে আমি নিরস্ত হইলাম না। ডাক্তার বুথের শরণ লইলাম।

তাঁকে সঙ্গে লইয়া বিশপ-এর সহিত দেখা করিলাম। আমাদের দলে অনেক খ্রীস্টান ভারতীয় ছিল। আমার প্রস্তাব তাঁর খুব ভাল লাগে। তিনি কথা দেন, আমাদের এই বিষয়ে সহায়তা করিবেন।

ওদিকে সময়ও আমাদের অনুকূল হইল। সরকার যতটা ধরিয়া লইয়াছিল বোঅররা তা অপেক্ষা অনেক বেশি সংগঠনের, দৃঢ়তার ও বীরত্বের পরিচয় দেয়। ফলে শেষটায় আমাদের সেবা সরকার চায়।

আমাদের সেবাদলে আমরা ১,১০০ জন ছিলাম। উহার মধ্যে দলপতির সংখ্যা ছিল ৪০। তিন শত স্বাধীন ভারতীয় ছিল। অন্য সব ছিল গিরমীটিয়া। ডা. বুথও আমাদের সঙ্গে ছিলেন। আমাদের দল ভাল কাজ করিয়াছিল। যদিও আমাদের কাজ গোলা-বারুদের নিশানার বাইরে ছিল ও আমরা 'রেড ক্রস'-এর রক্ষণে ছিলাম তথাপি সংকটকালে গোলা-বারুদের ভিতর কাজ করার সুযোগও আমরা পাইয়াছিলাম। বিপদ হইতে দূরে থাকিতে আমরা চাই নাই, সরকারই সে ব্যবস্থা করিয়াছিল। কিন্তু স্পিয়াংকোপের হারের পরে অবস্থা বদলিয়া যায়। তাই জেনারেল বুলর এই মর্মে অনুরোধ জানান—আপনারা বিপদের ক্ষেত্রে যাইতে বাধ্য নহেন, তা সত্ত্বেও বিপদ মাথায় লইয়া যুদ্ধক্ষেত্র হইতে সৈনিক ও অফিসারদের ডুলিতে তুলিয়া অপসারণ করিতে যদি আপনারা আগাইয়া আসেন তবে সরকার কৃতজ্ঞ থাকিবে। বিপদ মাথায় লইতে ত আমরা তৈরিই ছিলাম। আর তাই স্পিয়াংকোপের যুদ্ধের পরে আমরা গোলা-বারুদের সীমার ভিতরে কাজ করার সুযোগ পাই। এই সময়ে আহতদের বহন করিয়া দিনে কুড়ি-পঁচিশ মাইল আমাদের চলিতে হইত। আহতদের মধ্যে জেনারেল উডগেটের মত যোদ্ধাকে বহন করার ভাগ্য আমাদের হইয়াছিল।

ছয় সপ্তাহ পরে আমাদের বিদায় দেওয়া হয়। স্পিয়াংকোপ ও ভালক্রাঞ্জ-এর পরাজয়ের পরে বোঅরদের হাত হইতে অবরুদ্ধ লেডীস্মিথ ইত্যাদি জায়গা তড়িঘড়ি উদ্ধার করার ভাবনা ত্যাগ করিয়া ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষ হইতে যে পর্যন্ত সৈনিক সহায়রা আসিয়া না পৌঁছে ততদিন ব্রিটিশ সেনাপতি ঢিমাগতিতে যুদ্ধ চালানো স্থির করেন।

আমাদের সামান্য কাজের খুব সুখ্যাতি তখন হইয়াছিল। তার ফলে ভারতীয়দের প্রতিষ্ঠা বাড়িয়া গিয়াছিল। 'শত হলেও ভারতীয়রা সাম্রাজ্যেরই ত সন্তান' এই ধুয়া সংবলিত নানা গীতিকা সংবাদপত্রে প্রকাশিত

হইয়াছিল। জেনারেল বুলর তাঁর খরীতায় (ডিসপ্যাচে) আমাদের দলের কাজের সুখ্যাতি করিয়াছিলেন। দলপতিরা সমরপদক লাভ করিয়াছিল।

ভারতীয়রা অধিকতর সংগঠিত হইল। গিরমীটিয়া ভারতীয়দের সহিত সম্পর্ক আরও ব্যাপক আরও ঘনিষ্ঠ হইল। তাদের মধ্যে অধিক জাগৃতি আসিল আর হিন্দু মুসলমান খ্রীস্টান, মাদ্রাজী গুজরাটী সিন্ধী সকলেই যে ভারতীয় এই ভাব অধিক জমাট হইল। সকলেরই বিশ্বাস জন্মিল যে এবার ভারতীয়দের দুর্দশা নিশ্চয় দূর হইবে। গোরাদের ব্যবহারে তখন পরিবর্তন স্পষ্ট লক্ষ্য করা গিয়াছিল।

যুদ্ধের সময়ে গোরাদের সহিত মধুর সম্পর্ক গড়িয়া উঠিয়াছিল। হাজারো 'টমির' সঙ্গে একত্র আমরা থাকিতাম। আমাদের সহিত তারা বন্ধুর ন্যায় ব্যবহার করিত এবং তাদের সেবার জন্য গিয়াছিলাম বলিয়া তারা আমাদের কাছে কৃতজ্ঞ ছিল।

দুঃখের সময় মনুষ্যস্বভাব আপন গৌরবে জলজল করিয়া ওঠে। এমন একটি ঘটনার কথা উল্লেখ না করিয়া থাকা যাইতেছে না। চীবলী ছাউনীর দিকে আমরা মার্চ করিয়া যাইতেছিলাম। এই ক্ষেত্রেই লর্ড রবার্টস্-এর পুত্র লেফট্‌নান্ট রবার্টস্ মরণাঘাত পাইয়াছিলেন। তাঁর শব বহন করার গৌরব আমাদের দল লাভ করিয়াছিল। কুচকাওয়াজ চলিতেছিল, দিনটা ভয়ানক গরম ছিল—সকলেই পিপাসায় কাতর। পথে একটা ছোট ঝরনা মিলে। কারা আগে জল পান করিবে? আমার মনে হয়, টমিরা আগে পান করুক, পরে আমরা পান করিব। কিন্তু আমাদের দেখিয়া টমিরা সরিয়া গিয়া প্রথমে আমাদের জল খাইতে বলে, আগ্রহ করিতে থাকে। এভাবে দুইয়ের মধ্যে মধুর 'তোমরা আগে, আমরা পিছে'-এর তকরার চলে।

১১

স্বাস্থ্য-ব্যবস্থার উন্নতি ও দুর্ভিক্ষত্রাণ

সমাজের কোন অঙ্গ নিশ্চেষ্ট থাকিবে ইহা আমার কাছে চিরদিন অসহ্য। আমাদের (দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়) সমাজের দোষ ঢাকিতে বা দোষের সাফাই গাইতে অথবা সমাজকে তার দোষ দূর করিতে না বলিয়া কেবল তার দাবির কথা বলিতে কোন দিনও আমার মন সায় দেয় নাই। তাই

দক্ষিণ-আফ্রিকাবাসী ভারতীয়দের ওপর চাপানো দোষ (তার কিছুটা সত্যও ছিল) হইতে তাদিগকে মুক্ত করার কাজ নাতালে বসার সঙ্গে সঙ্গেই আমি আরম্ভ করিয়াছিলাম। হামেশা বলা হইত: ভারতীয়রা নিজেদের ঘরদোর আশপাশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখে না, বড় নোংরা থাকে। এই দোষ কেউ দিতে না পারে এই জন্য ভারতীয় সমাজের মুখ্য ব্যক্তিরা আগেই মনোযোগী হইয়াছিলেন। কিন্তু ঘরে ঘরে যাওয়ার কাজ শুরু হয় ডারবানে প্লেগ লাগার ভয় দেখা দিলে। এই কাজে ম্যুনিসিপালিটীর কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ও সহযোগও মিলিয়াছিল। আমাদের সহায়তার কারণে ম্যুনিসিপালিটীর কাজ সহজ হইয়াছিল। আর অন্য দিকে ভারতীয়দের হয়রানি কমিয়াছিল। কেন না, মড়ক ইত্যাদি আপদ দেখা দিলে ম্যুনিসি-পালিটীর কর্তৃপক্ষ সাধারণতঃ ঘাবড়াইয়া যায় আর প্রতিকারের জন্য যতটা আবশ্যক তাহা অপেক্ষা অধিক কড়াকড়ি করিয়া বসে। যারা তাদের কু-নজরে পড়ে তাদের ওপর অকথ্য জুলুম চলে। সাফ-সাফাইর দিকে নিজেরা মনোযোগী হইয়াছিল বলিয়া সমাজ নির্যাতন হইতে বাঁচিয়া গিয়াছিল।

কটু অভিজ্ঞতাও আমার কতকটা না হইয়াছিল তা নয়। দেখিতে পাইয়াছিলাম যে সরকারের নিকট হইতে অধিকার আদায়ের প্রশ্নে সমাজের কাছ হইতে সহজে যে সহায়তা পাওয়া গিয়াছিল, সমাজকে তার নিজ কর্তব্য করিতে বলিয়া তত সহজে তার কাছ হইতে সেই সহায়তা পাওয়া যায় নাই। কোথাও কোথাও অপমান ভোগ করিতে হইয়াছিল, আর কোথাও কোথাও ভদ্র উপেক্ষা। নোংরাপনা ত্যাগ করার কষ্ট পোয়াইতে তাদের বিরক্তির অবধি ছিল না। সে স্থলে ওই কাজের জন্য তাদের কাছ হইতে পয়সা পাওয়ার আশা দুরাশা ছিল। অসীম ধৈর্য বিনা লোককে দিয়া কোন কাজ করানো যায় না এই শিক্ষা ভালরূপেই আমার হইয়াছিল। সংস্কারের গরজ ত সংস্কারকের নিজের। সংস্কারক যে সমাজকে শুধরাইতে যাইবে সেই সমাজ তার বিরোধ করিবে না, তাকে গালি দিবে না, তাকে শূলে চড়াইতে যাইবে না ত কি—এর জন্য তার তৈরিই থাকিতে হইবে। সংস্কারকের চোখে যা ভাল কাজ সমাজের চোখে তা মন্দ কাজ মনে হইবে বই কি? আর কুকাজ যদিই বা মনে না করে উহার প্রতি কেনইবা উদাসীন না হইবে?

এই আন্দোলনের ফলে ঘরদোর যে সাফ-সুতরা রাখা আবশ্যক এই

কথা ভারতীয়রা মোটামুটি মানিয়া লয়। কর্তৃপক্ষের চোখে আমার মর্যাদা বাড়ে। তারা বুঝিতে পায় যে কেবল অভিযোগ করা বা অধিকার দাবি করাই আমার কাজ নয়, পরন্তু অভিযোগ বা দাবি করার বিষয়ে আমি যেমন দৃঢ় নিজেদের দোষত্রুটী দূর করার ব্যাপারেও তেমন দৃঢ়।

কিন্তু অন্য এক দিকে সমাজের বোধ জাগ্রত করা বাকী ছিল—অবস্থা-বিশেষে ভারতের প্রতি যে উপনিবেশী ভারতীয়দের করণীয় রহিয়াছে আর তা যে করা উচিত সেই বোধ। ভারতবর্ষ গরীব। উপনিবেশীরা পয়সা কামাইবার জন্য বিদেশে ঘরদোর বাঁধিয়াছে। এই উপার্জনের কিছুটা অংশ বিপদের সময় ভারতবর্ষের পাওয়া চাই। ১৮৯৭ সনের দুর্ভিক্ষে দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়রা এই কর্তব্য পালন করিয়াছিল। ১৮৯৯ সনের দুর্ভিক্ষ আরও ভীষণ ছিল। প্রথম বারে যে টাকা সংগ্রহ হইয়াছিল দ্বিতীয় বারে তাহা অপেক্ষা অনেক বেশি অর্থ পাওয়া গিয়াছিল। ইংরেজদের নিকটও আমরা অর্থের জন্য আবেদন করিয়াছিলাম আর তারা সেই আবেদনে ভাল সাড়া দিয়াছিল। গিরমীটিয়া ভারতীয়েরাও সাধ্যমত এই ফণ্ডে সাহায্য করিয়াছিল। ওই দুই দুর্ভিক্ষের সময়ে যে রেওয়াজ চালু হইয়াছিল আজ পর্যন্ত তা বজায় আছে। আর দেখা যায় যে ভারতে যখনই ব্যাপক দুঃখ দেখা দিয়াছে তখনই দক্ষিণ-আফ্রিকাবাসী ভারতীয়েরা ভারতে বড় রকম সাহায্য পাঠাইয়াছে।

দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতবাসীদের সেবা করিতে করিতে এইরূপে সত্যের নব নব দর্শন নিত্য আমার হইতেছিল। সত্য বিশাল বৃক্ষ, যতই তার সেবা করা যায় ততই দিব্য ফল তাতে ফলিবে। সত্যের যত গভীরে ডোবা যায় তত অমৃত রতন মিলিবে—সেবার পথ তত খুলিবে।

১২

দেশগমন

যুদ্ধের কাজ হইতে মুক্ত হওয়ার পরে আমার মনে হয়, আমার কাজ এখন আর দক্ষিণ আফ্রিকায় নয়, ভারতে। সেখানে কাজ করার ছিল না তা নয়, কিন্তু আমার ভয় হইয়াছিল যে হয়ত টাকা রোজগার করাই আমার মুখ্য কর্ম হইয়া দাঁড়াইবে।

দেশ হইতে বন্ধুরা বারবার ডাকিতেছিলেন। আর আমারও মনে হইয়াছিল দেশে গেলে অধিক সেবা দিতে পারিব। নাতালে মি. খাঁ ও মনসুখলাল নাজর ত ছিলেনই। সহকর্মীদের কাছে মুক্তি চাহিলাম। অনেক আপত্তির পরে, এক বছর কাল মধ্যে ভারতীয়েরা যদি দক্ষিণ আফ্রিকায় আমার ফিরিয়া যাওয়া আবশ্যক মনে করে ত আমি ফিরিয়া যাইব এই সর্তে বন্ধুরা আমাকে মুক্তি দেন। সর্তটা আমার কঠিন মনে হইয়াছিল, কিন্তু আমি যে প্রেমডোরে বাঁধা পড়িয়াছিলাম।

কাচে রে তাঁতণে মনে হরজীয়ে বাঁধী
জেম তাণে তেম তেমনী রে
মনে লাগী কটারী প্রেমণী। *

মীরাবাঈ গাহিয়াছেন। আমার দশা কমবেশি অমনটাই ছিল, সাধ্য কি ওই প্রেমডোর ছিঁড়ি। বন্ধুদের অনুরোধ উপেক্ষা করার উপায় ছিল না। তাঁদের কথায় সম্মত হইলাম। ছুটি পাইলাম।

এই সময়ে নাতালের সহিতই আমার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ ছিল। নাতালের ভারতীয়েরা আমার ওপর প্রেমামৃত বর্ষণ করেন। এখানে ওখানে সব জায়গায় বিদায়ী সভায় আয়োজন করেন ও মানপত্র দেন। কোন কোন সভায় মূল্যবান উপহারও তাঁরা দিয়াছিলেন।

১৮৯৬ সনে দেশে ফিরিবার কালেও নানা উপহার পাইয়াছিলাম কিন্তু এবারকার উপহারে ও সভার দৃশ্যে আমি অভিভূত হইয়াছিলাম। উপহারে সোনাচাঁদির জিনিস ত ছিলই, হীরার বস্তুও ছিল।

মনে প্রশ্ন জাগিল—এই সকল বস্তু গ্রহণ করার আমার অধিকার কোথায়? এই সব উপহার লই ত পয়সা না লইয়া সমাজের সেবা করিয়াছি মনে করা যাইবে কি? উপহারের গুটি কয়েকমাত্র মক্কেলেরা দিয়াছিল; বাকী সবই পাইয়াছিলাম দশের কাজের পুরস্কার স্বরূপে। তা ছাড়া, মক্কেল ও সহকর্মীতে ত আমি কোন ব্যবধান করিতাম না। প্রধান প্রধান মক্কেলেরা সকলেই সার্বজনিক কাজে আমার সহচর ছিলেন।

উপহারের একটি ছিল আমার পত্নী কস্তুরবার জন্য—পঞ্চাশ গিনি মূল্যের হার। কিন্তু ওটিও ত আমার সেবার বাবতই মিলিয়াছিল। অতএব অন্য উপহার হইতে তাহা আলাদা করা যাইতে পারে কি?

* হরির প্রেমডোরে আমি বাঁধা পড়েছি। সে যেদিকে টানে সেদিকে আমি ফিরি।

যে সন্ধ্যায় বেশির ভাগ উপহার পাইয়াছিলাম সেই রাতটা আমার অনিদ্রায় শোয়ার ঘরে পায়চারি করিয়া কাটিয়াছিল। তবুও কি যে করি তা খুঁজিয়া পাইলাম না। শত শত টাকার উপহার ছাড়াও কষ্টের ছিল আর রাখাও ছিল আরও অধিক কষ্টের।

মন বলিতেছিল—উপহার না হয় রাখিলে, আর উহার কোন ক্রিয়াও তোমার মনের ওপর হইল না। কিন্তু তোমার স্ত্রীপুত্রের ওপর উহার ক্রিয়া কি হইবে? তাদের না সেবার তালিম দিতেছ? সেবার পুরস্কার লইতে নাই এই কথা না তাদের অনুক্ষণ বুঝাইয়াছ! তোমার নিজের ঘরে না দামী গয়নার স্থান নাই? চালচলন না তুমি দিন দিন সাদাসিধা করিতেছ? এই অবস্থায় সোনার ঘড়ি তোমার ঘরে কে ব্যবহার করিবে! সোনার চেন ও হীরার আংটি কে পরিবে? সত্যই ত অন্যকেও ত সে সময়ে আমি গহনা-পত্র ত্যাগ করিতে বলিতাম। তবে এই সব গহনার ও জহরতের কি করা যায়?

এই সব বস্তু আমার রাখা উচিত নয় এই নির্ণয় করিলাম। পারসী রুস্তমজী প্রভৃতিকে এই সব গহনার অছি বানাইয়া তাঁদের নামে যে দলিল লিখিয়া দেওয়া দরকার তার মুসাবিদা করিলাম ও স্থির করিলাম সকালবেলা স্ত্রীপুত্রের কাছে সব কথা বলিয়া মনের বোঝা হাল্কা করিব।

জানিতাম স্ত্রীকে বোঝানো কঠিন হইবে। ছেলেদের নিজমতে আনিতে বেগ পাইতে হইবে না এই বিশ্বাস আমার ছিল। ঠিক করিলাম, ছেলেদের আমার উকিল ধরিব।

ছেলেরা সহজেই বুঝিল ও বলিল, 'এই সবে আমাদের দরকার নেই। এই সব ফিরিয়ে দেওয়াই আমাদের কর্তব্য। কখনও যদি এই রকম বস্তুর ইচ্ছা হয় ত নিজেরা কি তা যোগাড় করতে পারব না?'

খুশী হইলাম। 'ভাল, তোমাদের মাকে এ কথা তোমরা বুঝাবে ত?'—জিজ্ঞাসা করিলাম।

'নিশ্চয়, এ ত আমাদের কর্তব্য। এই সব গয়না পরার মার দরকার কি! আমাদের জন্যই না এ সব রাখতে চান। এ সবে আমাদের দরকার নেই। তবে আর তিনি জেদ করবেন কেন?'

কিন্তু যতটা ভাবা গিয়াছিল কাজ তাহা অপেক্ষা শক্ত ছিল।

স্ত্রী বলিল, 'তোমার দরকার না থাকতে পারে, তোমার ছেলেদেরও

দরকার না থাকতে পারে। ছেলেদের যে রাস্তায় নেবে তারা সে রাস্তায় যাবে। ভাল, আমায় না হয় পরতে না দিলে, কিন্তু বৌদের? তাদের কাজে ত লাগবে। আর কে জানে কাল কি হবে! এত ভালবাসার জিনিস ফেরত দেওয়া যাবে না'—এই বাগ্‌ধারার সহিত তার অশ্রুধারা বহিল। ছেলেরা টলিল না। আমি ত শক্ত ছিলামই।

নরম স্বরে বলিলাম, 'ছেলেদের বিয়ে ত হতে দাও। ছেলেদের কি আমরা অল্প বয়সে বিয়ে দেব! বড় হয়ে যেমন মন চায় করবে। আর আমরা কি গয়না-শৌখীন বৌ আনতে যাচ্ছি! আর, ধর, কোন গয়না গড়াতেই হয় ত আমি ত আছিই।'

'তোমায় আমি জানি। আমার গয়না কে নিয়েছে? তুমিই না? যা আমায় পরতে দাওনি, যার জন্যে গঞ্জনা আমার ভুগতে হয়েছে, সেই 'তুমি' তা আমার বৌদের এনে দেবে! এখন থেকেই ছেলেদের তুমি বৈরাগী বানাচ্ছ। এই গয়না ফেরত দেওয়া হবে না। আর আমার হারের ওপর তোমার অধিকার কি?'

'কিন্তু এই হার তোমার সেবার বাবত কি আমার সেবার বাবত মিলেছে?'—জিজ্ঞাসা করিলাম।

'উত্তম, মানছি। তোমার সেবা মানে আমার সেবাও নয় কি? রাত নেই দিন নেই আমাকে দিয়ে যে সেবা করিয়ে নিয়েছ সে সেবা কি এতে ধরা হবে না? আমাকে কাঁদিয়ে যে-কাউকে তুমি ঘরে রেখেছ আর তাদের সেবা করিয়েছ, তার কি?'

এই সব বাণ চোখা ছিল। কয়েকটা বিঁধিয়াও ছিল খুব। কিন্তু তবুও গহনা ফেরত দেওয়ার সংকল্পে আমি অটল ছিলাম। যেন তেন প্রকারে তাকে রাজী করাইয়াছিলাম। ১৮৯৬ ও ১৯০১ সনে পাওয়া উপহার ফেরত দেই। ট্রাস্ট গঠন করা হয়, এবং আমার ইচ্ছা অথবা অছিদের ইচ্ছা মত উহা দশের কাজে ব্যয় করা হইবে এই শর্তে ব্যাঙ্কে জমা রাখা হয়।

দশের কাজের জন্য পয়সার দরকার হইলে অনেক বার এই ট্রাস্টের ওপর আমার নজর পড়িয়াছে, কিন্তু তা আমি বেচিতে দেই নাই, চাঁদা আদায় করিয়া কাজ চালাইয়া লইয়াছি। আজও সেই ফণ্ড বা কোষ আছে, আপদে-বিপদে তা কাজে আসে ও দিন দিন আয়তনে বাড়িতেছে।

এই কার্যের জন্য কোন দিনও আমার আপসোস হয় নাই। আর সময়ে

উহা যে ভালই হইয়াছিল সে কথা কস্তুরবাও বুঝিতে পায়। ইহাতে অনেক প্রলোভনের হাত হইতে আমরা বাঁচিয়া গিয়াছি।

গণসেবকের নিজের জন্য কোন উপহার গ্রহণ করা উচিত নয় ইহা আমার সুদৃঢ় অভিমত।

১৩

দেশে

দেশে রওনা হইলাম। রাস্তায় মরিশসে জাহাজ বেশ কিছু দিন ছিল। মরিশসে নামিয়াছিলাম। ওখানকার অবস্থা ভালমত জানিয়া লইয়াছিলাম। উপনিবেশের গবর্নর সর চার্লস ব্রুস-এর অতিথিরূপে রাজভবনে এক রাত ছিলাম।

ভারতে পৌঁছানোর পরে দেশের নানা জায়গায় কিছুদিন ঘুরিয়া বেড়াই। ১৯০১ সনের কথা বলিতেছি। মিঃ (পরে সার) দীনশা ওয়াচার সভাপতিত্বে কংগ্রেস সেই বছর কলিকাতায় হয়। বলা বাহুল্য, আমি কংগ্রেসে গিয়াছিলাম। ওই আমার কংগ্রেসের প্রথম অভিজ্ঞতা।

যে গাড়ীতে সার ফিরোজশা মেহতা বোম্বাই হইতে রওনা হইয়াছিলেন সেই গাড়ীতেই আমি উঠিয়াছিলাম কারণ দক্ষিণ আফ্রিকার বিষয়ে গাড়ীতে তাঁর সহিত আমার কথা বলার ছিল। আমি জানিতাম তিনি বাদশাহের মত চলেন-ফিরেন। নিজের জন্য গোটা একটা সেলুন তিনি ভাড়া করিয়াছিলেন। কোন এক স্টেশন হইতে অন্য এক স্টেশন পর্যন্ত তাঁর সেলুনে গিয়া কথা বলার অনুমতি আমি পাইয়াছিলাম। নির্দিষ্ট স্টেশনে তাঁর সেলুনে গিয়া দেখা করিলাম। তাঁর সঙ্গে মি· দীনশা ওয়াচা ও মি· (এখন সার) চীমনলাল শীতলবাদ ছিলেন। আমাকে দেখিয়াই সার ফিরোজশা বলেন, 'গান্ধী, মনে হচ্ছে আপনার জন্য কিছু করা যাবে না। যে প্রস্তাব পাস করতে বলবেন তা অবশ্য পাশ করিয়ে দেব। কিন্তু নিজের দেশেই বা আমাদের কি অধিকার আছে? আমার মনে হয়, নিজের দেশে যতদিন না নিজেদের হাতে ক্ষমতা পাচ্ছি ততদিন কোন উপনিবেশে আমাদের অবস্থা ভাল হবে না।'

আমি অবাক হইলাম। মনে হইল মি. চীমনলাল তাঁর কথায় সায় দিলেন ; মি. ওয়াচা করুণার দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাইলেন।

আমার কথা বুঝাইয়া বলিবার চেষ্টা একটু করিলাম, কিন্তু বোম্বাইয়ের তাজহীন বাদশাহকে আমার মত লোক কি বুঝাইবে? কংগ্রেসে প্রস্তাব উপস্থিত করিতে পাইব এইটুকুতেই সন্তোষ মানিলাম।

'প্রস্তাব লেখা হলে আমাকে দেখাবেন ত', আমাকে উৎসাহ দেওয়ার জন্যই মি. দীনশা ওয়াচা বলিলেন।

কলিকাতায় গাড়ী পৌঁছিল। অভ্যর্থনা সমিতির লোকেরা মহা ঘটা করিয়া সভাপতি ও নেতাদের লইয়া গেল। কোন স্বেচ্ছাসেবককে জিজ্ঞাসা করিলাম আমি কোথায় উঠিব। সে আমাকে রিপন কলেজে লইয়া যায়। অনেক প্রতিনিধির ব্যবস্থা সেখানে করা হইয়াছিল। ভাগ্যক্রমে যেখানে লোকমান্য তিলক ছিলেন সেই খণ্ডে আমি থাকিতে পাই। মনে পড়ে, আমার একদিন পরে তিনি আসিয়াছিলেন।

যেখানে লোকমান্য সেখানে ছোটখাটো দরবার বসিবে না ত কি! চিত্রকর হইতাম ত তক্তপোষের ওপরে বসা তাঁর সেই সময়কার ছবি ঠিকঠিক আঁকিয়া দিতে পারিতাম এমনই স্পষ্ট চিত্র সেই জায়গার ও সেই বৈঠকের আমার চোখে এখনও ভাসিতেছে। কত যে লোক তাঁর সঙ্গে দেখা করিতে আসিত! তাঁদের এক জনের, 'অমৃতবাজার পত্রিকার' মতিবাবুর নাম আমার মনে আছে। এই দুই জনের উচ্চ হাসির ও শাসকদের অন্যায় কর্মের সমালোচনার কথা কখনও ভুলিবার নয়।

কিন্তু এই ক্যাম্পের ব্যবস্থাপনার একটু বিশদ আলোচনা না করিলে নয়। স্বেচ্ছাসেবকদের একের অন্যের সহিত ঠোকাঠুকি লাগিয়াই ছিল। কাউকে কোন কিছু করিতে বলিলে সে নিজে তা না করিয়া আর কাউকে করিতে বলিত। আর দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিত তৃতীয়কে। বেচারা প্রতিনিধিদের অবস্থা হইয়াছিল শোচনীয়।

কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবকের সঙ্গে আমার খাতির জমিয়াছিল। দক্ষিণ আফ্রিকার কাহিনী তাদের অল্পবিস্তর শুনাইয়াছিলাম। তাতে তারা একটু লজ্জা পায়। সেবার মর্ম তাদের বুঝাইতে চেষ্টা করি। একটু বোঝে। কিন্তু সেবাবৃত্তি চট্‌ করিয়া গজায় না। ইচ্ছা থাকিলেই হয় না, অভ্যাসও থাকা চাই। এই সব সরলহৃদয় স্বেচ্ছাসেবকদের ইচ্ছার অভাব

ছিল না, কিন্তু অভ্যাস আদৌ ছিল না। কংগ্রেস বছরে তিন দিন বসিত। তার পরে ঘুমাইয়া পড়িত। বছরে তিন দিনের তামাশা হইতে কি আর মিলিতে পারে? আর প্রতিনিধিরাও তেমনি ছিল। তাদেরও ছিল তিন দিনেরই শিক্ষা। আপন হাতে তারা কোন কিছু করিত না। সব বিষয়েই হুকুম—স্বেচ্ছাসেরক, এটা দাও, ওটা আনো। ফরমাস তাদের মুখে লাগিয়াই থাকিত।

এখানেও অশুচি হইতে বাঁচার, অস্পৃশ্যদের হইতে আত্মরক্ষার প্রযত্ন দেখিতে পাইয়াছিলাম। দ্রবিড়ী (তামিল) পাকশাল একেবারে নিরালা ছিল। পাছে 'দৃষ্টিদোষ' ঘটে, অশুচির পরশ লাগে তাই কলেজ-কম্পাউণ্ডে তাদের জন্য চাটাইয়ের রসুই-ঘর তৈরি করা হইয়াছিল। দম বন্ধ হওয়ার মত ঘন ধোঁয়ায় ভরতি ওই পাকশালায় আহার, আচমন ইত্যাদি সকল ক্রিয়া তারা সমাপন করিত। পাকশাল না বলিয়া হাওয়া-চলাচল রহিত সিন্দুকও তাকে বলা চলিত। এই কি বর্ণধর্ম না তার ভেংচানি?—এই প্রশ্ন মনে ধাক্কা দিয়াছিল। কংগ্রেসে যারা প্রতিনিধি হইয়া আসিয়াছিল একে অন্যের বেলায় এতটা ছুঁতাছুঁত যদি তারা মানিয়া চলে তবে যাদের তারা প্রতিনিধি ছিল সেই জনসাধারণের একে অন্যের প্রশ্নে কতটা ছুঁতমার্গী হওয়া সম্ভব এই ত্রৈরাশিকের কথা ভাবিয়া আমার মন দমিয়া গিয়াছিল।

যত্রতত্র নোংরা। বাইরে তাকাইতাম ত দেখিতাম এখানে ওখানে জল জমিয়া রহিয়াছে। পায়খানা প্রয়োজনের তুলনায় কম ছিল। পায়খানার সেই চিত্র ও দুর্গন্ধের কথা মনে হইলে এখনও গা ঘিন ঘিন করে।

স্বেচ্ছাসেবকদের সব দেখাইলাম। তারা সাফ জবাব দিল, 'ও কাজ আমাদের নয়, মেথরের।' একটা ঝাঁটা চাহিলাম। যার কাছে চাহিলাম আমার দিকে সে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া তাকাইয়া রহিল। ঝাঁটা যোগাড় করিলাম। পায়খানা পরিষ্কার করিলাম। কিন্তু নিজের সুবিধার অধিক কিছু করা সম্ভব ছিল না। পায়খানা এত কম ছিল যে প্রতিবার ব্যবহারের পরে মল অপসারণ করা আবশ্যক ছিল। ততটা করা আমার সাধ্যের বাইরে ছিল। তাই নিজের মত ব্যবস্থা করিয়া আমার নিরস্ত হইতে হইয়াছিল। দেখিয়াছিলাম, অন্যদের তাতে ঘৃণা ছিল না।

এখানেই শেষ নয়। রাতে কেউ কেউ ঘরের সামনের বারান্দায় কাজ

সারিত। সকাল বেলা স্বেচ্ছাসেবকদের সেই মল দেখাইয়াছিলাম। তা সাফ করিতে কাউকে পাওয়া যায় নাই। তা সাফ করার গৌরব ও আমারই লাভ হইয়াছিল।

এদিকে আজকাল অনেক উন্নতি ঘটিয়াছে বটে, তা হইলেও এমন অবিবেচক প্রতিনিধি আজও আছে যারা মহাসভার ছাউনির যেখানে-সেখানে মল ত্যাগ করিয়া স্থানটাকে কদর্য করে, এবং কোন স্বেচ্ছাসেবক সেই মল দূর করিতে পাওয়া যায় না।

অমনটা নোংরা-ময়লার মধ্যে কংগ্রেস অনেক দিন চলিলে অসুখ-বিসুখ দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা ইহা আমি বুঝিতে পারিয়াছিলাম।

১৪

কেরানী ও 'বেয়ারা'

কংগ্রেসের বৈঠকের দুই এক দিন বাকী ছিল। ঠিক করিলাম, কংগ্রেস-কার্যালয়ে কোন কাজ মিলে ত সেই কাজ করিব ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিব।

যেদিন পৌঁছিয়াছিলাম স্নান ইত্যাদির পরে সেই দিনই কংগ্রেস দপ্তরে গেলাম। শ্রীভূপেন্দ্রনাথ বসু ও শ্রীঘোষাল সেক্রেটারী ছিলেন। ভূপেন-বাবুর কাছে গিয়া কাজ চাহিলাম। আমার দিকে তাকাইলেন ও বলিলেন, 'আমার এখানে কোন কাজ নেই। হয়ত মি· ঘোষাল আপনাকে কোন কাজ দিতে পারবেন। তাঁর কাছে যান।'

ঘোষালবাবুর কাছে গেলাম। আমাকে তিনি একবারটি দেখিয়া লইলেন। হাসিয়া বলিলেন, 'কেরানীর কাজ আপনাকে দিতে পারি। করবেন ?'

বলিলাম, 'অবশ্যই কবব। শক্তির বাইরে না হলে যে কোন কাজ দেন করব বলে তৈরি হয়ে এসেছি।'

'যুবক, এমনটিই ত হওয়া চাই।'

তাঁর পাশে দাঁড়ানো যুবকদের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, 'শুনলে, এই যুবক কি বলছে ?'

পরে আমার দিকে ঘুরিয়া বলিলেন :

'এই দেখুন, পত্রের স্তূপ, আর এই রয়েছে চেয়ার। বসুন। এগুলির

ব্যবস্থা করুন। দেখছেন ত শত লোক আসছে, তাদের সঙ্গে কথা বলব না এই সব অদরকারী পত্রের জবাব দিব? আমার এমন কেরানী নেই যাকে দিয়ে এ কাজ হতে পারে। এই সব পত্রের অনেকগুলিতে প্রায় কোন বস্তু নেই। তবুও সবগুলি দেখে যান। যে সবের উত্তর দেওয়া প্রয়োজন মনে করেন উত্তর দিন। আর যেখানে আমাকে জিজ্ঞাসা করা আবশ্যক মনে হবে জিজ্ঞাসা করবেন।'

আমার ওপর তাঁর এই আস্থা দেখিয়া আমি অতিশয় মুগ্ধ হইলাম।

শ্রীঘোষাল আমাকে চিনিতেন না। নামধাম তিনি পরে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন।

দেখিলাম কাজটা আদৌ কঠিন ছিল না। পত্রের স্তূপের ব্যবস্থা করিতে বেশি সময় লাগিল না। ঘোষালবাবু খুশী হইলেন। কথা বলিতে তিনি ভালবাসিতেন। দেখিতাম কথা বলিতে তাঁর অনেকটা সময় ব্যয় হইত। আমার পরিচয় পাওয়ার পরে কেরানীর কাজে আমাকে লাগাইয়া ছিলেন বলিয়া তিনি একটু অপ্রস্তুত হন। তাঁকে আশ্বস্ত করিয়া আমি বলিয়াছিলাম, 'কোথায় আপনি আর কোথায় আমি। আপনি কংগ্রেসের পুরানো সেবক। আমার এই ত হাতে খড়ি। আপনি আমার গুরুজন। এই কাজে লাগিয়ে আপনি আমার উপকার করেছেন। কংগ্রেসের সেবা আমায় করতে হবে। কংগ্রেসের কাজকর্মের পরিচয় লাভের অমূল্য সুযোগ আপনি আমায় দিয়েছেন।'

'সত্য বলতে কি, এ হচ্ছে ঠিক মনোভাব। তবে আজকালকার যুবকেরা এ কথাটা বোঝে না। বটেই ত, কংগ্রেসের জন্ম থেকে তার সঙ্গে আমার পরিচয়। মি. হিউমের মত তার আতুঁড়েও আমার হাত ছিল।'

আর এভাবে আমাদের মধ্যে বন্ধুত্ব জন্মিল। দুপুরবেলা আগ্রহ করিয়া তাঁর সঙ্গে আমাকে তিনি খাওয়াইলেন।

ঘোষালবাবুর বোতাম বেয়ারা পরাইয়া দিত। ইহা দেখিয়া আমিই বেয়ারার কাজ লইলাম। কাজটা আমার ভালই লাগিয়াছিল। গুরুজনের প্রতি আমার শ্রদ্ধা চিরদিনের। আমার মনোভাবের পরিচয় পাওয়ার পরে আমা হইতে ছোটখাটো সেবা নিতে তাঁর বাধিত না; বরং খুশীই হইতেন। বোতাম পরাইয়া দিতে বলিয়া মুচকি হাসিয়া তিনি বলিতেন, 'দেখতে পাচ্ছেন, কংগ্রেস সেক্রেটারীর বোতাম পরাবার মত সময়ও নেই,

কারণ তখনও তাঁর কাজ করতে হয়।' তাঁর এই মজাদার সরলভাব দেখিয়া আমার হাসি পাইত, তা বলিয়া তাঁর ওসব ব্যক্তিগত সেবায় আমার কখনও অরুচি জন্মায় নাই। ওই সেবা হইতে আমার যে লাভ হইয়াছিল তার মূল্য আঁকে কষা যাইবে না।

কংগ্রেস তন্ত্রের (কার্যকলাপের) পরিচয় দিনকয়েক মধ্যেই পাইলাম। নেতাদের অনেকের সঙ্গে দেখা করিয়াছিলাম। গোখেল ও সুরেন্দ্রনাথের মত প্রধানেরা আসিতেন যাইতেন: তাঁদের চালচলন লক্ষ্য করার সুযোগ মিলিয়াছিল। অকারণ বিস্তর সময় নষ্ট হইতেছিল তাও নজরে পড়ে। ইংরেজী বুলির আধিপত্য দেখিতে পাই। সেই দিনেও তাতে বেদনাবোধ করিয়াছিলাম। শক্তির অপচয় নিবারণের দিকে প্রায় লক্ষ্যই ছিল না। এক জনে যে কাজ করিতে পারে সে কাজে অনেককে লাগিতে দেখিয়াছিলাম। অন্যদিকে কতকগুলি অতি আবশ্যক কাজ করার জন্য কেউ ছিল না।

সবটা ব্যবস্থার সমালোচনা আমার মনে চলিত। কিন্তু উদার চিত্তে ধরিয়া লইয়াছিলাম যে ওই অবস্থায় যা-ই বলি না কেন, উহা অপেক্ষা ভাল কিছু করা সম্ভবপর ছিল না। তাই কোন কিছুর ওপর মনে বিতৃষ্ণা জন্মিতে পায় নাই।

১৫

কংগ্রেসে

কংগ্রেস বসিল। বিশাল মণ্ডপ। স্বেচ্ছাসেবকদের জমকালো কাতার, মঞ্চে উপবিষ্ট প্রধানগণ—এই সব দেখিয়া আমার তাক লাগিল। ব্যাকুল মনে জানিতে পারিলাম এই সভায় আমার স্থান কোথায়।

সভাপতির ভাষণ নয় ত তা ছিল এক পুস্তক। গোটাটা পড়া সম্ভব ছিল না। কোন কোন অংশ পাঠ করা হয়।

তারপর বিষয় নির্বাচনী সমিতির সদস্য নির্বাচিত হয়। গোখেল আমাকে সেই বৈঠকে লইয়া গিয়াছিলেন।

সার ফিরোজশা আমায় ভরসা দিয়াছিলেন বটে যে আমার প্রস্তাব তালিকায় স্থান পাইবে, কিন্তু বিষয় নির্বাচনী সভায় কে তা পেশ করিবে

আর কখন সে কথা বৈঠকে বসিয়া আমি ভাবিতেছিলাম। হরেক প্রস্তাবের ওপর লম্বা বক্তৃতা চলিতেছিল—সবই ইংরেজীতে। কোন না কোন হোমরা-চোমরা লোক সেই সকল প্রস্তাবের সমর্থক ছিলেন। এই নাকারার নাদে আমার ক্ষীণ মুরলীর শব্দ কে শুনিবে? রাত যত বাড়িতেছিল বুক ততই ধড়ফড় করিতেছিল। মনে পড়ে শেষের দিকে যে সকল প্রস্তাব আসিয়াছিল সে সকলের বিচার দ্রুতগতিতে সারা হইতেছিল। যাওয়ার জন্য সকলে ব্যগ্র ছিল। রাত তখন এগারোটা। দাঁড়াইয়া বলিব, সে সাহস হইল না। গোখেলের সঙ্গে আগেই দেখা করিয়াছিলাম। আমার প্রস্তাব তিনি দেখিয়াছিলেন। তাঁর চেয়ারের কাছে যাইয়া চুপিচুপি বলিলাম, 'আমার প্রস্তাবের কিছু একটা করুন।' তিনি বলিলেন, 'আপনার প্রস্তাবের কথা আমার মনে আছে। দেখছেন ত এখানকার ব্যস্তসমস্ত ভাব। তা হোক, এই প্রস্তাব বাদ পড়তে আমি দেব না।'

সার ফিরোজশা বলিলেন, 'কাজ তবে শেষ হল ত?'

'না, দক্ষিণ আফ্রিকার প্রস্তাব বাকী থেকে গেছে। মি. গান্ধী কখন হতে অপেক্ষায় রয়েছেন', গোখেল বলিয়া উঠিলেন।

'প্রস্তাবটা আপনি দেখেছেন?' সার ফিরোজশা জিজ্ঞাসা করেন।

'অবশ্যই।'

'আপনার ভাল লেগেছে?'

'ঠিক মনে হয়েছে।'

'তবে, গান্ধী পড়ুন।'

কাঁপিতে কাঁপিতে পড়িয়া শুনাইলাম।

গোখেল উহা সমর্থন করিলেন।

সকলে বলিয়া উঠিল, 'সর্বসম্মতিতে পাস।'

ওয়াচা বলিলেন, 'গান্ধী, আপনাকে পাঁচ মিনিট দেওয়া হবে।'

প্রস্তাব পাসের ধরন আমার ভাল লাগে নাই। প্রস্তাব যে কি তা বুঝিবার আয়াস পর্যন্ত কেহ করিল না! সকলেই উতলা। গোখেল দেখিয়াছেন ত ব্যস; অন্য কেউ দেখিবার বা বুঝিবার প্রয়োজনও বোধ করিল না।

ভোর হইল। মনে উদ্‌বেগ ছিল, ভাষণের কি করিব। পাঁচ মিনিটে কি বলিব তা ঠাহর করিতে পারিতেছিলাম না। তৈরি হওয়ার চেষ্টায়

ত্রুটি ছিল না। তবে মনের মত শব্দ জুটিতেছিল না। ঠিক করিয়াছিলাম যে লেখা বক্তৃতা পড়িব না। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকার অবাধে বলার অভ্যাসটা যেন এখানে হারাইয়া ফেলিলাম।

আমার প্রস্তাবের সময় আসিলে মি. দীনশা ওয়াচা আমার নাম ডাকিলেন। দাঁড়াইলাম। মাথা ঘুরিল। কোন রকমে প্রস্তাব পড়িলাম। বিদেশযাত্রার ও সমুদ্র-পাড়ি দেওয়ার গুণ কীর্তন করিয়া কোন কবি একটি কবিতা রচনা করিয়াছিলেন এবং তা ছাপাইয়া প্রতিনিধিদের মধ্যে বিলি করিয়াছিলেন। সেই কবিতা পড়িয়া শুনাইয়াছি ও দক্ষিণ আফ্রিকার দুঃখের দুইচার কথা বলিয়াছি ত মি. ওয়াচার হাতের ঘণ্টা বজিয়া উঠিল। পাঁচ মিনিট আমার শেষ হয় নাই এই বিষয়ে আমার কোন সংশয় ছিল না। আমি জানিতাম না যে আর দুই মিনিট মধ্যে আমার শেষ করিতে হইবে ইহার সংকেত স্বরূপ ঘণ্টা বাজিয়াছিল। অনেককে আধ ঘণ্টা পঁয়তাল্লিশ মিনিট পর্যন্ত বলিতে দেখিয়াছিলাম, তবুও ঘণ্টা বাজে নাই। ব্যথা পাইলাম। ঘণ্টা বাজিতেই বসিয়া পড়িলাম। কিন্তু জড়বুদ্ধি আমি সেই সময়টায় ধরিয়া লইয়াছিলাম যে-কবিতা আমি পাঠ করিয়াছিলাম তাতে সার ফিরোজশার কথার * জবাব দেওয়া হইয়াছে। প্রস্তাব পাস হওয়ার বিষয়ে কোন প্রশ্নই ছিল না। সেই দিনে দর্শক ও প্রতিনিধিতে প্রায় কোন ভেদ ছিল না। সকলেই হাত তুলিত। সব প্রস্তাব একমতে পাস হইত। আমার প্রস্তাবও ওভাবেই পাশ হয়। তাই আমার দৃষ্টিতে আমার প্রস্তাবের কোনই গুরুত্ব ছিল না। তা হইলেও কংগ্রেসে আমার প্রস্তাব পাস হইয়াছে এটাই আমার আনন্দের বিষয় ছিল। কংগ্রেসের মোহর যার ওপর পড়িয়াছে সারা ভারতের মোহর তার ওপর পড়িয়াছে এই বোধ কার পক্ষে যথেষ্ট নয়?

১৬

লর্ড কার্জন-এর দরবার

কংগ্রেস শেষ হইল। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকার কাজের সম্পর্কে চেম্বার অব কমার্স ইত্যাদি সংস্থার সহিত দেখা করার ছিল। তাই এক মাস

* অধ্যায় ১৩, অনুচ্ছেদ ৩ দেখুন

কলিকাতায় ছিলাম। এবার হোটেলে না থাকিয়া পরিচয়-পত্রের বলে ইণ্ডিয়া ক্লাব-এ এক ঘর লই। কয়েকজন প্রখ্যাত ভারতবাসী এই ক্লাব-এর মেম্বর ছিলেন। লোভ ছিল তাঁদের সঙ্গে পরিচয় করিয়া দক্ষিণ আফ্রিকার কাজে তাঁদের আগ্রহ সৃষ্টি করিব। নিত্য না হইলেও সময় সময় এই ক্লাব-এ গোখেল বিলিয়ার্ড খেলিতে আসিতেন। কলিকাতায় কিছুদিন থাকিব এই কথা শুনিবামাত্র তিনি আমাকে তাঁর সঙ্গে থাকার নিমন্ত্রণ জানান। ধন্যবাদ সহকারে তাঁর নিমন্ত্রণ স্বীকার করি, কিন্তু নিজ হইতে তাঁর ওখানে যাওয়া আমার সঙ্গত মনে হইল না। দুই একদিন আশায় থাকিয়া নিজেই আসিয়া আমাকে তাঁর বাড়ীতে লইয়া যান। আমার সংকোচ দেখিয়া তিনি বলেন, 'গান্ধী, আপনাকে এ দেশে থাকতে হবে। তাই এ রকম লজ্জা করলে কি করে চলবে? যত লোকের সম্পর্কে আসতে পারেন তত লোকের সম্পর্কে আপনার আসতে হবে। আমার ইচ্ছা আপনি কংগ্রেসের কাজ করবেন।'

গোখেলের সহিত থাকার সময়কার কথা বলার আগে ইণ্ডিয়া ক্লাব-এর এক অনুভবের কথা বলিয়া লই।

ওই সময়ে লর্ড কার্জন-এর দরবার হয়। দরবারে নিমন্ত্রিত কয়েকজন রাজা মহারাজা এই ক্লাবের মেম্বার ছিলেন। ক্লাবে আমি তাঁদের বাঙ্গালীদের সুন্দর ধুতি জামা ও চাদর পরিতে দেখিতাম। দরবারের দিন তাঁদের পরনে দেখিলাম পাতলুন, চোগা, খানসামার পাগড়ী ও চকচকে জুতা। বেদনা বোধ করিলাম: বেশ পরিবর্তনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম।

'আমাদের দুঃখ আমরাই জানি। পয়সা ও খেতাব রাখার জন্য যে অপমান আমাদের সইতে হয় তা আপনাকে কি করে বুঝাই!' উত্তরে তিনি বলেন।

'কিন্তু খানসামার এই পাগড়ী ও চকচকে বুট কেন?'

'খানসামাতে ও আমাদেতে আপনি কি তফাত দেখছেন?' জবাবে তিনি বলিলেন। 'ওরা আমাদের খানসামা আর আমরা লর্ড কার্জন-এর। লাট-দরবারে না যাই ত শাস্তি ভুগতে হবে। আর নিজেদের পোশাকে যাই ত তাও অপরাধ বলে গণ্য হবে। আর ওখানে গিয়ে কি লর্ড কার্জনের সঙ্গে কথা বলতে পাব? মোটেই নয়।'

এই দিলখোলা বন্ধুর দুঃখে দুঃখী হইলাম।

এই প্রসঙ্গে আর এক দরবারের কথা আমার মনে পড়িতেছে।

লর্ড হার্ডিং-এর হাতে কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তি স্থাপন কালে তাঁর দরবার হইয়াছিল। ভারতভূষণ মালব্যজী উহাতে উপস্থিত হওয়ার জন্য আমাকে বিশেষ নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। গিয়াছিলাম।

মেয়েদের শোভা পায় এমন পোশাকে সেখানে রাজরাজড়াদের দেখিয়াছিলাম—দেখিয়াছিলাম রেশমী পাজামা, রেশমী আচকান, গলায় মুক্তার হার, হাতে তাবিজ, পাগড়ীতে হীরার ঝালর। এই সবের ওপর কোমরবন্ধ হইতে ঝুলিতেছিল সোণার-বাঁট তলোয়ার! বেদনা বোধ করিয়াছিলাম।

কারো কাছে শুনিয়াছিলাম ওসব তাঁদের রাজাধিকারের নিশানা নয়, নিশানা গোলামির। আমার ধারণা ছিল ক্লীবের এই সব চিহ্ন তাঁরা স্বেচ্ছায় ধারণ করে, কিন্তু পরে জানিয়াছিলাম দরবারে রাজাদের নিজেদের সকল মূল্যবান জহরত পরিয়া আসিতে হয়, অন্যথা হওয়ার জো নাই। তাঁদের কেউ কেউ ওসব পরিতে ঘৃণা বোধ করে এবং দরবার ছাড়া অন্য কোন সময়ে ওসব ব্যবহার করে না এই খবরও পাইয়াছিলাম।

বলিতে পারি না আমার ওই শোনা কথা কতটা সত্য, তবে তাঁরা অন্য সময়ে ওসব পরুক আর না-ই পরুক ভাইসরয়ের দরবারে মেয়েদের (তাদেরও সকলে পরে না) ভূষণে উপস্থিত হওয়া অতীব দুঃখের ব্যাপার।

অর্থ, প্রতিপত্তি ও মানসম্মানের জন্য মানুষ কি পাপ, কি অন্যায়ই না করে!

১৭

গোখেলের সঙ্গে এক মাস—১

কি প্রথম দিনে কি পরে কোন দিনই আমার মনে হয় নাই আমি অতিথি এমনিভাবে গোখেল আমায় রাখিয়াছিলেন। মনে হইত আমি যেন তাঁর ছোট ভাই। আমার দরকারের কথা জানিয়া লইয়া তিনি সেইমত ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। কপালগুণে দরকার আমার কমই ছিল। নিজের সব কিছু নিজে করিয়া লওয়ার অভ্যাস আমার ছিল, অতএব অন্যের কাছ হইতে বড় একটা সেবা আমার লইতে হইত না। আমার পরিষ্কার-

পরিচ্ছন্নতা, আমার উদ্যম ও নিয়মনিষ্ঠা দেখিয়া তিনি খুব মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি ওসবের এত তারিফ করিতেন যে আমি বিব্রত হইতাম।

আমার মনে হইত না আমার কাছে তাঁর কিছু গোপন আছে। কোন বড়লোক তাঁর সঙ্গে দেখা করিতে আসিলে তাঁর সঙ্গে তিনি আমার পরিচয় করিয়া দিতেন। সেই সকল পরিচিতদের মধ্যে সর্বাগ্রে ডা· (এখন সার) প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের ছবি আমার সামনে ভাসিয়া ওঠে। বলিতে গেলে তিনি গোখেলের বাড়ীর পাশেই থাকিতেন আর প্রায়ই আসিতেন।

'ইনি প্রফেসর রায়। মাসে ৮০০ টাকা বেতন পান। নিজের খরচ ৪০ টাকা বাদে সব টাকা দশের কাজে দিয়ে দেন। বিবাহ তিনি করেন নাই ; করবেনও না।' এই কথা বলিয়া তাঁর সঙ্গে গোখেল আমার পরিচয় করিয়া দেন।

আজিকার ডা· রায়ে আর তখনকার ডা· রায়ে কোন তফাতই আমি দেখিতে পাই না। তখন তাঁর যে পোশাক ছিল আজও প্রায় সেই পোশাক তবে এখন তিনি খাদি পরেন, তখন পরিতেন দেশী মিলের কাপড়। গোখেল ও প্রফেসর রায়ের কথা শুনিয়া আমার তৃপ্তি হইত না· মনে হইত আরও শুনি। কেন না তাঁরা হয় দেশের কল্যাণের নয়ত জ্ঞানের কথা বলিতেন। কোন কোন কথায় বেদনা পাইতাম—নেতাদের সমালোচনা হইত বলিয়া। যাঁদের আমি মহারথী বলিয়া জানিতাম তাঁদের কেউ কেউ আমার দৃষ্টিতে নেহাত ছোট হইয়া যায়।

গোখেলের কার্যপদ্ধতি দেখিয়া আমার আনন্দ হইত, তেমনি শিক্ষাও লাভ হইত। নিজের একটি মুহূর্তও তিনি বিনা কাজে ব্যয় করিতেন না। দেখিয়াছিলাম, তাঁর ব্যক্তিগত সম্বন্ধ ও বন্ধুত্বের মূলেও ছিল জনহিতের দৃষ্টি। তাঁর সকল কথার মূলেও ছিল দেশের হিত। তাঁর কথায় না দেখিয়াছি কখনও মলিনতা, কপটতা বা মিথ্যা। ভারতের দারিদ্র্য ও পরাধীনতা তাঁর অন্তরে অনুক্ষণ বিঁধিত। অনেক লোক অনেক কাজে তাঁকে টানিতে চেষ্টা করিত। তাদের এক কথাই তিনি বলিতেন, 'আপনি তা করুন, আমার কাজ আমাকে করতে দিন। আমার চাই সকলের আগে দেশের স্বাধীনতা। তা মিললে অন্য কথা ভাবব। এখন এই কাজে ছাড়া অন্য কোন কাজে সময় ও শক্তি নিয়োগ করার অবসর আমার নেই।'

রাণাডের ওপর তাঁর অসীম শ্রদ্ধা কথায় কথায় ব্যক্ত হইত। 'রানাডে এই বলেছেন' এই উক্তি তাঁর কথাবার্তায় লাগিয়াই থাকিত। গোখেলের সঙ্গে আমার অবস্থান কালে রাণাডের মৃত্যুতিথি (জন্মতিথিও হইতে পারে ঠিক মনে নাই) পড়িয়াছিল। ওই তিথি গোখেল নিষ্ঠা সহকারে পালন করিতেন। আমি ছাড়া সেই সময়ে তাঁর ওখানে প্রাফেসর কাথবটে ও এক সবজজ ভদ্রলোক ছিলেন। তাঁদের তিনি অনুষ্ঠানে ডাকিয়াছিলেন। রানাডের অনেক কথা আমাদের বলিয়াছিলেন। প্রসঙ্গক্রমে রানাডে, তেলঙ্গ ও মাগুলিকের তুলনা করিয়াছিলেন। মনে আছে তেলঙ্গের ভাষার মাধুর্যের প্রশংসা করিয়াছিলেন। আর মাগুলিকের স্তুতি করিয়াছিলেন সংস্কারক বলিয়া। মক্কেলের কথা মাগুলিক কতটা যে ভাবিতেন এক কাহিনী অবলম্বনে সে কথা আমাদের শুনাইয়াছিলেন: যে ট্রেনে তিনি আদালতে যাইতেন একদিন সেই ট্রেন মিস করেন; তা হইলে কি হয়, স্পেশাল ট্রেন ভাড়া করিয়া তিনি ঠিক সময়ে কোর্টে যান। তাহা হইলেও সব দিক হইতে দেখিলে, কি বিচারক, কি ঐতিহাসিক, কি অর্থনীতিবিদ্, কি সংস্কারক হিসাবে রানাডে তাঁর যুগের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন। জজ হওয়া সত্ত্বেও তিনি নির্ভয়ে কংগ্রেস অধিবেশনে দর্শকরূপে যোগ দিতেন। তাঁর বিচারবুদ্ধির ওপর লোকের এতদূর আস্থা ছিল যে সকলে তাঁর নির্ণয় মানিয়া লইত—এমন কত কথাই না গোখেল আমাদের শুনাইয়াছিলেন। গুরুর গভীর জ্ঞান ও হৃদয়ের বিশালতার বর্ণনা করিতে করিতে গোখেল বিভোর হইয়া যাইতেন।

সেই সময়ে গোখেলের ঘোড়ার গাড়ি ছিল। তখন আমি জানিতাম না যে অবস্থাগতিকে ঘোড়ার গাড়ি তাঁর রাখিতে হইত। অভিযোগ করিয়া আমি বলিয়াছিলাম, 'ট্রামে আপনি যাতায়াত করেন না কেন? তাতে কি নেতার মান কমে?'

কথাটা তাঁর একটু লাগিয়াছিল। তিনি জবাবে বলিয়াছিলেন, 'আপনি আমায় ধরতে পারেননি। বিধান সভা (কাউন্সিল) হতে যে ভাড়া পাই তা আমি নিজের জন্য খরচ করি না। আপনাকে ট্রামে চলতে ফিরতে দেখি, আমার হিংসা হয়। কিন্তু অমনটা চলাফেরা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমার মত আপনি যখন লোকপরিচিত হবেন তখন অসম্ভব না হলেও ট্রামে চলা আপনার পক্ষে নিঃসন্দেহে কঠিন হবে। নেতারা যা কিছু করে

নিজেদের আরাম-আয়েশের জন্য করে এরূপ মনে করার কোন হেতু নেই। আপনার সাদামাঠা চলন আমার ভাল লাগে। যতটা সম্ভব সাদাসিধা-ভাবে আমি চলি। তা হলেও আপনাকে মানতেই হবে যে আমার মত লোকের কিছু খরচ না করলেই নয়।'

এইভাবে আমার এক অভিযোগ ত তিনি বেশ কাটিলেন। কিন্তু আমার আর এক অভিযোগের সন্তোষজনক উত্তর তিনি দিতে পারেন নাই।

'কিন্তু আপনি ত বেড়াতেও বের হন না। তাই আপনার শরীর যে ভাল যাচ্ছে না তাতে আর আশ্চর্য কি? দেশের কাজে ব্যায়ামের জন্যও কি অবসর মেলে না?'

এই কথার উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, 'কখন আপনি আমার ফুরশত দেখছেন যে বেড়াতে যাব?'

গোখেলের প্রতি আমার এত ভক্তি ছিল যে তাঁর কথার প্রতি-উত্তর দিতাম না। তাঁর জবাবে আমি তুষ্ট হইয়াছিলাম তা নয়, তবুও আমি চুপ করিয়া গিয়াছিলাম। তখন মনে করিতাম আর আজও মনে করি যে, যতই কাজ থাকুক না কেন তবুও তার মধ্যেই যেমন আমরা খাওয়ার সময় করিয়া লই তেমন ব্যায়ামেরও সময় করিয়া লওয়া যায়। নম্রভাবে এই বলিব যে তাতে দেশের সেবা বেশিই হয়, কম নয়।

১৮

গোখেলের সহিত এক মাস—২

গোখেলের সঙ্গে যখন ছিলাম ঘরে বসিয়া দিন কাটাইতাম না।

দক্ষিণ আফ্রিকার খ্রীস্টান বন্ধুদের আমি কথা দিয়াছিলাম যে ভারতবর্ষে ভারতীয় খ্রীস্টানদের সহিত মেলামেশা করিব, তাঁদের অবস্থার খোঁজ লইব। কালীচরণ ব্যানার্জির নাম জানিতাম। কংগ্রেসের কাজে অগ্রণীদের তিনি একজন ছিলেন। তাই তাঁর ওপর আমার শ্রদ্ধা ছিল। সাধারণভাবে ভারতীয় খ্রীস্টানেরা কংগ্রেস হইতে আর তেমনই হিন্দু-মুসলমান হইতে দূরে থাকিত। তাই তাঁদের আমি সংশয়ের দৃষ্টিতে দেখিতাম। কালীচরণ ব্যানার্জির বিষয়ে মনে তেমন সংশয় ছিল না। তাঁর সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছার কথা গোখেলকে বলি। তাতে তিনি বলিয়াছিলেন, 'তাঁর সঙ্গে দেখা করে

কি হবে? তিনি খুব ভাল মানুষ। কিন্তু আমার বিশ্বাস তাঁর সঙ্গে দেখা করে আপনি সন্তুষ্ট হবেন না। তাঁকে আমি ভাল করে জানি। তবুও যেতে চান ত যান।'

দেখা করার সময় চাহিলাম। সঙ্গে সঙ্গে পাইলাম। গেলাম। তখন তাঁর স্ত্রী মরণশয্যায়। তাঁর বাড়ী অনাড়ম্বর ছিল। কংগ্রেসে তাঁকে কোট-পাতলুনে দেখিয়াছিলাম। ঘরে দেখিলাম ধুতি-জামা পরনে, ভাল লাগিল। সেই সময়ে নিজে আমি পারসী কোট-পাতলুন পরিতাম, তাহা হইলেও এই পোশাক ও সাদাসিধা ভাব আমার খুব ভাল লাগিয়াছিল। তাঁর সময় নষ্ট না করিয়া আমার অসমাধানের কথা তাঁকে বলিলাম।

তিনি বলিলেন, 'আপনি মানেন কি যে আমরা সব পাপের বোঝা নিয়ে জগতে আসি?'

'মানি।'

'উত্তম। এই আদি পাপ হতে বাঁচার পথ হিন্দুধর্মে নেই, খ্রীস্টধর্মে আছে', এই কথা বলিয়া তিনি বলিলেন', 'পাপে মৃত্যু, মৃত্যু থেকে বাঁচার পথ যীশুশরণ', বাইবেল এ কথা বলেছে।'

ভগবদ্গীতার ভক্তিমার্গের কথা আমি পাড়িলাম। কিন্তু তার কোন ফল হইল না। তাঁর সৌজন্যের জন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানাইলাম। সন্তোষ লাভ করি নাই, তাহা হইলেও সাক্ষাৎকারে লাভবান হইয়াছিলাম।

বলা যাইতে পারে এই এক মাসে কলিকাতার অলিগলি আমি চষিয়া বেড়াইয়াছিলাম। বেশির ভাগ কাজ পায়ে হাঁটিয়া সারিতাম। এই সময়েই ন্যায়মূর্তি মিত্রের সঙ্গে আমি দেখা করিয়াছিলাম। আর সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গেও। দক্ষিণ আফ্রিকার কাজের জন্য তাঁর সহায়তা দরকার ছিল। রাজা প্যারীমোহন মুখুজ্যের সঙ্গেও এই সময় দেখা করিয়াছিলাম।

কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় আমাকে কালীমন্দিরের কথা বলিয়াছিলেন। ওই মন্দির দেখার প্রবল আগ্রহ আমার হয়। বইয়ে উহার বর্ণনা আমি পড়িয়াছিলাম। ন্যায়মূর্তি মিত্র ওই পাড়ায় থাকিতেন। যেদিন তাঁর সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলাম সেই দিন কালীমন্দিরেও গিয়াছিলাম। রাস্তায় দেখিলাম বলির পাঁঠা সারি সারি চলিয়াছে। মন্দিরের গলিতে ঢুকিয়া দেখিলাম দুই পাশে ভিক্ষুকের লম্বা কাতার। বাবাজীরা ত ছিলই।

সেই দিনেও তাজা-তাগড়া ভিখারীদের আমি ভিক্ষা দিতাম না। তাদের এক দঙ্গল আমার পিছে পিছে চলিতেছিল।

বারান্দায় এক বাবাজী বসা ছিল। সে আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'বেটা, কোথা যাস?' উত্তর দিলাম। সে আমাকে ও আমার সঙ্গীকে বসিতে বলিল। আমরা বসিলাম।

বলিলাম, 'এই যে ছাগবলি হচ্ছে একে কি ধর্ম মনে করেন?'

সে বলিল, 'জীববধকে কে ধর্ম বলবে?'

'তবে এখানে বসে সে কথা লোককে বলেন না কেন?'

'ওটা আমার কাজ নয়। এখানে বসে ভগবানকে ডাকা আমার কাজ।'

কিন্তু অন্য কোন জায়গা আপনার জুটল না, জুটল এই জায়গায়!'

'যেখানেই বসি আমাদের কাছে সবই সমান। লোক ত ভেড়ার পাল। নেতারা যেমন চালায় চলে। তাতে সাধুরা মাথা গলাতে যাবে কেন?' বাবাজী বলিল।

কথা বাড়াইলাম না। আমরা মন্দিরে গেলাম। রক্তের স্রোত বহিয়া যাইতেছিল। ওখানে তিষ্ঠানো গেল না। মন আকুল হইল, অস্থির বোধ করিলাম। সেই দৃশ্য আজও ভুলিতে পারি নাই।

সেই দিন সন্ধ্যায়ই এক বাঙ্গালী মজলিসে আমার খাওয়ার নিমন্ত্রণ ছিল। সেখানে এক ভদ্রলোকের সহিত এই নিষ্ঠুর পূজার আলোচনা হয়। তিনি বলিয়াছিলেন, 'আমার মনে হয় যে তুমুল শব্দে ওখানে নাকাড়া ইত্যাদি বাজে তাতে যেমন করেই মারা হোক পাঁঠার লাগে না।'

এই যুক্তি আমার কাছে অসার মনে হইয়াছিল। ভদ্রলোককে বলিয়াছিলাম যে পাঁঠা যদি কথা বলিতে পারিত ত অন্য কথা বলিত। আমার মনে হইয়াছিল এই নিষ্ঠুর প্রথা বন্ধ হওয়া উচিত। বুদ্ধদেবের কথা মনে পড়িয়াছিল। আমি দেখিতে পাই যে ও কাজ আমার সাধ্যের অতীত।

তখন আমার যে মত ছিল আজও আমার সেই মত। আমার কাছে পাঁঠার জীবনের মূল্য মনুষ্যজীবনের মূল্য হইতে কম নয়। মনুষ্যদেহ রক্ষা করার নিমিত্তে পাঁঠার দেহ নাশ করিতে আমি তৈরি নাই। আমি মনে করি যে, জীব যত বেশি অসহায় মানুষের ক্রূরতা হইতে বাঁচার দাবি মানুষের কাছে তার তত বেশি। কিন্তু সেই আশ্রয় দেওয়ার যোগ্য হইলেই না মানুষ

আশ্রয় দিতে পারে। পাঁঠাকে এই পাপ বলি হইতে রক্ষা করার জন্য যে আত্মশুদ্ধি ও ত্যাগ আবশ্যক ততটা আমার নাই, অর্জন করিতে হইবে। আমার মনে হয় ওই পরিমাণ আত্মশুদ্ধি ও ত্যাগের কথা জপিতে জপিতেই এই জন্ম আমার কাটিয়া যাইবে। এরূপ কোন তেজস্বী পুরুষ কি তেজস্বিনী নারী আসুক যে এই মহাপাতক হইতে মানুষকে বাঁচাইবে, নির্দোষ পশুকে রক্ষা করিবে ও মন্দিরকে শুদ্ধ করিবে। ইহা আমার অন্তরের নিরন্তর প্রার্থনা। জ্ঞানী, বুদ্ধিমান, ভাবনা-প্রধান বাংলা এই সব কি করিয়া সয়!

১৯

গোখেলের সহিত এক মাস—৩

কালীমাতার সামনে ধর্মের নামে যে ভয়ঙ্কর যজ্ঞ করা হয় তা দেখার পরে বাঙ্গালীদের জীবন জানার আগ্রহ আমার আরও বেশি বাড়িয়া গেল। ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে আমি আগেই বেশ পড়াশুনা করিয়াছিলাম। প্রতাপ-চন্দ্র মজুমদারের জীবনকথা কিছুটা জানিতাম। সভায় তাঁর কতকগুলি বক্তৃতাও শুনিয়াছিলাম। তাঁর লেখা কেশবচন্দ্র সেনের জীবনী যোগাড় করিয়া অতি আগ্রহে পড়িয়াছিলাম এবং সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ ও আদি ব্রাহ্ম সমাজে যে কি ব্যবধান তা বুঝিয়া লইয়াছিলাম। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের দর্শন পাইয়াছিলাম। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের দর্শন আকাঙ্ক্ষায় আমি ও অধ্যাপক কাথবটে গিয়াছিলাম; দর্শন পাই নাই। তখন তিনি কারও সঙ্গে দেখা করিতেন না। কিন্তু তাঁর বাড়ীতে ব্রাহ্ম সমাজের যে উৎসব তখন হয় নিমন্ত্রণ পাইয়া তাতে গিয়াছিলাম। উচ্চাঙ্গের বাংলা গান শোনার সৌভাগ্য সেখানে আমার হইয়াছিল। আর তাহা হইতে বাংলা গানের প্রতি আমার টান জন্মে।

ব্রাহ্ম সমাজের এতটা পরিচয় পাওয়ার পরে স্বভাবতই বিবেকানন্দকে দর্শন করার আকাঙ্ক্ষা হয়। মহা উৎসাহে প্রায় সবটা পথ হাঁটিয়া বেলুড় মঠে যাই। মঠের একান্ত পরিবেশ আমার ভাল লাগিয়াছিল। স্বামীজী অসুস্থ, কলিকাতায় নিজ বাটীতে আছেন, দেখা পাওয়া যাইবে না জানিয়া নিরাশ হইয়াছিলাম।

ভগিনী নিবেদিতার বাসস্থানের ঠিকানা সংগ্রহ করি। চৌরঙ্গীর এক

বিশাল ভবনে তাঁর সঙ্গে দেখা করি। তাঁর জাঁকজমক দেখিয়া থ হইয়া যাই। কথাবার্তায় আমাদের মধ্যে মিলনের সূত্র পাই নাই। গোখেলকে এ কথা বলিলে তিনি বলেন, 'এই মহিলা চপল-স্বভাবা * তাই তাঁর সঙ্গে যে আপনার বনবে না তা বুঝতে পারি।'

তাঁর সঙ্গে আর একবার আমার পেস্তনজী পাদশাহর বাড়ীতে দেখা হইয়াছিল। পেস্তনজীর বৃদ্ধা মাতাকে তিনি উপদেশ দিতেছিলেন এমন সময়ে আমি সেখানে গিয়া হাজির হই। এই জন্য তাঁদের দুইয়ের মধ্যে আমাকে দোভাষীর কাজ করিতে হয়। আমাদের মনের মিল না থাকিলেও হিন্দুধর্মের প্রতি তাঁর যে উদ্বেলিত প্রেম ছিল তা আমি বুঝিতে পারিয়াছিলাম। তাঁর বই আমি পরে পড়িয়াছিলাম।

দিনে দুই কাজ আমার ছিল: এক, দক্ষিণ আফ্রিকার কাজের ব্যাপারে কলিকাতার প্রধান প্রধান ব্যক্তিদের সহিত দেখা করিতাম; আর দুই, নগরীর ধর্ম ও সার্বজনিক সংস্থায় যাইতাম, পরিচয় লইতাম। ডা. মল্লিকের সভাপতিত্বে বোঅর যুদ্ধে ভারতীয় এম্বুলেন্স কোরের কার্য সম্পর্কে একদিন আমি ভাষণ দিয়াছিলাম। ইংলিশম্যান-এর সহিত আমার পরিচয় এই ব্যাপারেও খুব সহায়ক হইয়াছিল।

এই সময়ে মি. সণ্ডার্স অসুস্থ ছিলেন। কিন্তু ১৮৯৬ সনের মত এবারও তাঁর সহায়তা পাইয়াছিলাম। এই ভাষণ গোখেলের ভাল লাগিয়াছিল এবং ডা. রায় আমার ভাষণের প্রশংসা করিলে তিনি খুব খুশী হইয়াছিলেন।

গোখেলের সঙ্গে থাকার ফলে কলিকাতায় আমার কাজ খুব সহজ

* মূলে 'তেজ' শব্দ রহিয়াছে। বিনীত জোড়নীকোশ-এ 'তেজ'-এর অর্থ এইরূপ দেওয়া হইয়াছে—(১) উগ্র; (২) তীক্ষ্ণ; (৩) চপল। ইংরেজী অনুবাদে 'Volatile' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। Volatile শব্দ প্রয়োগ করিয়া ভগিনী নিবেদিতার ওপর অবিচার করা হইয়াছে 'মডার্ন রিভ্যু'-র এই মন্তব্যের কৈফিয়তে গান্ধীজী ত্রুটি স্বীকার করিয়া ১৯২৭ সনের ৩০শে জুনের 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' পত্রে In Justice to Her Memory শীর্ষক লেখায় বলিয়াছেন: "Though the translation is not mine, I cannot dissociate myself from it, because as a rule I revise these translations, and I remember having discussed the adjective with Mahadev Desai. We both had doubts about the use of the adjective being correct. The choice lay between volatile, violent and fanatical. The last two were considered to be too strong. Mahadev had chosen volatile and I passed it. But neither he nor I had the dictionary meaning in view."—অনুবাদক।

হইয়া যায়, বাংলার প্রধান প্রধান পরিবারের সহিত পরিচয় হয়; বাংলার সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের সুত্রপাত হয়।

এই স্মরণীয় মাসের অনেক কথা আমার ছাড়িয়া যাইতে হইতেছে। এই মাসে ব্রহ্মদেশেও আমি ঢু মারিয়া আসিয়াছিলাম। সেখানে ফুঙ্গীদের সহিত দেখা করিয়াছিলাম। তাদের আলস্য দেখিয়া দুঃখিত হইয়াছিলাম। স্বর্ণ পেগোডা দর্শন করি। অসংখ্য ছোট ছোট মোমবাতি মন্দিরে জ্বলিতেছিল দেখিতে পাই; জিনিসটা ভাল লাগে নাই। গর্ভগৃহে ইঁদুর দৌড়াইতে দেখিয়া স্বামী দয়ানন্দের মোরভীর অভিজ্ঞতার কথা মনে পড়িয়া যায়। ব্রহ্মদেশের মহিলাদের স্বাধীনতা, তাদের উৎসাহ দেখিয়া যতটা মুগ্ধ হইয়াছিলাম পুরুষদের জড়তা দেখিয়া ততটাই বেদনা বোধ করিয়াছিলাম। এই কয় দিনের প্রবাসে আমি বুঝিয়া লইয়াছিলাম যে বোম্বাই যেমন ভারতবর্ষ নহে রেঙ্গুনও তেমন ব্রহ্মদেশ নহে। আরও বুঝিয়াছিলাম যে আমরা যেমন ইংরেজ বণিকদের কমিশন এজেন্ট বা দালাল বনিয়াছি, তেমনি ইংরেজ বণিকদের সঙ্গে জুটিয়া ব্রহ্মদেশবাসীদের আমরা কমিশন এজেন্ট বানাইয়াছি।

ব্রহ্মদেশ হইতে ফিরিয়া আমি গোখেলের কাছ হইতে বিদায় লই। বিয়োগবেদনা অন্তরে বিঁধিয়াছিল। কিন্তু আমার বাংলার অথবা ঠিক ঠিক বলিলে কলিকাতার কাজ শেষ হইয়াছিল। তাই থাকার আর প্রয়োজন ছিল না।

মনে হয় ব্যবসায় আরম্ভ করার পূর্বে তৃতীয় শ্রেণীতে কিছুদিন ভারতের নানা জায়গায় ঘুরিয়া লওয়া যাক। তৃতীয় শ্রেণীতে ভ্রমণের উদ্দেশ্য ছিল তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের যে দুর্ভোগ ভুগিতে হয় তা সাক্ষাৎ অনুভব করা। গোখেলকে আমার সংকল্পের কথা বলি। প্রথমটায় ত তিনি কথাটা হাসিয়াই উড়াইয়া দেন। কিন্তু যখন আমার উদ্দেশ্যের কথা ভাঙ্গিয়া বলি তখন খুশী হইয়া সম্মতি দেন। ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলাম প্রথমে কাশী যাইব ও মিসিস এনি বেসান্টের সঙ্গে দেখা করিব। এনি বেসান্ট তখন সেখানে অসুস্থ ছিলেন।

তৃতীয় শ্রেণীতে ভ্রমণের উপযোগী কিছু জিনিসপত্র যোগাড় করি। গোখেল আমাকে পিতলের একটা কৌটা দেন। তাতে বেসনের লাড্ডু ও পুরি ভরতি ছিল। বার আনা দিয়া একটা ক্যানভাস ব্যাগ কিনি। ছায়া

(পোরবন্দরের অন্তর্বর্তী এক গ্রাম, যেখানে মোটা পশমের থান তৈরী হইত) উলের একটা লম্বা কোট বানাই। লম্বা কোট, পিরান, ধুতি ও টাওয়েল ব্যাগে পুরি। গায়ে চাপাইবার জন্য একটা কম্বলও লই। একটা জগ ত ছিলই। এই মাল লইয়া বাহির হইলাম। আমাকে বিদায় দেওয়ার জন্য গোখেল ও ডা. রায় স্টেশনে আসিয়াছিলেন, তাঁরা না আসুন এই মিনতি করা সত্ত্বেও। আমার অনুরোধ কেন যে রক্ষা করেন নাই তার কৈফিয়ত দিয়া গোখেল বলিয়াছিলেন, 'আপনি প্রথম শ্রেণীতে গেলে কখনই আসতাম না। কিন্তু এখন ত আমার না এসে উপায় ছিল না।'

প্ল্যাটফর্মে ঢুকিতে গোখেলকে কেউ বাধা দেয় নাই। তাঁর মাথায় রেশমী পাগড়ী, পরনে ধুতি ও গায়ে কোট ছিল। ডা. রায় ছিলেন বাঙ্গালীর পোশাকে। টিকেট কলেক্টর তাঁকে আটকায়। 'ইনি আমার বন্ধু', গোখেলের এই কথা শুনিয়া ডা. রায়কে ঢুকিতে দেয়।

এইরূপে তাঁদের আশীর্বাদ কুড়াইয়া আমার যাত্রা আরম্ভ হয়।

২০

কাশীতে

যাইতেছিলাম রাজকোট। ঠিক করিয়াছিলাম পথে কাশী, আগ্রা, জয়পুর পালানপুর দেখিয়া লইব। আর বেশি জায়গায় যাওয়ার সময় ছিল না। এই সব জায়গায় এক এক দিন ছিলাম। এক পালানপুর ছাড়া অন্য সব জায়গায় যাত্রীদের মত হয় ধর্মশালায় নয়ত পাণ্ডাদের বাড়ীতে ছিলাম। যতদূর মনে আছে, এই ভ্রমণে ভাড়া সমেত আমার একত্রিশ টাকা লাগিয়াছিল।

এই তৃতীয় শ্রেণীর ভ্রমণে বেশির ভাগ স্থলে মেল গাড়ীতে না চড়িয়া প্যাসেঞ্জার গাড়ীতে চড়িতাম, কারণ মেল গাড়ীতে বেশি ভিড় আর ভাড়াও বেশি।

তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ী ও তার পায়খানা তখন যেমন নোংরা ছিল আজও বস্তুত তেমনই নোংরা। এক-আধটু উন্নতি হয়ত হইয়া থাকিবে, তবে প্রথম ও তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়ার ব্যবধানের তুলনায় প্রথম শ্রেণীর ও তৃতীয় শ্রেণীর সুবিধায় আকাশ-পাতাল ব্যবধান। তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী নয় ত

ভেড়া আর পায়ও ভেড়ারই সুবিধা। ইউরোপে আমি তৃতীয় শ্রেণীতে যাতায়াত করিতাম। তবে তফাত বোঝার জন্য একবার আমি প্রথম শ্রেণীতে চড়িয়াছিলাম। প্রথম শ্রেণীতে ও তৃতীয় শ্রেণীতে এখানে যে তফাত সেখানে সেই তফাত আমি দেখি নাই। দক্ষিণ আফ্রিকার তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী বেশির ভাগ কাফরী। তাহা হইলেও ওখানকার তৃতীয় শ্রেণীর সুখ-সুবিধা এখানকার চাইতে অধিক। দক্ষিণ আফ্রিকার অনেক অঞ্চলের তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে শোয়ার সুবিধা পর্যন্ত আছে। বসার আসন গদি-আঁটা। যত আসন তার অধিক আরোহী উঠিতে দেওয়া হয় না। এখানে দেখিয়াছি, তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে কত লোক উঠিল সেদিকে নজর পর্যন্ত নাই।

রেলবিভাগের উপেক্ষা ত আছেই। তার ওপর রহিয়াছে যাত্রীদের নোংরা অভ্যাস ও অন্যের অসুবিধা কিসে হয় না হয় সেই বিবেচনার অভাব। আর এই কারণে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন লোকের পক্ষে তৃতীয় শ্রেণীতে চলা শাস্তি হইয়া দাঁড়ায়। যেখানে-সেখানে থুতু ফেলা, আবর্জনা ছড়ানো, যখন-তখন বিড়ি ফুঁকা, পান-জরদার পিচে আশপাশ নোংরা করা, চেঁচাইয়া কথা কওয়া, অকথ্য বুলি বলা, পাশে-বসা লোকের অসুবিধার কথা না ভাবা—এই হইতেছে সার্বত্রিক অনুভব। ১৯০২ সনে আমি তৃতীয় শ্রেণীতে ভ্রমণ করিয়াছি আবার ১৯১৫ হইতে ১৯১৯ সন এই কয় বছর একাদিক্রমে তৃতীয় শ্রেণীতে ভ্রমণ করিতে হইয়াছে—দুই সময়ের মধ্যে তফাত বেশি দেখি নাই।

এই অসহনীয় অবস্থার প্রতিকারের একটাই মাত্র উপায় আমি দেখিতে পাই। তাহা এই: শিক্ষিত লোকেরা এক দিকে যদি তৃতীয় শ্রেণীতে চলাফেরা করে ও লোকের অভ্যাস বদলাইবার চেষ্টা করে এবং অন্য দিকে রেল-কর্মচারীদের ত্রুটী-বিচ্যুতির বিরুদ্ধে অভিযোগের পর অভিযোগ করিয়া যদি রেল-কর্তৃপক্ষকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলে, ঘুষ দিয়া নিজেদের সুবিধা করিয়া না লয়, পাওনা সুবিধা পয়সা দিয়া কিনিবার চেষ্টা না করিয়া লড়াই করিয়া তা আদায় করিতে অগ্রসর হয় ও রেলকর্মচারীদের কোন বেআইনী কাজ বরদাস্ত না করে, তবে আমার বিশ্বাস এই অবস্থার অনেকটা পরিবর্তন ঘটিবে।

১৯১৮-১৯ সনের কঠিন অসুখের পরে তৃতীয় শ্রেণীতে যাতায়াত এক

রকম আমার বন্ধ করিতে হইয়াছে। তার জন্য মনোকষ্ট ভোগ ও লজ্জা বোধ করি, কেন না তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের অসুবিধা দূর করার কাজ যখন অনেকটা আগাইয়া আসিয়াছিল ঠিক তখনই আমার তৃতীয় শ্রেণীতে চলা বন্ধ হইয়া যায়। রেলে ও স্টীমারে গরীবদের তথা তৃতীয় শ্রেণীর আরোহীদের অসুবিধা, নিজেদের নোংরা অভ্যাস দোষে ওই অসুবিধার বৃদ্ধি, সরকার কর্তৃক বিদেশী বণিকদের অনুচিত সুবিধা প্রদান ও এইরূপ অন্য কতকগুলি বস্তু জনজীবনের এক স্বতন্ত্র কিন্তু গুরু প্রশ্ন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দৃঢ়সংকল্প ও উৎসাহী দুই এক জন সেবক এক মনে এক ধ্যানে যদি এই কাজে লাগেন তবে তাঁরা দেখিতে পাইবেন এই কাজ করার মত কাজ।

কিন্তু, এখন এখানে তৃতীয় শ্রেণীর যাতায়াতের কথা ছাড়িয়া কাশীর অভিজ্ঞতার কথায় যাইব। কাশী সকালবেলা পৌঁছি। স্থির করিয়াছিলাম কোন পাণ্ডার বাড়ী উঠিব। কয়েক জন ব্রাহ্মণ আমাকে ঘিরিয়া ধরে। তাদের মধ্যে যাকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও সজ্জন মনে হইল তাকে বাছিয়া লইলাম। দেখিতে পাইয়াছিলাম যে আমার পছন্দ ঠিকই হইয়াছিল। ব্রাহ্মণের উঠানে গাই বাঁধা ছিল। উপরে একটা ঘর ছিল। সেখানে আমি থাকিতে পাইলাম। বিধিমত গঙ্গাস্নান করিব ঠিক ছিল। সুতরাং উপবাসী ছিলাম। পাণ্ডা সব তৈরী করিল। তাকে বলিয়া রাখিয়াছিলাম দক্ষিণা সওয়া টাকার বেশি দিব না, অতএব সে মতে যেন আয়োজন করে। কোন ওজর আপত্তি না করিয়া পাণ্ডা তা মানিয়া লন। বলেন, 'ধনী-গরীব সবার কাজ আমরা একই সমান করি। দক্ষিণা যার যেমন ইচ্ছা ও সাধ্য দেয়।' আমার মনে হয় নাই আমার বেলায় পাণ্ডাজী কোন ক্রিয়া বাদসাধ দিয়াছিলেন। পূজা শেষে বারোটার কাছাকাছি কাশী-বিশ্বনাথ দর্শনে যাই। সেখানে যা দেখি তাতে দুঃখ হইয়াছিল। ১৮৯১ সনে বোম্বাইতে যখন ওকালতি করিতাম তখন 'তীর্থযাত্রায় কাশী' এই বিষয়ের ওপর প্রার্থনা সমাজে এক বক্তৃতা শুনিয়াছিলাম। তাই কিছুটা নিরাশ হওয়ার জন্য তৈরী ছিলাম। তবে তখন ভাবিতে পারি নাই এতটা নিরাশ হইতে হইবে।

মন্দিরের গলি সরু ও পিচ্ছিল। শান্তির নামগন্ধ ছিল না। মাছির ভনভনানিতে ও তীর্থযাত্রী ও দোকানদারদের কোলাহলে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিলাম।

এমন স্থানে লোকে আশা করে ধ্যান ও ভগবৎচিন্তনের আবহাওয়া। তার কিছুই সেখানে নাই। ধ্যান-ধারণা করিতে হয় ত পুরা সহায়তাটাই তাকে সেখানে নিজের ভিতরে খুঁজিতে হয়। এমন ভাববিভোর ভগিনীদেরও সেখানে দেখিয়াছি, আশেপাশে যা চলিতেছে তার দিকে তাঁদের লক্ষ্যও নাই, নিজেদের ধ্যানে তাঁরা নিমগ্ন। কিন্তু তা ত মন্দিরের ব্যবস্থাপকদের ব্যবস্থার ফল নয়। মন্দিরের ভিতরে-বাহিরে শুচিস্নিগ্ধ সুগন্ধ পরিবেশ সৃষ্টি করা সঞ্চালকদের কর্তব্য কর্ম। তার বদলে সেখানে দেখিতে পাইলাম হাল ফ্যাশানের মিঠাই ও খেলনায় ভরতি ঠকের বাজার।

মন্দিরের দরজার সামনে ফুলের স্তূপ : পচিয়া তা দুর্গন্ধ ছড়াইতেছিল। গৃহতল সুন্দর মর্মরে মোড়া। কোন কলাজ্ঞানবিহীন অন্ধ ভক্ত মর্মর ভাঙ্গিয়া টাকা বসাইয়াছে আর সেই টাকা ধূলি-ময়লা নিজ অঙ্গে টানিয়া লইয়া বিশ্রী রূপ ধারণ করিয়াছে।

জ্ঞানবাপীর কাছে গেলাম। ঈশ্বর খুঁজিলাম, পাইলাম না। তাই মনটা বিরক্ত ছিল। দেখিলাম জ্ঞানবাপীর পাশটাও নোংরা। দক্ষিণা চড়াইবার প্রবৃত্তি ছিল না। সত্য বলিতে কি তাই এক পাই চড়াইলাম। তাতে পূজারী পাণ্ডাজী তাতিয়া উঠিলেন। পাইটা আমার দিকে ছুঁড়িয়া মারিয়া দুই-চারটা গালি সংযোগে বলিলেন, 'অপমান করলি, নির্ঘাত নরকে যাবি।'

কথা গায়ে না মাখিয়া ধীরভাবে বলিলাম, 'মহারাজ, ভাগ্যে যা আছে হবে। কিন্তু আপনার মুখে গালি শোভা পায় না। পাই নিতে হয় নিন। নয়ত এ-ও হারাবেন।' 'যা, তোর পাইয়ে আমার কাজ নেই' বলিয়া আরও কিছু উত্তম কথা শুনাইলেন। পাই লইয়া রওনা হইলাম। ভাবিলাম, মহারাজ পাই হারাইল, আমার বাঁচিল। কিন্তু মহারাজ পাই খোয়াইতেই বসিয়াছে! পিছু ডাকিয়া বলিলেন, 'তা চড়া। তোর মত আমি হব না। পাই না নিই ত তোর অমঙ্গল হবে।'

নীরবে পাইটি চড়াইলাম। বাহির হইয়া আসিলাম।

তার পর দুই বার আমি কাশী-বিশ্বনাথে গিয়াছি। সে 'মহাত্মা' হওয়ার পরে। তাই ১৯০২ সনের অভিজ্ঞতা লাভের আর সুযোগ ছিল না। আমার 'দর্শনকারী'রা আমায় দর্শন করিতে দিলে ত! 'মহাত্মা' হওয়ার বেদনা 'মহাত্মাই' জানে। কিন্তু আবর্জনা ও কোলাহল তেমনিই দেখিয়াছি।

ভগবানের অনন্ত করুণার কথায় কারো সংশয় থাকে ত তাকে এই সব

তীর্থক্ষেত্রে যাইতে বলি। কতই না মিথ্যা আড়ম্বর, অধর্ম ও কপটাচার তাঁর নামে চলে ; মহাযোগী সবই সহেন। তিনি ত বলিয়াই রাখিয়াছেন :

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।

'যেমন করবে তেমন পাবে।' কর্মফল এড়াইবে কে? তবে আর ভগবান মাঝখানে পড়িতে যাইবেন কেন? বিধান দিয়াই তিনি খালাস।

মন্দিরে যাওয়ার পরে আমি মিসিস বেসাণ্টকে দর্শন করিতে যাই। জানিতাম তিনি সবে অসুখে ভুগিয়া উঠিয়াছেন। আমার নাম পাঠাইলাম। সঙ্গে সঙ্গে তিনি আসিলেন। নিছক দর্শনের জন্যই গিয়াছিলাম তাই বলিলাম, 'আমি জানি আপনার শরীর ভাল নয়। দর্শনের জন্যই এসে-ছিলাম। শরীর অসুস্থ সত্ত্বেও আপনার দেখা পেলাম এতেই আমি খুশী। আপনার সময় আর নেব না।'

এই বলিয়া বিদায় লইলাম।

২১

বোম্বাই-এ বসিলাম

গোখেলের বড়ই ইচ্ছা ছিল আমি বোম্বাইতে স্থির হইয়া বসি, ব্যারিস্টারি করি ও দশের কাজে তাঁকে সাহায্য করি। তখন দশের কাজের মানে ছিল কংগ্রেসের সেবা। যে সংস্থার সংগঠনে তাঁর হাত ছিল তার মুখ্য কর্ম ছিল কংগ্রেসের তন্ত্র চালনা।

গোখেলের পরামর্শ আমার ভাল লাগিয়াছিল। কিন্তু ব্যারিস্টারি জমিবে কিনা সে বিষয়ে আমার সংশয় ছিল। আগেকার তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা মনে তখনও ছিল। খোশামুদি করিয়া মকদ্দমা যোগাড় করা পূর্বের মতই আমার কাছে বিষের মত ছিল।

তাই প্রথমে আমি রাজকোটে বসি। আমার পুরানো হিতৈষী ও আমার বিলাত যাওয়ার মূল কারণ কেবলরাম মাবজী দবে সঙ্গে সঙ্গে তিনটি কেস দিয়া আমার ব্যবসা চালু করিয়া দেন। দুইটি ছিল কাঠিয়াওয়ারের পলিটিক্যাল্ এজেন্টের জুডিসিয়াল এ্যাসিণ্টাণ্টের আদালতে আপীল। তৃতীয়টি ছিল জামনগরের মূল কেস। এই কেসটা হাতে নিতে ভরসা

পাইতেছি না এরূপ বলিলে কেবলরাম দবে বলিয়া ওঠেন, 'হার-জিতের কথা ভেবো না। সাধ্যমত কর। সাহায্য করতে ত আমি রয়েছি।'

অপর পক্ষে উকিল ছিলেন স্ব. সমর্থ। কেস আমি ভাল করিয়াই তৈরী করিয়াছিলাম। এখানকার আইনের জ্ঞান আমার গভীর ছিল না, কিন্তু কেবলরাম দবে আমাকে খুঁটিনাটি তৈয়ার করিয়া দেন। 'ল অব এভিডেন্স' ফিরোজশার নখাগ্রে আর তার দরুনই তাঁর এই সাফল্য' দক্ষিণ আফ্রিকা যাওয়ার পূর্বে এই কথা এক বন্ধুর মুখে বহুবার শুনিয়াছিলাম। ওই কথা আমার মনে গাঁথিয়া গিয়াছিল। তাই দক্ষিণ আফ্রিকায় যাওয়ার সময় জাহাজে এখানকার 'ল অব এভিডেন্স' টীকা সমেত তন্ন তন্ন করিয়া পড়িয়াছিলাম। তা ছাড়া দক্ষিণ আফ্রিকার অভিজ্ঞতা ত ছিলই।

কেসে জয় হইল। কিছুটা আত্মবিশ্বাস জন্মিল। ওই দুই আপীলের বিষয়ে প্রথম হইতেই আমার কোন ভয় ছিল না। আপীল জয়যুক্ত হইল। তাই মনে হইল বোম্বাই গেলেও কোন অসুবিধা হইবে না।

বোম্বাইয়ে যাওয়ার কথা বলার পূর্বে ইংরেজ আমলাদের অবিচার ও অজ্ঞতার কথা বলিয়া লইব। জুডিশিয়াল এ্যাসিণ্টাটের কোর্ট সব সময় কোন এক স্থানে বসিত না: আজ এখানে কাল ওখানে এইভাবে স্থান বদলাইত। আর যেখানে সেই মহাশয় যাইতেন সেখানে উকিল ও মক্কেলদের দৌড়াইতে হইত। উকিলেরা সদরে যে ফী নিত মফঃস্বলে তাহা হইতে অধিক নিত। তাই মক্কেলদের দ্বিগুণ খরচ হইত। জজ এ কথা ভাবিয়াও দেখিত না।

যে আপীলের কথা বলিতেছি তার শুনানীর স্থান ছিল বেরাবল। তখন সেখানে প্লেগের মড়ক। বেরাবলের জনসংখ্যা ছিল ৫,৫০০। যতদূর মনে পড়ে তার মধ্যে পঞ্চাশ জন দৈনিক রোগে পড়িতেছিল। শহরটা প্রায় শূন্য হইয়া গিয়াছিল। শহর হইতে কিছু দূরে জনশূন্য ধর্মশালায় আমি উঠিয়াছিলাম। কিন্তু মক্কেলেরা যায় কোথায়! গরীব হইলে তাঁদের ভরসা ছিল ভগবান।

বেরাবলে প্লেগ চলিতেছে অতএব কোর্ট অন্য কোথাও বসানো হোক এই মর্মে সাহেবের কাছে দরখাস্ত করার জন্য এক উকিল বন্ধু (তাঁরও কোর্টে কেস ছিল) আমাকে তার করেন। দরখাস্ত পাইয়া সাহেব আমাকে বলিলেন, 'আপনি ভয় পাচ্ছেন?'

বলিলাম, 'প্রশ্নটা আমার ভয়ের নয়। মনে হচ্ছে, আমার ব্যবস্থা আমি করে নিতে পারব। কিন্তু মক্কেলদের কি হবে?'

সাহেব বলিলেন, 'প্লেগ ভারতে ঘর বেঁধেছে। ভয় করলে চলবে কেন? বেরাবলের আবহ চমৎকার (সাহেব শহর হইতে দূরে সমুদ্রের কিনারে মহলের মত তাঁবুতে ছিলেন)! এরূপ খোলা জায়গায় থাকতে লোকের শিখতে হবে।'

এই ফিলসফীর উত্তরে আমার আর কি বলার ছিল? সেরেস্তাদারকে সাহেব বলিলেন, 'মি· গান্ধী যা বললেন তা ভেবে দেখবেন। যদি মনে হয় উকিল ও মক্কেলদের খুব অসুবিধা হবে ত আমাকে বলবেন।'

তাঁর দৃষ্টিতে যা ভাল মনে হইয়াছিল সে কথা ত সাহেব খোলাদিলে বলিয়া দিলেন। কিন্তু গরীব ভারতবাসীদের অসুবিধার আন্দাজ তিনি কি করিয়া করিবেন? সে বেচারা ভারতের লোকের দরকার, অভ্যাস, রুচি ও রীত-রেওয়াজের কথা কি জানে? গিনির মাপে মাপ যার অভ্যাস তাকে পাই-এর মাপে মাপিতে বলিলে ঝট্ করিয়া সে তা পারিবে কেন? শত শুভেচ্ছা সত্ত্বেও হাতি যেমন কিসে পিঁপড়া মরে-বাঁচে এ কথা বুঝিতে অক্ষম ইংরেজও তেমন ভারতবাসীর দৃষ্টিতে ভারতবাসীকে দেখিতে ও তদনুযায়ী আইন করিতে অক্ষম।

এবার মূল বিষয়ে ফিরিয়া যাই। এই সব সফলতা সত্ত্বেও আর কিছু দিন রাজকোটে থাকার কথা ভাবিতেছিলাম। এর মধ্যে একদিন কেবল-রাম আমার কাছে আসিলেন ও বলিলেন, 'গান্ধী, এখানে থেকে তুমি বাড়তে পারবে না। তোমায় বোম্বাই যেতে হবে।'

'সেখানে আমায় কাজ দেবে কে? আপনি খরচ চালাবেন?'

'অবশ্যই চালাব। সময় সময় বড় ব্যারিস্টার রূপে এখানে ডেকে আনব আর মুসাবিদার কাজ ওখানে তোমায় পাঠাব। ব্যারিস্টারদের ছোট-বড় বানানো ত উকিল আমাদের হাতে। তুমি নিজ যোগ্যতার প্রমাণ জামনগরে ও বেরাবলে দিয়েছ অতএব আমি নিশ্চিন্ত। সার্বজনিক কাজের জন্য তোমার জন্ম, কাঠিওয়াড়ে তোমার কবর হবে, তা হতে দেব না। বল, কবে যাবে?'

'নাতাল থেকে কিছু টাকা আসবার কথা। তা পেলেই যাব।'

দুই এক সপ্তাহ মধ্যে টাকা পাইলাম ও আমি বোম্বাই রওনা হইলাম।

পেইন গিলবার্ট ও সয়ানীর আপিসে চেম্বার লইলাম; মনে হইল বোম্বাইতে স্থির হইলাম।

২২
ধর্মসংকট

আপিস নিলাম তেমন গিরগাঁও-এ বাসাও ভাড়া করিলাম। কিন্তু ভগবান আমায় স্থির হইয়া বসিতে দিলে ত! নূতন গৃহে যাওয়ার অল্প দিন পরে আমার দ্বিতীয় পুত্র মণিলালের (ছোট বেলায় শক্ত বসন্তেও ভুগিয়াছিল) কঠিন টাইফয়েড হয়। তাপ নামিত না। সঙ্গে নিউমোনিয়াও ছিল। আর রাতে বিকার।

ডাক্তার ডাকিলাম। তিনি বলিলেন ওষুধে বিশেষ কাজ হইবে না। ডিম ও মাংসের যূসের ব্যবস্থা দিলেন।

মণিলাল তখন দশ বছরের ছিল। তাকে জিজ্ঞাসা করাও যা নিজকে জিজ্ঞাসা করাও তা। আমি তার অভিভাবক। নির্ণয় আমারই করিতে হইল। ডাক্তার সজ্জন ব্যক্তি ছিলেন—পারসী। তাঁকে বলিলাম, আমরা সবাই নিরামিষাশী। আমার মতে এই দুই বস্তুর কোনটিই চলবে না। অন্য কোন ব্যবস্থা করতে পারেন না?”

ডাক্তার বলিলেন, ‘আপনার ছেলের প্রাণের আশঙ্কা রয়েছে। দুধে জল মিশিয়ে দেওয়া যেতে পারে, তবে তাতে পুরো পুষ্টি মিলবে না। আপনি ত জানেন যে অনেক হিন্দু পরিবারও আমায় ডাকে। আমার ব্যবস্থা তাঁরা মেনে নেন। আমার মনে হয় আপনার অতটা কঠোর না হওয়া ভাল।’

‘আপনি যা বলছেন তা ঠিক। ডাক্তারের দৃষ্টি হতে এ কথা আপনি খুবই বলতে পারেন। আমার দায়িত্ব এখানে অত্যন্ত বেশি। ছেলে সাবালক হলে তার ইচ্ছা অবশ্যই জানার চেষ্টা করতাম আর তাকে তার ইচ্ছামত চলতে দিতাম। এই ক্ষেত্রে ছেলের হয়ে আমাকেই নির্ণয় করতে হবে। এরূপ সময়েই মানুষের ধর্মের পরীক্ষা হয় এ কথা আমি মনে করি। সঙ্গতই হোক বা অসঙ্গতই হোক, মাংস, ডিম ইত্যাদি না খাওয়া আমি ধর্মের অঙ্গ মনে করি। জীবন ধারণের উপকরণেও কোথাও সীমা

টানতে হয়। এমন কতক জিনিস আছে জীবন রক্ষার জন্যও যা করা চলে না। এমন সময়েও সে সব আমি নিজে করতে বা পরিবারের কাউকে করতে বলতে পারি না। অতএব আপনি যে ভয় করছেন সে ঝুঁকি আমায় নিতে হচ্ছে। কিন্তু আপনার কাছে একটা মিনতি। আপনার চিকিৎসা করাতে পারছি না। জলের কতকগুলি প্রয়োগের কথা আমি জানি। তা করে দেখব। কিন্তু বুক বা নাড়ী পরীক্ষা করতে আমি জানি না, তাই বালকের শরীরের অবস্থা আমি বুঝতে পারব না। অনুগ্রহ করে সময় সময় আপনি যদি মণিলালের শরীর পরীক্ষা করে কখন কি পরিবর্তন ঘটে আমাকে বলেন ত আমি আপনার নিকট কৃতজ্ঞ থাকব।'

ডাক্তার ভাল লোক ছিলেন। তিনি আমার অসুবিধা বোঝেন ও বলেন, মণিলালকে তিনি দেখিতে আসিবেন। যদিও মণিলালের পক্ষে নির্ণয় করা সম্ভব ছিল না তবুও ডাক্তারের সঙ্গে আমার যে কথা হইয়াছিল তাকে তা আমি বলি ও তার মত জানিতে চাই।

'নিশ্চিন্ত মনে আপনি জল-চিকিৎসা করুন। মুরগীর যূস আমি খাব না, ডিমও না।'

এই কথায় আমি খুশী হইলাম, যদ্যপি আমি জানিতাম যে আমি বলিলে এই দুই বস্তু সে খাইত।

ক্যুনের চিকিৎসা আমার জানা ছিল, আর উহার প্রয়োগও আমি করিয়াছিলাম। উপবাস অসুখে ফল দেয় এ কথা আমি জানিতাম। ক্যুনের পদ্ধতিমতে মণিলালকে আমি কটি-স্নান করাইতে লাগিলাম। তিন মিনিটের বেশি তাকে আমি টবে রাখিতাম না। তিন দিন জলমিশ্রিত কমলালেবুর রস ছাড়া অন্য কোন পথ্য তাকে দেই নাই।

তাপ কমিতেছিল না, কখন কখন ১০৪° পর্যন্ত উঠিত। রাতে প্রলাপ বকিত। ভয় পাইলাম। বালক চলিয়া যায় ত লোকে আমায় কি বলিবে। বড়দা কি ভাবিবেন! অন্য ডাক্তার ডাকিলে হয় না? আয়ুর্বেদ চিকিৎসা করানো ত যায়? নিজেদের খেয়াল সন্তানের ওপর চাপানোর কি অধিকার মা-বাপের আছে?—ইত্যাদি নানা কথা মনে উঠিল।

আবার ইহার উল্টা ভাবও: তুই নিজের বেলায় যা করতিস ছেলের বেলায়ও তা করিস ত ঈশ্বর খুশী হবেন। জল-চিকিৎসায় তোর বিশ্বাস, ওষুধে নয়। ডাক্তার কি রোগীকে জীবন দেয়? সে ত পরীক্ষাই চালায়।

জীবনের ডোর একমাত্র ঈশ্বরের হাতে। তাই ঈশ্বরের নাম নে, তাঁর ওপর বিশ্বাস রাখ ও নিজ পথ আঁড়াইয়া থাক—মনে ধাক্কা দিতেছিল।

এরূপ বিপরীত ভাবের আনাগোনা মনে চলিতেছিল। রাত হইল। মণিলালের পাশে আমি শোয়া ছিলাম। মনে হইল, জল-নিংড়ানো ভেজা চাদরে মণিলালকে ঢাকিয়া দিলে হয় না? উঠিলাম। চাদর লইলাম। ঠাণ্ডা জলে তা ডুবাইলাম। নিংড়াইলাম। তা দিয়া পা হইতে গলা পর্যন্ত মণিলালকে ঢাকিয়া দিলাম। তার ওপর দুই কম্বল চাপা দিলাম। মাথায় ভেজা তোয়ালে রাখিলাম। শরীর যেন তপ্ত কড়ার মত শুকনো, জ্বরে ভাজিতেছিল। ঘামের লেশও ছিল না।

অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়াছিলাম। আধঘণ্টাটাক খোলা হাওয়ায় বেড়াইয়া ক্লান্তি দূর করার ও শান্তি লাভের জন্য মণিলালকে তার মায়ের হেপাজতে রাখিয়া আমি চৌপাটী গেলাম। তখন দশটা হইবে। লোকের চলাচল কমিয়া গিয়াছিল। মন ভাবনায় ব্যাকুল ছিল, কোন দিকে খেয়াল ছিল না। ঈশ্বরকে ডাকিতেছিলাম, বলিতেছিলাম, ‘এই ধর্মসংকটে তুমি আমার মান রাখ।’ আর মুখে ‘রাম’ ‘রাম’ আওড়াইতেছিলাম। একটু পায়চারি করিয়া ঘরে ফিরিলাম: বুক ধড়ফড় করিতেছিল।

ঘরে ঢুকিতেই মণিলাল বলিল, ‘বাপু, এসেছ!’

‘এসেছি, বাবা।’

‘এ থেকে আমায় বের করো। জ্বলে মরছি।’

‘ঘাম বেরিয়েছে কি? দুলাল!’

‘ভিজে চুবচুব হয়েছি। চাপা সরিয়ে দাও বাপু।’

মণিলালের কপালে হাত দিয়া দেখিলাম বিন্দু বিন্দু ঘাম বাহির হইয়াছে। তাপ নামিতেছে। ভগবানের উদ্দেশ্যে মাথা নোয়াইলাম।

‘মণিলাল, এখন তোমার জ্বর ছাড়বে। আর একটু বেশি ঘাম বেরুতে দেবে না?’

‘না, বাপু। এই আগুনের কুণ্ড থেকে ত আমায় বার করো। পরে না হয় আবার ঢাকবে।’

কথায় ভুলাইয়া আরও মিনিট কয়েক কাটাইয়া দিলাম। কপাল হইতে ঘাম ধারায় গড়াইতেছিল। চাদর সরাইলাম। গা পুছিয়া দিলাম। বাপবেটা একসাথে খুব ঘুমাইলাম, বেহুঁশ ঘুম ঘুমাইলাম।

সকাল বেলা গায়ের তাপ অনেকটা কমিল। জলমেশানো দুধ ও ফলের রস, এই পথ্য চল্লিশ দিন চলিল। ভয় কাটিয়া গিয়াছিল। জ্বর ছাড়িয়াও ঠিক ছাড়িতেছিল না। কিন্তু তখন তা আয়ত্তে আসিয়াছিল।

মণিলালের স্বাস্থ্য এখন আমার সকল ছেলের স্বাস্থ্য অপেক্ষা অনেক ভাল। মণিলাল রামের কৃপায়, কি জলচিকিৎসার ফলে, কি অল্প পথ্যের কারণে অথবা শুশ্রূষার গুণে সারিয়া উঠিয়াছিল সে কথা কে বলিবে? যাঁর যেমন দৃষ্টি তিনি এই ব্যাপারটাকে সেভাবে দেখিবেন। আমার নিজের মনে হইয়াছিল আর আজও মনে হয় যে, ঈশ্বর আমার মান রক্ষা করিয়াছিলেন।

২৩

আবার দক্ষিণ আফ্রিকায়

মণিলাল সারিয়া উঠিল, কিন্তু আমার মনে হইল যে গিরগাঁওয়ের বাড়ী স্যাঁতসেঁতে ও আলোহীন বলিয়া থাকার যোগ্য নয়। অতএব রেবাশঙ্কর জগজীবনের সহিত পরামর্শ করিয়া বোম্বাইর শহরতলিতে খোলা জায়গায় ঘরভাড়া লওয়া স্থির করিলাম। বাঁদরা, সান্তাক্রুজ ইত্যাদি স্থান ঘুরিয়া দেখিলাম। বাঁদরায় কসাইখানা ছিল বলিয়া সে পাড়ায় থাকার ইচ্ছা ছিল না। ঘাটকোপর ও উহার আশপাশের জায়গা সমুদ্র হইতে বেশ দূরে। অবশেষে সান্তাক্রুজে একটা বাংলা পাওয়া যায়। সকলের মনে হয় স্থানটা স্বাস্থ্যের অনুকূল। ভাড়া করিলাম।

চার্চগেটে যাওয়ার প্রথম শ্রেণীর টিকেট কিনিলাম। অনেক দিন দেখিতাম প্রথম শ্রেণীতে আমি একমাত্র যাত্রী। মনে পড়ে এজন্য মনে একটু অভিমান বোধ করিতাম। বেশির ভাগ দিন বাঁদরা পর্যন্ত হাঁটিয়া গিয়া চার্চগেটের টানা দ্রুত ট্রেন ধরিতাম।

যতটা আশা করিয়াছিলাম তাহা অপেক্ষা আয়ের দিক হইতে আমার ব্যবসা ভালই চলিতেছিল। আমার দক্ষিণ আফ্রিকার মক্কেলরা মধ্যে মধ্যে আমাকে কাজ দিত; তার ফলে সহজে আমার সংসারখরচ মিটিয়া যাইত।

তখনও হাইকোর্টের কোন কাজ পাই নাই। কিন্তু 'মুট'-এ (বিতর্কে) আমি যাইতাম। তাতে যোগ দিতাম না: সাহসে কুলাইত না। মনে আছে

জমিয়তরাম নানাভাঈ উহাতে এক প্রধান অংশ গ্রহণ করিতেন। অন্যান্য নূতন ব্যারিস্টারদের মত আমিও হাইকোর্টে কেস শুনিতে যাইতাম। শেখার টানে যতটা না যাইতাম তার চাইতে সমুদ্রের ফুরফুরে হাওয়ায় ঢোলার টানে বেশি যাইতাম। অন্য সাথীদের ঢুলিতে দেখিতাম তাই লজ্জা বোধ হইত না। মনে হইত ঢোলাটাও এক কায়দা বটে!

তবে হাইকোর্ট লাইব্রেরিতে পড়াশুনা করিতে ও লোকের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করিতে লাগিলাম। মনে হইতেছিল অল্প দিনেই হাইকোর্টে কাজ জুটিবে।

এইভাবে এক দিকে ব্যবসা সম্পর্কে যখন আমি কিছুটা নিশ্চিন্ত বোধ করিতেছিলাম তখন অন্য দিকে আমাকে কি কাজে লাগাইবেন সে কথা গোখেল ভাবিতেছিলেন। তাঁর দৃষ্টি ত আমার ওপর ছিলই। সপ্তাহে দুই তিন বার তিনি আমার চেম্বারে ঢু মারিতেন। খবর লইতেন। কোন কোন দিন সঙ্গে বিশেষ কোন বন্ধুকে লইয়া আসিতেন। তাঁদের সঙ্গে পরিচয় করিয়া দিতেন। নিজের কাজের পরিচয় দিতেন।

কিন্তু এ কথা বলা যাইতে পারে যে, ভগবান কোন দিনও কি আমায় আমার মত চলিতে দিয়াছেন? আমি ভাবিয়াছি এক, তিনি আমা দ্বারা করাইয়াছেন আর এক।

স্থির হইয়া বসিব স্থির করিয়াছি ও কতকটা স্থির হইয়াছি বলিয়া মনে হইয়াছে এমন সময় আচমকা দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে তার পাইলাম: 'চেম্বারলেন এখানে আসছেন। আপনার আসা দরকার।' দেওয়া-কথার কথা মনে পড়িল। তার করিলাম: 'খরচের ব্যবস্থা করলে রওনা হব।' টাকা দিন কয়েক মধ্যে আসিল। আপিস ছাড়িলাম; পাততাড়ি গুটাইলাম; দক্ষিণ আফ্রিকা রওনা হইলাম।

বুঝিয়াছিলাম কম পক্ষে এক বছর ওখানে আমার থাকিতে হইবে। মনে হইল বাড়ীটা না-ছাড়া ও ছেলেদের ওখানে রাখাই ঠিক হইবে।

যে সব যুবকের দেশে কাজ মিলে না সাহসী হয় ত তাদের দেশান্তরে যাওয়া উচিত তখন আমার ভাবনা এইরূপ ছিল। তাই আমি এরূপ চার-পাঁচ জন যুবক সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলাম। মগনলাল গান্ধী ছিল তাদের একজন।

গান্ধী পরিবার বৃহৎ ছিল আর এখনও বৃহৎ। বাঁধাধরা পথ ছাড়িয়া

নিজেদের পথ নিজেরা বাছিয়া লইতে আগ্রহী ছেলেদের বিদেশে যাওয়া আমি পছন্দ করিতাম। বাবা এরূপ কিছুসংখ্যক লোককে রাজ্য সরকারে চাকরি করিয়া দিয়াছিলেন। আমি চাহিতাম এই নোকরির মোহ তারা কাটাইয়া উঠুক। তাদের চাকরি করিয়া দেওয়ার ক্ষমতা আমার ছিল না, আর থাকিলেও সে ইচ্ছা আমার ছিল না। তারা ও অন্য সকলে স্বাবলম্বী হউক এই ছিল আমার দৃষ্টি ।

কিন্তু পরে আমার আদর্শ যখন আগাইয়া যায় (আমি তেমন মনে করি) তখন তাদিগকে আমি আমার আদর্শের দিকে মোড় ঘুরাইতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। তাদের মধ্যে মগনলাল গান্ধীকে আমার পথে টানিতে আমি সর্বাধিক সফলকাম হইয়াছিলাম। কিন্তু সে কথা পরে বলিব।

স্ত্রীপুত্রের সহিত ছাড়াছাড়ি, পাতা সংসার ভাঙ্গা, নিশ্চিত হইতে অনিশ্চিতে প্রবেশ—এই সব ক্ষণেকের তরে বিঁধিয়াছিল। কিন্তু অনিশ্চিতে আমি অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিলাম। চারিদিকে যা দেখি, চারিদিকে যা ঘটে, সবই অনিশ্চিত, ক্ষণিক। এই অনিশ্চিতের পরপারে যে পরম তত্ত্ব লুকাইয়া রহিয়াছে তার দর্শন মিলে ত, তাতে জীবনতরী জুড়িয়া দেওয়া যায় ত জীবন সার্থক। সেই খোঁজই পরম পুরুষার্থ।

একদিন আগেও না একদিন পরেও না, ঠিক সময়ে ডারবনে গিয়া পৌঁছি। কাজ আমার অপেক্ষায় ছিল। চেম্বারলেনের কাছে ডেপ্যুটেশন যাওয়ার দিন ধার্য হইয়াছিল। তাঁর কাছে পড়ার আরজি লেখা ও ডেপ্যুটেশনের সঙ্গে যাওয়া এই দুই কাজ আমার ছিল।

আত্মকথা ঃ চতুর্থ ভাগ

১

যা কিছু লাভ সব বরবাদ

মি· চেম্বারলেন দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে সাড়ে তিন কোটি পাউণ্ড নিতে এবং ইংরেজদের আর সম্ভব হইলে বোঅরদের মন জয় করিতে আসিয়াছিলেন, তাই ভারতীয় প্রতিনিধিদের বরাতে ঠাণ্ডা জবাব মিলিল :

'আপনারা ত জানেনেই যে স্বায়ত্তশাসিত উপনিবেশ সরকারের ওপর ওপরওয়ালা সরকারের কথা বড় একটা চলে না। আপনাদের অভিযোগ সত্য বলে মনে হয়। আমি আমার সাধ্যমত করব। তবে এখানে থাকতে হলে যতটা পারা যায় গোরাদের খুশী রেখেই আপনাদের থাকতে হবে।'

জবাব শুনিয়া প্রতিনিধিরা দমিয়া গেলেন। আমি নিরাশ হইলাম। আমাদের সকলেরই উহা চোখ ফুটাইয়া দিল। বুঝিলাম 'কেঁচে গণ্ডূষ' করিতে হইবে। সাথীদের অবস্থাটা বুঝাইলাম।

মি· চেম্বারলেনের কথায় দোষই বা কি ছিল? ঘুরাইয়া পেঁচাইয়া না বলিয়া মোলায়েম শব্দে সোজা 'লাঠি যার মাটি তার' এই ন্যায়ের কথা তিনি স্মরণ করাইয়া দিয়াছিলেন।

কিন্তু লাঠি আর আমাদের কোথায় ছিল? লাঠি খাওয়ার মত শরীরও প্রায় ছিল না।

মি. চেম্বারলেন মাত্র কয়েক সপ্তাহের জন্য আসিয়াছিলেন। দক্ষিণ আফ্রিকা ছোটখাট জায়গা নয়। একটা দেশ, উপমহাদেশই বলা চলে। আফ্রিকা উপমহাদেশের সমষ্টি। কন্যাকুমারী হইতে শ্রীনগর ১৯০০ মাইল ত ডারবন হইতে কেপটাউন ১১০০ মাইলের কম নয়। চেম্বারলেন ঝড়ের বেগে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাইতেছিলেন।

নাতাল হইতে সোজা তিনি ট্রান্সভালে যান। সেখানকার ভারতীয়দের কেস তৈরি করিয়া তাঁর কাছে আমার পেশ করার ছিল কিন্তু প্রিটোরিয়ায় কিরূপে যাই? সেখানে সময়মত পৌঁছিতে পারি আমার জন্য এমনটা অনুমতি সংগ্রহ করা ওখানকার ভারতীয়দের পক্ষে সম্ভবপর ছিল না।

যুদ্ধে ট্রান্সভাল একরকম উজাড় হইয়া গিয়াছিল। না ছিল পেটে খাওয়ার, না ছিল কটিতে পরার বস্ত্র। দোকানপাট সব খালি, তালা-আঁটা। মালে সেইসব ভরতি হইলে ও তাদের কপাট খুলিলে তবে লোকে জিনিসপত্র পাইবে। ঝাঁ করিয়া তা হওয়ার ছিল না। মাল আমদানি হইতে থাকিলে তবে না ঘরদোর ছাড়িয়া চলিয়া যাওয়া লোকদের আসিতে দেওয়া যায়। তাই নিজ ঘরে ফিরিয়া আসার জন্য প্রত্যেক ট্রান্সভালবাসীর পাস লইতে হইত। গোরারা সহজেই পাস পাইত। ভারতীয়দের পাস মেলা ভার ছিল।

যুদ্ধের সময়ে ভারতবর্ষ ও লঙ্কা হইতে অনেক রাজকর্মচারী ও সিপাহী দক্ষিণ আফ্রিকায় আসে। তাদের মধ্যে যারা যারা সেখানে থাকিয়া যাইতে চায় ব্রিটিশ সরকারের মনে হয় তাদের সেই স্থবিধা দেওয়া উচিত। নূতন অফিসারের দরকারও ছিল। অতএব সহজেই ওই সব অভিজ্ঞ লোক চাকরি পাইল। তাদের মধ্যে কয়েকজন ধারালো-বুদ্ধি চক্রী অফিসার একটি নূতন বিভাগই খুলিয়া বসিল। আর এই বিভাগ কর্মকুশলতার পরিচয়ও দিল। নিগ্রোদের জন্য একটা বিশেষ বিভাগ ত ছিলই। এশিয়াবাসীদের জন্য তবে তেমন একটা বিভাগ নয় কেন? ওপর ওপর দেখিতে যুক্তিটা অঠিক ছিল না। আমার ওখানে যাওয়ার আগেই এই বিভাগ খোলা হইয়াছিল এবং আস্তে আস্তে উহা নিজের জাল ছড়াইতেছিল। ভারপ্রাপ্ত অফিসাররা যে-কোন উদ্বাস্তুকে পাস দিতে পারিত কিন্তু এই নূতন বিভাগের স্থপারিশ বিনা এশিয়াবাসীদের তারা কি করিয়া পাস দেয়? নূতন বিভাগের স্থপারিশ মত পাস দিলে পারমিট অফিসারদের ঝুঁকি ও বোঝা কিছুটা হাল্কাও হইয়া যায়। এই ছিল নূতন বিভাগের যুক্তি। আসলে নূতন বিভাগ চাহিতেছিল কাজের অজুহাত স্মষ্টি করিতে ও পয়সা লুটিতে। কাজ না থাকিলে এই বিভাগের আবশ্যকতা প্রমাণ হয় না আর সেজন্য শেষটায় উঠিয়াও যাইতে পারে, তাই এই কাজ তারা স্মষ্টি করিয়া লয়।

ভারতীয়দের এই বিভাগে দরখাস্ত করিতে হইত। উত্তর অত্যন্ত দেরীতে মিলিত। ট্রান্সভালে যাওয়ার লোক অনেক ছিল, তাই এক দল দালাল দেখা দেয়। দালালেরা ও কর্মচারীরা দুইয়ে মিলিয়া গরীব ভারতীয়দের হাজারো টাকা লুটিয়া লইত। শুনিতে পাইলাম যে প্রভাব বিনা প্রবেশের অনুমতি-পত্র পাওয়া যায় না, এবং অনেক সময় স্থপারিশ সত্ত্বেও শত শত

টাকা দক্ষিণা দিতে হয়। এভাবে আমার পথ কোন দিকেই খোলা ছিল না। আমি পুরানো বন্ধু পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের কাছে গেলাম ও তাঁকে বলিলাম, 'আপনি পারমিট অফিসারের কাছে পরিচয়-পত্র দিন ও পারমিট পাই সে ব্যবস্থা করুন। ট্রান্সভালে আমি ছিলাম তা ত আপনি জানেনই।' তখনই টুপি পরিয়া আমাকে সঙ্গে লইয়া বাহির হইলেন এবং পারমিট করিয়া দিলেন। গাড়ী ছাড়িবার পুরা এক ঘণ্টাও বাকী ছিল না। জিনিস-পত্র আমি গুছাইয়া রাখিয়াছিলাম। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে কৃতজ্ঞতা জানাইলাম, প্রিটোরিয়া রওনা হইলাম।

কিরূপ অসুবিধায় পড়িতে হইবে তা পরিষ্কার বুঝিতে পারিলাম। প্রিটোরিয়ায় পৌঁছিলাম। আরজি মুসাবিদা করিলাম। ডারবনে প্রতিনিধিদের নাম আগে জানিতে চাওয়া হইয়াছিল বলিয়া মনে পড়ে না। কিন্তু এখানে নূতন বিভাগ কায়েম হইয়াছিল। তারা প্রতিনিধিদের নাম চাহিয়া পাঠাইল। প্রিটোরিয়ার ভারতীয়রা পূর্বেই জানিতে পারিয়াছিল যে কর্মচারীরা আমাকে ডেপ্যুটেশন হইতে বাদ দিবে।

এই দুঃখের অথচ মজাদার কাহিনী অন্য প্রকরণে বলিব।

২

এশিয়ার নবাবী দক্ষিণ আফ্রিকায়

আমি কিভাবে ট্রান্সভালে প্রবেশ করিয়াছি নূতন বিভাগের বড় কর্তারা তা ঠাহর করিয়া উঠিতে পারে নাই। তাদের কাছে যে সব ভারতীয় যাতায়াত করিত তাদের নিকট তারা খোঁজখবর করিয়াছিল। কিন্তু সে বেচারারা কি তা জানিত? তারা ধরিয়া লইল আমার পূর্ব-পরিচয়ের জোরে বিনা পারমিটে আমি প্রবেশ করিয়া থাকিব আর সে অবস্থায় আমাকে গ্রেপ্তার করা যাইবে।

বড় যুদ্ধের পরে সাধারণত সরকারের হাতে বিশেষ ক্ষমতা দেওয়া হয়। দক্ষিণ আফ্রিকায়ও তাহাই করা হইয়াছিল। শান্তি রক্ষার নিমিত্তে এক জরুরী আইন জারি করা হইয়াছিল। বিনা পারমিটে প্রবেশকারী লোককে সেই আইন বলে গ্রেপ্তার ও কয়েদ করা চলিত। এই ধারা মতে আমাকে

গ্রেপ্তার করার সলা-পরামর্শ চলিতেছিল। কিন্তু সাহস করিয়া আমার কাছে কেউ পারমিট চাহিতে পারিতেছিল না।

অফিসারেরা ডারবনে তার করিল। অনুমতি লইয়া প্রবেশ করিয়াছি জানিতে পারিয়া নিরাশ হইল। কিন্তু হাল ছাড়িবার পাত্র তারা ছিল না। ট্রান্সভালে না হয় আসিয়াই গিয়াছি, তাই বলিয়া মি· চেম্বারলেনের কাছে আমার যাওয়ার পথে বাধা সৃষ্টি করিতে তাদের কে আটকায়!

সে মতে ডেপুটেশনে যারা যাইবে তাদের নাম তারা চাহিয়া পাঠাইল। দক্ষিণ আফ্রিকার এখানে ওখানে সর্বত্রই বর্ণবিদ্বেষ ছিল, তবে ভারতবর্ষে যে নোংরামি ও চালবাজি দেখিয়াছি এখানেও তা দেখিতে হইবে তার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। দক্ষিণ আফ্রিকার সরকারী বিভাগগুলি লোকসেবার জন্য গঠিত হইয়াছিল ও জনমতের নিকট দায়ী ছিল। সুতরাং রাজকর্মচারীদের আচরণে কতকটা সৌজন্য ও বিনয় দেখা যাইত। আর এই সুবিধাটা গোরা ভিন্ন অন্য লোকেরাও কম-বেশী ভোগ করিত। এখন এশিয়ার অফিসারদের সহিত এশিয়ার নবাবশাহীও আসিল আর আসিল নবাবী সেই মেজাজ ও ধাত। দক্ষিণ আফ্রিকায় এক প্রকারের প্রজাধিকার ছিল কিন্তু এশিয়া হইতে যে চিজ আমদানি হইয়াছিল তারা ছিল নিছক স্বেচ্ছাচারী। তার কারণ এশিয়ায় প্রজাসত্তা ছিল না, প্রজা ছিল বিদেশী শাসনাধীন। ইউরোপীয়রা দক্ষিণ আফ্রিকায় ঘর-দোর বাঁধিয়া বসিয়া গিয়াছিল সুতরাং ওখানকার তারা অধিবাসী ছিল; বিভিন্ন বিভাগের কর্মচারীদের ওপর তাদের এক্তিয়ার ছিল। এই কাঠামোতে এশিয়ার স্বেচ্ছাচারীদের আমদানিতে ভারতীয়রা ডাঙ্গায় বাঘ আর জলে কুমিরের মত অবস্থায় পড়িল।

এই স্বৈরাচারের আঁচ আমার গায়েও বেশ লাগিল। সিংহল হইতে আগত এই বিভাগের প্রধানের কাছ হইতে হুকুম আসিল আমাকে তার কাছে হাজির হইতে হইবে। পাঠকের মনে হইতে পারে 'হুকুম' শব্দ অতিশয়োক্তি। তাই একটু খুলিয়া বলি। লিখিত আদেশ আমার ওপর জারি করা হইয়াছিল তা নয়। ভারতীয়দের অগ্রণীদের হামেশা এই দপ্তরে যাইতে হইত। স্ব· তৈয়ব হাজী খাঁ মহম্মদ এই নেতাদের অন্যতম ছিলেন। তাঁর কাছে এই সাহেব জিজ্ঞাসা করে আমি কে এবং কেন সেখানে আসিয়াছি।

তৈয়ব শেঠ জবাবে বলেন, 'তিনি আমাদের পরামর্শদাতা। তাঁকে আমরা ডেকে এনেছি।'

সাহেব বলেন, 'আমরা তবে এখানে কি করতে রয়েছি? আপনাদের রক্ষার জন্যই কি আমরা নিযুক্ত হইনি? গান্ধী এখানকার অবস্থার কি জানে?'

এই চোটপাটের জবাবে তৈয়ব শেঠের যেমনটা যোগাইল তিনি বলিলেন, 'আপনারা ত আছেনই। তবে গান্ধী আমাদের আপন জন। নয় কি? তিনি আমাদের ভাষায় কথা বলেন, আমাদের বোঝেন। শত হলেও আপনারা রাজকর্মচারী।'

সাহেব হুকুম করিল, 'গান্ধীকে আমার কাছে নিয়ে আসতে হবে।'

তৈয়ব শেঠ ও অন্য কয়েক জনের সঙ্গে আমি গেলাম। আমরা সেখানে বসিতে পাইব তাও কি হয়? সকলকে দাঁড়াইয়া থাকিতে হইল।

আমার দিকে চাহিয়া সাহেব বলিল, 'বলুন, আপনি এখানে কেন এসেছেন?'

বলিলাম, 'আমার দেশবাসীরা আমায় ডেকেছেন পরামর্শ দিয়ে তাদের সাহায্য করতে। তাই এসেছি।'

'কিন্তু আপনি জানেন না কি যে এখানে আপনার আসার অধিকার নেই? আপনি আসার অনুমতি পেয়েছেন, সে ভুলে। আপনাকে এখানকার অধিবাসী বলে গণ্য করা চলে না। এখান থেকে আপনাকে চলে যেতে হবে। মি. চেম্বারলেনের কাছে আপনি যেতে পারেন না। এখানকার ভারতীয়দের রক্ষা করার জন্যই না বিশেষ করে এশিয়াটিক ডিপার্টমেন্ট খোলা হয়েছে। আচ্ছা, যান।' এই বলিয়া সাহেব বিদায় লইল। আমার কথা বলার সুযোগ আমি পাইলাম না।

কিন্তু আমার সঙ্গীদের সাহেব থাকিতে বলিল। তাঁদের সে খুব ধমকাইল। আমাকে ট্রান্সভাল হইতে বিদায় করিতে তাঁদের বলিল।

বন্ধুরা অপদস্থ হইয়া ফিরিলেন। এইভাবে হঠাৎ আমাদের সামনে এক সমস্যা উপস্থিত হইল।

৩

অপমান হজম করিলাম

এই অপমানে আমার গা জ্বলিতেছিল, কিন্তু এরূপ অপমান পূর্বে কতবারই না সহ্য করিয়াছি অতএব জিনিসটা গা-সহা হইয়া গিয়াছিল। তাই অপমান গায়ে না মাখিয়া কিছুই যেন হয় নাই এইভাবে নিজ কর্তব্য করিয়া যাওয়া স্থির করিলাম।

এশিয়াটিক বিভাগের বড় কর্তার এক পত্র আসিল। তাতে বলা হইয়াছিল যে মি· গান্ধী ডারবনে মি· চেম্বারলনের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন। তাই এই ডেপ্যুটেশন হইতে তাঁর নাম বাদ দেওয়া আবশ্যক হইয়াছে।

এই পত্র সাথীদের কাছে অসহ্য লাগিল। তাঁরা বলিলেন ডেপ্যুটেশনে যাইয়া কাজ নাই। ভারতীয় সমাজের বিসদৃশ অবস্থার কথা বুঝাইয়া বলিয়া তাঁদের আমি বলিলাম:

'আপনারা যদি মি· চেম্বারলেনের নিকটে ডেপ্যুটেশনে না যান ত ধরে নেওয়া হবে এখানে ভারতীয়দের কোন অভাব-অভিযোগ নেই। আমাদের কথা ত লিখেই ধরা হবে। আর তৈরিও তা হয়েছে। আমিই তা পড়ি বা অন্য কেউ তাতে কিছু এসে যায় না। মি· চেম্বারলেন এই নিয়ে আমাদের সঙ্গে আলোচনা করবেন না। আমার অপমানটা আপনাদের গিলতে হবে।'

আমার কথা শেষ হইতে না হইতে তৈয়ব শেঠ বলিয়া উঠিলেন, 'কিন্তু আপনার অপমান ত সমাজেরই অপমান, নয় কি? আপনি যে আমাদের প্রতিনিধি সে কথা কি করে ভুলি?'

আমি বলি, 'সত্য বটে কিন্তু সমাজেরও এরূপ অপমান গিলতে হবে। অন্য কোন পথ আমাদের আছে কি?'

'যা হবার হবে। নূতন অপমান ডেকে আনতে যাই কেন? অমনিও ত মন্দ হচ্ছেই। কি অধিকার আছে যে খোয়াব?'

—তৈয়ব শেঠ বলিলেন।

এই কথায় তেজ ছিল। ভালও আমার লাগিয়াছিল। কিন্তু আমি জানিতাম, ওই তেজ কাজে আসিবে না। আমাদের দৌড় যে কতটা তা আমার অজানা ছিল না। তাই সাথীদের আমি শান্ত করি ও আমার স্থানে

জর্জ গডফ্রেকে (তিনি ভারতীয় ছিলেন আর ব্যারিস্টারও) লইয়া যাইতে বলি।

তাই মি· গডফ্রে ডেপ্যুটেশনের অগ্রণী হন। আমাকে বাদ দেওয়ার বিষয়ে মি· চেম্বারলেন ডেপ্যুটেশনকে বলেন, 'একই প্রতিনিধির কথা বার বার শোনার চাইতে নূতন কারোর কথা শোনা ভাল নয় কি।' এই কথায় তিনি ক্ষতটাকে মলমে মোলায়েম করিতে চেষ্টা করেন।

কিন্তু ইহাতে নিষ্পত্তি ত হইলই না, উল্টা সমাজের ও আমার কাজ বাড়িয়া গেল। আবার গোড়া হইতে আরম্ভ করার পালা আসিল।

'আপনার কথায়ই না সমাজ যুদ্ধে সহায়তা করেছিল। এই ত তার পরিণাম!'—এরূপ চিমটিও কেউ কেউ কাটিয়াছিল। কিন্তু ওই খোঁটা গায়ে না মাখিয়া আমি বলিয়াছিলাম, 'আমার তাতে আপসোস নেই। সহায়তা আমরা করেছিলাম; আজও আমি মনে করি ঠিক কাজ করা হয়েছিল। সহায়তা করেছিলাম না বলে বলব আমরা আমাদের কর্তব্য করেছিলাম। সত্য বটে তার ফল আপনারা দেখতে পাচ্ছেন না, তবুও আমি বলি যে ভাল কাজের ফল ভাল ছাড়া কখনও মন্দ হয় না। গত কথা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই। এখন আমাদের কর্তব্য কি সেই কথা ভাবাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। সে কথা আপনারা বিবেচনা করুন।' অন্যেরা আমার কথায় সায় দেন।

আমি আরও বলিয়াছিলাম, 'যে কাজের জন্য আপনারা আমায় ডেকেছিলেন, বস্তুত সে কাজ শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে, আপনারা আমায় ছুটি দিলেও যত দিন আমার পক্ষে থাকা সম্ভব ততদিন ট্রান্সভালে আমার পড়ে থাকা কর্তব্য। নাতাল আর নয়, ট্রান্সভালকে এখন আমার কর্মক্ষেত্র করতে হবে। এক বছর মধ্যে ফিরে যাওয়ার কথা আমি ছাড়ছি ও এখানে ওকালতি করার সনদ নিচ্ছি। এই নূতন বিভাগকে দেখে নেবার শক্তি আমার আছে। এই বিভাগকে সায়েস্তা করতে না পারলে সর্বস্ব খুইয়ে ভারতীয়দের এখান হতে উৎখাত হতে হবে। অপমানের মাত্রা দিন দিন বেড়ে যাবে। মি· চেম্বারলেন আমার সঙ্গে দেখা করতে অস্বীকার করেছেন, ওই অফিসার আমার সঙ্গে অভদ্র ব্যবহার করেছে, সমাজের অপমানের তুলনায় আমার এই অপমান কিছুই নয়। এরা আমাদের কুকুরের মত নাচাবে আর আমরা নাচব, এ অসহ্য।'

এইভাবে আলোচনার চক্র গতি লাভ করিল। প্রিটোরিয়ার ও জোহানিসবর্গের ভারতীয়দের সহিত কথা বলিলাম। জোহানিসবর্গে আপিস খোলা ঠিক করিলাম।

ট্রান্সভাল সুপ্রীম কোর্টে ওকালতি করার সনদ পাইব কিনা এই বিষয়ে সন্দেহ ছিল। কিন্তু উকিল মণ্ডলী হইতে আমার দরখাস্তের বিরোধ হয় নাই এবং সুপ্রীম কোর্ট আমার আবেদন মঞ্জুর করে। কোন ভারতীয়ের পক্ষে উপযুক্ত স্থানে আপিস খোলার মত ঘর পাওয়া শক্ত ছিল। মি· রীচের সহিত আমার মোটামুটি বেশ আলাপ-পরিচয় হইয়া গিয়াছিল। তিনি ওখানকার ব্যবসায়ীদের একজন ছিলেন। তাঁর পরিচিত একজন হাউস-এজেণ্টের সাহায্যে আইনী মহলে ভাল আপিস পাই ও ওকালতি শুরু করি।

বাড়ন্ত ত্যাগবৃত্তি

ট্রান্সভালের ভারতীয়দের অধিকারের জন্য কিরূপ লড়াই লড়িতে হইয়াছিল ও এশিয়াটিক ডিপার্টমেণ্টের মোকাবিলা কিভাবে করিতে হইয়াছিল তা বলার পূর্বে আমার জীবনের আর একটা দিক দেখিয়া লওয়া আবশ্যক।

এতদিন আমার বৃত্তি একাগ্র ছিল না। পরমার্থে স্বার্থের খাদ ছিল।

বোম্বাইতে যখন আপিস খুলিয়াছিলাম তখন এক সুদর্শন ও সুভাষী মার্কিন বীমাদালাল আমার কাছে আসে। আমরা যেন কত দিনের পুরানো বন্ধু এই ভাবে আমার ভবিষ্যৎ কল্যাণের কথা সে পাড়ে: 'আমেরিকায় আপনার পদমর্যাদার সব লোকে বীমা করে। আপনারও তেমনি ভবিষ্যতের জন্য নিশ্চিন্ত হওয়া উচিত। শরীরের কি কিছু বিশ্বাস আছে? মার্কিন আমরা বীমা করাকে ধর্ম জ্ঞান করি। যেমন তেমন একটি পলিসী নিন এ কথা বলতে পারি কি?'

এর আগে বহু দালাল দক্ষিণ আফ্রিকায় ও ভারতে আমার কাছে আসিয়া আমল পায় নাই। আমি মনে করিতাম লোকে বীমা করে ভয়ে ও ভগবানের ওপর আস্থার অভাবে। কিন্তু এই বেলায় আমি মার্কিন এজেণ্টের ফুসলানিতে ভুলিলাম। সে যখন কথা বলিতেছিল আমার চোখের সামনে

তখন স্ত্রীপুত্রের ছবি ভাসিয়া ওঠে। 'ভাল, স্ত্রীর গহনা বেচে তুমি প্রায় শেষ করেছ। তোমার কিছু ঘটে ত স্ত্রীপুত্রের দায় তোমার গরীব দাদা, যিনি বাবার স্থান নিয়েছেন ও মহান্ উদারতায় সব কিছু বইছেন, তাঁর ওপরই না বর্তাবে? সে কি ঠিক হবে?'—এরূপ যুক্তি দিয়া মন তৈয়ার করিলাম, ১০,০০০ টাকার বীমা করিলাম।

কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকায় আমার জীবনের গতি ঘোরার সঙ্গে সঙ্গে মনের গতিও ঘুরিয়া যায়। ওই পরীক্ষার কালে যা কিছু আমি করিয়াছিলাম সবই ভগবানের নামে তাঁরই সেবার নিমিত্ত করিয়াছিলাম। জানিতাম না কতদিন দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকিতে হইবে। ধরিয়া লইয়াছিলাম ভারতে আমার ফিরিয়া আসা হইবে না, তাই স্ত্রীপুত্র আনার কথা ঠিক করি; মনে হয় তাদের দূরে রাখা উচিত নয়। তাদের ভরণপোষণের মত টাকা রোজগার করার কথাও ভাবি। মন স্থির হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জীবনবীমা করিয়াছি বলিয়া মনে দুঃখ হয়, বীমাদালালের ফাঁদে পা বাড়াইয়াছি বলিয়া লজ্জা বোধ করি। মনে মনে বলি, 'যে দাদা বাবার স্থান নিয়েছেন তিনি ছোট ভাইয়ের বিধবাকে বোঝা মনে করবেন এ কথা তুই মনে করতে গেলি কেন? তুই আগে মরবি এ কথাই বা ধরে নিলি কেন? পালন করার মালিক ঈশ্বর, না তুই, না তোর ভাই? বীমা করে তোর ছেলেপিলেদের তুই পরাধীন করেছিস। তারা নিজের পায়ে দাঁড়াবে না কেন? লাখো লাখো গরীবের ছেলেপিলের কি হয়? নিজেকে তুই তাদের একজন মনে করিসনে কেন?'

চিন্তার এরূপ নানা প্রবাহ মনে বহিতে থাকে। এই ভাবনা মত তখনই কাজ করিয়াছিলাম তা নয়। মনে পড়ে বীমার এক কিস্তি টাকা দক্ষিণ আফ্রিকায় দিয়াছিলাম।

বাইরের ঘটনাপ্রবাহেও আমার এই চিন্তাধারা পুষ্ট হয়। দক্ষিণ আফ্রিকার প্রথম প্রবাসকালে খ্রীস্টান পরিবেশে আসার দরুন আমার ধর্মভাব জাগ্রত হয়। এবার থিয়োসোফীর আবহাওয়ায় আসি। ধর্মজিজ্ঞাসা আরও একটু বাড়ে। মি. রীচ থিয়োসোফিস্ট ছিলেন। জোহানিসবর্গের সোসাইটীর সহিত তিনি আমার যোগাযোগ করিয়া দেন। আমি উহার সভ্য হই নাই। দৃষ্টিভেদ আমার ছিল। তা হইলেও প্রায় সকল থিয়োসোফিস্টদের নিকট-সম্পর্কে আসিয়াছিলাম। প্রতিদিন তাঁদের সঙ্গে ধর্মালোচনা হইত। তাঁদের

সঙ্গে থিয়োসোফীর পুস্তকের পাঠ চলিত, তাঁদের বৈঠকে কখন কখনও ভাষণও দিতাম। ভ্রাতৃভাবের অনুশীলন ও প্রসার থিয়োসোফীর মূল লক্ষ্য। এই বিষয়ে খুব আলোচনা হইত। আদর্শের সহিত আচরণের ভেদ দেখিতে পাইলে সংঘের মেম্বরদের সমালোচনা করিতাম। ওই সমালোচনায় আমার নিজেরও কতকটা উপকার হইয়াছিল। আত্মনিরীক্ষণ আমার করিতে হইত।

৫

আত্মনিরীক্ষণের ফল

সন ১৮৯৩-এ যখন খ্রীস্টান বন্ধুদের নিকট সম্পর্কে আসি তখন আমি আনাড়ী জিজ্ঞাসু মাত্র ছিলাম। খ্রীস্টান বন্ধুরা বাইবেলের বাণী আমায় শুনাইতেন, ব্যাখ্যা করিয়া তা বুঝাইয়া দিতেন আর যীশুকে আমি স্বীকার করি সেই চেষ্টা করিতেন। খোলা মনে, নম্রভাবে তাঁদের কথা আমি শুনিতাম। সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুধর্মের পড়াশুনা আমি সাধ্যমত করিতেছিলাম। অন্য ধর্ম বোঝার চেষ্টাও আমার চলিতেছিল।

সন ১৯০৩-এ অবস্থাটা দাঁড়াইয়াছিল কতকটা ভিন্ন। থিয়োসোফিস্ট বন্ধুরা তাঁদের সোসাইটীতে আমাকে টানিতে চেষ্টা করিতেন বটে, তবে তা করিতেন তাঁরা হিন্দু আমার কাছ হইতে কিছু পাওয়ার আশায়। থিয়োসোফীর সাহিত্যে হিন্দুধর্মের ছায়া ও প্রভাব সুস্পষ্ট। তাই বন্ধুরা মনে করিতেন আমার কাছ হইতে সহায়তা পাইবেন। তাঁদের আমি বলিয়াছিলাম যে আমার সংস্কৃতের জ্ঞান অতি অল্প, প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ মূলে পড়ি নাই, আর অনুবাদেও কম পড়িয়াছি। তবুও সংস্কার ও পুনর্জন্মে বিশ্বাস বিধায় তাঁরা ধরিয়া লইয়াছিলেন যে আমা হইতে অল্প-বিস্তর সহায়তা তাঁদের মিলিবেই। বৃক্ষহীন দেশে লোকে এরণ্ডকে যেমন বৃক্ষ মনে করে আমার অবস্থাও ঠিক তা-ই। কয়েকজন বন্ধুর সহিত বিবেকানন্দের রাজযোগ ও অন্য কয়েকজনের সহিত নভুভাইয়ের রাজযোগ পাঠ করিয়াছিলাম। কোন এক বন্ধুর সহিত পাতঞ্জল যোগশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে হইয়াছিল। গীতাপাঠ অনেকের সহিত চলিয়াছিল। ছোট এক জিজ্ঞাসা 'মণ্ডল' আমরা খুলিয়াছিলাম। নিয়মিত পাঠ সেখানে চলিত। গীতা-ভক্তি ও গীতা-প্রীতি আগে হইতেই আমার

ছিল। এখন উহার গভীরে প্রবেশ করার আকাঙ্ক্ষা জাগিল। দুই-একখানি অনুবাদ আমার কাছে ছিল। উহার সাহায্যে মূল সংস্কৃত বোঝার চেষ্টা করিতে থাকি। ঠিক করি, প্রতিদিন একটি বা দুইটি শ্লোক কণ্ঠস্থ করিব।

দাঁত মাজার ও স্নান করার সময়ে সকালবেলা শ্লোক মুখস্থ করিতাম। দাঁত মাজিতে পনর ও স্নান করিতে কুড়ি মিনিট লাগিত। পশ্চিমী ধরনে দাঁত দাঁড়াইয়া মাজিতাম। গীতার শ্লোক লিখিয়া দেওয়ালে আঁটিয়া লইতাম, আওড়াইতাম, প্রয়োজনমত দেখিয়া লইতাম। এভাবে আওড়াইতে আওড়াইতে স্নানের সময়ে শ্লোক মনে গাঁথিয়া যাইত। ওই সময়টায় পূর্বের মুখস্থ শ্লোকগুলিও একবার ঝালাইয়া লইতাম। মনে আছে এভাবে তের অধ্যায় কণ্ঠস্থ করিয়া লইয়াছিলাম। পরে কাজের চাপে ও সত্যাগ্রহের জন্ম হইলে উহার পরিচর্যায় ও ভাবনা-চিন্তায় আর কোন দিকে মন দেওয়ার অবকাশ আমার ছিল না, আজও যেমন নাই।

সহাধ্যায়ীদের ওপর এই গীতাধ্যয়নের প্রভাব কি হইয়াছিল তাঁরাই জানেন; আমার কাছে এই পুস্তক জীবন-আচরণের অব্যর্থ পথপ্রদর্শক হইয়া যায়। অজানা ইংরেজী শব্দের বানান ও অর্থ যেমন ইংরেজী অভিধান দেখিয়া নির্ণয় করি, তেমনি কর্তব্য নির্ণয়ের কথায় বা জটিল সমস্যা সমাধানের প্রশ্নে আমি গীতার শরণ লই।

‘অপরিগ্রহ’ ও ‘সমভাব’ ইত্যাদি শব্দ আমায় পাইয়া বসে। সমভাব কিভাবে আসে আর তা রক্ষা করাই বা যায় কিরূপে; যে লোক অপমান করিয়াছে, যে লোক ঘুষ খায়, যে কর্মচারী অভদ্র আচরণ করে, যে সাথী পূর্বে অকারণ বিরোধ করিয়াছে আর যে লোক বরাবর ভাল করিয়াছে এই সবকে এক চোখে দেখার উপায় কি; অপরিগ্রহ পালন করার পথ কি; আমাদের দেহই কি মস্ত এক পরিগ্রহ নয়; স্ত্রীপুত্রাদি পরিগ্রহ নয় কি; আলমারি ভরতি বইগুলি কি জ্বালাইয়া দিব; যা কিছু সব ত্যাগ করিয়া কি তাঁর শরণ নেব? ইত্যাদি প্রশ্ন মনে জাগিল। অন্তর হইতে সোজা জবাব আসিল: সব কিছু হোমে না চড়াইলে তাঁকে পাওয়া যায় না। ইংরেজের আইন এখানে আমায় পথ দেখাইল। স্নেলের কানুনী আচার সংহিতার—ইক্যুইটীর—কথা মনে পড়িল। গীতার অধ্যয়নের ফলে ‘ট্রাস্টী’ শব্দের অর্থ আমার কাছে আরও স্পষ্ট হইয়া গেল। আইন-শাস্ত্রের জুরিস-প্রুডেন্স-এর ওপর আমার শ্রদ্ধা বাড়িল। তাতেও আমি ধর্ম দেখিতে

পাইলাম। 'ট্রাস্টীর' কোটি কোটি টাকা থাকে কিন্তু তার এক পয়সাও সে নিজের মনে করে না। মুমুক্ষুর অমনটাই হইতে হয় গীতামাতার কাছ হইতে আমি এই শিক্ষা পাই। হৃদয়ের পরিবর্তন বিনা অপরিগ্রহী ও সমভাবী হওয়া যায় না এ কথা আমি দিবালোকের মত স্পষ্ট দেখিতে পাই। যে ভগবান আমার স্ত্রীপুত্র ও আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন তিনিই আমাদের দেখিবেন এই কথা বলিয়া রেবাশঙ্কর ভাইকে লিখি তিনি যেন আমার পলিসী বাতিল হইয়া যাইতে দেন, কিছু আদায় হয় ভাল, নয়ত যেন মনে করেন ও টাকা মারা গিয়াছে। পিতা সম বড়দাকে লিখি—এতদিন যা কিছু বাঁচিয়াছে তা তোমাকে দিয়াছি। এবার আমার আশা ছাড়িবে। এখন হইতে যা কিছু বাঁচিবে তা এখানকার ভারতীয়দের কাজে যাইবে।

কথাটা বড়দাকে অত তাড়াতাড়ি বুঝাইতে পারি নাই। কঠোর ভাষায় তাঁর প্রতি আমার কর্তব্যের কথা তিনি আমায় স্মরণ করাইয়া দেন ও বলেন আমি যেন বাবার চাইতে বুদ্ধিমান হইতে না যাই, বাবা যেমন পরিবার প্রতিপালন করিতেন আমারও তেমন প্রতিপালন করা কর্তব্য ইত্যাদি। আমি তাঁর কথার প্রতি-উত্তরে নম্রভাবে জানাই যে, আমি বাবার কাজই করিতেছি, পরিবার শব্দের অর্থ একটু ব্যাপক করিলেই আমার পদক্ষেপের মর্ম তিনি বুঝিতে পারিবেন।

বড়দা আশা ছাড়েন। পত্র লেখাও বস্তুত বন্ধ করেন। এতে আমার অবশ্য দুঃখ হইয়াছিল। কিন্তু যা ধর্ম মনে করিয়াছিলাম তা ত্যাগ করিলে আমার আরও অধিক দুঃখ হইত। দুইয়ের মধ্যে যেটা কম দুঃখের সেটা বাছিয়া লই। বড়দাকে আমি আন্তরিক ভক্তি করিতাম। ওই ঘটনায় তাঁর প্রতি আমার ভক্তি কমেও নাই আর মলিনও হয় নাই। তিনি আমাকে অতিশয় ভালবাসিতেন। তাই তিনি বেদনা অনুভব করিয়াছিলেন। আমার পয়সা তিনি যত-না চাহিতেন তার চাইতে বেশি চাহিতেন সংসারের প্রতি আমি আমার কর্তব্য করি।

প্রায় শেষ সময়ে বড়দা আমার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়াছিলেন। মৃত্যু ঘনাইয়া আসিলে তিনি দেখিতে পান যে আমি সত্য ও ধর্মের পথ আশ্রয় করিয়াছি। তিনি আমায় বেদনাভরা পত্র লিখেন, বাবা ছেলের কাছে ক্ষমা চাইতে পারে এ কথা যদি বলা চলে ত বলিব বড়দা ক্ষমা চাহিয়াছিলেন। তিনি তাঁর ছেলেদের আমার হাতে সঁপিয়া দেন ও আমার

ইচ্ছামত তাদের লালনপালন করিতে বলেন। আমার সঙ্গে দেখা করার জন্য তিনি ব্যাকুল হইয়াছিলেন। তারে আমাকে জানান যে তিনি দক্ষিণ আফ্রিকায় আসিবেন। জবাবে তার করিয়া তাঁকে আসিতে বলি। কিন্তু অদৃষ্টে আমাদের মিলন ছিল না।

তাঁর পুত্রদের বিষয়ে তিনি যা আশা করিয়াছিলেন তাও পূর্ণ হয় নাই। বড়দা দেশে দেহত্যাগ করেন। ছেলেরা অন্য আবহাওয়ায় গড়িয়া উঠিয়াছিল। তাদের পরিবর্তন হইল না। এতে তাদের দোষ ছিল না। স্বভাব কি বদলানো যায়? বলবান সংস্কার কি মুছিয়া ফেলা যায়? আমরা চাই যে আমাদের মত পরিবর্তন ও বিকাশ আমাদের আশ্রিত ও সাথীদেরও ঘটুক। আমরা ভুলিয়া যাই যে আমাদের এই আশা মিথ্যা। মাতাপিতা হওয়ার দায়িত্ব যে কত বড় তার আভাস এই দৃষ্টান্ত হইতে পাওয়া যাইবে।

নিরামিষ আহারের জন্য ত্যাগ

জীবনে যেমন ত্যাগ ও সাদাসিধা ভাব ও ধর্মজাগৃতি বাড়িতেছিল তেমন নিরামিষ আহার ও উহা প্রচারের আগ্রহ আমার প্রবল হইতেছিল। আপনি আচরি ও জিজ্ঞাসুদের বিচারি—প্রচারের এই একটা মাত্র পথই আমি জানি।

জোহানিসবর্গে একটা নিরামিষ ভোজনগৃহ ছিল। ক্যুনের জল-চিকিৎসায় বিশ্বাসী এক জর্মন তা চালাইত। সেখানে আমি যাইতাম এবং যত পারিতাম ইংরেজ বন্ধুদের সঙ্গে লইয়া যাইতাম। কিন্তু আমি দেখিতে পাই যে উহা বেশিদিন টিকিবে না। টাকার অভাব তার লাগিয়াই ছিল। যতটা সাহায্য পাইতে পারে মনে হইয়াছিল সাহায্য করিয়াছিলাম। কিছু টাকাও আমার নষ্ট হইয়াছিল। শেষ পর্যন্ত তা উঠিয়া যায়।

থিয়োসোফিস্টদের অনেকে নিরমিশাষী—কেউবা পুরা, কেউবা কতকটা ওই গোষ্ঠীর। এক সাহসী মহিলা বেশ জাঁকালো এক নিরামিষ ভোজনগৃহ খোলে। কারুশিল্পের দিকে তার ঝোঁক ছিল; বেহিসাবী ছিল। হিসাবনিকাশ বুঝিত না। বন্ধু তার অনেক ছিল, কাজটা ছোট আকারে সে শুরু করিয়াছিল। পরে বড় করার উদ্দেশ্যে বড় বড় ঘর ভাড়া নেয় ও

আমার কাছে সহায়তা চায়। তার হিসাবপত্রের খোঁজখবর আমার ছিল না। ধরিয়া লইয়াছিলাম তার বরাদ্দ ঠিক। পয়সা আমার হাতে ছিল: মক্কেলদের অনেকের পয়সা আমার কাছে জমা থাকিত। তাদের একজনের সম্মতি লইয়া তার গচ্ছিত টাকা হইতে এক হাজার পাউণ্ড দেই। এই মক্কেল বিশাল হৃদয়ের ছিল, বিশ্বাসী ছিল। গিরমীটিয়া হইয়া সে বলে, 'ভাই, আপনার মনে হয় ত দিন। আমি আপনাকে জানি, আর কিছু জানি না।' তার নাম বদ্রী। সত্যাগ্রহে তার ভূমিকা বেশ বড় ছিল। ফাটক ভোগও তার হইয়াছিল। এইটুকু সম্মতি পাইয়া আমি টাকা ধার দেই।

দুই তিন মাস মধ্যে আমি জানিতে পাই যে ওই টাকা ফেরত পাওয়া যাইবে না। এত বড় ক্ষতি বহন করার শক্তি আমার ছিল না। এমন অনেক কাজ হাতে ছিল যাতে ওই টাকা লাগাইতে পারিতাম। ওই টাকা আর ফেরত পাওয়া যায় নাই। কিন্তু স্বভাববিশ্বাসী বদ্রীর টাকা মারা যাইতে দেওয়া যায় কি? সে আমাকে বই জানিত না। ওই টাকা আমি নিজে পূরণ করি।

কোন মক্কেল বন্ধুকে ওই লেনদেনের কথা বলিলে তিনি মিষ্টি চুটকি কাটিয়া বলিয়াছিলেন:

'ভাই (আমার ভাগ্যের কথা, দক্ষিণ আফ্রিকায় না হইয়াছিলাম আমি 'মহাত্মা' না হইয়াছিলাম 'বাপু'। মক্কেল বন্ধুরা আমাকে 'ভাই' বলিয়া ডাকিত।), কাজটা ঠিক করেন নাই। এ টাকা আপনি ফেরত পাবেন না। জানি বদ্রীকে আপনি বাঁচিয়ে নেবেন, কিন্তু আপনার নিজের যাবে। সংস্কারের কাজে অনেক মক্কেলের পয়সা যদি এভাবে লাগান ত মক্কেলরা শেষ হবে আর ভিখারী হয়ে আপনার ঘরে বসতে হবে। আপনার সার্বজনিক কাজ খতম হবে।'

সুখের কথা এই বন্ধু বাঁচিয়া আছেন। কি দক্ষিণ আফ্রিকায় কি অন্য কোথাও তাঁহা অপেক্ষা শুদ্ধচরিত্র লোক আমি দেখি নাই। কাউকে সন্দেহ করার পরে যদি তিনি বুঝিতে পারিতেন যে ভুল করিয়াছেন ত সেই লোকের কাছে তিনি ক্ষমা চাহিতেন।

দেখিতে পাই যে সাবধান করিয়া দিয়া তিনি ভাল করিয়াছিলেন। বদ্রীর পয়সা আমি দিয়া দিয়াছিলাম। কিন্তু অমনটা হাজার পাউণ্ড আবার খোয়াইতাম ত তা পূরণ করা আমার অসাধ্য হইত, আর সে স্থলে জীবনে

আমি যা করি নাই ও সদা ঘৃণা করিয়াছি সেই কাজ—ধার—আমায় করিতে হইত। বুঝিতে পাইলাম যে সংস্কারের আগ্রহেও নিজ শক্তির অতিরিক্ত কিছু করা অসঙ্গত। কর্ম অনাসক্তভাবে করিতে হয় গীতার এই মূল শিক্ষার উল্টা আচরণ যে আমি করিয়াছিলাম সে কথাও আমি বুঝিতে পাই। এই ভুল আমার পক্ষে দীপস্তম্ভ হইয়া রহিয়াছে।

নিরামিষ ভোজনের প্রচারার্থে এরূপ ক্ষতি স্বীকারের মনোভাব আমার ছিল না। ওটা ছিল আমার বেগতিকের তীর্থযাত্রা।

৭

মাটি ও জলের প্রয়োগ

ওষুধে অরুচি আমার বরাবরই ছিল। জীবন সরল সহজ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে অরুচি বাড়িতে থাকে। ডারবনে যখন ওকালতি করিতাম তখন ডা. প্রাণজীবন মেহতা আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসেন। সে সময়টায় আমি দুর্বলতায় ও কখন কখন গাঁট-বাতে ভুগিতাম। তিনি তার জন্য ওষুধ ব্যবস্থা করেন। অসুখ সারিয়া যায়। তার পর দেশে ফিরিয়া আসা পর্যন্ত তেমন কোন বিশেষ অসুখে ভুগিয়াছি বলিয়া আমার মনে পড়ে না।

কিন্তু জোহানিসবর্গে আমার দাস্ত পরিষ্কার হইত না ও কখন কখন মাথা ধরিত। সময় সময় জোলাপ লইতাম। আহারের বিষয়ে ত সাবধান ছিলামই। তবুও বলা যাইবে না আমি একেবারে রোগমুক্ত ছিলাম। বিরেচকের হাত হইতে কি করিলে বাঁচা যাইবে এটা সর্বক্ষণের চিন্তা ছিল।

ম্যানচেস্টার-এ 'নো-ব্রেকফাস্ট এসোসিয়েশন' স্থাপনা হইয়াছে এই খবরটার ওপর ওই সময়ে আমার চোখ পড়ে। তাদের যুক্তি ছিল এই : ইংরেজেরা অনেক বার খায় ও বেশি খায় : রাত বারোটা পর্যন্ত তাদের খানা-পিনা চলে আর তাই তাদের ডাক্তারের শরণ লইতে হয় ও ওষুধের খরচ বাড়ে। অন্তত সকালের খাওয়া বাদ দিলে এই আপদ হইতে বাঁচা যায়। দেখিতে পাই আমার বেলায় এই সব কথা পুরোটা না খাটিলেও কতকটা খাটে। তিনবার আমি ভরপেট খাইতাম, তা ছাড়া বিকালে চা খাইতাম। অল্পাহারী আমি কোন কালেই ছিলাম না। নিরামিষে বিনা

মশলায় যত রকম রুচিকর খাদ্য হইতে পারে খাইতাম। ঘুম হইতে ছয়টা-সাতটার আগে বড় একটা উঠিতাম না। ইহা হইতে আমার মনে হয় যে সকালের খাওয়া বাদ দিলে আমার মাথাধরা অবশ্য সারিবে। সকাল-বেলার খাওয়া ছাড়ি। দিন কয়েক বেশ কষ্ট হয়, কিন্তু মাথাধরা একদম সারিয়া যায়। ইহা হইতে আমি ধরিয়া লই যে প্রয়োজনের অধিক আমি খাইতাম।

কিন্তু কোষ্ঠ-কাঠিন্যের অসুবিধা এতে দূর হইল না। ক্যুনের কটিস্নানের উপচার করিলাম। তাতে কতকটা উপকার হইল; আশানুরূপ ফল মিলিল না। এর মধ্যে ওই জর্মন হোটেলওয়ালা বা অন্য কেউ আমাকে জুস্ট-এর 'রীটর্ন টু নেচার' (প্রকৃতির শরণ নাও) পুস্তকখানি দেন। তাতে মাটি প্রয়োগের কথা পড়ি। এই বইয়ে লেখক বলিয়াছেন যে বাদাম ও টাটকা ফল মানুষের প্রকৃতিনির্দিষ্ট খাদ্য। কেবল ফলাহারের সুপারিশ অনুসারে তখন আমি চলি নাই। কিন্তু মাটির উপচার তখনই আরম্ভ করি। উহার আশ্চর্য ফল ফলে। প্রয়োগ-পদ্ধতি এইরূপ ছিল: লাল বা কাল ক্ষেতের পরিষ্কার মাটি পরিমাণ মত ঠাণ্ডা জলে ভিজাইয়া পরিষ্কার ভেজা পাতলা কাপড়ে জড়াইয়া পেটে লাগাইয়া পটি দিয়া বাঁধিয়া রাখা। এই পুলটিস শোয়ার সময় রাতে বাঁধিতাম আর সকালে বা তার আগে ঘুম ভাঙ্গিলে খুলিয়া ফেলিতাম। এতে কোষ্ঠ-কাঠিন্য আমার একেবারে সারিয়া যায়। মাটির এই প্রয়োগ পরে নিজের ওপর ও আমার সঙ্গীদের ওপর অনেক বার করিয়াছিলাম। কোন ক্ষেত্রে তা নিষ্ফল হইয়াছিল বলিয়া মনে পড়ে না। দেশে ফেরার পরে তেমনটা আত্মবিশ্বাসে উহার প্রয়োগ আমি করিতে পারি নাই। তার এক কারণ, কোন এক জায়গায় বসিয়া ইহার প্রয়োগ করার সুযোগ আমি পাই নাই। তা হইলেও মাটি ও জলের চিকিৎসায় আমার বিশ্বাস তখন যেমন ছিল বস্তুত তেমনই আছে। এখনও নিজের বেলায় আমি এই উপচারের প্রয়োগ করি আর প্রসঙ্গ উপস্থিত হইলে সঙ্গীদেরও তেমনটা করিতে বলি।

দুইবার আমি কঠিন রোগে ভুগিয়াছি। তথাপি আমি মনে করি মানুষের ওষুধ খাওয়ার প্রয়োজন বিশেষ নাই। হাজারে নয় শত নিরানব্বইটি অসুখ পথ্য আর মাটি ও জল ইত্যাদি ঘরোয়া টোটকায় সারিতে পারে।

কথায় কথায় বৈদ্য, হাকিম ও ডাক্তারের কাছে যে দৌড়ায়, ভেষজ ও

রাসায়নিক ওষুধ গিলে, আয়ু ত তার ক্ষয় হয়ই অধিকন্তু নিজ মনের ওপর কর্তৃত্ব হারাইয়া সে মনুষ্যত্ব খোয়ায় এবং শরীরের প্রভু না হইয়া হয় উহার দাস।

বিছানায় শোয়া রোগী এই কথা লিখিতেছে বলিয়া কেউ যেন কথাটা উড়াইয়া দিবেন না। আমার অসুখের কারণ আমি জানি। নিজ দোষেই আমি অসুখে পড়িয়াছি এই জ্ঞান ও বোধ আমার ষোল-আনা আছে; তাই আমি অধীর হই নাই। এই সব ব্যামো আমি ভগবানের আশীর্বাদ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি, সুতরাং এটা-ওটা ওষুধ খাওয়ার প্রলোভন হইতে রক্ষা পাইয়াছি। আমি জানি আমার এই একগুঁয়েমির দরুন ডাক্তার বন্ধুরা অসুবিধায় পড়েন। তবে আমাকে ত্যাগ না করিয়া তাঁরা উদারভাবে আমার জিদ মানিয়া নেন।

কিন্তু ওই সময়কার নিজের স্থিতির কথা আর বাড়াইব না। ১৯০৪ সনের কথায় ফিরিয়া যাইতেছি। তার আগে পাঠকদের এখানে একটু সাবধান করিয়া দেওয়া আমার কর্তব্য। এই প্রকরণ পড়িয়া যাঁরা জুস্টের বই কিনিবেন তাঁরা যেন উহার সব কথা বেদবাক্য বলিয়া না মানেন। লেখকেরা প্রায়ই বিষয়ের একটা দিক লোকের সামনে ধরে। কিন্তু যে কোন বিষয় কম পক্ষে সাত দিক হইতে দেখা চলে। আর হয়ত পৃথক পৃথক ভাবে এই সাত দৃষ্টিই ঠিক, যদ্যপি একই সময়ে ও একই প্রসঙ্গে সে সব সত্য নয়। তা ছাড়া, বিক্রী ও নাম-যশের জন্যও অনেক বই লেখা হয়। অতএব লোকে যেন এই সব বই বাছ-বিচার করিয়া পড়েন আর তদনুসারে পরীক্ষা-প্রয়োগ করিতে হইলে অভিজ্ঞ ব্যক্তির পরামর্শ নেন, অন্যথায় ধীরভাবে পড়াশুনা করিয়া জিনিসটা আয়ত্ত করিয়া পরীক্ষায় অগ্রসর হন।

৮

সাবধান

এই প্রকরণেও মূল কথায় ফিরিয়া যাইতে পারিতেছি না। আগের প্রকরণে মাটির প্রয়োগের কথা একটু বলিয়াছি। মাটির প্রয়োগের সঙ্গে সঙ্গে খাদ্যের প্রয়োগও আমার চলিতেছিল। অতএব সে সম্বন্ধে এখানে দুই-চার কথা বলা আবশ্যক। বিশদ আলোচনা যথাস্থানে করা যাইবে।

খাদ্য সম্পর্কে আমার নানা প্রয়োগের সবিস্তার আলোচনা এখানে বা পরে করা অনাবশ্যক। কারণ এই বিষয়ে 'ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়ন'-এ আমার ধারাবাহিক লেখা বাহির হইয়াছিল, আর পরে তা 'স্বাস্থ্যের সাধারণ জ্ঞান' * নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। আমার চটি চটি বইয়ের মধ্যে এই বই কি পশ্চিমে কি পূর্বে সর্বাধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। ইহার কারণ আজও আমি ধরিতে পারি নাই। 'ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়ন'-এর পাঠকদের জন্যই এই বই লেখা হইয়াছিল। কিন্তু আমি জানি, 'ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়ন' পড়েন নাই পূর্ব-পশ্চিমের এমন অনেক ব্যক্তির জীবনের মোড় এই পুস্তকপাঠে ঘুরিয়া গিয়াছে। তাঁরা এই বিষয়ে আমার সহিত পত্র-ব্যবহার করিয়াছেন ও করেন। তাই এই বই সম্বন্ধে এখানে কিছু বলা প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। কেন না তাতে লেখা বিচার বা তত্ত্বের হেরফের করার আবশ্যকতা বোধ না করিলেও আচরণে আমি কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন করিয়াছি। সে খবর এই পুস্তকের পাঠকেরা জানেন না। তা তাঁদের জানা দরকার।

আমার যে কোন কাজ আমি ধর্মভাবনা হইতে করি। আর আমার অন্য লেখার মত এই পুস্তকও আমি সেই ধর্মভাবনা হইতেই লিখিয়াছি। তাই এই পুস্তকে বর্ণিত কতকগুলি সিদ্ধান্ত অনুসারে আজ চলিতে পারিতেছি না বলিয়া আমি দুঃখ ও লজ্জা অনুভব করি।

আমার নিশ্চিত বিশ্বাস এই যে, শৈশবে মায়ের দুধ খাওয়ার পরে মানুষের পক্ষে আর দুধ খাওয়া অনাবশ্যক। গাছপাকা ফল বা বাদাম ছাড়া অন্য কিছু খাওয়া তার উচিত নয়। বাদাম ইত্যাদির শাঁস ও আঙ্গুর ফল হইতে শরীর ও বুদ্ধির পুরা পুষ্টি মিলিতে পারে। ওরূপ খাদ্য খাইলে ব্রহ্মচর্যাদি আত্মসংযম খুব সহজ হয়। যেমন খায় মানুষ তেমন হয় এই চলতি কথা মিছা নয়—আমার নিজের ও সঙ্গীদের অভিজ্ঞতা হইতে এ কথা আমি বলিতেছি। এই মতের বিশেষ বিবেচনা এই বইয়ে রহিয়াছে।

কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য, ঠেকিয়া উহার কোন কোন সিদ্ধান্তের বিপরীত আচরণ আমি ভারতবর্ষে করিয়াছি। খেড়া জেলায় যখন সিপাহী সংগ্রহের কাজ করিতেছিলাম তখন আহারের ভুলের দরুন কঠিন অসুখে মরিতে

* এই বিষয়ে গান্ধীজীর বিচারধারা ১৯৪২ সনে নবজীবন প্রকাশক (আহমদাবাদ) কর্তৃক প্রকাশিত 'Key to Health' নামক পুস্তিকায় পাওয়া যাইবে।

বসিয়াছিলাম ; বিনা দুধে ভাঙ্গা শরীর চাঙ্গা করার বহু চেষ্টা করি। জানা-শোনা বৈদ্য ডাক্তার, রাসায়নিকদের শরণ লই। তাঁদের কেউ ব্যবস্থা করিলেন মুগের জল, কেউবা মহুয়ার তেল, আর কেউবা বাদামের দুধ। এই সব পরীক্ষা করিতে করিতে শরীর ক্ষয় করিলাম কিন্তু বিছানা হইতে উঠিতে পারিলাম না। বৈদ্যরা চরক আদি হইতে শ্লোক আবৃত্তি করিয়া বলিলেন রোগমুক্তির জন্য সব কিছু খাওয়া চলে, মাংস পর্যন্ত। এই বৈদ্যরা আমাকে দুধ ত্যাগের সংকল্পে অটল থাকিতে উৎসাহ দিবেন এই আশা দুরাশা ছিল। 'বীফ টী' ও ব্র্যাণ্ডী বিনা ভাবনায় যে ডাক্তারেরা খাইতে বলেন তাঁরা আমাকে দুধ ছাড়া চলিতে বলিবেন তা কি হইতে পারে !

গরু বা মোষের দুধ খাওয়ার উপায় ছিল না ; তাতে ব্রত ভঙ্গ হইত। যে কোন দুধ ত্যাগ ছিল ব্রতের লক্ষ্য। কিন্তু বাঁচিয়া থাকার আগ্রহে মনকে ধোঁকা দিলাম, ব্রতের সার ছাড়িলাম ছাল রাখিলাম। ছাগ-মাতার দুধ খাইলাম। ছাগ-মাতার দুধ যখন খাই তখন জানিতাম যে ব্রতের আত্মা আমি হনন করিতেছি।

কিন্তু 'রৌলট অ্যাক্ট'-এর বিরুদ্ধে লড়িবার আকাঙ্ক্ষা আমায় পাইয়া বসে, আর তা হইতে বাঁচিয়া থাকার আগ্রহ জন্মে, আর যাকে আমি আমার জীবনের মহান্ প্রয়োগ মনে করি আমার সেই মহান্ প্রয়োগে ছেদ পড়ে।

আত্মার সহিত আহারপানের সম্বন্ধ নাই, আত্মা খায় না, পান করে না ; যা পেটে যায় হানি তাতে হয় না, হয় যা (যে বচন) অন্তর হইতে বাহিরে আসে তাতে ইত্যাদি যুক্তির কথা আমি জানি। এ কথা একেবারে ভুয়ো তা নয়। তবে তর্কে না যাইয়া আমি এখানে আমার গভীর প্রত্যয়ের কথা বলিয়া নিরস্ত হইব : যে মানুষ ঈশ্বরকে সমীহ করে, তাঁকে প্রত্যক্ষ করিতে চায় এমন সাধক ও মুমুক্ষুর যেমন চিন্তায় ও কথায় সংযমী হইতে হয় তেমনি কি খাইব ও কতটা খাইব সেই দিকেও সংযমী হইতে হয়।

সে যাই হোক, আমার এই ব্যর্থতার কথা আমি সকলের কাছে ধরিতেছি তাতেই আমার কর্তব্য শেষ হইতেছে না। তাঁদের এ কথাও বলি এই বিষয়ে তাঁরা যেন আমার নজির অনুকরণ না করেন। অতএব যে সব ভাইবোন আমার স্বাস্থ্য বিষয়ক পুস্তিকা পড়িয়া দুধ ত্যাগ করিয়াছেন তাঁদের আমি সতর্ক করিয়া দিতেছি। দুধ ত্যাগ তাঁদের পক্ষে যদি সর্বদিক হইতে হিতের হইয়া থাকে বা অভিজ্ঞ চিকিৎসক যদি তেমন পরামর্শ

দিয়া থাকেন ত আলাদা কথা, নতুবা আমার পুস্তক দৃষ্টে তাঁরা যেন দুধ ত্যাগের সংকল্প আঁকড়াইয়া না থাকেন। আজ পর্যন্ত আমার এখানকার অভিজ্ঞতা এই : যাদের হজমশক্তি ক্ষীণ হইয়া গিয়াছে বা যারা রোগে শয্যা লইয়াছে তাদের পক্ষে দুধের তুল্য লঘুপাচ্য অথচ পুষ্টিকর খাদ্য অন্য কিছু নাই।

এই প্রকরণের কোন পাঠক-বৈদ্য, ডাক্তার বা হাকিম বা অন্য অভিজ্ঞ ব্যক্তি দুধের বদলে দুধের সমান পুষ্টিকর সহজপাচ্য কোন গাছ-গাছড়া বা শাক-সবজি আছে কিনা তাহার পড়া বা শোনা নয়, নিজ অনুভবসিদ্ধ কথা আমাকে জানাইলে আমি নিরতিশয় বাধিত হইব।

৯
জুলুমবাদের সহিত টক্কর

এখন এশিয়াটিক বিভাগের কথায় ফিরিয়া যাই।

এশিয়াই কর্মচারীদের সর্বাপেক্ষা বড় কেন্দ্র ছিল জোহানিসবর্গে। আমি দেখিতেছিলাম, রক্ষণের নামে এই সব কর্মচারী ভারতীয় ও চীনা ইত্যাদিকে চুষিতেছিল। প্রতিদিন লোকে আমার কাছে আসিয়া নালিশ করিত : 'যাদের প্রবেশ-অধিকার আছে তারা প্রবেশ করতে পাচ্ছে না; প্রবেশ অধিকার নাই এমন লোক শ' শ' পাউণ্ড ঠেকিয়ে ঢুকে যাচ্ছে। এর বিহিত আপনি ছাড়া আর কে করবে?' আমিও ঠিক অমনটাই ভাবিতেছিলাম— এই আপদ দূর করিতে না পারি ত বৃথাই আমার এখানে—ট্রান্সভালে— বসা।

আমি প্রমাণ যোগাড় করিতে লাগিলাম। যথেষ্ট প্রমাণ যখন যোগাড় হইল পুলিশ কমিশনারের কাছে গেলাম। দেখিতে পাইলাম তিনি ন্যায়পরায়ণ লোক। আমার কথায় আদৌ কান দিবেন এই ভরসা আমার ছিল না— কিন্তু আমার কথা তিনি ধৈর্য ধরিয়া শুনিলেন ও যে প্রমাণ ও তথ্য আছে তা পেশ করিতে বলিলেন। সাক্ষীদের তিনি নিজে জিজ্ঞাসাবাদ করিলেন ও বুঝিতে পাইলেন যে অভিযোগ সত্য। কিন্তু আমার মত তিনিও জানিতেন যে দক্ষিণ আফ্রিকায় গোরা আসামীদের বিরুদ্ধে গোরা পঞ্চায়েতের (জুরীর) কাছে কালা আদমীর সুবিচার পাওয়া মুশকিল।

তিনি বলেন, 'তবুও আসুন, চেষ্টা করে ত দেখি। এসব দোষীদের জুরীরা ছেড়ে দেবে এই ভয়ে এদের বিনা আঁচড়ে যেতে দেওয়া ঠিক হবে না। তাই এদের আমি গ্রেপ্তার করছি। আপনাকে এটুকু বলতে পারি যে আমার দিক থেকে চেষ্টার ত্রুটি হবে না।'

এই বিশ্বাস আমার ছিলই। একাধিক কর্মচারীর ওপর আমার সন্দেহ ছিল। কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে আমার হাতে অকাট্য প্রমাণ ছিল না। দুই জনের বিষয়ে কোনই সংশয় ছিল না। তাদের নামে ওয়ারেণ্ট বাহির হইল।

আমার চলাফেরার কথা গোপন ছিল না, তা সম্ভবও ছিল না। পুলিশ কমিশনারের কাছে যে প্রায় রোজ যাই তা অনেকে জানিত। ওই দুই অফিসারের কয়েকজন মোটামুটি পটু গোয়েন্দা ছিল। তারা আমার আপিসের ওপর নজর রাখিত ও আমার যাতায়াতের খবর অফিসারদের দিত। এখানে বলা আবশ্যক যে, এই দুই অফিসার এত মন্দ ছিল যে তাদের হইয়া গোয়েন্দাগিরি করার লোক বেশি ছিল না। ভারতীয়দের ও চীনাদের সহায়তা যদি না পাইতাম তবে ওদের গ্রেপ্তার করানো যাইত না।

এদের একজন ফেরার হইল। পুলিশ কমিশনার ফেরারী পরোয়ানা বলে তাকে গ্রেপ্তার করিয়া আনিলেন। কেস চলে, তাদের বিরুদ্ধে ভাল প্রমাণ ছিল আর তাদের একজন ফেরারও হইয়াছিল। তবুও তারা বেকসুর খালাস পাইল।

আমি অত্যন্ত নিরাশ হইলাম। পুলিশ কমিশনারও অতিশয় দুঃখিত হইলেন। উকিলের পেশার ওপর আমার ঘৃণা জন্মিল। অন্যায় ঢাকার জন্য বুদ্ধির কসরত দেখিয়া বুদ্ধির ওপরই আমার ধিক্কার জন্মে।

এই দুই অফিসারের কুখ্যাতি এতটা ছড়াইয়া পড়িয়াছিল যে খালাস পাইলেও তাদের কাজে বহাল রাখা সরকারের পক্ষে সম্ভব ছিল না। দুইই বরখাস্ত হইল এবং এশিয়াই ঘাঁটি কতকটা সাফ হইল। ভারতীয়দের উদ্‌বেগ কিছুটা কমিল ও সাহস কিছুটা বাড়িল।

আমার প্রতিষ্ঠা বাড়িল। পসারও বাড়িল। মাসে মাসে যে শত শত পাউণ্ড ঘুষ দিতে হইত তার পুরোটা হইতে বলা যাইবে না, অনেকটা হইতে ভারতীয় সমাজ রক্ষা পাইল। পুরোটা হইতে রক্ষা পায় নাই, তার কারণ

অসতেরা তখনও করিয়া খাইতেছিল। কিন্তু মিথ্যার আশ্রয় যারা লইতে চাহিত না সত্যের পথে তাদের চলা সম্ভব হইয়াছিল এ কথা বলিতে পারি।

অফিসাররা এতটা মন্দ হইলেও ব্যক্তি হিসাবে তাদের বিরুদ্ধে আমার মনে কোন রাগ ছিল না এ কথা বলিতে পারি। আমার এই প্রকৃতির কথা তারাও জানিত। কষ্টে পড়িয়া তারা যখন আমার শরণ লইয়াছিল আমি তাদের সহায়তা করিয়াছিলাম। আমি বিরোধ না করিলে জোহানিসবর্গ ম্যুনিসিপালিটীতে তাদের চাকরি হইতে পারে তাদের কোন বন্ধু আসিয়া আমায় এ কথা বলে। তারা চাকরি পায় সে আমি করিব, তাকে বলি। তারা ওই চাকরি পাইয়াও ছিল।

এর ফলে, যে সব অফিসারের সম্পর্কে আমি আসিয়াছিলাম তারা বুঝিতে পায় যে এই ব্যক্তি হইতে তাদের কোন হানি হইবে না। আর তাই তাদের বিভাগের বিরুদ্ধে যদিও আমি সময় সময় লড়িতাম, তাদের সম্বন্ধে কটু কথা আমার বলিতে হইত, তবুও তারা আমার সহিত মধুর ব্যবহার করিত। এরূপ আচরণ যে আমার মজ্জাগত সে বোধ তখন আমার স্পষ্ট ছিল না। এইরূপ ব্যবহার যে সত্যাগ্রহের ভিত ও অঙ্গ বিশেষ তা আমি পরে বুঝিতে পাইয়াছি।

মানুষ ও তার কাজ দুই পৃথক বস্তু। ভাল কর্মের আদর ও মন্দের অনাদর হওয়া অবশ্যই দরকার। ভাল বা মন্দ কার্যের কর্তার প্রতি মনে সব সময় প্রীতি ও দয়া থাকা চাই। জিনিসটা সহজে বোঝা গেলেও লোকে সে মতে প্রায়ই চলে না, ফলে জগতে ঘৃণার বিষ ছড়ায়।

এইরূপ অহিংসা সত্য সাধনার মূল বস্তু। আমি সতত অনুভব করি অহিংসার শরণ না লইলে সত্যের দর্শন মিলে না। তন্ত্রের বিরোধ করা, তন্ত্রকে আঘাত হানা কর্তব্যস্বরূপ হইতে পারে, কিন্তু তন্ত্রীর ওপর আঘাত হানা নিজের ওপর আঘাত হানারই সমান। (কেন না, সকলে আমরা একই ধাতুতে আর সেই একই হাতে গড়া পুতুল অতএব সকলেই আমরা অনন্ত শক্তির আধার। কারো অবমাননা করিলে সেই অনন্ত শক্তিরই অবমাননা করা হয়; তাই তাকে আঘাত করিয়া আমরা জগতকেই আঘাত করি।

১০

এক পবিত্র স্মৃতি ও প্রায়শ্চিত্ত

আমার জীবনে বরাবর এমন সব ঘটনা ঘটিয়াছে যা আমাকে নানা ধর্মের নানা জাতির লোকের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আনিয়াছে। তাদের এই নিকট পরিচয়ের অনুভব হইতে বলিতে পারি যে এ আমার স্বজন সে পরজন, এ আমার দেশবাসী সে বিদেশী, এ কালা সে গোরা, এ হিন্দু সে মুসলমান-খ্রীস্টান-পারসী-ইহুদি—এরূপ ভেদ কোনদিনও আমি করি নাই। এরূপ পৃথকভাব আমার মনে ঠাঁইই পায় নাই। এটাকে আমার বিশেষ গুণ বলিব না, বলিব আমার স্বভাবের সহজ অঙ্গ, কেন না অভেদভাব সাধনার নিমিত্ত তেমন প্রযত্ন আমি করি নাই যেমন করিয়াছি অহিংসা, ব্রহ্মচর্য, অপরিগ্রহ ইত্যাদি যম সাধনার নিমিত্ত।

ডারবনে যখন ওকালতি করিতাম তখন আমার কেরানীরা প্রায় সব সময় আমার সঙ্গে ছিল; তাদের কেউ ছিল হিন্দু কেউ ছিল খ্রীস্টান, অথবা প্রদেশ হিসাবে বলি ত কেউ ছিল গুজরাটী কেউ ছিল মাদ্রাজী। তাদের আপন জনই ভাবিতাম; অন্য নজরে দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। আমার স্ত্রী আমার এই অভেদ আচরণে বাধা দিলে তার সহিত আমার ঝগড়া হইত।

পঞ্চম মাতা-পিতার ঘরে জন্ম এক খ্রীস্টান কেরানী আমার ছিল।* বাড়ীটা পাশ্চিমী ধরনে তৈরি ছিল। তাই কোন ঘরে জল-নিকাশের ব্যবস্থা ছিল না আর আমার মতে না থাকাই ভাল। অতএব প্রত্যেক ঘরে প্রস্রাবের পাত্র ছিল। সেই সব পাত্র পরিষ্কার করার জন্য মেথর রাখিতাম না, চাকরকে দিয়াও তা করাইতাম না। স্বামীস্ত্রী নিজেরাই আমরা সাফ করিতাম। কেরানীরা কিছুদিন পরে ঘরের লোক হইয়া যাইত যখন তখন তারা তাদের পাত্র নিজেরাই সাফ করিত। পঞ্চম সন্তান এই খ্রীষ্টান কেরানী নূতন আসিয়াছিল। আমরা ছাড়া নূতনদের পাত্র কে আর সাফ করিবে। অন্য নূতনদের পাত্র কস্তুরবা সাফ করিত। কিন্তু ওটা যে ছিল পঞ্চমের পাত্র: কস্তুরবা অতটা যাইতে পারিল না। আমাদের দুইয়ে ঝগড়া হইল। আমি পরিষ্কার করিব এও তার ভাল লাগিতেছিল না

* বর্ণতুচ্ছ বহির্ভূত দাক্ষিণাত্যের অস্পৃশ্য জাতি।

আর নিজেও সে করিতে পারিতেছিল না। চক্ষু হইতে মুক্তাবিন্দু ঝরিতেছে, রক্তচক্ষু হইতে ধিক্‌কার ঠিকরাইতেছে, পাত্র হাতে সিঁড়ি বাহিয়া নামিতেছে—কস্তুরবার সেই চিত্র আজও আমার চোখে ভাসিতেছে। কিন্তু আমি যেমন অনুরক্ত পতি ছিলাম তেমনই ছিলাম নিষ্ঠুর পতি। আমি মনে করিতাম আমি তার শিক্ষক। অন্ধ ভালবাসায় তাকে তাই কত কষ্টই না দিয়াছি!

কস্তুরবা ওই বাসনটা লইয়া গেল। কেবল তাতেই আমার মন উঠিল না, কাজটা হাসিমুখে না করিলে আমার সন্তোষ কোথায়! গলার স্বর চড়াইয়া বলিলাম, 'এমন অবুঝ ব্যাপার আমার ঘরে চলবে না।'

কথাটা তীরের মত তার বিঁধিল।

সে জ্বলিয়া উঠিল, 'তোমার ঘর নিয়ে তুমি থাক। আমি চললুম।' আমি ঈশ্বর ভুলিলাম, নিজেকে ভুলিলাম: দয়ামায়া উবিয়া গেল। তার হাত ধরিলাম। সিঁড়ির শেষেই বাইরের দরজা ছিল। বেচারী অবলাকে আমি দরজার কাছে লইয়া গেলাম। দরজা অর্ধেক খুলিলাম। কস্তুরবার চোখ হইতে দরদর ধারায় জল ঝরিতেছিল। সে বলে, 'তোমার লজ্জা নেই, আমার আছে। লজ্জার মাথা তুমি খেয়ে বসেছ? বাইরে আমি কোথা যাব? এখানে আমার মা-বাপ আছে যে তাঁদের কাছে যাব? আমি তোমার স্ত্রী বলে কি লাথি-ঘুষি খেতে হবে? দোহাই তোমার, দরজা বন্ধ করো। কেউ দেখে ত তা না হবে ভাল তোমার পক্ষে, না আমার পক্ষে।'

বড়াই থাকিল, অন্তরে লজ্জায় মরিলাম। দরজা বন্ধ করিলাম, স্ত্রী যদি আমায় ছাড়িয়া না যাইতে পারে আমিই কি তাকে ছাড়িয়া যাইতে পারি? ঝগড়া আমাদের মধ্যে অনেক হইয়াছে, কিন্তু পরিণাম তার শুভ হইয়াছে। পত্নী নিজের অদ্ভুত সহনশক্তি বলে সদা জয়ী হইয়াছে।

অনাসক্তভাবে আজ আমি এই বর্ণনা করিতে পারিতেছি, কারণ এই ঘটনা আমাদের জীবনের আর এক যুগের। এখন আমি মোহান্ধ পতি নই, শিক্ষক নই। চায় ত কস্তুরবা আজ আমাকে শাসাইতে পারে। এখন আমরা একে অন্যের কামবাসনামুক্ত পরীক্ষিত বন্ধু। কোন প্রত্যাশা না করিয়া আমার অসুখে বিসুখে সে বরাবর আমার সেবা করিয়া আসিয়াছে।

এই ঘটনা ১৮৯৮ সনে ঘটে। তখন ব্রহ্মচর্যের কল্পনাও আমার মনে ছিল না। পত্নী যে সহধর্মিণী, সহচারিণী ও সুখদুঃখের ভাগী এই বোধ তখন আমার ছিল না। তখন আমি মনে করিতাম পত্নী বিষয়ভোগের

বস্তু; স্বামীর যে কোন আজ্ঞা পালন করার জন্যই তার জন্ম, আর চলিতামও আমি সে ভাবেই।

১৯০০ সন হইতে আমার ভাবের পরিবর্তন হইতে থাকে। ১৯০৬ সনে তার ফল ফলে। কিন্তু সে কথা যথাস্থানে বলিব। এখানে কেবল এ কথাই বলিব যে, যেমন যেমন কামবাসনা হইতে আমি মুক্ত হইতেছিলাম তেমন তেমন আমার সংসারজীবন শান্ত, নির্মল ও মধুর হইতেছিল; আজও হইতেছে।

আমরা আদর্শ দম্পতি, আমার পত্নীতে কোন দোষ নাই, অথবা আজ আমাদের লক্ষ্য একই এ কথা যেন এই পুণ্যস্মৃতি প্রসঙ্গ হইতে কেউ ধরিয়া না নেন। আমার আদর্শ হইতে স্বতন্ত্র কোন আদর্শ কস্তুরার আছে কিনা বেচারা সে নিজেই সম্ভবত তা জানে না। আমার সব কাজের সহিত হয়ত বা আজও সে একমত নয়। সে সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করি না, করিয়া লাভও নাই। কারণ না তার মাবাপ তাকে লেখাপড়া শিখাইয়াছিলেন, আর না আমি, যখন সে অবসর আমার ছিল। কিন্তু অন্য বহু হিন্দু পত্নীতে যে গুণ কমবেশী দেখা যায় সে গুণ তাতে যথেষ্ট মাত্রায় ছিল—ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক, জ্ঞানত হোক অজ্ঞানত হোক আমার পিছনে চলাকেই সে তার জীবনের সার্থকতা মনে করিয়াছে এবং আমার পবিত্র জীবন যাপনের প্রযত্নে কখনও সে প্রতিবন্ধক হয় নাই। তাই আমাদের মানসিক শক্তির ব্যবধান মস্ত হইলেও আমাদের জীবন তুষ্ট, সুখী ও ঊর্ধ্বমুখী এরূপ আমি মনে করি।

১১

ইংরেজদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে

এই প্রকরণ লিখিতে আরম্ভ করিয়া মনে হইল, এই কথা এমন জায়গায় আসিয়া গিয়াছে যে উহা সপ্তাহে সপ্তাহে কিভাবে লেখা হয় তা এখন পাঠকদের বলা আবশ্যক।

কোন পরিকল্পনা করিয়া এই কথা আমি লিখিতে আরম্ভ করি নাই। বই, রোজনামচা বা অপর কোন কাগজপত্র অবলম্বনেও এই সব প্রকরণ

আমি লিখিতেছি না। বলা যায় যে লেখার দিন অন্তর্যামী যেমন লেখান তেমন লিখি। যা আমি ভাবি, যা আমি করি, অন্তর্যামীর প্রেরণায় তা আমি করি কি করি না তা আমি জোর করিয়া বলিতে পারি না। তবে আমার যে সব কর্মকে লোকে অতি বৃহৎ বা অতি তুচ্ছ বলিয়া গণনা করে তা এমন ভাবে ঘটিয়াছে যে সেই দিকে তাকাই ত মনে হয় অন্তর্যামীর প্রেরণায়ই তা ঘটিয়াছে, এ কথা বলি ত অধিক বলা হইবে না।

অন্তর্যামীকে আমি দেখি নাই, জানি নাই। জগৎ ঈশ্বরে বিশ্বাস করে। সেই বিশ্বাসকেই আমি নিজের পাথেয় করিয়া লইয়াছি। আমার এই বিশ্বাস এতই অটল যে তা অনুভবেরই তুল্য। কিন্তু বিশ্বাসকে অনুভব বলিলে সত্যের হানি হয় এ কথা উঠিতে পারে। তাই এ কথা বলাই ঠিক হইবে যে আমার ঈশ্বর-বিশ্বাসের স্বরূপ যে কি তা প্রকাশ করার ভাষা আমার নাই।

এই অদৃষ্ট অন্তর্যামীর হাতের পুতুলরূপে এই কথা আমি লিখিতেছি এ কথা যে আমি কেন বলিলাম তা, আমার বিশ্বাস, এই ব্যাপার হইতে কিছুটা পরিষ্কার হইবে। 'ইংরেজদের পরিচয়' শিরোনামা দিয়া এর আগের প্রকরণ লিখিতে গিয়াছিলাম। কিন্তু লিখিতে আরম্ভ করিয়া দেখিলাম এই পরিচয় দেওয়ার পূর্বে প্রস্তাবনারূপে কিছু বলা আবশ্যক আর তাই 'ইংরেজদের পরিচয়' শীর্ষ বদলাইয়া তার জায়গায় আমার করিতে হইল 'পবিত্র স্মৃতি'।

এই প্রকরণ লিখিতে আরম্ভ করিলাম ত অন্য এক সমস্যা দেখা দিল— ইংরেজদের পরিচয় দিতে গিয়া কি লিখিব আর কি বাদ দিব এই কঠিন প্রশ্ন খাড়া হইল। যা বলা দরকার তা না বলি ত সত্যের লাঞ্ছনা হয়। অন্য দিকে, কি যে আবশ্যক আর কি যে নয় তা নির্ণয় করাও শক্ত, বিশেষ এই কথা লেখা আদৌ সঙ্গত কিনা সেই বিষয়েই যখন আমি একান্ত নিঃসংশয় নই।

অনেক দিন আগে পড়িয়াছিলাম যে ইতিহাসরূপে আত্মকথামাত্রই অপূর্ণ আর অসুবিধাও তার আছে: কথাটার অর্থ এখন আমার কাছে অধিকতর সুস্পষ্ট হইল। আমি জানি, মনে আছে এমন সব কথাই আমি এই কথায় ধরিতেছি না। সত্যের খাতিরে কতটা দেওয়া আর কতটা বাদ দেওয়া দরকার তাই বা কে বলিবে? তা ছাড়া আমার জীবনের ঘটনাবিশেষের অপূর্ণ ও একতরফা বিবরণের মূল্যই বা ন্যায়ালয়ের দৃষ্টিতে

কি হইবে? যে সকল প্রকরণ লিখিয়াছি তা ধরিয়া কোন নিকর্মা লোক আমাকে জেরা করিতে বসে ত সম্ভবত অনেক নূতন তথ্য আবিষ্কার করিতে পারিবে। আর সে ব্যক্তি যদি বিরূপ সমালোচকের ভূমিকা গ্রহণ করে তবে আমার বুজরুকি জগতের সামনে ফাঁস করিয়া নিজে অভিমানে ফুলিয়া ঢোল হইতে পারিবে।

তাই ক্ষণেকের তরে মনে হইয়াছিল এই সব প্রকরণ না লেখাই ভাল। কিন্তু অন্তর্যামী বারণ না করা অবধি লিখিয়া যাইব: অনৈতিক না হইলে আরম্ভ করা কাজ কখনও ছাড়িতে নাই এই সর্বজনমান্য কথামত চলিব স্থির করিয়াছি।

সমালোচকের তুষ্টির জন্য এই কথা লিখিতেছি না। এই কথা নিজেই সত্যের এক প্রয়োগ তাই লিখিতেছি। তা ছাড়া, সহকর্মীদের আশ্বাস দেওয়ার, চিন্তার খোরাক যোগানোর ইচ্ছা ত আমার রহিয়াছেই। বস্তুত, তাদের অনুরোধেই আমি ইহা লিখিতে শুরু করিয়াছি। স্বামী আনন্দ ও জয়রামদাস যদি পিছনে লাগিয়া না থাকিতেন তবে হয়ত এই কথা আরম্ভ হইত না। অতএব এই আত্মকথা লেখা যদি দোষের হয় ত তাঁরাও এই দোষের ভাগী।

এবার এই প্রকরণের শিরোনামার বিষয়ে যাই। ভারতীয় কেরানীদের ও অন্য সবাইকে যেমন আমি নিজ ঘরে আপন জনের মত রাখিয়াছিলাম ইংরাজদেরও তেমন আমি ডারবনের গৃহে রাখিয়াছিলাম। আমার এই কাজটা অনেকে ভাল চোখে দেখিত না। কিন্তু আমিও তাদের না রাখিয়া ছাড়িব না এই ছিল আমার মনের ঝোঁক। কোন স্থলেই এই দিকে আমার ভুল হয় নাই এ কথা বলা যাইবে না। তিক্ত অভিজ্ঞতাও যে কিছু না হইয়াছিল তা নয় কিন্তু সেই অভিজ্ঞতা দেশী-বিদেশী উভয়কে জড়াইয়াই হইয়াছিল। তার জন্য আমার আপসোস নাই। কটু অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও এবং স্বজনদের অসুবিধা ও কষ্ট ভুগিতে হইতেছে সে কথা জানা সত্ত্বেও আমি আমার স্বভাব বদলাই নাই। আপনজনেরা উদারতা পূর্বক তা সহিয়া লইত। নূতন নূতন লোকের সংসর্গে আমার পরিবারের লোকেরা উদ্বেগ বোধ করিলে আমি তাদের দোষ ধরিতে ইতস্তত করিতাম না। আমি মনে করি, যে মানুষ আস্তিক, যে মানুষ নিজ অন্তর-পুরুষকে অন্য সকলের ভিতর দেখিতে ইচ্ছুক, সকলের সঙ্গে তার অলিপ্তভাবে থাকার শক্তি লাভ করা

চাই। নূতন সম্বন্ধ পাতানোর সুযোগ আসিলে সেই সুযোগ না হারাইয়া সম্বন্ধ পাতানো আর তা সত্ত্বেও রাগদ্বেষ বিমুক্ত থাকাই এই শক্তি সাধনার পথ।

অতএব বোঅর যুদ্ধ আরম্ভ হইলে জোহানিসবর্গ হইতে আসা দুইজন ইংরেজকে গৃহ ভরতি থাকিলেও আমি স্থান দেই। দুইজনই তাঁরা থিয়োসোফিস্ট ছিলেন। একজনের নাম ছিল কিচিন। এঁর কথা পরেও আসিবে। এই দুই বন্ধুর কারণে আমার সহধর্মিণীর অনেকবার কাঁদিতে হইয়াছিল। আমার নিমিত্তে এরূপ দুঃখভোগ তার আরও করিতে হইয়াছিল। ইংরেজদের নিজ গৃহে নিজ পরিজনের মত রাখার অভিজ্ঞতা ওই আমার প্রথম। ইংলণ্ডে আমি অবশ্য ইংরেজ গৃহে ছিলাম, তবে সেখানে আমি তারা যেমন থাকে তেমন থাকিতাম, অন্য কথায় তা হোটেলে থাকারই মত ছিল। এখানে ছিল ঠিক তার উল্টা। এই বন্ধুরা ঘরের হইয়া গিয়াছিল। অনেকটা ভারতীয় রীতরেওয়াজ মত তারা চলিত। গৃহের বাইরেকার সাজসজ্জা ইংরেজী ঢঙের ছিল বটে কিন্তু ভিতরকার চালচলন পোশাক-আশাক মূলত ভারতীয় ধরনের ছিল। মনে আছে, তাদের অমনটা ঘরের করিয়া লওয়াতে আমাদের কতকটা অসুবিধা ভুগিতে হইত, কিন্তু এ কথা বিনা দ্বিধায় বলিতে পারি যে এই দুই বন্ধু পরিবারের অন্যদের মতই অবাধে চলিতে পাইত। ডারবন অপেক্ষা জোহানিসবর্গে এইরূপ সংস্পর্শ অধিক বাড়িয়া গিয়াছিল।

১২

ইংরেজদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে—২

জোহানিসবর্গে এক সময়ে আমার চারজন ভারতীয় কেরানী ছিল। বলিতে পারি না তাদের আমি ছেলের মত দেখিতাম কি কেরানীর মত। ওই চারজনেও আমার কাজ চলিত না। টাইপিং একমাত্র আমিই এক-আধটু জানিতাম। ওই যুবকদের দুইজনকে টাইপিং শিখাইয়াছিলাম। কিন্তু ইংরাজীতে কাঁচা ছিল বলিয়া তাদের টাইপিং ভাল হইত না; তা ছাড়া তাদের একজনকে হিসাবরক্ষকরূপে গড়িয়া তুলিতে হইয়াছিল। ইচ্ছা থাকিলেও নাতাল হইতে কাউকে আনা সম্ভব ছিল না। কারণ ছাড়পত্র বিনা কোন ভারতীয়ের এখানে প্রবেশ করার পথ ছিল না। আর নিজের

সুবিধার নিমিত্ত পারমিট অফিসারের কৃপা চাওয়ার প্রবৃত্তিও আমার ছিল না।

ফাঁপড়ে পড়িলাম। কাজ এত বাড়িয়া গিয়াছিল যে শত চেষ্টা করিয়াও কুলাইয়া উঠিতে পারিতেছিলাম না। কি ওকালতির কাজ কি সার্বজনিক কাজ—দুই কাজই জমিয়া যাইতেছিল। ইংরেজ কেরানীতে আপত্তি ছিল না। সংশয় ছিল কোন গোরা স্ত্রী বা পুরুষ কালো আদমীর কাজ করিবে কিনা। তবুও চেষ্টা করিয়া দেখার কথা ভাবিলাম। কোন টাইপরাইটার এজেন্টের সহিত পরিচয় ছিল। তাঁর কাছে যাইয়া বলিলাম যে আমার স্টেনোগ্রাফার দরকার, দিতে পারেন কিনা। তিনি বলেন মেয়ে স্টেনো মিলিতে পারে, চেষ্টা করিয়া দেখিবেন। মিস ডিক নাম্নী এক স্কচ কুমারীর খোঁজ তিনি পান। তাকে আমার কাছে পাঠান। সদ্য দেশ হইতে সে দক্ষিণ আফ্রিকায় আসিয়াছিল। তার অভাব ছিল। সৎপথে যে-কোথাও কাজ করিতে প্রস্তুত ছিল। দেখিয়াই বুঝিলাম সে ভাল মানুষ।

জিজ্ঞাসা করিলাম, 'ভারতীয়ের কাজ করতে তোমার আপত্তি নেই ত?'

বিনা দ্বিধায় সে বলিল, 'মোটেই না।'

'কত মাইনে চাও?'

সে বলে, 'সাড়ে সতেরো পাউণ্ড কি বেশি মনে হয়?'

'যে কাজ চাই তা তোমা থেকে পাই ত মোটেই বেশি নয়। কাজে কবে লাগতে পারো?'

'বলেন ত এক্ষুনি।'

মহা খুশী হইলাম। পত্রের বয়ান বলিতে লাগিলাম। ধরিয়া লইতে বলিলাম।

দিন কয়েক মধ্যে সে কেরানীতে কেরানী, কন্যাকে কন্যা বা ভগ্নীতে ভগ্নী হইয়া গেল। চড়া কথা কোন দিনও তাকে আমার বলিতে হয় নাই। তার কাজে ভুল প্রায় থাকিত না। সময় সময় হাজার হাজার পাউণ্ডের লেনদেন তার হাতে হইত। হিসাবপত্রও সে রাখিত। সে পুরাপুরি আমার বিশ্বাস অর্জন করিয়াছিল। তার চাইতেও বড় কথা এই যে, আমি তার এতটা বিশ্বাসভাজন হইয়াছিলাম যে তার গুহ্যতম কথাও সে আমাকে বলিত। জীবনসঙ্গী চূড়ান্ত নির্বাচনের পূর্বে সে আমার পরামর্শ লইয়াছিল। কন্যাদান করার সৌভাগ্যও আমারই হইয়াছিল। মিসিস ম্যাকডোনল্ড

হইলে পর মিস ডিককে আমার কাজ ছাড়িতে হয়। তা হইলেও বিবাহের পরেও যখনই কাজের চাপ খুব বাড়িয়াছে আর তার সহায়তা চাহিয়াছি, সে সহায়তা তার কাছে পাইয়াছি।

কিন্তু তার জায়গায় একজন স্থায়ী শর্টহ্যাণ্ড রাইটারের দরকার হইল। ভাগ্যক্রমে আর একটি মেয়ে জুটিয়া গেল। তার নাম ছিল শ্লেশিন। মি. কেলেনবেক তাকে আমায় দেন। কেলেনবেকের পরিচয় পরে দিব। এখন ট্রান্সভালের এক হাইস্কুলের সে শিক্ষিকা। সতর বছর বয়সে সে আমার কাছে আসে। তার কোন কোন খামখেয়াল কেলেনবেক ও আমার পক্ষে বরদাস্ত করা শক্ত হইত। চাকরি করার জন্য চাকরি করিতে সে আসিয়াছিল তা নয়, আসিয়াছিল অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য। বর্ণদ্বেষ তার ধাতে ছিল না। হোক না বয়সে জ্যেষ্ঠ বা জ্ঞানে শ্রেষ্ঠ কাউকেই সে সমীহ করিত না। লোককে অপমান করিতে তার বাধিত না; যে লোকের ওপর তার যে ধারণা হইত মুখের ওপর সোজা বলিয়া দিত। তার এই অধীরতার কারণে আমার সময় সময় মুশকিলে পড়িতে হইত। কিন্তু তার ছলরহিত সরল স্বভাবের দরুন আমার বিরক্তি পরক্ষণেই দূর হইয়া যাইত। তার ইংরেজী আমার ইংরেজী অপেক্ষা আমার বিবেচনায় ভাল ছিল: তার সততায় আমার পূর্ণ আস্থা ছিল তাই অনেক সময় না দেখিয়াই তার টাইপ-করা চিঠি আমি সই করিয়া দিতাম।

তার ত্যাগবৃত্তির মাপজোখ করা যায় না। সে অনেক দিন আমার কাছ হইতে মাসে ছয় পাউণ্ড লইত আর শেষ পর্যন্ত দশ পাউণ্ডের বেশি নিতে কোন দিনও তাকে রাজী করিতে পারি নাই; সাফ অস্বীকার করিয়াছিল। বেশি নিতে বলিতাম ত আমাকে সে ধমকাইত ও বলিত, 'পয়সার জন্য আপনার কাছে রয়েছি কি? রয়েছি আপনার কাজ আমার ভাল লাগে বলে, আপনার আদর্শ ভাল লাগে তাই।'

একবার সে ঠেকায় পড়ে, চল্লিশ পাউণ্ড চায়, কিন্তু বলে ধার দেন ত নিতে পারি নচেৎ নয়। গত বছর সব টাকা সে ফিরাইয়া দিয়াছে। তার সাহস তার ত্যাগেরই তুল্য ছিল।

যে সকল স্ফটিকস্বচ্ছ চরিত্রের, ক্ষত্রিয়ের বীরত্ব তুচ্ছকারী নারীর সংস্পর্শে আসার সৌভাগ্য আমার হইয়াছে এই নারী তাদের অন্যতম। এখন সে বয়স্কা প্রৌঢ়া কুমারী। তার বর্তমান মানসিক স্থিতির কথা আমি সঠিক

জানি না। তা হোক, আমার নানা পুণ্যস্মৃতির ন্যায় এই বালার স্মৃতিও চিরকাল আমার মনে জাগরূক থাকিবে। তাই তার সম্বন্ধে যা জানি তা না লিখিলে সত্যের দ্রোহী হইব।

কাজের বেলায় রাতদিন ভেদ তার ছিল না। দুপুররাতেও কোথাও যাইতে হইলে সে একাকী চলিয়া যাইত ; সঙ্গে লোক দেওয়ার কথা বলিলে আমাকে সে চোখ রাঙাইত। হাজারো সমর্থ ভারতীয় তাকে সমীহ করিত, তার কথা মানিয়া চলিত। আমরা সকলে যখন জেলে ছিলাম, দায় কাঁধে লওয়ার মত লোক প্রায় কেউ বাইরে ছিল না, তখন একলা সে লড়াইয়ের সব কাজ চালাইয়াছিল। এমন এক সময় আসিয়াছিল যখন লাখো টাকার লেনদেন, হাজারো পত্রের বিধিব্যবস্থা ও 'ইণ্ডিয়ন ওপিনিয়ন'-এর পরিচালনা সব কিছু তারই করিতে হইয়াছিল। অবসাদ যে কি তা সে জানিত না।

মিস শ্লেশিনের সম্বন্ধে কত কথাই না বলার আছে। কিন্তু গোখেল যে কথায় তার প্রশংসা করিয়াছিলেন সে কথা দিয়া এই প্রকরণ শেষ করিব। আমার সকল সঙ্গীদের গোখেল জানিতেন। তাদের সহিত আলাপ-পরিচয়ের ফলে তাদের অনেকের ওপর তাঁর অতীব ভাল ধারণা জন্মিয়াছিল। তাদের সম্বন্ধে সময় সময় তিনি মতামত দিতেন। কি ভারতীয় কি ইউরোপীয় আমার সকল সঙ্গীদের মধ্যে মিস শ্লেশিনকে তিনি প্রধান স্থান দিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন, 'এমন ত্যাগ এমন নির্ভয়তা ও দক্ষতা আমি খুব কম লোকে দেখিয়াছি। আমার মতে শ্লেশিনের স্থান তোমার সঙ্গীদের মধ্যে সর্বাগ্রে।'

১৩
'ইণ্ডিয়ন ওপিনিয়ন'

অন্য ইউরোপীয়দের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের কথাও বলার রহিয়াছে। কিন্তু তার আগে দুই তিনটা নেহাত জরুরী কথা বলিয়া লওয়া আবশ্যক।

তাহা হইলেও তাদের একজনের পরিচয় এখানেই করিয়া লইতে হইবে। মিস ডিকের আসাতেও সব কাজ হইয়া উঠিতেছিল না। আরও লোকের দরকার ছিল। মি. রীচের কথা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। তাঁর সহিত আমার বিলক্ষণ পরিচয় ছিল। এক ব্যবসায়ী সংস্থার তিনি ব্যবস্থাপক ছিলেন। ওই কর্ম ছাড়িয়া তাঁকে আমি আমার আর্টিকল হইতে বলি।

কথাটা তাঁর ভাল লাগে। তিনি আমার আর্টিকল হন। কাজের চাপ আমার হাল্কা হয়।

ঠিক এই সময়ে শ্রীমদনজীত 'ইণ্ডিয়ন ওপিনিয়ন' প্রকাশ করার কথা ভাবেন। আমার পরামর্শ ও সহায়তা চান। ছাপাখানা তাঁর পূর্ব হইতেই ছিল। তাঁর প্রস্তাবে রাজী হই। ১৯০৪ সনে পত্র প্রকাশিত হয়। মনসুখলাল নাজর সম্পাদক হন। কিন্তু সম্পাদনার বোঝা বস্তুত আমাকেই বহিতে হইত। দূর হইতে পত্র সম্পাদনার এমনটা যোগ প্রায় বরাবর আমার ভাগ্যে ঘটিয়াছে। মনসুখলাল কাজটা চালাইতে পারিতেন না তা নয়। সম্পাদনার কাজে ভারতে থাকিতেই তিনি কিছুটা হাত পাকাইয়াছিলেন। কিন্তু আমি থাকিতে দক্ষিণ আফ্রিকার জটিল সমস্যার বিষয়ে লিখিতে তিনি ভরসা পাইতেন না। আমার বিচারশক্তিতে তাঁর যারপরনাই আস্থা ছিল, তাই যে সব সম্পাদকীয় লেখা দরকার তার সবটা বোঝা তিনি আমার ওপর চাপাইয়াছিলেন। আজিকার মত তখনও পত্র সাপ্তাহিক ছিল। আরম্ভে তা গুজরাটী, হিন্দী, তামিল ও ইংরাজীতে বাহির হইত। কিন্তু আমি দেখিতে পাই যে তামিল ও হিন্দী সংস্করণ নামেই মাত্র ছিল: প্রকাশনের উদ্দেশ্য তার দ্বারা সাধিত হইত না। ওই দুই সংস্করণ চালাইতে থাকা আত্মপ্রবঞ্চনা মাত্র এই ভাবিয়া বন্ধ করিয়া দেই।

কোন দিনও ভাবি নাই এই কাগজের জন্য আমার পয়সা যোগাইতে হইবে। কিন্তু অল্পদিন মধ্যেই দেখিতে পাইলাম যে পয়সা না গুঁজিলে কাগজ চলিবে না। নামে সম্পাদক না হইলেও কি ভারতীয়েরা কি গোরারা সকলেই জানিত যে পত্রের সব কিছুই আমি করি। পত্র প্রকাশ না করিলে কথা ছিল না কিন্তু প্রকাশ করার পরে বন্ধ হইয়া গেলে তা ভারতীয়দের অক্ষমতার নজির হইত এবং তার ফলে অন্য দিক হইতেও ক্ষতি হইত এরূপ আমার মনে হয়। অতএব উহাতে আমি পয়সা ঢালিতে থাকি বলা চলে। শেষে আমার যা কিছু বাঁচিত সবই উহাতে যাইত। মনে আছে এক সময় প্রতি মাসে ৭৫ পাউণ্ড আমাকে পাঠাইতে হইত।

কিন্তু এত কাল পরে আজও আমার মনে হয় যে এই পত্র ভারতীয় সমাজের প্রকৃষ্ট সেবা করিয়াছে। শুরুতেও ইহা হইতে পয়সা কামাইবার দৃষ্টি কারো ছিল না। আমার হাতে যত দিন ছিল আমার জীবনের

অদল-বদলের ছায়া বা প্রতিবিম্ব উহাতে পড়িত। এখনকার 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' ও 'নবজীবন'-এর মত সেই সময়ে 'ইণ্ডিয়ন ওপিনিয়ন' অনেকটা আমার জীবনের দর্পণ ছিল। প্রতি সপ্তাহে উহার কলমে আমি আমার আত্মা খুলিয়া ধরিতাম ও যে বস্তুকে আমি সত্যাগ্রহ বলিয়া মানিতাম তা পাঠকের সামনে ধরার প্রযত্ন করিতাম। জেলের সময় বাদে দশ বছরের অর্থাৎ ১৯১৪ সন পর্যন্ত 'ইণ্ডিয়ন ওপিনিয়ন'-এর প্রায় এমন কোন সংখ্যা ছিল না যাতে আমার লেখা ছাপা হয় নাই। আমার মনে পড়ে না, বিচার না করিয়া ওজন না করিয়া উহাতে কোন শব্দ লিখিয়াছি, বা কাউকে অযথা খুশী করার জন্য কিছু বলিয়াছি অথবা জানিত কোন অতিশয়োক্তি করিয়াছি। উহা আমার নিজের বেলায় সংযমসাধনার ও বন্ধুদের বেলায় তাঁদের নিকট আমার চিন্তাধারা পৌঁছিয়া দেওয়ার বাহন হইয়ছিল। সমালোচকেরা উহাতে সমালোচনার খোরাক প্রায় পাইতেন না। আমি জানি যে উহার লেখার ধাঁচ এমন ছিল যে সমালোচকদের কলম আপনা হইতে থমকিয়া যাইত। 'ইণ্ডিয়ন ওপিনিয়ন' না থাকিলে সত্যাগ্রহ চালানো যাইত কিনা সন্দেহ। সত্যাগ্রহের খবর জানার ও দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের অবস্থা যে কি তার সঠিক বিবরণ পাওয়ার জন্য পাঠকেরা আগ্রহে উহার পথ চাহিয়া থাকিত। উহার মারফতে মানবমনের কত রঙ্গ-বেরঙ্গের ছবিই না আমি পাইতাম। সম্পাদকে ও পাঠকে শুদ্ধ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক পাতাইবার প্রযত্ন সতত করিতাম, তাই মনখোলা অসংখ্য পত্র তাদের কাছ হইতে পাইতাম। লেখকদের প্রকৃতি অনুসারে তার কোনটা হইত ঝাঁঝালো, কোনটা কটু-তিক্ত, আর কোনটা বা মধুর-মিষ্ট। সেই সব পড়া, তাদের মর্ম বোঝা ও সেই সবের উত্তর দেওয়া—এই সব মিলিয়া 'ইণ্ডিয়ন ওপিনিয়ন' আমার শিক্ষার উত্তম বাহন হইয়াছিল। পাঠকদের পত্র হইতে সমাজের নাড়ীর গতি আমি সঠিক ধরিতে পারিতাম। উহা হইতে সম্পাদকের দায়িত্বের সম্যক্ বোধ আমার জন্মিয়াছিল এবং সমাজের মন জয় করিতে সক্ষম হইয়াছিলাম, যার ফলে ভবিষ্যৎ সংগ্রাম সম্ভবপর হইয়াছিল এবং শিষ্ট অথচ অদম্যরূপ ধারণ করিয়াছিল।

সেবা যে সাংবাদিকতার মুখ্য লক্ষ্য হওয়া চাই 'ইণ্ডিনিয়ন ওপিনিয়ন'-এর প্রথম মাসের সম্পাদনা হইতে তা আমি বুঝিতে পাই। সংবাদপত্রের শক্তি অতি প্রবল। কিন্তু অসংযত জলপ্রবাহে যেমন গ্রামশুদ্ধ গ্রাম ডুবিয়া যায়,

ফসল নষ্ট হয়, তেমন অসংযত কলম চালনায়ও অনর্থ ঘটে। এই অঙ্কুশ বাইরের হয় ত নিরঙ্কুশতা হইতেও তা ভয়ানক;. ভিতরের হয় ত তা লাভ-দায়ক। এই বিচার যদি ঠিক হয় তবে পৃথিবীর কয়টি পত্র, জানি না, এই যাচাইতে উৎরাইবে? কিন্তু অপদার্থ বলিয়া গণ্য কাগজ বন্ধ করিবে কে? আর কোনগুলি যে অপদার্থ তাই বা ঠিক করিবে কে? পদার্থের মত অপদার্থও পাশাপাশি চলিবে। ভাল্র-মন্দের দঙ্গল হইতে মানুষ রুচি অনুযায়ী বাছিয়া লইবে।

১৪
'কুলী-লোকেশন' বা হাড়ী-পাড়া

ভারতবর্ষে আমরা আমাদের সেবকশ্রেষ্ঠ ঢেড়, ভাঙ্গী ইত্যাদিকে অস্পৃশ্য বলিয়া গণনা করিয়া গ্রামের বা শহরের বাহিরে আলাদা রাখি। গুজরাটীতে তাদের বস্তিকে 'ঢেড়বাড়ো' বলা হয়। এই নামে লোকে নাক সিঁটকায়। খ্রীস্টান ইউরোপে এক কালে ইহুদিদের ঠিক এমনটাই অস্পৃশ্য মনে করা হইত ও তাদের জন্য যে 'হাড়ী-পাড়া' বসানো হইত তার নাম ছিল 'ঘেটো'। কথাটাকে লোকে অলক্ষুনে মনে করিত। তেমনি দক্ষিণ আফ্রিকায় আমরা ভারতীয়রা হাড়ী হইয়া গিয়াছি। এণ্ড্রুজের ত্যাগপ্রভাবে ও শাস্ত্রী মহাশয়ের জাদুদণ্ডের জাদুতে আমাদের শুদ্ধি হইবে কিনা ও সেই শুদ্ধির ফলে আমাদের হাড়ীত্ব ঘুচিবে কিনা তা জানে ভবিষ্যৎ।

ইহুদিরা নিজেদের ঈশ্বরের আদুরে জন ও অন্য সকলকে তার অনাদুরে জন মনে করিত। সেই পাপের দণ্ড উদ্ভটভাবে যদ্যপি অসঙ্গতরূপে তাদের সন্তান-সন্ততিদের ভুগিতে হইয়াছিল। প্রায় তেমনটাই হিন্দুরাও নিজেদের সভ্য বা আর্য ও অন্য সবকে অনার্য বা অচ্ছুত মনে করিত। নিজেদের এই পাপের ভোগ উদ্ভটভাবে যদ্যপি অনুচিতরূপে দক্ষিণ আফ্রিকা ও অন্যান্য উপনিবেশে তাদের ভুগিতে হইতেছে। আর আমার মনে হয় তাদের পড়শী, দেশবাসী ও তাদেরই রঙের বলিয়া মুসলমান ও পারসীদেরও এই দুর্ভোগ ভুগিতে হইতেছে।

কেন যে এই প্রকরণের 'লোকেশন' নামকরণ করিয়াছি পাঠক সম্ভবত এখন তা কতকটা বুঝিতে পারিয়াছেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় আমরা ভারতীয়রা

'কুলী' উপাধি পাইয়াছি। মোট যারা বয় বা পয়সার বদলে যারা মজুরি করে ভারতবর্ষে তাদের 'কুলী' বলা হয়। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকায় শব্দটা অবজ্ঞার অর্থে ব্যবহার হয়: 'কুলী' সেখানে অস্পৃশ্য বা পঞ্চমেরই শামিল। 'কুলী'দের থাকার জন্য যে স্থান ঠিক করিয়া দেওয়া হয় সেই স্থানের নাম কুলী 'লোকেশন'। জোহানিসবর্গে এরূপ এক লোকেশন ছিল। অন্যান্য জায়গার লোকেশনে ভারতীয়দের কোনরূপ মালিকানা স্বত্ব বা অধিকার তখনও ছিল না আর আজও নাই।* কিন্তু জোহানিসবর্গের এই লোকেশনের জমি ভারতীয়রা ৯৯ বছরের পাট্টায় ইজারা লইয়াছিল। বসতি অত্যন্ত ঘন ছিল। লোক বাড়িতেছিল, বস্তির পরিধি বাড়িতেছিল না। পায়খানাগুলি কোন-মতে সাফ করা হইত বটে, তা বাদে স্বাস্থ্যের দিক হইতে অন্য কোন দৃষ্টি ম্যুনিসিপালিটী দিত না। না ছিল রাস্তা না ছিল আলোর ব্যবস্থা। লোকেশনের বাসিন্দাদের ভালমন্দ সম্বন্ধে উদাসীন পৌরসভা লোকেশনের স্বাস্থ্যবিধানে মনোযোগী হইবে ইহা দুরাশা ছিল। শহরের স্বাস্থ্যব্যবস্থার ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার জ্ঞান যদি বাসিন্দাদের থাকিত তবে ম্যুনিসিপালিটীর সহায়তা বিনাই স্বাস্থ্যসংরক্ষণের ব্যবস্থা নিজেরাই করিয়া লইতে পারিত। ওখানকার বাসিন্দারা যদি রবিনসন ক্রুশোর† মত হইত, জঙ্গলে মঙ্গল করার, ধুলাতে ধান ফলাইবার শক্তি ধরিত, তবে তাদের ভাগ্য অন্যরূপ হইত। কিন্তু বহু রবিনসন ক্রুশো দল বাঁধিয়া পরদেশে গিয়া ডেরা বাঁধিয়াছে এই নজির ইতিহাসে নাই। ধন ও ব্যবসায়ের জন্য সাধারণত লোকে বিদেশে যায়। ভারতবর্ষ হইতে অজ্ঞ, গরীব, দীনদুঃখী যত মজুরই বেশি গিয়াছিল। তাদের রক্ষার জন্য পদে পদে ব্যবস্থার দরকার ছিল। তাদের পিছু পিছু ব্যবসায়ী ও অন্য স্বাধীন লোক গিয়াছিল, কিন্তু সংখ্যায় তারা খুবই কম ছিল।

এইভাবে স্বাস্থ্য-বিভাগের ডাহা গাফিলতির ও বাসিন্দাদের অজ্ঞানতার কারণ লোকেশন বাসের অযোগ্য হইয়া উঠে। ম্যুনিসিপালিটী ওই

* ইংরেজী অনুবাদে এইরূপ আছে:
অন্য যে সব স্থানে লোকেশন ছিল সেখানে ভারতীয়দের প্রজাস্বত্ব অধিকার ছিল কিন্তু জোহানিসবর্গের লোকেশনের জমি ভারতীয়রা ৯৯ বছরের পাট্টায় ইজারা লইয়াছিল।

1959 Edition, p. 212

† মূলে রবিনসন ক্রুশোর নাম নাই। ইংরেজী অনুবাদে আছে।

অস্বাস্থ্যকর অবস্থা দূর করার কোন চেষ্টাই করিল না। উল্টা, নিজেদের কর্তব্য অবহেলার দরুন যে নোংরা অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছিল তাকেই অজুহাত বানাইয়া লোকেশন উচ্ছেদ করার নিশ্চয় করিল: বিধান সভায় উচ্ছেদ আইন পাস করিয়া লইল। আমি যখন জোহানিসবর্গে গিয়া বসি তখন এই অবস্থা ছিল।

জমিতে বাসিন্দাদের মালিকানা স্বত্ব ছিল তাই ক্ষতিপূরণ পাওয়ার দাবি তাদের ছিল। খেসারতের পরিমাণ ধার্যের নিমিত্ত এক বিশেষ আদালত গঠিত হইয়াছিল। ম্যুনিসিপালিটীর নির্দিষ্ট খেসারত কম মনে হইলে মালিক ওই আদালতে আপীল করিতে পারিত। আপীলে খেসারত বাড়িয়া গেলে আইন অনুসারে উকিল-খরচ ম্যুনিসিপালিটীর দিতে হইত।

বেশির ভাগ মালিক দাবির এই মামলায় আমাকে উকিল দেয়। ইহা হইতে পয়সা রোজগার করার ইচ্ছা আমার ছিল না। আমি মক্কেলদের বলিয়া দেই, 'আপনারা জিতেন ত ম্যুনিসিপালিটী থেকে যে খরচ পাওয়া যাবে তাতেই আমি সন্তোষ মানব। হারেন কি জিতেন দলিল পিছু দশ পাউণ্ড আমাকে দেন ত মনে করব যথেষ্ট দিয়েছেন।' আরও বলিয়াছিলাম যে আমার ইচ্ছা, ওই টাকার অর্ধেক দিয়া গরীবদের জন্য হাসপাতাল তৈরি করিব বা অন্য কোন সার্বজনিক কাজের নিমিত্ত আলাদা করিয়া রাখিব। আমার এই কথায় সকলে খুব খুশী হইয়াছিল—হইবারই কথা।

প্রায় সত্তরটা মামলার একটায় মাত্র হার হয়। অতএব আমার ফীর টাকা বেশ মোটা হয়। কিন্তু 'ইণ্ডিয়ন ওপিনিয়ন'-এর ক্ষুধার শেষ ছিল না, তাই ওই টাকার ১৬০০ পাউণ্ড তার উদরে গিয়াছিল বলিয়া আমার মনে পড়ে।

এই সকল মামলার জন্য খুব খাটিয়াছিলাম। মক্কেলের ভিড় লাগিয়াই থাকিত। এদের প্রায় সকলেই উত্তর ভারতের বিহার আদি প্রদেশ হইতে বা দক্ষিণ ভারতের তামিল, তেলুগু অঞ্চল হইতে একড়ারনামা দিয়া আসিয়াছিল। পরে গিরমীটমুক্ত হইয়া স্বাধীনভাবে ব্যাপার-ব্যবসা করিত।

নিজেদের বিশেষ বিশেষ দুঃখের প্রতিকারের নিমিত্ত সাধারণ ব্যবসায়ী সংঘের বাইরে গিরমীটমুক্ত ব্যবসায়ীদের এক পৃথক্ ব্যবসায়ী সংঘ ছিল। এদের মধ্যে সরলচিত্ত, উদারমনা, মহৎ চরিত্রের ব্যক্তিও ছিল। তাদের মুখ্য শ্রীজয়রাম সিংহ সভাপতি ছিলেন। মুখ্য বা সভাপতি না হইলেও শ্রীবদ্রী মুখ্যেরই সমান ছিলেন। দুই জনই পরলোকগত হইয়াছেন। এই

দুইয়ের কাছ হইতে আমি যারপরনাই সহায়তা পাইয়াছিলাম। শ্রীবদ্রীর সহিত আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় জন্মিয়াছিল। সত্যাগ্রহের পুরোভাগে তিনি ছিলেন। এঁর ও অন্য ভাইদের মারফতে উত্তর ও দক্ষিণ ভারতীয় বহু ঔপনিবেশিকের নিকট সম্পর্কে আমি আসিয়াছিলাম। আমি তাদের উকিলই ছিলাম তা নয়, আমি তাদের ভাই হইয়া গিয়াছিলাম, তাদের ত্রি-তাপের (তিন প্রকার দুঃখের) ভাগী হইয়া গিয়াছিলাম।

ভারতীয়রা আমাকে কি বলিয়া ডাকিত তা জানার কুতূহল হওয়া স্বাভাবিক। আমাকে গান্ধী বলিয়া সম্বোধন করিতে শেঠ আবদুল্লার ভাল লাগিত না। আমার ভাগ্যের কথা, 'সাহেব' বলিয়া ডাকিয়া বা সাহেব ভাবিয়া কেউ কোন দিন আমাকে অপমান করে নাই। শেঠ আবদুল্লা অতি মধুর নাম চালু করেন। তিনি আমাকে 'ভাই' বলিয়া ডাকিতেন। তাঁর এই 'ভাই' সম্বোধন অন্য সবে লুফিয়া লয়। দক্ষিণ আফ্রিকায় যত দিন ছিলাম লোকে আমাকে এই নামে ডাকিত। গিরমীটমুক্ত ভারতীয়রা যখন আমাকে ভাই বলিয়া ডাকিত তখন তাতে আমি পাইতাম অমৃতের আস্বাদ।

১৫

মড়ক—১

ম্যুনিসিপালিটী লোকেশনের মালিকানা পাইল, কিন্তু ভারতীয়দের সঙ্গে সঙ্গে সেখান হইতে উচ্ছেদ করিল না। তাদের জায়গা করিয়া দেওয়ার প্রশ্ন ছিল। সুবিধার জায়গা ম্যুনিসিপালিটী বাছিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। অতএব ভারতীয়েরা ওই 'নোংরা' লোকেশনেই থাকিয়া যায়। দুইটি পরিবর্ত্তন ঘটিল : মালিকানা হারাইয়া ভারতীয়েরা ম্যুনিসিপালিটীর ভাড়াটে বনিল আর জায়গাটা পূর্বাপেক্ষা আরও বেশি কদর্য হইয়া উঠিল। মালিক যত দিন ছিল ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় আইনের ডরে লোকেরা স্থানটাকে তবুও কিছু পরিষ্কার রাখিত। ম্যুনিসিপালিটীর সে ভয় ছিল না। বাড়ী-গুলিতে ভাড়াটে বাড়িয়া গেল আর সেই সঙ্গে আবর্জনা-জঞ্জাল ও অব্যবস্থাও বাড়িয়া গেল।

এই অবস্থায় ভারতীয়রা অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল। ঠিক সেই সময়েই হঠাৎ

ভীষণ প্লেগ দেখা দেয়। রোগ হইত কি মরিত এই দাঁড়ায় অবস্থা। ফুসফুস-প্লেগ গ্রন্থি-প্লেগ হইতে মারাত্মক। ওই প্লেগ ফুসফুসের প্লেগ ছিল।

ভাগ্যের কথা, প্লেগ লোকেশনে দেখা দেয় নাই। জোহানিসবর্গের আশপাশে অনেক সোনার খনি। তারই একটাতে প্লেগের উৎপত্তি হইয়াছিল। খনির শ্রমিকদের বেশির ভাগ ছিল কাফরী। তাদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার পুরো দায় ছিল গোরা মালিকদের। ওই খনিতে কিছু-সংখ্যক ভারতীয়ও কাজ করিত। তাদের তেইশ জনের ছোঁয়াচ লাগে ও প্লেগ হয়। কোন এক সন্ধ্যায় প্লেগ লইয়া তারা তাদের লোকেশনের ঘরে ফিরিয়া আসে।

শ্রীমদনজীত সেই সময়ে 'ইণ্ডিয়ন ওপিনিয়ন'-এর গ্রাহক করার ও চাঁদা সংগ্রহের জন্য ওই অঞ্চলে ঘুরিতেছিলেন আর ওই ঘটনার কালে ঠিক লোকেশনেই ছিলেন। তিনি খুব নির্ভীক লোক ছিলেন। রোগীদের তিনি দেখিতে পান। তাঁর হৃদয় গলে। পেনসিলে লিখিয়া এই মর্মে তিনি আমাকে এক চিরকুট পাঠান: 'এখানে হঠাৎ ভয়ানক প্লেগ দেখা দিয়েছে। এখনই এসে আপনার কিছু করা দরকার। নয়ত অবস্থা ভয়ঙ্কর দাঁড়াবে। শীঘ্র আসবেন।'

একটা বাড়ী খালি পড়িয়াছিল। পরোয়া না করিয়া মদনজীত তার তালা ভাঙ্গিয়া সেখানে রোগীদের সরান। আমি সাইকেলে লোকেশনে যাই। টাউন-ক্লার্ককে খবরটা দেই এবং কি অবস্থায় পড়িয়া যে পড়ো বাড়ীটা দখল করিয়াছিলাম সে কথাও জানাই।

ডা. উইলিয়ম গডফ্রে জোহানিসবর্গে ডাক্তারি করিতেন। খবরটা পাওয়ামাত্র রোগীদের সেবার জন্য তিনি চলিয়া আসেন। ডাক্তারির ও শুশ্রূষার ভার তিনি নেন। কিন্তু আমাদের তিনজনের পক্ষে তেইশ জন রোগীর দেখাশোনা করা সম্ভবপর ছিল না।

অনুভব হইতে আমার বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, আগ্রহ শুদ্ধ হয় ত বিপদের সহিত যুঝিবার মত সেবক ও সাধন জুটিয়া যায়। আমার আপিসে চারজন ভারতীয় ছিল—কল্যাণদাস, মানেকলাল, গুণবন্তরায় দেশাই ও অপর একজন, তার নাম আমার মনে নাই। কল্যাণদাসকে তাঁর বাবা আমার হাতে সঁপিয়া দিয়াছিলেন। কল্যাণদাসের মত পরোপকারী ও আজ্ঞাপালনে তৎপর ব্যক্তি দক্ষিণ আফ্রিকায় আমি কচিৎ দেখিয়াছি। ভাগ্যক্রমে

কল্যাণদাস তখন অবিবাহিত ছিল, তাই বিপদের কাজে তাকে লাগাইতে আমার কোন দ্বিধা হয় নাই। মানেকলাল আমার কাছে আসিয়াছিল জোহানিসবর্গে। মনে পড়ে সেও কুমার ছিল। কেরানীই বলুন, সহকর্মীই বলুন, আর পুত্রই বলুন, এই চারজনকে আহুতি দিতে আমি প্রস্তুত হইলাম। কল্যাণদাসকে জিজ্ঞাসা করার প্রশ্নই ছিল না। অন্যদের জিজ্ঞাসা করিলাম। সঙ্গে সঙ্গে অল্প কিন্তু মধুমাখা কথায় তারা বলিল, 'আপনি যেখানে আমরা সেখানে।'

মি. রীচের পরিবার বড় ছিল। সে ঝাঁপ দিতে প্রস্তুত ছিল। কিন্তু তাকে আমি মানা করি। তাকে বিপদে টানিতে একেবারেই আমি রাজী ছিলাম না ; সে সাহস আমার ছিল না। কিন্তু বাইরে থাকিয়া বহু কাজ সে করিয়াছিল।

সেবার ও জাগরণের সেই রাত ভীষণ ছিল। বহু রোগীর সেবা আমি করিয়াছি কিন্তু প্লেগ-রোগীর শুশ্রূষা ওই ছিল আমার প্রথম। ডাক্তার গডফ্রের সাহসের পরশ আমাদেতে লাগিয়াছিল। রোগীদের খুব বেশি কিছু করার ছিল না। ওষুধ খাওয়ানো, জল দেওয়া, মলমূত্র সাফ করা, বিছানা পরিষ্কার রাখা ও আশা দেওয়া এই ছিল আমাদের কাজ।

যুবকেরা প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়াছিল, অদম্য সাহসের পরিচয় দিয়াছিল। তা দেখিয়া আমার আনন্দের অবধি ছিল না। ডা. গডফ্রের সাহসের কথা বুঝা যায়, অভিজ্ঞ মদনজীতের নির্ভয়তার কথাও বুঝা যায়, কিন্তু নবীন এই চার যুবকের সাহসের কথায় কি বলা যাইবে!

আমার যতটা মনে আছে, সেই রাতে কোন রোগীকে আমরা হারাই নাই।

কিন্তু অতীব দুঃখের হইলেও ঘটনাটা এতই গুরুত্বপূর্ণ ও আমার নিজের পক্ষে এতই ধর্মময় যে পরের দুই প্রকরণেও ওই কথা না বলিয়া আমি থাকিতে পারিতেছি না।

১৬

মড়ক—২

পড়ো বাড়ী দখল করিয়া রোগীদের পরিচর্যার ভার লইয়াছিলাম বলিয়া টাউন-ক্লার্ক আমাকে কৃতজ্ঞতা জানান আর অকপটে স্বীকার করেন, 'এমন অবস্থায় তড়িঘড়ি কিছু করার উপায় আমাদের (টাউন-কাউন্সিলের) হাতে নেই। আপনার যে সহায়তা দরকার টাউন-কাউন্সিলের পক্ষে তা দেওয়া সম্ভব হলে টাউন-কাউন্সিল তা দেবে। অনুগ্রহ করে চাইবেন।' কিন্তু এই ঘটনায় ম্যুনিসিপালিটী নিজের কর্তব্য সম্বন্ধে সজাগ হইল ও এই অবস্থায় যা যা করা দরকার অবিলম্বে সেই দিকে মনোযোগী হইল।

পরের দিন টাউন-কাউন্সিল আমাকে একটা খালি গুদাম দেয় ও রোগীদের সেখানে সরাইতে বলে। কিন্তু ম্যুনিসিপালিটী উহা পরিষ্কার করিয়া দিল না। বাড়ীটা পড়ো ছিল, নোংরা ছিল। আমরা নিজেরাই তাহা পরিষ্কার করিয়া লই। উদারমনা ভারতীয়দের সাহায্যে তক্তপোশ ইত্যাদি সংগ্রহ করিয়া একটা সাময়িক হাসপাতাল খোলা হইল। ম্যুনিসি-পালিটী এক নার্স ও তার সঙ্গে রোগীদের জন্য ব্রাণ্ডীর বোতল ও অন্য কিছু জিনিস পাঠাইল। হাসপাতালের ভার ডাক্তার গডফ্রের হাতেই থাকে।

নার্স সদয়হৃদয়া ছিল। রোগীদের সেবা করিতে প্রস্তুত ছিল। পাছে ছোঁয়াচ লাগে এই ভয়ে রোগীদের কাছে তাকে আমরা প্রায় যাইতে দিতাম না।

সময়-সময় রোগীদের ব্রাণ্ডী দেওয়ার নির্দেশ ছিল। ছোঁয়াচ হইতে বাঁচার জন্য আমাদেরও নার্স একটু একটু ব্রাণ্ডী খাইতে বলিয়াছিল। সে নিজেও খাইত। আমাদের কেউ ব্রাণ্ডী ছোঁয়ও নাই। রোগীদের তাতে উপকার হইবে এই বিশ্বাসও আমার ছিল না। ডা. গডফ্রের অনুমতি লইয়া রোগীদের তিন জনের—যারা ব্রাণ্ডী না খাইতে ও মাটির পুলটিস লাগাইতে প্রস্তুত ছিল—তাদের বেদনার স্থান মাথায় ও বুকে মাটির পুলটিস লাগাই। তাদের দুইজন সারিয়া ওঠে। অন্য কুড়িজন এই গুদামেই মারা যায়।

ম্যুনিসিপালিটী অন্য ব্যবস্থা করিতেছিল। জোহানিসবর্গ হইতে সাত মাইল দূরে একটা লেজেরেটো অর্থাৎ ছোঁয়াচে রোগের হাসপাতাল ছিল। সেখানে তাঁবু খাটাইয়া এই তিন জন রোগীকে লইয়া যাই। নতুন আক্রমণ

হয় ত তাদেরও সেখানে পাঠানোর ব্যবস্থা হয়। অতএব আমরা এই কাজ হইতে মুক্ত হইলাম।

দিন কয়েক পরে জানিতে পাই যে ওই ভালমানুষ নার্সের প্লেগ হয় ও সঙ্গে সঙ্গে সে মারা যায়। ওই দুইটি রোগী কি ভাবে যে বাঁচিয়া গিয়াছিল আর আমরা ছোঁয়াচ হইতে কেমন করিয়া রক্ষা পাইয়াছিলাম তা বলা কঠিন। তবে এর ফলে মাটি-চিকিৎসার ওপর বিশ্বাস এবং ওষুধ হিসাবেও মদের ওপর আমার অবিশ্বাস বাড়িয়া যায়। আমি জানি যে আমার এই বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের কোন দৃঢ় প্রমাণ নাই। কিন্তু তখন যা আমার মনে হইয়াছিল আর আজও মনে দাগ কাটিয়া আছে তা আমি উপেক্ষা করিতে পারিতেছি না আর তাই আবশ্যকবোধে এখানে তার উল্লেখ করিলাম।

মড়ক লাগিতেই আমি সমাচার-পত্রে এক কটু পত্র লিখি। তাতে ম্যুনিসিপালিটীকে লোকেশন নিজহাতে নেওয়ার পরে উহার ব্যবস্থাদি উপেক্ষা করার জন্য ও প্লেগ দেখা দেওয়ার জন্যও দায়ী করি। এই পত্রের কারণে মি. পোলক আমার সাথে আসিয়া জোটেন। আর অনেকটা এই সূত্রেই স্বর্গীয় রেভারেণ্ড যোসেফ ডোকের সহিত আমার পরিচয়ের সূচনা হয়।

কোন এক প্রকরণে পুর্বে বলিয়াছি যে আমি এক নিরামিষ ভোজন গৃহে খাইতে যাইতাম। আলর্বট ওয়েস্ট-এর সহিত সেখানে আমার পরিচয় হয়। প্রতি সন্ধ্যায় সেখানে আমাদের দেখা হইত। যাওয়ার পরে এক সঙ্গে আমরা বেড়াইতে বাহির হইতাম। ওয়েস্ট একটি ছোট ছাপাখানার অংশীদার ছিলেন। প্লেগ সম্বন্ধে আমার পত্র তিনি কাগজে পড়েন। খাওয়ার সময়ে ভোজনালয়ে আমাকে দেখিতে না পাইয়া তিনি চিন্তিত হন।

প্লেগের সময়ে আমরা (আমি ও আমার সহকর্মীরা) আহার কমাইয়া দিয়াছিলাম। মড়কের সময়ে পেট যত হাল্কা রাখা যায় তত ভাল বহুদিন হইতে এই নিয়ম আমি পালন করিয়া আসিতেছিলাম। তাই সন্ধ্যার খাওয়া আমি বন্ধ করিয়া দিয়াছিলাম। আর আমা হইতে কারো ছোঁয়াচ না লাগে এই কারণে দুপুরে এমন সময়ে খাইতে যাইতাম যখন প্রায় অন্য কেউ খাইতে আসিত না। ভোজনালয়ের মালিকের সহিত আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। তাকে আমি বলিয়াছিলাম যে আমি প্লেগের রোগীর সেবা করি তাই যত কম লোকের সংস্পর্শে আসি তত ভাল।

ভোজনালয়ে আমাকে দেখিতে না পাইয়া দ্বিতীয় কি তৃতীয় দিনে অতি ভোরে আমি যখন বাহির হওয়ার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলাম এমন সময়ে ওয়েস্ট দরজায় করাঘাত করেন। দরজা খুলিতে তিনি বলেন, 'ভোজনালয়ে না দেখে ভয় হল আপনার অসুখ-বিসুখ হয়নি ত। এ সময়ে এলে দেখা পাবই তাই এখন এলাম। আমাকে কাজে লাগান ত আমি লাগতে প্রস্তুত। রোগীদের সেবা করতে তৈরি। আপনি জানেন, নিজের পেট ছাড়া অন্য পেটের ভাবনা আমার ভাবতে হয় না।'

ওয়েস্টকে কৃতজ্ঞতা জানাইলাম। তৎক্ষণাৎ বলিলাম, 'রোগীর সেবায় আপনাকে লাগাব না। নতুন রোগী না এলে দুই এক দিনে আমাদের কাজ শেষ হবে। তবে একটা কাজ আছে বটে।'

'কি কাজ?'

'ডারবনে গিয়ে ইণ্ডিয়ন ওপিনিয়ন-এর প্রেসের ভার নেওয়া সম্ভব হবে কি? মদনজীত এখন এখানকার কাজে ব্যস্ত রয়েছেন। ওখানে কারো যাওয়া দরকার। আপনি যান ত ওদিককার চিন্তা আমার থাকে না।'

'আপনি জানেন আমার একটা ছাপাখানা আছে। খুব সম্ভব যেতে পারব। পাকা কথা আজ সন্ধ্যায় দিই ত চলবে কি? বেড়াবার কালে চূড়ান্ত কথা হবে।'

আমি খুশী হইলাম। সেই দিনই সন্ধ্যায় কথা হয়। তিনি যাইতে রাজী। পয়সা রোজগারের জন্য তিনি যাইতেছিলেন না, সুতরাং বেতনের প্রশ্ন ছিল না। তবুও মাসিক দশ পাউণ্ড আর লাভ হয় ত লাভের এক অংশ দেওয়ার কথা ঠিক হয়। পরের দিন রাতের মেলে ওয়েস্ট তাঁর বকেয়া উসুলের ভার আমার ওপর দিয়া রওনা হইয়া যান। সেদিন হইতে আমার দক্ষিণ আফ্রিকা ছাড়ার দিন পর্যন্ত তিনি আমার সুখ-দুঃখের ভাগী ছিলেন।

বিলাতের লিংকনশায়ারের লাউথ গ্রামে কৃষক পরিবারে মি. ওয়েস্টের জন্ম। পুঁথিবিদ্যা তাঁর সামান্যমাত্র। কিন্তু অভিজ্ঞতার পাঠশালায় নিজের উদ্যমে তিনি সুশিক্ষিত। চরিত্রবান, সংযমী, ঈশ্বরভীরু, সাহসিক ও পরোপকারী ইংরেজ—এই দৃষ্টিতে চিরদিন আমি ওয়েস্টকে দেখিয়াছি।

তাঁর ও তাঁর পরিবারের আরও কিছু পরিচয় পরের কোন কোন প্রকরণে দিব।

১৭

লোকেশন ভস্মসাৎ

প্লেগ-রোগীদের সেবাকার্য হইতে সাথীরা ও আমি মুক্ত হইলেও প্লেগের কারণ জনিত অন্য অনেক কাজের চাপ তখনও মাথায় ছিল।

লোকেশনের স্বাস্থ্য বিষয়ে ম্যুনিসিপালিটীর কোন নজর না থাকিলেও গোরা নাগরিকদের স্বাস্থ্যের কথায় উহা সদা-সতর্ক ছিল। তাদের স্বাস্থ্য-রক্ষার জন্য অর্থব্যয়ে কোন দিনই উহার কুণ্ঠা ছিল না, আর এখন ত প্লেগ না ছড়ায় এই জন্য পয়সা জলের মত খরচ করিতেছিল। ভারতীয়দের স্বাস্থ্য ব্যাপারে কর্তব্যে অবহেলা করিয়াছিল বলিয়া আমি ম্যুনিসিপালিটীকে নানাভাবে দায়ী করিয়াছিলাম। তা সত্ত্বেও গোরাদের কল্যাণ কামনায় ম্যুনিসিপালিটীর এই আগ্রহ ও উদ্‌যোগের প্রশংসা না করিয়া আমি থাকিতে পারি নাই। উহার এই শুভ প্রযত্নে ম্যুনিসিপালিটীকে আমি আমার সাধ্যমত সাহায্য করিয়াছিলাম। আমার বিশ্বাস আমার ওই সহায়তা না পাইলে ম্যুনিসিপালিটীর মুশকিলে পড়িতে হইত আর হয়ত বা গুলি চালাইতে হইত—উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ওই অপকর্ম করিতে উহার বাধিত না।

তেমন কিছু ঘটিতে পায় নাই। ভারতীয়দের ব্যবহারে ম্যুনিসিপালিটীর কর্তৃপক্ষ তুষ্ট হইয়াছিল আর প্লেগ সংক্রান্ত পরের অনেক কাজ সহজ হইয়া গিয়াছিল। আমার সবটা প্রভাব বিস্তার করিয়া ভারতীয়দের আমি ম্যুনিসিপালিটীর কথা মত চলিতে বলি। আমার সব কথা মানিয়া লওয়া ভারতীয়দের পক্ষে খুবই কঠিন ব্যাপার ছিল, তবু আমার মনে পড়ে না কেউ আমার কথা উপেক্ষা করিয়াছিল।

লোকেশনের চারদিকে পাহারা বসিল। অনুমতি বিনা সেখান হইতে কেউ বাহিরে যাইতে ও বাহির হইতে কেউ ভিতরে যাইতে পাইত না। আমি ও আমার সাথীরা ইচ্ছামত যাওয়া-আসার অনুমতি পাইয়াছিলাম। ম্যুনিসিপালিটী ঠিক করে যে জোহানিসবর্গ হইতে তের মাইল দূরে খোলা ময়দানে তাঁবু খাটাইয়া লোকেশনের লোকদের তিন সপ্তাহ রাখিবে ও লোকেশন জ্বালাইয়া দিবে। কিন্তু তাঁবু খাটাইতে ও খাদ্যাদির ব্যবস্থা করিতে কিছু সময় দরকার। ওই সময়টায় পাহারা না বসাইয়া উপায় ছিল না।

লোকেরা অতিশয় ভয় পাইয়াছিল। কিন্তু আমি তাদের পাশে থাকাতে তারা আশ্বস্ত হয়। গরীবদের অনেকে নিজেদের যা কিছু সঞ্চয় ঘরে পুঁতিয়া রাখিয়াছিল। এখন সেই সব ওখান হইতে সরানো আবশ্যক হইল। ব্যাঙ্কের সহিত লেনদেন তাদের ছিল না; ব্যাঙ্কের নামও তারা জানিত না। আমি তাদের ব্যাঙ্ক হইলাম। আমার আপিসে টাকার স্তূপ জমিতে থাকিল। এরূপ বিপদ্‌কালে পারিশ্রমিক বাবদ পয়সা লওয়া আমার সাজে না। কাজটা কোনমতে কষ্টেসৃষ্টে কুলাইয়া লইলাম। আমার ব্যাঙ্কের ম্যানেজারের সঙ্গে আমার ভাল পরিচয় ছিল। তাঁকে বলি যে অনেক টাকা আমার জমা দিতে হইবে। তামার ও রূপার বেশি টাকা-পয়সা লইতে ব্যাঙ্ক রাজী ছিল না। তা ছাড়া প্লেগের স্থান হইতে আসা টাকা ছুঁইতে কেরানীদের আপত্তি হওয়ার ভয়ও ছিল। ম্যানেজার আমার জন্য সব রকমের সুবিধা করিয়া দেন। স্থির হয় জীবাণুনাশক জলে টাকা ধুইয়া ব্যাঙ্কে পাঠানো হইবে। মনে পড়ে এইভাবে প্রায় ৬০,০০০ পাউণ্ড ব্যাঙ্কে জমা রাখা হইয়াছিল। যাদের বেশি টাকা জমা দেওয়ার ছিল তাদের মেয়াদী খাতে (ফিক্সড্ ডিপোজিটে) টাকা রাখিতে বলিয়াছিলাম। তারা আমার পরামর্শ মানিয়া লইয়াছিল। তার ফলে তাদের কারো কারো ব্যাঙ্কে টাকা রাখার অভ্যাস হইয়া যায়।

লোকেশনের বাসিন্দাদের জোহানিসবর্গ হইতে স্পেশাল ট্রেনে জোহানিস-বর্গের নিকটবর্তী ক্লিপস্প্রুট ফার্মে নেওয়া হয়। ম্যুনিসিপালিটী সরকারী ব্যয়ে তাদের খাওয়া-দাওয়া ইত্যাদির ব্যবস্থা করে। তাঁবুর ওই গ্রাম দেখিলে মনে হইত বুঝিবা ছাউনি। অমনটা থাকার অভ্যাস ছিল না বলিয়া লোকেদের বাধবাধ ঠেকিতেছিল; তারা অস্বস্তি বোধ করিতেছিল। তবে বিশেষ কোন অসুবিধা তাদের ভুগিতে হয় নাই। সাইকেলে প্রতিদিন একবার যাইতাম। চব্বিশ ঘণ্টা মধ্যে তারা দুঃখ ভুলিয়া যায় ও আনন্দে দিন কাটাইতে থাকে। যখনই যাইতাম দেখিতাম তারা ভজন-কীর্তন গাহিতেছে, খেলাধুলা করিতেছে। খোলা হাওয়ায় তিন সপ্তাহ থাকাতে তাদের স্বাস্থ্যের নিঃসংশয় উন্নতি হইয়াছিল।

যতটা মনে পড়ে যেদিন লোকেশন খালি হয় তার পর দিন তা জ্বালাইয়া দেওয়া হয়। সেখানকার কোনও বস্তু বাঁচাইবার লোভ ম্যুনিসিপালিটী করে নাই। ঠিক ওই সময়ে ও ওই কারণে ম্যুনিসিপালিটী উহার বাজারের

গৃহ-নির্মাণের হাজার দশেক পাউণ্ড মূল্যের কাঠ পোড়াইয়া দেয়। মার্কেটে মরা ইঁদুর দেখা গিয়াছিল বলিয়া ওই কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছিল।

ম্যুনিসিপালিটীর মস্ত ক্ষতি হইয়াছিল। কিন্তু তার ফলে রোগ ছড়াইতে পায় নাই। শহর হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচে।

১৮

একখানি বই-এর জাদুপ্রভাব

প্লেগের কারণে আমার ওপর গরীব ভারতীয়দের বিশ্বাস বাড়িয়া গেল। পসারও বাড়িল আর দায়িত্বও। অন্য দিকে নূতন-পরিচিত ইউরোপীয়-দের জন কয়েকের সহিত সম্পর্ক এতটা ঘন হইল যে তাঁদের প্রতি আমার নৈতিক দায় বেশ খানিকটা বৃদ্ধি পাইল।

ওয়েস্টের সঙ্গে যেমন পোলকের সঙ্গেও তেমন নিরামিষ ভোজনালয়ে আমার পরিচয় হইয়াছিল। এক সন্ধ্যায় আমার টেবিল হইতে সামান্য দূরের টেবিলে এক যুবক আহার করিতেছিল, সে আমাকে তার কার্ড পাঠায়, আমার সহিত কথা বলিতে চায়। আমার টেবিলে তাকে আসিবার নিমন্ত্রণ জানাই। সে আসে।

'আমি 'ক্রিটিক' পত্রের সহ-সম্পাদক। প্লেগ সম্বন্ধে আপনার পত্র পড়ে আপনার সঙ্গে দেখা করার আকাঙ্ক্ষা জন্মে। আজ সেই বাসনা পূর্ণ হল।'

মি. পোলকের সরল ব্যবহারে মুগ্ধ হইলাম। সেই রাতেই আমরা একে অন্যের পরিচয় লাভ করিলাম। জীবনের মূল বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি প্রায় একরূপ। সাদাসিধা জীবনের দিকে তাঁর ঝোঁক ছিল। কোন কিছু করণীয় মনে হইলে তদনুসারে তিনি চলিতেন; তাঁর এই দৃঢ়তা দেখিয়া আমি অবাক হইতাম। সহসা নিজ জীবনে তিনি কতকগুলি মৌলিক পরিবর্তন সাধন করেন।

'ইণ্ডিয়ন ওপিনিয়ন'-এর খরচ বাড়িয়াই চলিয়াছিল। ওয়েস্টের প্রথম রিপোর্টে আমি ভয় পাই। তিনি জানান, 'আপনি এতে লাভের সম্ভাবনা দেখেছিলেন। আমি তা দেখতে পাচ্ছি না। ভয় হয় ক্ষতিই হবে। হিসাবপত্র ঠিক নেই। অনাদায়ী অনেক পড়ে আছে কিন্তু তার মাথামুণ্ডু

ঠিক করা প্রায় অসম্ভব। অনেকটা হেরফের করা দরকার। এই রিপোর্ট পড়ে ঘাবড়াবেন না। সাধ্যমত গুছিয়ে নিতে চেষ্টা করব। এসেছি, লাভ হোক বা লোকসান হোক, থাকব।'

লাভের ব্যাপার নয় দেখিয়া ওয়েস্ট চলিয়া যাইতে পারিতেন, কোন দোষ আমি তাঁকে দিতে পারিতাম না। উল্টা, নিঃসন্দেহ না হইয়া লাভের কথা বলিয়াছিলাম বলিয়া তিনি আমাকেই দোষ দিতে পারিতেন। এ সব সত্ত্বেও তাঁর মুখে অভিযোগের টুঁ-শব্দটি পর্যন্ত শোনা যায় নাই। কিন্তু আমার বিশ্বাস, অবস্থা জানার পরে মি. ওয়েস্ট আমাকে সহজবিশ্বাসী মানুষ ঠাওরাইয়াছিলেন। যাচাই না করিয়া মদনজীতের ধারণার ওপর নির্ভর করিয়া ওয়েস্টকে আমি লাভের কথা বলিয়াছিলাম।

এখন আমি বুঝিতে পাইয়াছি যে নিঃসন্দেহ না হইলে অন্যের কথায় নির্ভর করিয়া দেশসেবকের কোন কথা বলিতে নাই। সত্যের পূজারীর অত্যন্ত সাবধানে চলিতে হয়। পুরাপুরি খোঁজ-খবর না করিয়া কাউকে কোন কিছু ধরিয়া লইতে বলিলেও সত্যের লাঞ্ছনা হয়। সখেদে বলিতেছি যে এই কথা জানা সত্ত্বেও আমি আমার বিশ্বাস-প্রবণতার ঊর্ধ্বে উঠিতে পারি নাই। পারি নাই তার কারণ এই যে আমার শক্তির অধিক কাজ আমি করিতে চাই। এই লোভের হেতু আমা অপেক্ষা আমার সহকর্মীদের অধিক অস্বস্তি ভুগিতে হইয়াছে।

ওয়েস্টের পত্র পাইয়া আমি নাতাল রওনা হই। সব কথা আমি পোলককে বলিয়াছিলাম। আমাকে বিদায় দিতে তিনি স্টেশনে আসেন। 'এই বইখানি রাস্তায় পড়ার মত। পড়বেন। ভাল লাগবে।' এই বলিয়া রাস্কিনের 'আনটু দিস লাস্ট' বইখানি তিনি আমার হাতে দেন।

পড়িতে আরম্ভ করিলাম ত একটানা পড়িয়া ফেলিলাম। বইখানি মন কাড়িয়া লয়। জোহানিসবর্গ হইতে নাতালে যাইতে ২৪ ঘণ্টা লাগিত। গাড়ী সন্ধ্যায় ডারবনে পৌঁছিল। ঘরে গেলাম। অনিদ্রায় রাত কাটিল। সংকল্প করিলাম, এই বইয়ের আদর্শে নিজ জীবন ঢালিয়া গড়িব।

জীবনে এই প্রথম আমি রাস্কিনের লেখা পড়ি। বলা চলে, ছাত্রজীবনে পাঠ্যপুস্তকের বাইরে প্রায় কোন পুস্তক পড়ি নাই। কর্মজীবনে প্রবেশ করার পরে পড়ার সময় আমার খুব কমই মিলিয়াছে। এখনও তাহাই। অতএব কেতাবী জ্ঞান আমার নিতান্তই কম। আমার মনে হয় না এই

বাধ্যতামূলক সংযম হেতু আমি কিছু হারাইয়াছি। কিন্তু বলিতে পারি, অল্প-স্বল্প যা কিছু পড়িয়াছি তা উত্তমরূপে আত্মসাৎ করিয়া লইয়াছি। এই বই সেই সেই বই-এর এক যা অকস্মাৎ আমার জীবনের মোড় ঘুরাইয়া দিয়াছে। এই বই পরে আমি অনুবাদ করিয়াছি ও তার নাম দিয়াছি 'সর্বোদয়'। আমার বিশ্বাস, যে সব বস্তু আমার গভীরে লুকানো ছিল রাস্কিনের এই মহৎ রচনায় তার কোন-কোনটির প্রতিবিম্ব আমি দেখিতে পাইয়াছিলাম; প্রতিবিম্ব আমার মনে ক্রিয়া করিয়াছিল, আমার জীবনের দিশা ঘুরাইয়া দিয়াছিল। কবি তিনি যিনি আমাদের অন্তরের ঘুমন্ত শুভ ভাবনাকে জাগ্রত করেন। কবির প্রভাব সকলের ওপর সমান হয় না কারণ সকলের বিকাশের স্তর এক নয়।

'আনটু দিস লাস্ট'-এর সিদ্ধান্ত আমার মতে এই:

১। সকলের কল্যাণে আমার কল্যাণ নিহিত।

২। উকিল ও নাপিতের কাজের মূল্য সমান হওয়া চাই, কারণ খোরাক-পোশাক কামাইবার দাবি সবাইর সমান।

৩। সাদাসিধা চাষী ও মজুরের জীবনই সত্যিকার শুদ্ধ জীবন।

এর প্রথমটি আমি জানিতাম। দুইয়ের ধোঁয়াটে ধারণা আমার ছিল। তিনের কথা কোন দিন আমার মনে আসে নাই। 'আনটু দিস লাস্ট' দিনের আলোর মত আমার কাছে স্পষ্ট করিয়া দেয় যে দুই ও তিন একের গর্ভে রহিয়াছে। ভোর হইল। সংকল্প করিলাম, এই সিদ্ধান্ত অনুসারে জীবন ঢালিয়া গড়িব।

১৯

ফিনিক্স-এর পত্তন

সর্বপ্রথমে ওয়েস্টের সহিত বিষয়টার আলোচনা করি। আমার ওপর 'আনটু দিস লাস্ট'-এর প্রভাবের কথা তাঁকে বলি ও 'ইণ্ডিয়ন ওপিনিয়ন'-কে খামারে নেওয়ার এবং সকলে সমান পয়সা লইয়া খামারে কাজ করিয়া অবসর সময়ে ছাপাখানার কাজ চালানোর প্রস্তাব তাঁর কাছে করি। মি. ওয়েস্ট এই প্রস্তাবে সায় দেন। স্থির হয় কালো কি গোরা সকলে খাওয়া-পরা বাবদ মাথা পিছু তিন পাউণ্ড পাইবে।

কিন্তু দুইটি কথা বিবেচনা করার ছিল : প্রেসে যারা কাজ করিত (জনা দশেক) তাদের সকলে জঙ্গলে যাইবে কিনা ; দুই, কেবল খাওয়া-পরার ভাতায় তারা রাজী হইবে কিনা। আমরা দুই জনে স্থির করি যে, যারা শুরুতেই এই যোজনায় যোগ দিতে না পারিবে তারা তাদের বেতন লইতে থাকিবে এবং ধীরে ধীরে সংস্থায় মিলিয়া যাওয়ার আদর্শ ধরিয়া আগাইয়া চলিবে।

কর্মীদের সহিত এই বিষয়ে কথাবার্তা বলিলাম। প্রস্তাবটা মদনজীতের মোটেই ভাল লাগে নাই। তাঁর ভয় হইল, যে কাজে তিনি মনপ্রাণ ঢালিয়া দিয়াছিলেন আমার বোকামিতে মাসেক মধ্যে তা শেষ হইবে, 'ইণ্ডিয়ন ওপিনিয়ন' উঠিয়া যাইবে, কর্মীরা পালাইবে, প্রেস অচল হইবে।

আমার ভাইপো ছগনলাল গান্ধী এই প্রেসে কাজ করিত। তার সঙ্গেও আমি ও ওয়েস্ট কথা বলি। তার স্ত্রীপুত্র ছিল। কিন্তু বাল্যকাল হইতে সে আমার মতে লেখাপড়া করিয়াছিল ; আমার সঙ্গে কাজ করিতে তার ভাল লাগিত। তাই কোন কথা না বলিয়া সে এই যোজনায় যোগ দেয়। আজও সে আমার সঙ্গেই আছে। মেসিনম্যান গেবিন্দস্বামী-ও যোজনায় যোগ দেয়। অন্য সকলে যোগ না দিলেও প্রেস যেখানে যাইবে সেখানে যাইতে রাজী হয়।

মনে পড়ে, কর্মীদের সহিত কথাবার্তায় দুই দিন গিয়াছিল। কথা শেষ হইতেই ডারবনের নিকটের কোন স্টেশনের লাগাও জমি আবশ্যক বলিয়া সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেই। জবাবে ফিনিক্স-এর জমির প্রস্তাব আসে। ওয়েস্ট ও আমি জমি দেখিতে যাই। সাতদিন মধ্যে কুড়ি একর জমি বন্দোবস্ত লওয়া হইল। জমিতে ছোট একটা ঝরনা ছিল। আম ও কমলালেবুর গাছ কতকগুলি ছিল। পাশেই আশি একরের এক খণ্ড জমি ছিল। ওই জমিতেও অনেক গাছ ছিল, আর ছিল একটা পড়ো বাড়ী। ওই জমিও অল্প দিন মধ্যে কেনা হইল। ১,০০০ পাউণ্ড মূল্য দিতে হইয়াছিল।

আমার যে কোন সাহসের কাজে স্বর্গীয় রুস্তমজী সহায় হইতেন। আমার এই যোজনা তাঁর ভাল লাগিয়াছিল। ঘর তৈরী করার জন্য তিনি তাঁর এক বৃহৎ গুদামের টিন ইত্যাদি দ্রব্য বিনা পয়সায় দিলেন। তা দিয়া ঘর তোলার কাজ শুরু হইল। বোঅর যুদ্ধে আমার সঙ্গী হইয়াছিল এমন

জন কয়েক ছুতার ও রাজমিস্ত্রী ঘর তৈরীর কাজে আমাকে সহায়তা করিয়াছিল। ৭৫ ফুট লম্বা ও ৫০ ফুট চওড়া ঘর বা কারখানা এক মাসেরও কম সময়ে তৈরী হইয়া গেল। বিপদের ভয় উপেক্ষা করিয়া ওয়েস্ট ও অপর কয়েকজন লোক ছুতার ও রাজমিস্ত্রীদের সঙ্গে সেই সময় ছিলেন। ফিনিক্স লম্বা ঘাসে ঢাকা পড়তি জমি ছিল। তাই সাপের আড্ডা ছিল। সুতরাং বাসের পক্ষে নিরাপদ ছিল না। শুরুতে সকলেই তাঁবুতে ছিল। জিনিসপত্রের বেশির ভাগ সপ্তাহ মধ্যে গরুর গাড়ীতে ফিনিক্সে আসিয়া যায়। স্থানটা ডারবন হইতে চৌদ্দ ও ফিনিক্স স্টেশন হইতে আড়াই মাইল দূরে।

'ইণ্ডিয়ন ওপিনিয়ন'-এর একটা সংখ্যামাত্র বাইরে—'মারকিউরী' প্রেসে ছাপিতে হইয়াছিল।

ভারত হইতে আমার সঙ্গে যে সব আত্মীয়-স্বজন নিজেদের ভাগ্য পরীক্ষার্থে আসিয়াছিল তারা এটা-ওটা ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছিল। তাদের আমি আমার মতে আনিতে ও ফিনিক্সে টানিতে চেষ্টা করিতে থাকি। তারা ওখানে গিয়াছিল পয়সা কামাইতে সুতরাং তাদের আমার মতে আনা সহজ কর্ম ছিল না। তবুও জন কয়েক আমার ডাকে সাড়া দেয়। তাদের এক জনের—মগনলাল গান্ধীর—নামই করিতে পারিতেছি। অন্য যারা আসিয়াছিল অল্প দিন থাকিয়া তারা ফিনিক্স ছাড়িয়া চলিয়া যায়। মগনলাল ব্যবসা গুটাইয়া চিরদিনের মত আমার সঙ্গে জুটিয়াছিল আর তখন হইতে আমার সঙ্গেই আছে। নিজের বুদ্ধি, ত্যাগ ও অনন্য ভক্তি গুণে আমার আরম্ভদিনের সঙ্গীদের মধ্যে মগনলাল আমার আধ্যাত্মিক পরীক্ষায় প্রথম স্থান গ্রহণ করিয়াছে। আমার মনে হয় আমার স্বয়ং-শিক্ষিত কারিগরদের মধ্যে তার সমান আর কেউ নাই।

এই ভাবে ১৯০৪ সনে ফিনিক্সের পত্তন হয়: নানা বাধা-বিঘ্ন সত্ত্বেও ফিনিক্স ও 'ইণ্ডিয়ন ওপিনিয়ন' এই দুইই আজও টিকিয়া আছে।

কিন্তু আরম্ভদিনের অসুবিধার কথা, অদলবদল যা যা করিতে হইয়াছিল সেই কথা ও আশা-নিরাশার কথাও পাঠকদের কাছে ধরার যোগ্য। সে কথা পৃথক প্রকরণে বলিব।

২০

প্রথম রাত

ফিনিক্স হইতে প্রথম অঙ্ক বাহির করা সহজে ঘটিয়া ওঠে নাই। দুই বিষয়ে সতর্ক না হইলে 'ইণ্ডিয়ন ওপিনিয়ন'-এর হয় এক সপ্তাহ বাদ যাইত বা তা বিলম্বে বাহির হইত। এই সংস্থায় ইঞ্জিনে-চলা যন্ত্র বসাইবার দিকে আমার মনের সায় ছিল না। যেখানে খেতের কাজ হাতে করা হইবে সেখানে সংবাদপত্রও হাতে-চালানো যন্ত্রে ছাপাই মানানসই হইবে, এই ছিল আমার দৃষ্টি। কিন্তু দেখিলাম ওই বাসনাকে কার্যে রূপ দেওয়া সম্ভব নয়। তাই অয়েল-ইঞ্জিন বসানো হইয়াছিল। তাজা হইলেও আমি ওয়েস্টকে বলি যে অয়েল-ইঞ্জিন কখনও বিগড়াইলে কাজ অচল না হয় এমন কোন বিকল্প ব্যবস্থা রাখা সঙ্গত হইবে। আর সে অনুসারে হাতে চালানো এক চক্রের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। পত্র দৈনিকের আকারের ছিল। ইঞ্জিন বিকল হইলে তা তাড়াতাড়ি মেরামত করার সুবিধা অজ-পাড়াগাঁ ফিনিক্সে-ছিল না। তাই আকারে ছোট করিয়া পত্র ফুল-স্কেপের সাইজ করা হয় ঠেকায় পড়িলে যাতে পায়ের চাপে চালানো ট্রেডেলে ছাপা চলে।

প্রথম দিকটায় 'ইণ্ডিয়ন ওপিনিয়ন'-এর প্রকাশ-তারিখের পূর্ব রাত্রে আমাদের সকলের অধিক রাত অবধি জাগিতে হইত। কাগজ ভাঁজ করার কাজটা ছোট-বড় সকলে হাতে হাতে করিত। রাত দশটা হইতে বারটার মধ্যে কাজ শেষ হইয়া যাইত। কিন্তু প্রথম রাতের কথা চিরকাল মনে থাকিবে। ফর্মা মেশিনে আঁটা হইল কিন্তু মেশিনের চলার নাম নাই। ইঞ্জিন বসানো ও চালু করিয়া দেওয়ার জন্য ডারবন হইতে এক ইঞ্জিনিয়র আনা হইয়াছিল। সে ও ওয়েস্ট দুই জনে হদ্দ চেষ্টা করিলেন কিন্তু ইঞ্জিন সাড়া দিল না। সকলে ভাবনায় পড়িল। হতাশ হইয়া অবশেষে ওয়েস্ট জলভরা চোখে আসিয়া বলিলেন, 'ইঞ্জিন আজ চলবে বলে মনে হচ্ছে না। সপ্তাহের পত্র সময়মত বার করার সম্ভাবনা দেখছি না।'

'তা হয় ত আমরা নাচার। কিন্তু কেঁদে কি হবে? আর কোন চেষ্টা করার থাকে ত করতে হয়। ওই হাত-চাকার কি হল? দেখলে হয় না?'—বলিয়া আমি সান্ত্বনা দিলাম।

ওয়েস্ট বলিলেন, 'চাকা চালাবার লোক আমাদের কাছে কোথা?

আমরা যে কয় জন আছি তাতে এই চাকা ঘুরবে না। এর জন্য পালাক্রমে চার-চার জন লোকের দরকার। আমাদের নিজেদের লোকেরা সবাই ক্লান্ত।'

ঘরদুয়ার তৈরির কাজ শেষ হইতে তখনও বাকী ছিল। সুতরাং সুতারেরা তখনও ছিল। আর ছাপাখানার মেজেতে তারা ঘুমাইতেছিল। তাদের দিকে দেখাইয়া আমি বলিলাম, 'এই যে ভাইরা আছে? সকলে আমরা আজ সারা রাত জাগব। আমার মনে হয় এই চেষ্টা করে দেখা বাকী আছে।'

ওয়েস্ট বলিল, 'সুতারদের জাগাতে ও কাজ করতে বলতে আমি ভরসা পাচ্ছি না। আর আমাদের নিজেদের লোকেরা ক্লান্ত। তাদের কি করে বলি?'

বলিলাম, 'ওটা আমার কাজ।'

ওয়েস্ট বলিল, 'তা হলে কাজটা হয়ত উতরে যাবে। আমি মিস্ত্রীদের জাগাইলাম, তাদের সাহায্য চাহিলাম। বেশি বলা-কওয়ার দরকার হইল না। তারা বলিল, 'এমন সময়েও যদি কাজ না দিই ত আমরা মানুষ কিসের? আপনি ঘুমোন। আমরা চাকা ঘোরাব। এতে আমাদের কষ্ট হবে না।'

আমাদের ছাপাখানার লোকেরা ত এক পায়ে খাড়াই ছিল।

ওয়েস্টের আনন্দের অবধি ছিল না। কাজ করিতে করিতে তিনি গান গাহিতেছিলেন। ছুতারদের সঙ্গে আমি চাকা ঘুরাইতে থাকি। অন্যেরা পালাক্রমে হাত দিতেছিল। কাজ চলিতে লাগিল। ভোর সাতটায় দেখিলাম ছাপা তখনও অনেকটা বাকী। ওয়েস্টকে বলিলাম, 'এবার ইঞ্জিনিয়রকে জাগালে হয় না? দিনের আলোতে আর একবার চেষ্টা করে দেখলে হয়। ইঞ্জিন চলে ত আমাদের কাজ ঠিক সময়ে হয়ে যাবে।'

ওয়েস্ট ইঞ্জিনিয়রকে জাগাইলেন। সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া সে ইঞ্জিন ঘরে গেল। হাত দিতেই ইঞ্জিন চলিতে লাগিল। আনন্দের গুঞ্জনে প্রেস ভরিয়া গেল। আমি বলিলাম, 'এ কি হল! রাতে এত সাধ্যসাধনা করা হল তবুও মুখ ফিরিয়ে থাকল, আর এখন ছুঁতে না ছুঁতেই চলতে লাগল যেন কোন খুঁতই এতে কোথাও ছিল না?'

'এর উত্তর দেওয়া কঠিন। কখন কখন দেখা যায় মানুষের মত মেশিনেরও

যেন বিশ্রাম চাই এমনটাই তা ব্যবহার করে'—এ কথা ওয়েস্ট বলিয়াছিলেন কি ইঞ্জিনিয়র মনে নাই।

ইঞ্জিন মুখ ঘুরাইয়া ছিল না ত আমাদের সকলকে পরীক্ষা করিয়া লইয়াছিল, আর শেষ মুহূর্তে চলিয়াছিল না ত বলিয়াছিল—আন্তরিক শুদ্ধ শ্রমের ফল এমনটাই মধুর হয়, এই ব্যাপারটাকে আমি এই দৃষ্টিতেই দেখি।

পত্র সময়মত স্টেশনে চলিয়া গেল; আমরা সকলে নিশ্চিন্ত হইলাম।

এরূপ নিষ্ঠার ফলে পত্রের ঠিক সময়ে প্রকাশ দস্তুর হইয়া যায় এবং ফিনিক্সে পরিশ্রমের আবহ সৃষ্টি হয়। এই সংস্থার জীবনে এমনও এক যুগ আসিয়াছিল যখন ভাবিয়া চিন্তিয়াই ইঞ্জিন ব্যবহার না করিয়া দৃঢ়তা সহকারে চাকা ঘুরাইয়াই কাজ উঠানো হইত। আমি মনে করি ওই সময়ে ফিনিক্সের নৈতিক জীবন সর্বোচ্চ স্তরে উঠিয়াছিল।

২১
পোলক ঝাঁপ দিলেন

ফিনিক্স ত গড়িয়াছিলাম কিন্তু মধ্যে মধ্যে দিন কয়েক ছাড়া একটানা অনেক দিন সেখানে থাকিতে পারি নাই এই বেদনা আমার চিরদিন রহিয়া গিয়াছে। ফিনিক্সের স্থাপনা কালে আমার আকাঙ্ক্ষা ছিল যে আমিও সেখানে থাকিব, ওখানেই পেটের ভাত কামাইব, আস্তে আস্তে ওকালতি ছাড়িয়া দিব, ফিনিক্সে বসিয়া যে সেবা দেওয়া সম্ভব দিব এবং ফিনিক্সের সফলতাকেই সফলতা বলিয়া গণনা করিব। কিন্তু সেই ইচ্ছা পূর্ণ হয় নাই। অভিজ্ঞতা হইতে বার বার দেখিয়াছি যে মানুষ চায় এক আর হইয়া যায় অন্য এক। তবে সাথে সাথে ইহাও অনুভব করিয়াছি যে, লক্ষ্য সত্যের সাধনা হইলে যা চাই তা না পাইলেও যা মিলে তা কখনও অকল্যাণের হয় না, উল্টা অনেক সময় তা আশার অতিরিক্ত কল্যাণের হয়। ফিনিক্স যে রূপ পাইয়াছিল ও যে সব ঘটনা ঘটিয়াছিল তা অধিক কল্যাণের হইয়াছিল এ কথা জোর দিয়া বলিতে না পারিলেও নিঃসংশয়ে বলিতে পারি যে অকল্যাণের তা হয় নাই।

আপন পরিশ্রমে সকলে আমরা পেটের ভাত করিয়া লইব এই উদ্দেশ্যে ছাপাখানার আশপাশের জমি আমরা মাথাপিছু তিন একর করিয়া বাঁটিয়া

লই। এক খণ্ড আমিও পাইয়াছিলাম। যে টিন আমাদের চোখের বিষ তারই চালা এই সব জমিতে উঠিল। চাষীদের মত মাটি-খড়ের বা ইটের ঘর তৈরি করার ইচ্ছা আমাদের ছিল। তা সম্ভব হইল না। খরচ তাতে বেশি হইত, সময়ও বেশি লাগিত। আমরা ব্যস্ত হইয়াছিলাম যত তাড়াতাড়ি পারা যায় ডেরা বাঁধিয়া কাজে লাগার জন্য।

সম্পাদক মনসুখলাল নাজরই ছিলেন। এই নূতন যোজনায় তিনি যোগ দিলেন না। ডারবনেই তিনি থাকিয়া যান। ইণ্ডিয়ন ওপিনিয়ন-এর এক খুদে শাখা ডারবনেও ছিল। সেখান হইতে তিনি ব্যবস্থাদি করিতেন। মাইনে-করা কম্পোজিটর ত ছিলই। তা হইলেও আমাদের লক্ষ্য হইল ছাপাখানার অতি সহজ কিন্তু মহাবিরক্তিকর এই কাজটা সকলে আমরা শিখিয়া লই। সুতরাং যারা কম্পোজের কাজ জানিত না তা তারা শিখিয়া লইল। শেষ দিন তক আমি এই কাজে সকলের পিছনে আর মগনলাল সকলের আগে ছিল। ছাপাখানার বিন্দুবিসর্গ না জানিলেও মগনলাল পটু কম্পোজিটর হইয়া গেল, আর কম্পোজিংয়ের গতিও তার বাড়িল। তাহাই কি, আশ্চর্য হইয়া আমি দেখিলাম যে ছাপাখানার সব কাজ সে আয়ত্ত করিয়া লইয়াছে। আমার বরাবর মনে হইয়াছে, যে শক্তি মগনলালের ছিল তার ধারণা তার নিজের ছিল না।

তখনও সব কিছু গুছানো হয় নাই, ঘরদোরের কাজও পুরাপুরি শেষ হয় নাই ; সেই অবস্থায়ই নূতন গড়া পরিবার ছাড়িয়া আমার জোহানিসবর্গে যাইতে হয়। সেখানকার কাজ আর বেশিদিন উপেক্ষা করার জো ছিল না।

জোহানিসবর্গে গিয়া এই মহৎ পরিবর্তনের কথা পোলককে বলি। তাঁর দেওয়া পুস্তকের এই পরিণাম দেখিয়া তিনি অত্যন্ত খুশী হন। উৎসাহে বলেন, 'এই অসম সাহসিকতার কাজে কি আমি শরিক হতে পারি না?' আমি বলি, 'কেন নয়, অবশ্যই পারেন। ইচ্ছা হলে এই যোজনায় যোগ দেওয়ার পক্ষে কোন বাধা নেই।' পোলক বলেন, 'নেন ত আমি তৈরি।'

তাঁর সংকল্পে মুগ্ধ হই। মুক্তি চাহিয়া 'ক্রিটিক'-এর মুখ্যকে তিনি এক মাসের নোটিশ দেন এবং ওই সময় অন্তে ফিনিক্সে চলিয়া যান। মিশুকতার গুণে সকলের মন জয় করেন ও পরিবারের একজন হইয়া যান। সাদাসিধা ধাঁজের ছিলেন বলিয়া ফিনিক্সের জীবন তাঁর কাছে কিম্ভূতকিমাকার বা কঠিন

মনে হয় নাই ; সহজেই রুচিকর মনে হইয়াছিল। কিন্তু তাঁকে আমি বেশি-দিন ফিনিক্সে রাখিতে পারি নাই।

মিঃ রীচ ঠিক করেন যে বিলাতে তিনি তাঁর আইন-অধ্যয়ন শেষ করিবেন। একা আমার পক্ষে আপিসের সবটা বোঝা আলগানো অসম্ভব হয়। অতএব পোলককে আমি আমার আপিসের কাজে সাহায্য করিতে ও এটর্নির পড়া পড়িতে বলি। মনের কোণে ছিল, পোলকের আইন-পড়া শেষ হইলে আমরা উভয়ে ফিনিক্সে গিয়া বসিব। কিন্তু কল্পনাটা স্বপ্নমাত্র ছিল। যাকে তিনি বিশ্বাস করিতেন বিনা বাক্যে তার কথা মানিয়া লওয়ার চেষ্টা তিনি করিতেন এই ছিল পোলকের স্বভাব। পত্রের উত্তরে তিনি লিখিলেন, 'এখানকার জীবন আমার বেশ লাগছে। আনন্দে আছি। ভরসা রাখি সংস্থার বিকাশে সহায়তা করতে পারব। কিন্তু আপনি যদি বোঝেন যে আমি ওখানে গেলে আমরা সহজে ও অল্পকাল মধ্যে আমাদের আদর্শে পৌঁছতে পারব তবে যেতে প্রস্তুত আছি।' তাঁর পত্র পাইয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইলাম। পোলক ফিনিক্স ছাড়িলেন, জোহানিসবর্গে আসিলেন, এটর্নি হওয়ার জন্য আমার কেরানী হইলেন।

এই সময়েই মেকিনটায়র নামে এক স্কচ থিয়োসোফিস্টকে (স্থানীয় কোন আইন পরীক্ষার পড়ায় তাঁকে আমি সাহায্য করিতেছিলাম) আমি এটর্নির পড়া পড়িতে বলি, যেমন পোলককে বলিয়াছিলাম। মেকিনটায়র আমার আপিসে যোগ দেন।

এইরূপে অল্প দিন মধ্যে ফিনিক্সের মহৎ আদর্শের দিকে না আগাইয়া উহার বিপরীত জীবনস্রোতে দূর হইতে দূরে ভাসিয়া চলিলাম। ভগবানের ইচ্ছা যদি অন্যরূপ না হইত তবে সরল জীবনের বাহানায় বিছানো মোহজালে ফাঁসিয়া যাইতাম।

স্বপ্নেও আমরা কেউ ভাবি নাই এমন এক ভাবে আমার আদর্শ ও আমি রক্ষা পাই। কিন্তু সে কথা বলার পূর্বে পরের কয়েক প্রকরণে অন্য কিছু বলিয়া লইতে হইবে।

২২

রাখে কৃষ্ণ মারে কে ?

দক্ষিণ আফ্রিকায় এই বার আসার সময় পত্নীকে সান্ত্বনা দিয়া আসিয়াছিলাম এক বছর পরে ফিরিয়া আসিব। বছর শেষ হইল কিন্তু শীঘ্র ফিরিতে পারিব সেই সম্ভাবনা দেখা যাইতেছিল না। অতএব স্ত্রীপুত্রদের লইয়া আসা স্থির করিলাম।

ছেলেরা আসিল। তৃতীয় পুত্র রামদাসের জাহাজের কাপ্তেনের সহিত খুব ভাব হইয়াছিল। কাপ্তেনের সহিত খেলিতে গিয়া তার হাত ভাঙ্গিয়া যায়। কাপ্তেন চিকিৎসার ভাল ব্যবস্থা করেন। জাহাজের ডাক্তার ভাঙ্গা হাড় জুড়িয়া দেন। কাঠের ফালিতে গলা হইতে রুমালে ঝুলানো হাত লইয়া রামদাস ঘরে পোঁছে। ডাক্তার বলিয়া দিয়াছিলেন যে বাড়ী পোঁছার পরে ভাল কোন ডাক্তার দিয়া যেন হাত ঠিক করিয়া লওয়া হয়। সেই সময়টায় আমি মাটি-চিকিৎসায় পরম উৎসাহী ছিলাম। আমার হাতুড়ে-বিদ্যায় যে সব মক্কেলের আস্থা ছিল তাদের আমি মাটি ও জলের প্রয়োগ করিতে বলিতাম।

সুতরাং রামদাসের বেলায় অন্য কিছু করা যাইত কি? রামদাসের তখন বয়স ছিল আট। তাকে বলি, 'তোর চিকিৎসা আমি করি ত ঘাবড়াবি না ত?' হাসিয়া রামদাস বলে, 'করো'। ভালমন্দ বাছিয়া লওয়ার বয়স ওটা না হইলেও ডাক্তার ও হাতুড়েতে কি ব্যবধান তা সে ভাল করিয়াই জানিত। সে যাই হোক, টোটকার দিকে আমার ঝোঁকের কথা সে জানিত এবং আমার ওপর তার বিশ্বাস ও নির্ভর দুইই ছিল। ভয়ে ভয়ে তার ব্যাণ্ডেজ খুলিলাম, ঘা পরিষ্কার করিলাম, সাফ মাটির পুলটিস লাগাইলাম ও যেমনটা বাঁধা ছিল তেমনটা বাঁধিয়া দিলাম। এই ভাবে প্রতিদিন আমি নিজে ঘা ধুইতাম ও মাটি লাগাইতাম। বিনা বিঘ্নে দিন দিন ঘা ভরিয়া আসিতেছিল এবং মাসেক মধ্যে ঘা পুরাপুরি ভরিয়া যায়। যে সময় মধ্যে সারিবে বলিয়া জাহাজের ডাক্তার বলিয়াছিলেন সেই সময় মধ্যেই ঘা সারিয়া যায়।

এই ও অন্য প্রয়োগের কারণ টোটকার (গৃহ-চিকিৎসার) ওপর আমার বিশ্বাস বাড়িয়া যায় এবং অধিক আত্মবিশ্বাসে উহার প্রয়োগ আমি করিতে

থাকি। প্রয়োগের পরিধিও বাড়িয়া যায়—ঘা, জ্বর, অজীর্ণ, ন্যাবা ও অন্য অসুখে আমার মাটি-জল, উপবাসের প্রয়োগ নানা বয়সের লোকের ওপর চলিতে থাকে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে প্রয়োগ সফল হইয়াছিল। তাহা হইলেও দক্ষিণ আফ্রিকার সেই আত্মবিশ্বাস আজ আমার নাই। এবং অভিজ্ঞান হইতে ইহাও বুঝিতে পাইয়াছি যে এই সব প্রয়োগে ভয়ও রহিয়াছে।

আমার এই সব প্রয়োগ সফল হইয়াছিল এ কথা সপ্রমাণ করার জন্য ও সকল প্রয়োগের কথা বলিতেছি না। সর্বভাবে কোন প্রয়োগ সফল হইয়াছিল এই দাবি আমি করিতে পারি না। তেমন দাবি ডাক্তারেরাও করিতে পারে না। তবুও যে প্রসঙ্গ পাড়িলাম তা এ কথা বলার জন্য যে অজানা কোন প্রয়োগ করিতে হইলে নিজের ওপর তা আগে করা কর্তব্য। সে স্থলে সত্য প্রয়োগকারীর কাছে শীঘ্র ধরা পড়িবে এবং ঈশ্বর তার প্রয়োগে সহায় হইবেন।

প্রাকৃতিক চিকিৎসার ঝুঁকির মতই ইউরোপীয়দের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসাতেও ঝুঁকি ছিল। কিন্তু সেই ঝুঁকি সত্ত্বেও আমি তাঁদের নিকট-সম্পর্কে আসিয়াছিলাম।

পোলককে আমার সঙ্গে থাকার জন্য নিমন্ত্রণ করিলাম। আর আমরা মায়ের পেটের ভাইয়ের মত থাকিতেও লাগিলাম। যে মহিলার সহিত পোলকের বিবাহ হয় তাঁর সহিত কয়েক বছর আগেই তাঁর প্রণয় হইয়াছিল। সুযোগমত বিবাহ করিবেন এ কথা উভয়ে ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন। আমার যেন মনে হয় সংসার করার পূর্বে কিছু সঞ্চয় করিয়া লওয়ার ইচ্ছা পোলকের ছিল। আমা অপেক্ষা রাস্কিনের লেখা তিনি ঢের বেশি পড়িয়াছিলেন। তা হইলে কি হয়, পশ্চিমের আবহাওয়ায় তিনি মানুষ হইয়াছিলেন তাই রাস্কিনের দেখানো পথে ষোল-আনা তিনি আগাইয়া যাইতে পারিতেছিলেন না। যুক্তি দর্শাইয়া তাঁকে আমি বলি, 'হৃদয় যার সহিত জুড়ে গেছে সেরেফ অর্থের অনটন হেতু তার বিরহ ভোগ করা কাজের কথা নয়। আপনি যে কথা ভাবছেন সে কথা ভাবলে গরীবের কোনকালেও বিয়ে হতে পারে না। সে কথা যাক, আপনি ত আমার সঙ্গে রয়েছেন। তাই সংসারখরচের প্রশ্ন নেই। দেরী না করে বিয়ে করুন। আমি মনে করি এটাই শুভের পথ।'

পূর্বে বলিয়াছি যে কোন কথা কোনও দিন দুইবার আমার পোলককে বলিতে হয় নাই। সঙ্গে সঙ্গে আমার কথা তিনি মানিয়া লন। ভাবী মিসিস পোলক বিলাতে ছিলেন। তাঁকে পোলক পত্র লিখিলেন। তিনি রাজী হইলেন এবং মাস কয়েক মধ্যে বিবাহার্থে জোহানিসবর্গে আসিলেন। বিবাহ নিখরচায় হয়। এমন কি বিশেষ কাপড়-চোপড়ের আয়োজন পর্যন্ত ছিল না। ধর্ম অনুষ্ঠানেরও কোন প্রয়োজন ছিল না। মিসিস পোলক ছিলেন জাতিতে খ্রীস্টান আর পোলক ছিলেন ইহুদি। নীতিধর্ম ছিল উভয়ের বন্ধনডোর।

প্রসঙ্গত এই বিবাহের এক মজাদার কাহিনী বলি। ট্রান্সভালের গোরাদের বিবাহের রেজিস্ট্রারের কালোদের বিবাহ রেজিস্ট্রী করার অধিকার ছিল না। এই বিবাহের অনুবর* আমি ছিলাম। অনুবর হওয়ার জন্য গোরা মিলিত না তা নয়, কিন্তু পোলকের কাছে তা অসহ্য ছিল। তাই আমরা তিন জনে রেজিস্ট্রারের কাছে যাই। যে বিবাহে আমি অনুবর সে বিবাহের বরকনে দুইই যে গোরা তার বিশ্বাস কি? অনুসন্ধান করিয়া দেখার জন্য রেজিস্ট্রী তিনি মুলতবি রাখিতে চাহিলেন। পরের দিন রবিবার ছিল। আর তার পরের দিন নববর্ষ, সুতরাং ছুটির দিন। এই ওজরে বিবাহের দিনক্ষণ বদলিয়া যাইবে এ আমার অসহ্য মনে হইল। প্রধান ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল। তিনি এই বিভাগের ঊর্ধ্বতম কর্মচারী ছিলেন। যুগলকে লইয়া তাঁর কাছে গেলাম। তিনি হাসিলেন ও আমাকে একখানি চিঠি দিলেন। বিবাহ রেজেস্ট্রী হইল।

এর পূর্বে কমবেশী জানাশোনা গোরা পুরুষই কেবল আমাদের সঙ্গে থাকিয়াছে। এখন অজানা এক ইংরেজকন্যা আমাদের গৃহে আসিল। আমার ত নিজের মনে পড়ে না এই কারণে (নববিবাহিত দম্পতির আগমনে) পরিবারে কোনদিন খিটিমিটি হইয়াছে। শ্রীমতী পোলক ও আমার স্ত্রীর মধ্যে কখন কোন তিক্ততা যদিই বা ঘটিয়া থাকে ত কোন্ সুব্যবস্থিত এক-জাত এক-ভাব পরিবারে তেমনটা না ঘটে? আর এ কথাও মনে রাখিতে হইবে যে আমাদের পরিবারে যেমন হরেক বর্ণের, হরেক ধর্মের ও হরেক ভাবের লোক ছিল তেমনি হরেক ভাবের, হরেক জাতের অবাধ আনাগোনাও

* অনুবর—Best Man

ছিল। ভাবিয়া দেখিলে দেখা যাইবে স্বজাত পরজাত এই ভাবনা মনের তরঙ্গমাত্র। আসলে আমরা সকলে একই পরিবারের।

ওয়েস্টের বিবাহের কথাও এখানে বলিয়া লই। জীবনের এই সময়ে ব্রহ্মচর্য বিষয়ে আমার চিন্তা পুরাপুরি সুনির্দিষ্ট ছিল না। তাই অবিবাহিত বন্ধুদের বিবাহ দেওয়া আমার এক ধর্ম হইয়াছিল। ওয়েস্ট যখন মা-বাপের সঙ্গে দেখা করিতে ইংলণ্ড যান তখন তাঁকে বলিয়া দেই সম্ভব হইলে বিবাহ করিয়া সস্ত্রীক আসিবেন। ফিনিক্স ছিল আমাদের সকলের ঘর আর আমরা সকলে নিজেদের চাষী ভাবিতাম তাই বিবাহ ও বিবাহের পরিণতি বংশবৃদ্ধি আমাদের কাছে ভয়ের বস্তু ছিল না। ওয়েস্ট লেস্টারের এক সুন্দরী কন্যাকে বিবাহ করিয়া লইয়া আসেন। এই পরিবারের লোকেরা লেস্টারের বড় জুতার কারখানায় কাজ করিত। মিসিস লেস্টারও কিছু দিন জুতার কাজ করিয়াছিল। তাকে আমি সুন্দরী বলিয়াছি কারণ প্রকৃত সৌন্দর্য ত গুণে। সে গুণে সুন্দরী ছিল; গুণে সে আমার মন জয় করিয়া লইয়াছিল। ওয়েস্ট তাঁর শাশুড়ীকেও সঙ্গে আনিয়াছিলেন। বৃদ্ধা আজও বাঁচিয়া আছেন। পরিশ্রমকে তিনি পরিশ্রম মনে করিতেন না। খোশমেজাজে উৎসাহভরে তিনি কাজ করিতেন। আমরা তাঁর কাছে হার মানিতাম, লজ্জিত হইতাম।

গোরা বন্ধুদের যেমন বিবাহ করাইলাম তেমন ভারতীয় বন্ধুদের নিজেদের পরিবার দেশ হইতে আনিতে উৎসাহ দিলাম। এইভাবে ফিনিক্স ছোটখাট এক গাঁয়ের রূপ ধারণ করিল। পাঁচ-ছয়টি ভারতীয় পরিবার আসিয়া ডেরা বাঁধিল। বংশবৃদ্ধি হইতে লাগিল।

২৩

সংসারে হেরফের : বালশিক্ষা

ডারবনের গৃহে অদলবদল করিয়াছিলাম সে কথা আগে বলিয়াছি। ঝোঁকটা যদিও সরলতার দিকে ছিল তথাপি খরচটা মোটাই থাকিয়া গিয়াছিল। কিন্তু রাস্কিনের শিক্ষাপ্রভাবে জোহানিসবর্গের গৃহের হের-ফেরটা কঠোরতর হয়।

ব্যারিস্টারের গৃহ যতদূর সাদাসিধা ধরনের করা চলে করিলাম। কিন্তু

আসবাবপত্র কিছু না রাখিয়া উপায় ছিল না। আসল পরিবর্তন মনে ঘটিয়াছিল। সব কাজ নিজ হাতে করার আগ্রহ বাড়িয়া যায়। তাই বালকদের সেভাবে গড়িতে থাকি।

বাজারের পাউরুটি কেনা বন্ধ করিলাম। কুনের পদ্ধতিতে বিনা খমিরে আছাঁটা আটার পাউরুটি ঘরে তৈরি করিতে লাগিলাম। কিছুটা পদার্থ নষ্ট হয় বলিয়া মিলের আটা বা ময়দা গুণে নিকৃষ্ট, হাতে-ভাঙ্গা আটা স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল ও সরল জীবনের সহায়ক আর সস্তাও বটে—এই সব কথা বিবেচনা করিয়া সাত পাউণ্ড দামে একটা জাঁতা কিনিলাম। লোহার চাকটা ঘোরানো এক জনের পক্ষে শক্ত কিন্তু দুই জনের পক্ষে সহজ ছিল। বেশির ভাগ দিন আমি, পোলক ও ছেলেরা জাঁতায় আটা ভাঙ্গিতাম। ওই সময়টায় তার রান্নাবান্নার কাজ শুরু হইয়া যাইত তবুও কোন-কোন দিন কস্তুরবা আসিত। মিসিস পোলক যখন আসিল সেও এই কাজে সাহায্য করিত। এই শরীরচালনার ফলে বালকদের খুব লাভ হইয়াছিল। জোর করিয়া আমি কখনও তাদের জাঁতা ঘোরানো কি অন্য কাজে লাগাইতাম না। খেলার আনন্দে তারা ওই কাজ করিত। পরিশ্রম হইলে চলিয়া যাওয়ার ঢালা স্বাধীনতা তাদের ছিল। জানি না এই হেতু বা অন্য কোন কারণে এই সব ছেলেরা বা অন্য যে সব ছেলের কথা পরে বলিব তারা আমার কাজ করিতে কখনও কসুর করিত না। আমার বরাতে বেয়াড়া ছেলে জোটে নাই তা নয়। তবে বেশির ভাগ বালক আনন্দে তাদের কাজ করিত। আমার কপালে অনিচ্ছুক বা 'আর পারছি না' ওজরকারী বালক দুই একটির বেশি মিলে নাই।

ঘরদোর ঝাটপাট দেওয়ার জন্য চাকর ছিল। সে পরিবারেরই এক জনের মতন ছিল। বালকেরা তার কাজে পুরা সহায়তা করিত। পায়খানা ম্যুনিসিপালিটীর মেথর পরিষ্কার করিত। কিন্তু পায়খানার ঘর ও বসার জায়গা আমরা নিজেরাই ধুইতাম। চাকরকে তা ধুইতে বলিতাম না; সে ও কাজটা করুক এই প্রত্যাশা করিতাম না। ইহা হইতেও বালকদের শিক্ষা লাভ হইত। ফল হইয়াছিল এই যে আমার কোন ছেলেই এই কাজটাকে অতি ঘৃণার চোখে দেখিত না; স্বাস্থ্যের সাধারণ নিয়ম অনায়াসে তারা শিখিয়া লইয়াছিল। জোহানিসবর্গে আমরা প্রায়-একটা অসুখে ভুগিতাম না। কখনও কারো অসুখ হইলে বালকেরা খুশী মনে তার সেবা

করিত। তাদের পুঁথিবিদ্যা আমি উপেক্ষা করিয়াছি এই কথা আমি মানি না। তবে এ কথাও ঠিক যে তা বলি দিতেও আমি দ্বিধা করি নাই। এই ত্রুটীর জন্য আমার বিরুদ্ধে আমার ছেলেদের অভিযোগ করার কারণ আছে। আর কখন কখন অসন্তোষ তারা প্রকাশও করিয়াছে। এই দিকে কিছুটা ত্রুটি যে আমার ছিল তা অস্বীকার করার উপায় নাই। পুঁথিবিদ্যা দেওয়ার আগ্রহ আমার খুবই ছিল, আর সে দিকে নিজেই আমি চেষ্টা করিতাম, কিন্তু এই ব্যাপারে প্রায় সব সময় কোন না কোন বিঘ্ন উপস্থিত হইত। গৃহে শিক্ষার কোন ব্যবস্থা করা যায় নাই বলিয়া আমি তাদের আপিসে লইয়া যাইতাম। আপিস আড়াই মাইল দূরে ছিল। তাই সকাল-সন্ধ্যায় মিলিয়া কমপক্ষে পাঁচ মাইল হাঁটার ব্যায়াম আমাদের হইত। অন্য কোন লোক সঙ্গে না থাকিলে কথাবার্তার মারফতে শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করিতাম। আপিসে তারা মক্কেল ও কেরানীদের সম্পর্কে আসিত; কিছু পড়িতে বলিতাম ত পড়িত; ঘোরাফেরা করিত; বাজার হইতে ছোটখাট কিছু কেনার থাকিলে কিনিয়া আনিত। বড় ছেলে হরিলাল বাদে অন্য ছেলেদের এভাবে আমি জোহানিসবর্গে লালনপালন করিয়াছিলাম। হরিলাল দেশে থাকিয়া গিয়াছিল। নিয়মিতভাবে এক ঘণ্টাও যদি প্রতিদিন তাদের আমি পুঁথিবিদ্যা দিতে পারিতাম ত আমি মনে করিতে পারিতাম যে তাদের আমি আদর্শ শিক্ষা দিয়াছি। তা পারিয়া উঠি নাই বলিয়া আমার নিজেরও খেদ আছে আর পুত্রদেরও আছে। বড় ছেলে হরিলাল তার বেদনা আমার সামনে নির্জনে ও সংবাদপত্র মারফত প্রকাশ্যে অনেক বার ব্যক্ত করিয়াছে। অমনটা না করিয়া আমার উপায় ছিল না এ কথা বুঝিয়া অন্য ছেলেরা উদারচিত্তে আমার ত্রুটি ক্ষমা করিয়া লইয়াছে। এই ত্রুটির জন্য আমার অনুতাপ নাই অথবা থাকিলেও তা এই কারণে যে আমি আদর্শ পিতা হইতে পারি নাই। কিন্তু আমি বলিব যে ধর্মজ্ঞানে আমি আমার পুত্রদের পুঁথিবিদ্যা সমাজসেবার বেদীতে বলি দিয়াছি। অন্যে ও কাজকে অকাজও বলিতে পারেন, তবে এ কথা বলিতে পারি যে তাদের চরিত্রগঠনের জন্য যা কিছু করা দরকার তা করিতে কোন ত্রুটি আমি করি নাই। আর আমি মনে করি মাতাপিতা মাত্রের তা অবশ্যকর্তব্য। তা সত্ত্বেও তাদের চরিত্রে যে ত্রুটি দেখা যায় তা আমার চেষ্টার ত্রুটিজনিত নয়, তা তাদের মাতাপিতা আমাদের ত্রুটির প্রতিবিম্ব ইহা আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

মাতাপিতার আকৃতি সন্তানে অর্শায় তেমন তাদের দোষগুণও। প্রতিবেশের কারণ নানা রকমের কমতি-বাড়তি হয় বটে তবে যে পুঁজি লইয়া তার জীবন আরম্ভ হয় সে পুঁজি সে পায় বাপদাদা হইতে এই বিষয়ে সংশয় নাই। দেখিয়াছি কোন কোন বালক-বালিকা মা-বাপ হইতে বর্তানো দোষ হইতে আত্মরক্ষা করিয়াছে। এটা আত্মার সহজাত পবিত্রতার জন্যই সম্ভব হইয়াছে।

বালকদের ইংরেজী শেখার কথায় পোলক ও আমার মধ্যে অনেক বার ঝাঁজালো তর্কবিতর্ক হইয়াছে। আমার চিরদিনের বদ্ধ ধারণা—যে মা-বাপ সন্তানদের শিশুকাল হইতে ইংরেজী বলিতে শেখায় তারা সন্তান-দ্রোহী ও দেশদ্রোহী। এ কথাও আমি মনে করি যে এতে বালকেরা নিজ দেশের আধ্যাত্মিক ও সামাজিক উত্তরাধিকার হইতে বঞ্চিত হয় আর সেই অনুপাতেই দেশের ও জগতের সেবার অযোগ্য হয়। এই বিশ্বাস হেতু বুঝিয়া-সুঝিয়াই আমি সব সময় বালকদের সহিত গুজরাটীতে কথা বলিতাম। পোলকের তা ভাল লাগিত না। বালকদের ভবিষ্যৎ আমি নষ্ট করিতেছি যুক্তিতর্কে পোলক এ কথা আমায় বুঝাইতে চেষ্টা করিতেন। তিনি প্রেমবশে আগ্রহভরে আমাকে বলিতেন যে ইংরেজীর মতন জগৎ-চলতি ভাষা বালকেরা শৈশবে যদি শিখিয়া লয় তবে জীবন-সংগ্রামে অনায়াসেই তারা অনেককে পিছনে ফেলিয়া আগাইয়া যাইবে। এই যুক্তি আমার ভাল লাগিত না। এই কথা পরে তিনি আর পাড়িতেন না, এখন মনে পড়ে না কেন,—আমার যুক্তি সঙ্গত মনে হইয়াছিল বলিয়া কি আমার জিদ দূর হইবার নয় বলিয়া। তা প্রায় কুড়ি বছর আগেকার কথা। তাহা হইলেও তখন যে মত আমি পোষণ করিতাম অভিজ্ঞতা হইতে সেই মত এখন আমার আরও দৃঢ় হইয়াছে। আর যদিও আমার ছেলেরা পুঁথিবিদ্যায় কাঁচা থাকিয়া গিয়াছে তবুও মাতৃভাষার যে পরিচয় আপনা-আপনি তাদের হইয়াছে তাতে তাদের ও দেশের লাভ হইয়াছে কেন না নিজ দেশে তারা আজ পরদেশী নহে, অন্যথায় তা তারা হইত। আপনা হইতেই তারা দ্বিভাষী হইয়াছে, কারণ বহু ইংরেজ বন্ধুর সংসর্গে তারা আসিয়াছিল এবং এমন দেশে ছিল যেখানকার মুখ্য ভাষা ইংরেজী। তাই তারা ইংরেজী বলিতে ও চলনসই লিখিতেও শিখিয়াছে।

২৪
জুলু 'বিদ্রোহ'

জোহানিসবর্গে সংসার পাতিয়া ভাবিলাম স্থির হইলাম। কিন্তু স্থির হওয়ার যোগ আমার কপালে থাকিলে ত। যেই ভাবিলাম স্থির হইলাম অমনি এক অ-ভাবা ব্যাপার ঘটিল। সংবাদপত্রে দেখিতে পাইলাম নাতালে জুলু-'বিদ্রোহ' ঘটিয়াছে। জুলুদের প্রতি আমার কোন শত্রুতা ছিল না। কোন ভারতীয়ের কোন ক্ষতি তারা কোনদিনও করে নাই। ওইটা 'বিদ্রোহ' কিনা সে বিষয়েও আমার সন্দেহ ছিল। কিন্তু তখন আমি বিশ্বাস করিতাম ব্রিটিশ সাম্রাজ্য জগতের পক্ষে কল্যাণকর। মনে মুখে আমি রাজানুগত ছিলাম। সাম্রাজ্যের ক্ষয়ক্ষতি আমি চাহিতাম না। অতএব উহা 'বিদ্রোহ কি বিদ্রোহ নয় এই প্রশ্ন আমার কর্তব্য নির্ণয়ের ব্যাপারে বাধক হয় নাই। নাতালে প্রতিরক্ষা বাহিনী ছিল, আর প্রয়োজন হইলে বিপদ্‌কালে নূতন লোকও তাতে ভরতি করা হইত। পড়িলাম, 'বিদ্রোহ' দমনের জন্য স্বয়ং-সেবক দল রওনা হইয়া গিয়াছে।

নিজকে আমি নাতালবাসী মনে করিতাম। নাতালের সহিত সম্পর্কও আমার নিকট ছিল। তাই গবর্নরকে পত্র লিখিয়া জানাইলাম যে প্রয়োজন হইলে আহতদের সেবার জন্য ভারতীয়দের এক দল লইয়া আমি যাইতে প্রস্তুত আছি। অবিলম্বে হাঁ-জবাব আসিল।

প্রস্তাবটা এত তাড়াতাড়ি স্বীকার করিবে এই আশা আমার ছিল না। তবুও পত্র লেখার পূর্বেই সবটা জিনিস ভাবিয়া রাখিয়াছিলাম। স্থির করিয়া রাখিয়াছিলাম প্রস্তাব গৃহীত হইলে জোহানিসবর্গের সংসার তুলিয়া দিব, মি. পোলক কোন ছোট বাড়ীতে উঠিয়া যাইবেন, আর আমার স্ত্রী ফিনিক্সে যাইবে। এই ব্যবস্থায় কস্তুরবার পূর্ণ সম্মতি ছিল। আমার এইরূপ কোন কাজে তার দিক হইতে কোন দিন কোন বাধা আসিয়াছে বলিয়া আমার মনে পড়ে না। গবর্নরের পত্র পাওয়া মাত্র বাড়ীওয়ালাকে নিয়ম অনুযায়ী বাড়ী ছাড়ার এক মাসের জানানি দিই। জিনিসপত্রের কিছু ফিনিক্সে পাঠাই, আর কিছু পোলকের কাছে থাকে।

ডারবনে গেলাম। লোকের জন্য আবেদন করিলাম। বড় দল গঠনের প্রয়োজন ছিল না। চব্বিশ জন আমরা তৈরি হইলাম। দলে আমি

বাদে চার জন গুজরাটী ছিল। এক জন ছিল পাঠান। তা বাদে অন্য সবই ছিল মাদ্রাজ অঞ্চলের গিরমীটমুক্ত ভারতীয়।

ওজন বাড়ানোর আর কাজের সুবিধার জন্যও বটে, চিকিৎসাবিভাগের প্রধান রেওয়াজমাফিক আমাকে অস্থায়ী 'সরজেণ্ট-মেজর' ও আমার পছন্দ-করা তিন জনকে 'সরজেণ্ট' ও অন্য এক জনকে 'করপোরল' খেতাব দেন। সরকারের কাছ হইতে পোশাকও পাওয়া গিয়াছিল। আমাদের সেবা-দল প্রায় ছয় সপ্তাহ সাক্ষাৎ কর্মে ছিল।

'বিদ্রোহ'-এর স্থানে গিয়া দেখিলাম কোন মতেই ওটাকে বিদ্রোহ বলা চলে না। বিরোধের লক্ষণ কোথাও দেখা গেল না। নূতন কর চাপানো হইয়াছিল। কোন জুলু সরদার তার লোকদের বলিয়া দেয় এই কর দিও না। কর আদায় করিতে গিয়া এক সরজেণ্ট খুন হইয়াছিল। এই ঘটনাটাকে বাড়াইয়া বাড়াইয়া 'বিদ্রোহ' নাম দেওয়া হইয়াছিল। সে যাই হোক আমার টান ছিল জুলুদের ওপর। কেন্দ্রে পৌঁছিয়া মুখ্যত জুলু ঘায়েলদের সেবার সুযোগ পাইলাম; খুব খুশী হইলাম। প্রধান ডাক্তার আমাদের স্বাগত করেন ও বলেন, 'কোন গোরা এই জখমীদের সেবা করতে চায় না। আমি একা কাকে দেখি আর কাকে না দেখি! এদের ঘায়ে পচ ধরেছে। রক্ষা, আপনারা এসেছেন। এটাকে এই নির্দোষ লোকদের ওপর ঈশ্বরের কৃপা বলেই আমি মনে করি।' এই বলিয়া ঘা-বাঁধার পাটি, জীবাণু-নাশক পদার্থ ইত্যাদি দেন এবং স্বয়ং আমাদের ক্যাম্প-হাসপাতালে লইয়া যান। আহতরা আমাদের দেখিয়া খুশী হইল। গোরা সৈনিকেরা গরাদের ওদিক হইতে উঁকি মারিয়া জুলুদের শুশ্রূষা করিতে আমাদের বারণ করিত। তাদের কথায় কান দিতাম না বলিয়া রাগ করিত এবং জুলুদের লক্ষ্য করিয়া মুখে আনা যায় না এমন সব উক্তি করিত।

ওই সিপাইদের সহিতও ধীরে ধীরে আমার পরিচয় হয়। তখন তারা সেবাকার্যে বাগড়া দিত না। ওই সেনাদলে কর্নেল স্পার্কস ও কর্নেল ওয়লী ছিলেন। ১৮৯৬ সনে তাঁরা আমার ঘোর বিরোধ করিয়াছিলেন। আমার এই আচরণে তাঁরা অভিভূত হন। একারণ তাঁরা আমাকে ডাকিয়া কৃতজ্ঞতা জানান। তাঁরা আমাকে জেনারেল মেকেঞ্জির কাছেও লইয়া যান এবং তাঁর সহিত পরিচয় করিয়া দেন। পাঠক যেন মনে করিবেন না যে এঁরা পেশাদার সৈনিক ছিলেন। কর্নেল ওয়লী নামজাদা উকিল ছিলেন।

কর্নেল স্পার্কস খুব বড় এক কসাইখানার মালিক ছিলেন। আর জেনারেল মেকেঞ্জি ছিলেন নাতালের বিখ্যাত কৃষক। সকলেই তাঁরা স্বেচ্ছাসেবক ছিলেন, আর স্বেচ্ছাসেবকের শিক্ষাও গ্রহণ করিয়াদিলেন। যুদ্ধের অভিজ্ঞতাও তাঁদের ছিল।

যে সব জখমীদের শুশ্রূষার ভার আমরা পাইয়াছিলাম তারা যুদ্ধে জখম হইয়াছে তা নয়। তাদের এক ভাগকে সন্দেহে ধরিয়া কয়েদ করা হইয়াছিল। জেনারেল তাদের বেতের সাজা দিয়াছিলেন। চাবুকের ক্ষত বিনা চিকিৎসায় পাকিয়া উঠিয়াছিল। আর এক ভাগ ছিল সরকারের মিত্র জুলু। মৈত্রীর চিহ্ন তাদের অঙ্গে থাকিলেও সৈনিকেরা ভুলে তাদের ওপর গুলি চালাইয়াছিল।

এই কাজের অতিরিক্ত আর একটা কাজও আমার ওপর পড়িয়াছিল—ওষুধ তৈরি করিয়া গোরা সৈনিকদের খাওয়ানো। এই কাজ আমার অসাধ্য ছিল না, কারণ ডাক্তার বুথের খুদে হাসপাতালে এক বছর আমি কম্পাউণ্ডারের কাজ করিয়াছিলাম। এই কাজের কারণে অনেক গোরার সহিত আমার পরিচয় হইয়াছিল।

কিন্তু লড়াইয়ে নিযুক্ত সৈনিক এক জায়গায় থাকিতে পায় না। যেখান হইতে বিপদের খবর আসে সেখানে দৌড়াইতে হয়! ঘোড়সওয়ারই বেশি ছিল। ছাউনি উঠিত আর সৈনিকরা কুচ আরম্ভ করিত ত তাদের পিছু পিছু ডুলি কাঁধে আমাদের ছুটিতে হইত। দুই কি তিন বার এক দিনে চল্লিশ মাইল পর্যন্ত হাঁটিতে হইয়াছিল। কিন্তু যেখানেই যখন গিয়াছি কপালগুণে ভগবানের কাজ মানে জুলুসেবার কাজ আমরা পাইয়াছি। সিপাইদের ভুলে আহত মিত্র-জুলুদের ডুলিতে বহিবার ও ছাউনিতে তাদের শুশ্রূষা করিবার সুযোগ আমরা পাইয়াছিলাম।

১৫

হৃদয়মন্থন

'জুলু-বিদোহ' হইতে অনেক অভিজ্ঞতা আমার হইয়াছে, চিন্তার অনেক খোরাক আমি পাইয়াছি। বোঅর যুদ্ধ ততটা ভয়ঙ্কর মনে হয় নাই যতটা ভয়ঙ্কর এই কাণ্ডটা মনে হইয়াছিল। লড়াই এখানে চলিতেছিল না,

চলিতেছিল মনুষ্য-শিকার। এমনটা আমারই মনে হইয়াছিল তা নয়, এই সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছিল এরূপ কয়েক জন ইংরেজও ঠিক তাই মনে করিতেন। পটকার দুড়ুম দুড়ুম শব্দের মত প্রতিদিন ভোরে দূরের নির্দোষ জুলু-গ্রাম হইতে সৈনিকদের বন্দুকের শব্দ ছাউনিতে আমাদের কানে আসিত ; মন আমাদের বিষাইয়া উঠিত। কিন্তু সেই বিষ আমি গিলিতাম, জুলু জখমীদের সেবাই আমার বিশেষ কর্ম ছিল বলিয়া। আমি দেখিতে পাইয়াছিলাম যে আমরা যদি সেবা-বাহিনী গঠন না করিতাম তবে জুলুরা বিনা চিকিৎসায় মরিত। এই কথা মনে করিয়া আমার মন শান্ত হইত, সান্ত্বনা পাইত।

অন্য অনেক কারণেও মনে চিন্তার স্রোত বহিত। স্থানটা জনবিরল ছিল। পাহাড়ের গায়ে ও উপত্যকার কোলে দূরে দূরে সরলস্বভাব সাদাসিধা 'অসভ্য' বলিয়া গণ্য জুলুদের বাঁশ-ঘাসের কুঁড়ের ক্র্যাল বা বসতি, আর সব শূন্য। দৃশ্যটি মনোলোভা ছিল। যোজনব্যাপী প্রসারিত জনপ্রাণীহীন গম্ভীর পরিবেশের মধ্য দিয়া আহতদের বহিয়া বা এমনি চলিতে চলিতে নানা চিন্তা মনে ভিড় করিত।

ব্রহ্মচর্য সম্বন্ধে আমার ভাবনা ওখানে সুস্পষ্ট রূপ পায়। সাথীদের সহিত এই বিষয়ে কিছুটা আলোচনা করিয়াছিলাম। ব্রহ্মচর্য বিনা যে ঈশ্বরের দর্শন মিলে না এই জ্ঞান তখন আমার ছিল না, কিন্তু একাগ্র সেবার জন্য যে ব্রহ্মচর্য আবশ্যক তা আমি পরিষ্কার বুঝিতে পাইয়াছিলাম। অনুভব করিয়াছিলাম যে সেবার পরিধি আমার দিন দিন বাড়িয়া যাইবে ; ভোগবিলাসে, সন্তানোৎপাদনে ও তাদের পালন-পোষণে যদি আটকিয়া যাই তবে একাগ্র সেবা করিতে পারিব না অতএব দুই ঘোড়ার সওয়ার হইলে চলিবে না। পত্নী সন্তানসম্ভবা হইলে কি এই কাজ হাতে লইতে পারিতাম এই কথা মনে খেলিয়া গেল। আরও মনে হইল যে ব্রহ্মচর্য বিনা পরিবারের ও সমাজের সেবা এক সঙ্গে চলিতে পারে না ; ব্রহ্মচারী হইলে বিবাহিতের পক্ষেও এই দুই সেবা যুগপৎ করা সম্ভব।

এই বিচারচক্রে পাক খাইতে খাইতে ব্রত গ্রহণের জন্য মন কতকটা আকুল হইল। এই ব্যাকুলতায় কি জানি কি এক আনন্দদায়ী উন্মাদনা ছিল। কল্পনা পাখা বিস্তার করিল, সেবার ক্ষেত্র অনন্তপ্রসার হইল।

এরূপ নিবিড় দৈহিক শ্রম ও মানসিক চিন্তা যখন চলিতেছিল তখন

খবর রটিল যে বিদ্রোহ শান্ত হইয়া আসিয়াছে আর আমাদের শীঘ্র ছুটি মিলিবে। এর দুই-এক দিন পরে আমাদের ছুটির পরোয়ানা আসে; দিন কয়েক মধ্যে আমরা যে যার ঘরে ফিরিয়া যাই।

এর কিছু দিন পরে সেবা-দলের কার্যের প্রশংসা করিয়া গবর্নর আমাকে এক বিশেষ পত্র লিখেন।

ফিনিক্সে ফেরার পরে ব্রহ্মচর্যের প্রসঙ্গ মহা আগ্রহে ছগনলাল, মগনলাল, ওয়েস্ট প্রভৃতির কাছে পাড়ি। কথাটা তাদের সকলের ভাল লাগে। সকলে উহার প্রয়োজনীয়তাও স্বীকার করে, তবে এ কথাও বলে যে ব্রহ্মচর্য পালন অতি শক্ত ব্যাপার। জন কয়েক সাহসভরে আগাইয়া যায়। জানি তাদের কেউ কেউ সফল হইয়াছে।

জীবনভর ব্রহ্মচর্য পালন করিব এই ব্রত লইলাম। এই ব্রতের গুরুত্ব ও কঠিনতা তখন আমার সঠিক জানা ছিল না। ইহা যে কঠিন তা আজও অনুভব করি। ইহার গুরুত্ব দিন দিন অধিক উপলব্ধি করিতেছি। অ-ব্রহ্মচর্যের জীবন এখন আমার কাছে শুষ্ক মনে হয়, পশুজীবন মনে হয়। পশু সংযমের ধার ধারে না। স্বেচ্ছায় সংযম পালনেই মানুষের মনুষ্যত্ব। ধর্মগ্রন্থে ব্রহ্মচর্যের যে স্তুতি রহিয়াছে পূর্বে তা অতিশয়োক্তি মনে হইত, এখন মনে হয় তার উল্টা; যত দিন যাইতেছে ততই স্পষ্ট মনে হইতেছে যে ওই প্রশংসা অতীব সত্য ও অনুভবে সিদ্ধ।

যে ব্রহ্মচর্যের ফল এরূপ মহৎ সে ব্রহ্মচর্য সহজ হইতে পারে না, শারীরিক বস্তুমাত্রও তা হইতে পারে না। আরম্ভ তার সংযমে কিন্তু ওখানেই তার শেষ নয়। ব্রহ্মচর্যে চিন্তার মলিনতার স্থান নাই। স্বপ্নেও পূর্ণ ব্রহ্মচারীর বিকার-ভাব জন্মে না। যত দিন স্বপ্নে বিকারবাসনা উঁকি মারে তত দিন ব্রহ্মচর্য একেবারে অকেজো এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে।

কায়িক ব্রহ্মচর্য পালনেও আমার কম বেগ পাইতে হয় নাই। আজ বলিতে পারি এদিকে আমি নির্ভয় হইয়াছি। চিন্তার ওপর যে প্রভুত্ব আসা চাই তা আসে নাই। আমি মনে করি চেষ্টার আমার ত্রুটি নাই। কিন্তু কোথা হইতে আর কি ভাবে যে ইচ্ছার বিরুদ্ধে চিন্তার আক্রমণ হয় তা আজও আমি ঠাহর করিয়া উঠিতে পারি নাই। কুভাব রোখার উপায় মানুষের হাতে আছে এই বিষয়ে আমার কোন সংশয় নাই। তবে এই সিদ্ধান্তে আমি পৌঁছিয়াছি যে প্রত্যেকের তা নিজের নিজের মত খুঁজিয়া

লইতে হয়। মহাপুরুষেরা নিজেদের যে অভিজ্ঞতা আমাদের জন্য রাখিয়া গিয়াছেন তা পথপ্রদর্শক মাত্র। তা পূর্ণ নয়: সকলের পক্ষে উপযোগী অব্যর্থ কোন পথের ইঙ্গিত তাঁরা করিয়া যান নাই। তার কারণ পূর্ণতা একমাত্র প্রভুর কৃপায় লাভ হইতে পারে। আর তাই না নিজেদের তপস্যা দ্বারা ভক্তজনেরা পবিত্র রামনামাদি পারণ মন্ত্র আমাদের দিয়া গিয়াছেন। যে-কোন ধর্মগ্রন্থ বলে ভগবানে পূর্ণ আত্মসমর্পণ না করিলে মনের ওপর পূর্ণ কর্তৃত্ব মিলে না। পূর্ণ ব্রহ্মচর্য পালন করার প্রযত্ন হইতে আমি এই কথার সত্যতা সর্বক্ষণ অনুভব করি।

কিন্তু ওই প্রযত্নের, ওই সংগ্রামের অল্পবিস্তর কথা অন্য কোন কোন প্রকরণে আসিবে। এই ব্রতের আরম্ভ কি ভাবে করিয়াছিলাম তার ইঙ্গিত করিয়া এই প্রকরণ শেষ করিতেছি। উৎসাহের প্রাচুর্যে প্রথমটায় ব্রতের পালন সহজ মনে হইয়াছিল। ব্রত লওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটা পরিবর্তন করিয়াছিলাম: স্ত্রীর সহিত এক বিছানায় শুইতাম না, তাকে একান্তে পাওয়ার চেষ্টা করিতাম না।

এইভাবে যে ব্রহ্মচর্য ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় ১৯০০ সন হইতে পালন করিয়া আসিতেছিলাম ১৯০৬ সনের মধ্যভাগে তাকে ব্রতের জোরে বাঁধিয়া লই।

২৬

সত্যাগ্রহের জন্ম

জোহানিসবর্গের জীবনের নানা ঘটনার দিকে তাকাই ত মনে হয় ভাবী সত্যাগ্রহের ইঙ্গিতেই যেন এই আত্মশুদ্ধির ব্রত আমি লইয়াছিলাম। আজ আমি দেখিতে পাইতেছি যে ব্রহ্মচর্য ব্রত লওয়ার পূর্বেকার আমার জীবনের মুখ্য মুখ্য ঘটনা আমার অজান্তে আমাকে উহার জন্য প্রস্তুত করিতেছিল।

'সত্যাগ্রহ' শব্দের সৃষ্টির পূর্বে সত্যাগ্রহের কায়া আসে। বস্তুত সত্যাগ্রহের উৎপত্তিকালে সত্যাগ্রহ যে কি তা আমি জানিতাম না। গুজরাটীতে পর্যন্ত আমরা উহাকে 'প্যাসিব রেজিস্টেন্স' বলিতাম। গোরাদের কোন সভায় আমি দেখিতে পাইলাম যে 'প্যাসিব রেজিস্টেন্স'-এর সংকোচিত অর্থ করা যাইতে পারে, উহাকে দুর্বলের অস্ত্র বলা হয় এবং উহা হইতে দ্বেষ

জন্মিতে পারে ও অন্তে উহা হিংসায় আত্মপ্রকাশ করিতে পারে। তাই ভারতীয়দের লড়াইয়ের স্বরূপ বর্ণনা করিয়া আমার বলিতে হইয়াছিল যে আমাদের লড়াই 'প্যাসিব রেজিস্টেন্স' আদৌ নয়। এই ব্যাপার হইতে ভারতীয়দের লড়াইয়ের স্বরূপ প্রকাশ করার উপযুক্ত শব্দ সৃষ্টির প্রতি আমার নজর যায়।

কিন্তু ঠিক ভাবপ্রকাশক শব্দ কিছুতেই জুটিতেছিল না। তাই ঠিক শব্দ চাহিয়া 'ইণ্ডিয়ন ওপিনিয়ন'-এ সামান্য পুরস্কার ঘোষণা করি। প্রতিযোগিতার উত্তরে মগনলাল গান্ধী সত্+আগ্রহ='সদাগ্রহ' শব্দ সৃষ্টি করিয়া পাঠায়। পুরস্কার সে লাভ করে। কিন্তু 'সদাগ্রহ' শব্দকে আরও অধিক ভাববহ করার জন্য 'য' ফলা মধ্যে জুড়িয়া দিয়া 'সত্যাগ্রহ' শব্দ আমি বানাই আর এই নামে লড়াই গুজরাটীতে চালু হইয়া যায়।

এই লড়াইয়ের ইতিহাসকে দক্ষিণ আফ্রিকায় আমার বাকী জীবনের, বিশেষ আমার সত্যের প্রয়োগের ইতিহাস বলা যাইতে পারে। এই ইতিহাসের বেশির ভাগ আমি যেরবাডা জেলে লিখিয়াছি; বাকীটা পুরা করিয়াছিলাম বাহিরে আসিয়া। উহার গোটাটা প্রথমে 'নবজীবন'-এ প্রকাশ হয়। পরে 'দক্ষিণ আফ্রিকার সত্যাগ্রহের ইতিহাস' নামে তা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। 'কারেণ্ট থট'-এ উহার ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। অনুবাদ করিয়াছেন শ্রীবালজী গোবিন্দজী দেশাই। দক্ষিণ আফ্রিকায় আমার সর্বাপেক্ষা বড় প্রয়োগের কথা জানিতে ইচ্ছুক পাঠক তা যাতে পড়িতে পারেন সেই উদ্দেশ্যে এখন ওই ইংরেজী অনুবাদ* পুস্তকাকারে প্রকাশ করা যাইতেছে। পাঠকদের মধ্যে যাঁরা দক্ষিণ আফ্রিকার সত্যাগ্রহের ইতিহাস পড়েন নাই তাঁদের আমি তা পড়িতে অনুরোধ করি। উহাতে যা বলিয়াছি এই কথায় তার পুনরাবৃত্তি করিব না; আমার দক্ষিণ আফ্রিকার জীবনের ব্যক্তিগত যে সব ঘটনা উহাতে বলা হয় নাই পরের কয়েক প্রকরণে তার আলোচনা করিব। আর সে কথা বলা শেষ হওয়া মাত্র আমি আমার ভারতের প্রয়োগের কথা বলিতে শুরু করিব। অতএব যাঁরা এই প্রয়োগের কথা পূর্বাপর জানিতে চান তাঁদের কাছে নিবেদন তাঁরা যেন 'দক্ষিণ আফ্রিকার সত্যাগ্রহের ইতিহাস' সামনে রাখেন।

---

* নবজীবণ প্রকাশন মন্দির কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য সাধারণ সংস্করণ ৪.০০ টাকা, সস্তা সংস্করণ ৩.০০ টাকা।

২৭

খাদ্যের আরও পরীক্ষা

কায়মনোবাক্যে ব্রহ্মচর্য পালন করার ভাবনা ত ছিলই, আর ভাবনা ছিল কি করিলে সত্যাগ্রহ সংগ্রামে সর্বাধিক সময় দিতে পারি ও শুচিশুদ্ধ হইয়া তার উপযুক্ত হইতে পারি। এই কারণে খাদ্য-সংযমের দিকে আরও বেশি নজর যায় ও খাদ্য-পরিবর্তনের অধিকতর প্রেরণা জন্মে। পূর্বে পরিবর্তন করিয়াছিলাম মুখ্যত স্বাস্থ্যের দৃষ্টিতে, এখনকার অদলবদলের মূলে ছিল ধর্মভাবনা।

এখন উপবাস ও অল্পাহারের দিকে ঝোঁক বাড়িল। বিষয়-বাসনায় মানুষের জিভের লোভ বাড়ে। আমার অবস্থাও তাহাই ছিল। জননেন্দ্রিয় ও স্বাদেন্দ্রিয়কে বশে আনিতে আমার বহু বেগ পাইতে হইয়াছিল; এই দুই পুরা বশে আসিয়াছে এই দাবি আজও করিতে পারি না। আমি মনে করি আমি ভূরিভোজী ছিলাম। বন্ধুরা আমাতে সংযম দেখিত; আমার নিজের কাছে আদৌ তা সংযম মনে হইত না। যেটুকু সংযম পালন করিয়াছি তাও যদি না করিতাম ত পশুরও অধম হইতাম আর কোন্ দিন শেষ হইয়া যাইতাম। আমার নানা ত্রুটির কথা আমি জানিতাম ও সে সব দূর করার খুব চেষ্টা করিতাম এ কথা বলিতে পারি, আর তাই আজও এই দেহ টিকিয়া আছে ও তা হইতে কিছু কাজ পাওয়া গিয়াছে।

নিজের দুর্বলতার বিষয়ে সজাগ ছিলাম আর ভাগ্যক্রমে সৎসঙ্গও লাভ হইয়াছিল। এই কারণ একাদশী তিথিতে ফলাহার বা উপবাস করিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম। জন্মাষ্টমী ইত্যাদি তিথিও পালন করিতাম।

ফলাহার দিয়া পরীক্ষা আরম্ভ করি। কিন্তু সংযমের দিক হইতে ফলাহার ও অন্নাহারের মধ্যে বিশেষ কোন ব্যবধান দেখিতে পাই নাই। ভাত হইতে লোকে জিহ্বার যে স্বাদ উপভোগ করে অভ্যস্ত হইলে ফল হইতেও ততটাই বা তারও বেশি স্বাদ উপভোগ করা যায়। তাই একাদশী ইত্যাদি তিথিতে আমি উপবাস করিতে বা এক বেলা খাইতে আরম্ভ করি। তা ছাড়া প্রায়শ্চিত্তের প্রসঙ্গ আসিলেই এক বেলা উপবাস করিতাম।

কিন্তু দেখিতে পাই যে শরীর অধিক ক্লেদমুক্ত হয় বলিয়া ক্ষুধা বাড়ে ও খাদ্যে অধিক রুচি জন্মে। ইহাও আমি লক্ষ্য করিয়াছি যে উপবাসাদি

যেমন সংযমের সহায় হইতে পারে তেমন ভোগেরও তা বাহন হইতে পারে। এই আশ্চর্য ব্যাপারের প্রমাণ নিজের ও অন্যের অভিজ্ঞতা হইতে পরে বহুবার পাইয়াছি। দেহটাকে আরও বেশি আঁটসাঁট করিয়া কষিয়া লওয়ার দিকে নজর ত ছিলই তবে সংযম সাধা, জিভ জয় করা ছিল মুখ্য আগ্রহ। এই উদ্দেশ্যে এক খাদ্যবস্তু ছাড়িয়া আর এক ধরিতেছিলাম ও খোরাক কমাইতেছিলাম। কিন্তু জিভের লালসা যেমনটা তেমনই ছিল। এক খাদ্য ছাড়িয়া অন্য খাদ্য ধরিতেছিলাম; নূতন বস্তুতে পুরাতন বস্তু অপেক্ষা অধিক স্বাদ পাইতাম।

এই পরীক্ষায় আমার কয়েকজন সাথী সঙ্গী হইয়াছিলেন। তাঁদের মধ্যে মুখ্য ছিলেন হারমান কেলেনবেক। তাঁর পরিচয় দক্ষিণ আফ্রিকার সত্যাগ্রহ-এ আমি দিয়াছি অতএব এখানে আবার দেওয়া অনাবশ্যক। আমার হরেক উপবাসে, একাশনে ও পরিবর্তনে তিনি আমার সাথী ছিলেন। লড়াই যখন খুব জমজমাট হইয়া ওঠে তখন আমি তাঁর বাড়ীতে ছিলাম। রদবদলের কথা আমরা আলোচনা করিতাম: পুরানো বস্তু অপেক্ষা নতুন বস্তুতে আমরা অধিক আস্বাদ পাইতাম। ওরূপ আলোচনা যে অনুচিত এ কথা মনে হইত না। বরং তা ভালই লাগিত। অভিজ্ঞতা হইতে বুঝিতে পাইয়াছি যে জিভের আস্বাদের আলোচনায় মশগুল হওয়া অনিষ্টকর। তার মানে, জিভের স্বাদের জন্য মানুষ খাইবে না, খাইবে জীবনরক্ষার নিমিত্তে। প্রত্যেক ইন্দ্রিয় যখন শরীরকে আত্মদর্শনের সাধন বানাইবার জন্য শরীরের সেবা করিবে কেবল তখনই বলা যাইবে যে ইন্দ্রিয় শূন্যবৎ হইয়াছে ও নিজেরা স্বাভাবিক কর্ম করিতেছে।

এই স্বাভাবিকতা সাধনের নিমিত্ত যত প্রয়োগই আমরা করি না কেন তা তুচ্ছ। এই উদ্দেশ্যে অনেক শরীর ক্ষয় হয় হোক। উহাকে তুচ্ছ গণনা করিতে হইবে। কিন্তু দুঃখের কথা এর উল্টা হাওয়া এখন বহিতেছে। এই নাশবন্ত শরীরকে তাজা পুষ্ট করার জন্য, দুই দিন (কালের গণনায় যা পলভরও নয়) বেশি জিয়াইয়া রাখার জন্য বিনা দ্বিধায় আমরা অগুনতি জীবন নাশ করি, আর এভাবে আমরা শরীর ও আত্মায় শেষ হই। এক রোগ হইতে রক্ষা পাওয়ার চেষ্টায় শত রোগ ডাকিয়া আনি; বিষয়ভোগের তাড়নায় ভোগের ক্ষমতাই খোয়াইয়া বসি। আর এই সব আমাদের চোখের ওপরই ঘটিতেছে কিন্তু তা হইতে আমরা চোখ ফিরাইয়া থাকি।

খাদ্যের প্রয়োগ কেন ও কোন্ প্রেরণা হইতে করিয়াছিলাম তা বলা হইল। এবার খাদ্যের পরীক্ষা-প্রয়োগের একটু বিশদ আলোচনা করিব।

২৮
পত্নীর দৃঢ়তা

কস্তুরবার তিন বার অতি কঠিন অসুখ হয়, মরিতে মরিতে বাঁচিয়া যায়। তিন বারই ঘরোয়া চিকিৎসায় সে সারিয়া ওঠে। সত্যাগ্রহ চলিতেছিল বা আরম্ভ হয় হয় এমন সময়ে তার প্রথম অসুখ হয়। বারবার রক্তস্রাব হইতে থাকে। এক ডাক্তার বন্ধু অস্ত্রোপচারের কথা বলেন। একটু ইতস্তত করার পরে অস্ত্রক্রিয়ায় সে মত দেয়। অতিশয় দুর্বল হইয়া গিয়াছিল বলিয়া বিনা ক্লোরোফর্মে ডাক্তার অস্ত্রোপচার করেন। অস্ত্রোপচারের সময় তার ভীষণ কষ্ট হইয়াছিল কিন্তু কস্তুরবা যেভাবে তা সহিয়াছিল তা দেখিয়া আমি অবাক হইয়াছিলাম। ভালোয় ভালোয় অস্ত্রক্রিয়া শেষ হয়। ডাক্তার ও তাঁর সহধর্মিণী মনে প্রাণে কস্তুরবার সেবা-শুশ্রূষা করিয়াছিলেন। ইহা ডারবনের কথা। ডাক্তার আমাকে বলেন, চিন্তার কোন কারণ নাই, আপনি জোহানিসবর্গে যাইতে পারেন।

কিন্তু দিন কয়েক পরে ডাক্তার পত্র দ্বারা জানান যে, কস্তুরবার অবস্থা ভালোর দিকে নয়, বিছানা হইতে ওঠার শক্তি নাই, অজ্ঞানও একবার সে হইয়াছিল। আমার অজ্ঞাতে ঔষধ কি পথ্যরূপে মদ বা মাংস কস্তুরবাকে দেওয়া চলিবে না এ কথা ডাক্তার জানিতেন। ডাক্তার জোহানিসবর্গে টেলিফোনে আমায় বলেন, 'আপনার স্ত্রীকে শুরুয়া বা 'বীফ-টি' দেওয়া প্রয়োজন। অনুমতি চাই।' জবাবে তাঁকে আমি বলি, 'এই অনুমতি আমি দিতে অক্ষম। এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার মত অবস্থায় থাকলে ওকে আপনি জিজ্ঞাসা করুন। ওর আপত্তি না হয় ত দেবেন, কোন কথা নেই।' ডাক্তার বলেন, 'এই বিষয়ে রোগীর ইচ্ছা-অনিচ্ছার কথা জিজ্ঞাসা করার প্রবৃত্তি আমার নেই। আপনার আসা প্রয়োজন। আসুন। যা করা দরকার মনে করি তা করতে না পাই ত আপনার স্ত্রীর জীবনের জন্য দায়ী হব না।'

সেই দিনই আমি ডারবন রওনা হই। ডারবনে পৌঁছিলাম। ডাক্তার বলিলেন, 'মাংসের যূষ দিয়ে তবে আমি আপনাকে ফোন করেছিলাম।'

'ডাক্তার ! এটা তঞ্চকতা বইকি !' আমি বলিলাম।

'ওষুধ-পথ্য ব্যবস্থার কথায় তঞ্চকতার প্রশ্নই ওঠে না। এমন অবস্থায় রোগী অথবা তার আত্মীয়জনকে ঠকানো আমরা ডাক্তারেরা ধর্ম জ্ঞান করি। যে-কোনমতে রোগীর জীবন রক্ষা করা আমাদের ধর্ম'—ডাক্তার দৃঢ়ভাবে এ কথা বলেন।

অত্যন্ত বেদনা অনুভব করিলাম। কিন্তু ধৈর্য ধরিলাম। ডাক্তার বন্ধু ছিলেন, ভাল মানুষ ছিলেন। তিনি ও তাঁর পত্নী আমাকে ঋণে আবদ্ধ করিয়াছিলেন। কিন্তু চিকিৎসার এই নীতি আমি মানিয়া লইতে তৈরি ছিলাম না।

'ডাক্তার, কি করতে চান স্পষ্ট করে বলুন। সে মাংস বা বীফ-টি খেতে আপত্তি করে ত তা আমি দিতে দেব না, তাতে তার মৃত্যু যদি হয় তবুও না।'

ডাক্তার বলিলেন, 'আপনার ফিলসফী নিয়ে আপনি থাকুন। শুনুন, যত দিন আপনার স্ত্রী আমার চিকিৎসায় থাকবেন ততদিন আমি যা দরকার মনে করি দেব। তাতে আপত্তি থাকে ত সখেদে বলব, আপনার স্ত্রীকে আপনি নিয়ে যান। আমার ঘরে তিনি মরবেন চোখের ওপর তা আমি দেখতে পারব না।'

'এখুনি ওকে নিয়ে যেতে হবে এই কি আপনি বলছেন ?'

'তাঁকে নিয়ে যেতে কখন বললাম ? এইমাত্র বলছি যে আমার মত আমাকে চিকিৎসা করতে দিন। সে অবস্থায় আমরা দুইজনে সাধ্যমত এঁর সেবা করব ; আপনি নিশ্চিন্ত মনে ফিরে যেতে পারেন। এই সোজা কথাটা যদি না বোঝেন তবে আমি নাচার, সে ক্ষেত্রে আমার বলতে হবে যে আপনি আপনার স্ত্রীকে আমার এখান থেকে নিয়ে যান।'

মনে পড়ে আমার কোন ছেলে তখন আমার সঙ্গে ছিল। তাকে আমি জিজ্ঞাসা করি। সে বলে, 'তুমি যা বলছ তার সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ একমত। মাকে মাংস বা বীফ-টি দেওয়া চলবে না।' তার পরে কস্তুরবার কাছে গেলাম। তখন সে অতিশয় দুর্বল ছিল। তাকে কিছু জিজ্ঞাসা করা আমার পক্ষে কষ্টের ছিল। কিন্তু কর্তব্যবোধে ডাক্তারের সঙ্গে আমার যে কথা হইয়াছিল সংক্ষেপে তা তাকে বলি। দৃঢ়ভাবে সে বলে, 'মাংসের শুরুয়া আমি খাব না। মনুষ্যদেহ বার বার মিলে না। তোমার কোলে বরং মরব তবু অখাদ্য খেয়ে দেহ অশুচি করব না।'

যতটা পারিলাম বুঝাইলাম ও বলিলাম, 'আমার মত মত তোমার চলতে হবে এমন কোন কথা নেই।' আমাদের জানাশোনা বন্ধু ও পরিচিত হিন্দু কেউ কেউ ওষুধ হিসাবে মাংস-মদ্য খায় সেই নজিরও দেখাইলাম। কিন্তু সে মোটেই টলিল না। বলিল, 'এখান থেকে আমায় নিয়ে চল।'

অত্যন্ত খুশী হইলাম। সরাইতে ভয় পাইতেছিলাম। তা হইলেও সরানো স্থির করিলাম। ডাক্তারকে পত্নীর সংকল্পের কথা বলিলাম। ডাক্তার বিরক্ত হইয়া বলিলেন, 'দেখছি আপনি নিষ্ঠুর স্বামী। এরূপ অসুখের অবস্থায় বেচারাকে এসব কথা বলতে আপনার বাধল না? এখান থেকে নিয়ে যাওয়ার অবস্থা ওঁর নয়। নড়াচড়া সইবার শক্তি ওঁর মোটেই নেই। কে বলবে, রাস্তায়ও ওঁর প্রাণ বেরিয়ে যেতে পারে। তবুও যদি আপনি জেদ না ছাড়েন নিয়ে যেতে পারেন। ওঁকে মাংসের যূষ দিতে না দেন ত এক রাতও ওঁকে এখানে রাখার ঝুঁকি আমি নেব না, নিতে অক্ষম।'

তাই তখনই তাকে ওখান হইতে সরানোর কথা ঠিক করিলাম। গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি পড়িতেছিল। স্টেশন একটু দূরে ছিল। ডারবন হইতে ফিনিক্সে রেলে ও স্টেশন হইতে হাঁটাপথে দুই কি আড়াই মাইল যাওয়ার ছিল। ঝুঁকিটা মস্ত ছিল। ভগবান সহায় হইবেন এই ভরসায় ঝুঁকি লইলাম। লোক পাঠাইয়া আগেই ফিনিক্সে খবর দিলাম। ফিনিক্সে আমাদের 'হেমক' ছিল। হেমক মানে ফাঁক-ফাঁক-বোনা কাপড়ের ঝোলা বা পালকি। উহার মাথা বাঁশে বাঁধিয়া দিলে রোগী আরামে তাতে ঝুলিতে থাকে। ওয়েস্টকে লিখিয়াছিলাম ওই হেমক, এক বোতল গরম দুধ ও এক বোতল গরম জল এবং ছয় জন লোক সহ যেন তিনি স্টেশনে উপস্থিত থাকেন। গাড়ীর সময় কাছাকাছি হইতেই ওই ভয়ানক অবস্থায় কস্তুরবাকে রিক্সায় তুলিয়া স্টেশনে রওনা হইলাম।

কস্তুরবাকে আমার সাহস দিতে হয় নাই। উল্টা সেই আমাকে আশ্বাস দিয়া বলে, 'আমার কিছু হবে না; তুমি ভেবো না।'

আহার ছিল না বলিয়া কস্তুরবার শরীরে কিছুই ছিল না, অস্থিচর্মসার হইয়া গিয়াছিল। প্ল্যাটফর্মটা অতি বৃহৎ ছিল। অনেকটা গিয়া গাড়ীতে ওঠার ছিল। প্ল্যাটফর্মে রিক্সা ঢুকিতে পাইত না। তাই কোলে করিয়া কস্তুরবাকে আমি গাড়ীতে লইয়া যাই। ফিনিক্স স্টেশনে কথামত জালির

ডুলি বা হেমক উপস্থিত ছিল। রোগীকে তাতে আরামে লইয়া যাই। ওখানে জল-চিকিৎসায় কস্তুরবার শরীর ধীরে ধীরে ভাল হইতে থাকে।

ফিনিক্সে যাওয়ার দুই-তিন দিন পরে এক স্বামী আসেন। আমরা ডাক্তারের কথামত চলি নাই জানিতে পাইয়া আমাদের ওপর তাঁর কৃপা হয় আর তাই আমাদের বুঝাইবার জন্য তাঁর ওই আগমন। যতটা মনে আছে, সেই সময়ে আমার মেজো ছেলে মণিলাল ও সেজো রামদাস ওখানে ছিল। মনুস্মৃতির শ্লোক আবৃত্তি করিয়া স্বামী প্রমাণ করিতে লাগিয়া গেলেন যে মাংস খাওয়া চলে। পত্নীর সামনে এরূপ আলোচনা আমার ভাল লাগিতেছিল না। তবুও ভদ্রতার খাতিরে তাঁকে তাঁর কথা আমি বলিতে দিয়াছিলাম। মাংসাহারের সমর্থনে ওই সব শ্লোকের প্রমাণ আমার দরকার ছিল না, আমি ওগুলি জানিতাম। ওই শ্লোকগুলি প্রক্ষিপ্ত এ কথা যে এক পক্ষ মনে করে তাও আমি জানিতাম। প্রক্ষিপ্ত না হইলেও মত আমার বদলাইবার ছিল না। শ্লোকগুলি জানা সত্ত্বেও নিরামিষ আহার সম্পর্কে আমার নির্ণয় সুনিশ্চিত হইয়া গিয়াছিল। তা ছাড়া কস্তুরবা তার বিশ্বাসে দৃঢ় ছিলই। বেচারা কস্তুরবা শাস্ত্রের কি জানিত। বাপদাদার মানিয়া-চলা ধর্মই ছিল তার ধর্ম। ছেলেরা বাবার ধর্মে বিশ্বাসী ছিল। তাই স্বামীজীর সহিত তারা ঠাট্টা-তামাশা করিতেছিল। শেষটায় এই বলিয়া কস্তুরবাই ওই কথায় দাঁড়ি টানিয়া দেয়, 'স্বামীজী যা-ই বলুন, মাংসের যূষ খেয়ে আমি সেরে উঠতে চাই না। আপনার কাছে মিনতি আর আমায় জ্বালাবেন না। কিছু বলার থাকে ত আমার স্বামীপুত্রের কাছে বলুন। আমার শেষ কথা আমি বলে দিয়েছি।'

২৯

ঘরোয়া সত্যাগ্রহ

১৯০৮ সনে আমার প্রথম জেল হয়। জেলে কয়েদীদের এমন কতক-গুলি নিয়ম মানিয়া চলিতে হয় যা সংযমী ব্যক্তি বা ব্রহ্মচারীর স্বেচ্ছায় মানিয়া চলা কর্তব্য। উদাহরণস্বরূপ, কয়েদীদের সূর্য ডোবার আগে খাইয়া লইতে হয়। ভারতীয় ও কাফরী কয়েদীদের চা বা কফি দেওয়া হইত না। লবণ দরকার হইলে আলাদা পাওয়া যাইত। আস্বাদের জন্য কিছু খাওয়া

চলিত না। ভারতীয়দের জন্য জেলের প্রধান চিকিৎসকের কাছে 'কারী পাউডার' (মসলার গুঁড়া) ও রান্নার সময়ে খাদ্যে লবণ সংযোগ করার অনুমতি চাহিয়াছিলাম। উহার উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, 'এখানে ত আপনারা ভোজনবিলাসের জন্য আসেন নাই। স্বাস্থ্যের দিক হতে 'কারী পাউডারের' কোনই দরকার নেই। লবণ মেখেই খান বা রান্না করার সময়ে মিলিয়ে নেন, সে একই কথা।'

অনেক কষ্টে শেষটায় আমাদের বাঞ্ছিত পরিবর্তন করাইয়া লওয়া গিয়াছিল। কিন্তু শুদ্ধ সংযমের দৃষ্টিতে দেখা যায় ত এই দুই প্রতিবন্ধ ভালই ছিল। জবরদস্তির দ্বারা চাপানো প্রতিবন্ধের ফল বড় একটা ভাল হয় না, কিন্তু স্বেচ্ছায় স্বীকার করিলে এরূপ প্রতিবন্ধের ফল খুবই ভাল হয়। অতএব জেল হইতে বাহির হইয়াই আমি নিজে এই দুই নিয়ম পালন করিতে আরম্ভ করি। পারতপক্ষে চা খাইতাম না। আর সূর্য অস্ত যাওয়ার আগেই খাইয়া লইতাম। সেই অভ্যাস আজ স্বভাবের অঙ্গ হইয়া গিয়াছে।

কিন্তু এমন এক ব্যাপার ঘটে যার ফলে লবণও ত্যাগ করিয়াছিলাম, আর এক দিনের তরেও না ভাঙ্গিয়া একটানা দশ বছর ওই ব্রত পালন করিয়াছিলাম। নিরামিষ আহার বিষয়ক কোন কোন পুস্তকে পড়িয়াছিলাম যে লবণ না খাইলেও মানুষের চলে, তা বাদ দেওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল। লবণ না-খাওয়া ব্রহ্মচারীর পক্ষে লাভদায়ক এই ধারণা আমার পূর্বেই জন্মিয়াছিল। যাদের শরীর দুর্বল তাদের ডাল না খাওয়া উচিত ইহাও আমি পড়িয়াছিলাম ও অভিজ্ঞতা হইতে উহার সত্যতা অনুভব করিয়াছিলাম। এই দুই বস্তু আমার প্রিয় ছিল।

অস্ত্রক্রিয়ার পরে রক্তস্রাব কিছু দিন বন্ধ থাকিলেও আবার শুরু হয়। কোনভাবেই তা ঠেকানো যাইতেছিল না। কেবল জল-চিকিৎসায় কুলাইতেছিল না। আমার চিকিৎসার ওপর পত্নীর খুব আস্থা না থাকিলেও অবজ্ঞাও ছিল না। অন্য চিকিৎসা করানোর আগ্রহ তার ছিল না। সুতরাং আমার অন্য চিকিৎসায় কাজ না হওয়ায় আমি তাকে লবণ ও ডাল ত্যাগ করিতে অনুরোধ করি। অনেক যুক্তি উপস্থিত করি, আমার কথা যে ঠিক তা সপ্রমাণ করার জন্য বই হইতে পড়িয়া শুনাই। তাতে কোন কাজ হইল না, সে রাজী হইল না। অবশেষে সে বলিল, 'তোমাকে কেউ লবণ ও ডাল ছাড়তে বললে তুমিও ছাড়বে না।' কথাটা একটু বিঁধিল, আবার আনন্দও

হইল। আমার ভালবাসা উছলিয়া পড়ার সুযোগ পাইল। খুশী হইয়া বলিলাম, 'তোমার অনুমান ভুল। আমার যদি অসুখ হয় এবং বৈদ্য এই বস্তু বা অন্য কোন বস্তু ছাড়তে বলে ত নিশ্চয় ছেড়ে দেব। এই নাও, বৈদ্যের ব্যবস্থা বিনাই আমি এক বছরের মত ডাল ও লবণ ছেড়ে দিচ্ছি, তোমার ছাড়া না ছাড়ার সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই।'

কস্তুরবার ভয়ানক লাগিল। অতিশয় খেদে সে বলিয়া উঠিল, 'আমাকে ক্ষমা করো। তোমার স্বভাব জানা সত্ত্বেও কথাটা আমার মুখ থেকে বেরিয়ে গেছে। বলছি, ডাল-নুন আমি খাব না। দোহাই তোমার, প্রতিজ্ঞা তুমি ফিরিয়ে নাও। এ যে আমার অতি কঠোর সাজা হবে।'

বলিলাম: 'ডাল-নুন ছাড়বে, সে খুব ভাল কথা। আমি নিশ্চিত জানি এতে তোমার খুব উপকার হবে। কিন্তু যে প্রতিজ্ঞা করেছি তা ফেরাবার উপায় নেই। এতে আমার লাভই হবে। যে কারণেই মানুষ সংযম পালন করুক, তাতে তার লাভই হয়। তাই তুমি পীড়াপীড়ি করো না। এতে আমারও পরীক্ষা হবে, আর যে দুই বস্তু ছাড়বে নিশ্চয় করেছ তাতে অটল থাকার পক্ষে এ থেকে তোমার সহায়তা মিলবে।'

সে কি আর করে! সে হাল ছাড়িল। 'তুমি মহা জেদী, কারো কথা কি তুমি শোন' বলিয়া চোখের জলে বুকের দুঃখ সে হাল্কা করে।

আমার সাধ এই ঘটনাকে আমি সত্যাগ্রহ বলি। এটি আমার জীবনের নানা নিবিড় মধুর স্মৃতির একটি।

এর পরে কস্তুরবার শরীর দ্রুত ভাল হইতে থাকে। তার কারণ লবণ-ডাল ত্যাগ ছিল আর থাকিলেই বা কতটা ছিল, অথবা এই দুই বস্তু ত্যাগের কারণে আহারে যে হেরফের করিতে হইয়াছিল তা ছিল, অথবা আমার তদারকিতে যে সব নিয়ম তার মানিয়া চলিতে হইত তা কিংবা এই ঘটনা জনিত মানসিক উল্লাস এর মূলে ছিল সে কথা আমি জানি না, বলিতে পারি না। তা যা-ই হোক, কস্তুরবার দুর্বল শরীর সবল হইল, রক্তস্রাব বন্ধ হইল। আর 'বৈদ্যরাজ'-রূপে আমার খ্যাতি বাড়িল।

আর আমার বেলায় এই দুই ত্যাগের ফল উত্তমই হইল। ছাড়ার পরে নুন-ডালের জন্য আমার প্রাণ কখনও কাঁদে নাই। দেখিতে না দেখিতে এক বছর কাটিয়া গেল। দেখিতে পাইলাম, ইন্দ্রিয় সকল পূর্বাপেক্ষা অধিক শান্ত হইয়াছে এবং মন সংযমের দিকে বেশি ঝুঁকিয়াছে। এখানে বলিতে

হয় যে এক বছর শেষ হওয়ার পরেও ডাল-নুন বর্জন দেশে ফেরার পূর্ব দিন পর্যন্ত বজায় ছিল। ১৯১৪ সনে লণ্ডনে একবারমাত্র ডাল ও লবণ খাইয়াছিলাম। কিন্তু সে কথা ও কেন যে আবার লবণ ও ডাল খাইতে আরম্ভ করি সেই বৃত্তান্ত পরে বলিব।

লবণ ও ডাল ছাড়ার পরীক্ষা অন্য সাথীদের ওপরও আমি খুব চালাইয়াছিলাম। দক্ষিণ আফ্রিকায় তার ফল ভালই হইয়াছিল। এই দুই বস্তুর পরিহার বিষয়ে চিকিৎসকদের মতভেদ রহিয়াছে। কিন্তু সংযমের দৃষ্টিতে দেখিলে এই দুই বস্তুর ত্যাগে যে লাভ হয় এতে সংশয় নাই। ভোগী ও সংযমীর খাদ্য আলাদা আলাদা হওয়া চাই যেমন হওয়া চাই তাদের জীবনের গতি। ব্রহ্মচর্য পালন করিতে ইচ্ছুক লোক ভোগীর জীবন যাপন করিয়া ব্রহ্মচর্যকে কঠিন ও অনেক সময় অসম্ভব করিয়া তোলে।

সংযমের দিকে

কস্তুরবার অসুখের কারণে আহারে কতকটা অদলবদল করিতে হইয়াছিল সে কথা পূর্ব প্রকরণে বলিয়াছি। ব্রহ্মচর্যের প্রয়োজনে পরে খাদ্যের আরও হেরফের করি।

দুধ ছাড়া ছিল তার প্রথম দফা। দুধে ইন্দ্রিয়বিকার জন্মে এ কথা রায়চাঁদ ভাই-এর নিকট প্রথম শুনি। নিরামিষ আহার বিষয়ক পুস্তক পড়িবার পরে এই ভাব বৃদ্ধি পায়। কিন্তু ব্রহ্মচর্য ব্রত লওয়ার পূর্ব পর্যন্ত দুধ ছাড়ার সংকল্প করা সম্ভব হয় নাই। শরীর রক্ষার পক্ষে দুধ যে আবশ্যক নয় এ কথা অনেকদিন আগেই আমি বুঝিয়াছিলাম। কিন্তু ছাড়া সহজ ছিল না। ইন্দ্রিয়দমনের জন্য দুধ ছাড়া আবশ্যক এই বোধ যখন দিন দিন পুষ্ট হইতেছিল তখন গাই ও মোষের ওপর গোয়ালারা যে নিষ্ঠুর অত্যাচার করে সেই সম্পর্কে কিছু পুঁথিপত্র কলিকাতা হইতে আমি পাই। আমার ওপর উহার অদ্ভুত প্রভাব হয়। কেলেনবেকের সহিত ওই সম্বন্ধে আলোচনা করি।

কেলেনবেকের পরিচয় যদিও সত্যাগ্রহের ইতিহাসে দিয়াছি আর পূর্ব-এক প্রকরণেও তাঁর কথা উল্লেখ করিয়াছি তবুও এখানে আরও কিছু

বলা আবশ্যক। তাঁর সহিত দৈবাৎ আমার পরিচয় হইয়াছিল। মি. খাঁয়ের তিনি বন্ধু ছিলেন। মি. খাঁ লক্ষ্য করেন যে কেলেনবেকের অন্তরের গভীরে বৈরাগ্যবৃত্তি রহিয়াছে। সম্ভবত তাই তিনি তাঁর সহিত আমার পরিচয় করিয়া দেন।

পরিচয় হইল বটে কিন্তু তাঁর শৌখিনতা ও বেহিসাবী খরচের বহর দেখিয়া আমি ঘাবড়াইয়া যাই। কিন্তু প্রথম সাক্ষাতেই তিনি আমাকে ধর্ম সম্বন্ধে গভীর প্রশ্ন করেন। আলোচনাক্রমে বুদ্ধের ত্যাগের প্রসঙ্গ আসিয়া যায়। অল্প দিনে পরিচয় গাঢ় বন্ধুত্বে পরিণত হয়—এতটা যে আমি যেমন ভাবিতাম তিনিও তেমন ভাবিতেন, আমি যেমন করিতাম তিনিও কর্তব্যজ্ঞানে তেমন করিতেন।

তখন তিনি একা ছিলেন। বাড়ী ভাড়ার উপরন্তু এক নিজের জন্যই মাসে তাঁর ১২০০ টাকার অধিক খরচ হইত। পরে তিনি জীবন এতটা সাদাসিধা করিয়া লইয়াছিলেন যে তাঁর মাসিক খরচ কমিয়া ১২০ টাকায় দাঁড়াইয়াছিল। ইহা আমার সংসার তুলিয়া দেওয়ার পরেকার কথা। প্রথম বারে জেল হইতে বাহির হওয়ার পরে আমরা দুইয়ে এক সাথে থাকিতে আরম্ভ করি। রীতিমত কষ্ট করিয়া থাকিতাম।

তাঁর সহিত দুধের আলোচনা এই একত্র থাকাকালে আমার হইয়াছিল। মি. কেলেনবেক আমাকে বলেন, 'দুধের দোষের কথা আপনি যখন তখন বলেন। তবে দুধ আপনি ছাড়েন না কেন? দুধ না হলে চলে না তা ত নয়।' এই কথায় চকিত হইলাম। আবার আনন্দও হইল। আমরা উভয়ে তখনই দুধ ত্যাগের প্রতিজ্ঞা করিলাম। টলস্টয় ফার্মে ১৯১২ সনে এই ঘটনা ঘটে।

এইটুকু ত্যাগে মন উঠিল না। কিছু দিন পরে আমরা কেবল ফল খাইয়া থাকার সংকল্প করি—সহজে মিলে ও দামে সস্তা এমন ফল। হদ্দ গরীবের সমান থাকা আমাদের লক্ষ্য হয়। ফলাহারে বিস্তর সুবিধাও হইয়াছিল। বলা যায় রান্নার পাটই উঠিয়া গিয়াছিল। কাঁচা চীনা বাদাম, কলা, খেজুর, লেবু ও জলপাই তেল আমাদের সাধারণ আহার হইল।

যাঁরা ব্রহ্মচর্য পালন করিতে চান তাঁদের এখানে সাবধান করিয়া দেওয়া দরকার। ব্রহ্মচর্যের সহিত খাদ্যের ও উপবাসের সম্বন্ধ নিকট ত বটেই তবে ইহাও নিশ্চিত যে মনই উহার মুখ্য আকর। জ্ঞানপাপী মন উপবাসে শুদ্ধ

হয় না। সেই স্থলে মনের ওপর আহার পরিবর্তনের ক্রিয়া হয় না। আত্ম-নিরীক্ষণ, আত্মসমর্পণ, সর্বোপরি তাঁর কৃপা ছাড়া রতি-বাসনা নাশ হয় না। কিন্তু মনের সহিত দেহের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ এবং বিকারী মনের রোখ বিকারী খাদ্যের দিকে। আর ওই উত্তেজক খাদ্যের ক্রিয়া মনের ওপর হয়। তাই ততটা পরিমাণ খাদ্যের বাছবিচারের ও উপবাসের আবশ্যকতা অবশ্যই রহিয়াছে। বিকারী মন শরীর ও ইন্দ্রিয়কে কি করিয়া তার বশে রাখিবে? সে নিজেই শরীর ও ইন্দ্রিয়ের বশ হইয়া যায়। অতএব খাদ্য যত শুদ্ধ ও অনুত্তেজক হয় তত ভাল, আর উপবাসের প্রসঙ্গ আসিলেই উপবাস করা আবশ্যক।

আহার-সংযম ও উপবাসের কথায় যারা নাক সিঁটকায় তারা তাদের সমানই ভুল করে যারা আহার-সংযম ও উপবাসকেই সব কিছু মনে করে। আমার অভিজ্ঞতা এই যে, সংযমের দিকে যার মন ঝুঁকিয়াছে খাদ্যের বাছ-বিচারে ও উপবাসে তার প্রভূত সহায়তা হয়। এই দুইয়ের সাহায্য বিনা বস্তুতপক্ষে রতি-বাসনা নষ্ট হয় না।

৩১

উপবাস

অন্ন ও দুধ ছাড়িয়া যখন ফলাহার আরম্ভ করিয়াছিলাম ঠিক সেই সময়েই সংযমের সাধন হিসাবে উপবাসও করিতে শুরু করিয়াছিলাম। কেলেনবেকও এই পরীক্ষায় যোগ দিয়াছিলেন। পূর্বেও উপবাস করিতাম, কিন্তু তখন করিতাম স্বাস্থ্যের জন্য। সংযমের জন্য উপবাস আবশ্যক ইহা কোন বন্ধু আমায় বলেন।

বৈষ্ণব পরিবারে জন্মিয়াছিলাম ও মা নানা কঠিন ব্রত করিতেন। তাই আমি একাদশী ইত্যাদি তিথিতে উপবাস করিতাম, কিন্তু করিতাম মার দেখাদেখি মা-বাবাকে খুশী করার জন্য।

এরূপ ব্রত পালনে লাভ হয় এ কথা তখন বুঝিতাম না, বিশ্বাসও করিতাম না। কিন্তু যখন দেখিতে পাই যে ওই বন্ধু উপবাস করিয়া ফল পাইয়াছেন তখন আমার মনে হয় উপবাস করিলে ব্রহ্মচর্য পালনে তা সহায় হইবে। তাই তাঁর অনুকরণে একাদশী করার নিশ্চয় করি। সাধারণত একাদশীর

দিনে লোকে ফল ও দুধ খায় : তাকেই তারা একাদশী পালন বলে। কিন্তু আমার ত ফলাহারের উপবাস তখন নিত্যই চলিতেছিল। তাই গোটা দিনটাই আমি উপবাস করিতাম—জল বাদ দিয়া।

এই ব্রত, এই পরীক্ষা আমার আরম্ভ হইয়াছিল শ্রাবণ মাসে। আর ওই শ্রাবণ মাসটা সেই বছর রমজানও ছিল। বৈষ্ণব ব্রতের মত শৈব ব্রতও গান্ধী পরিবার পালন করিত। গান্ধীরা যেমন হাবেলীতে যাইত তেমন শৈব দেবালয়েও যাইত। পরিবারের কেউ কেউ গোটা শ্রাবণ মাস প্রদোষ * পালন করিত। অতএব আমিও প্রদোষ পালন করার সংকল্প করিলাম।

এই গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োগের আরম্ভ টলস্টয় আশ্রমে হইয়াছিল। ওখানে আমি ও কেলেনবেক সত্যাগ্রহী কয়েকটি পরিবারের দেখাশুনা করিতাম। ওই সব পরিবারে বালক ও যুবকও ছিল। তাদের জন্য স্কুল চালাইতাম। ওই সব যুবকদের মধ্যে চার পাঁচজন মুসলমান ছিল। ইসলামের রীত-রেওয়াজ যাতে তারা পালন করে সেইদিকে আমার দৃষ্টি ছিল ও তাদের উৎসাহ দিতাম। নামাজ পড়ার সুযোগ তাদের দিতাম। খ্রীস্টান ও পারসী বালকও আশ্রমে ছিল। কর্তব্যজ্ঞানে তাদেরও আমি নিজ নিজ ধর্মের রীতি মানিয়া চলিতে বলিতাম।

সুতরাং মুসলমান যুবকদের আমি এই মাসে রোজা রাখিতে উৎসাহ দান করি। প্রদোষ পালন করা ত আমার ছিলই। হিন্দু, পারসী ও খ্রীস্টান যুবকদেরও আমি মুসলমান যুবকদের সহিত উপবাস করিতে বলি। ত্যাগের কথায় অন্যের সহিত যোগ দিলে লাভ হয় এ কথা তাদের বুঝাইয়া বলি।

আশ্রমবাসীদের অনেকে আমার প্রস্তাব সন্তুষ্টচিত্তে মানিয়া লয়। হিন্দু ও পারসীরা মুসলমান সাথীদের ঠিক অনুকরণ করিত না, দরকারও ছিল না। মুসলমানেরা সূর্যাস্তের অপেক্ষায় থাকিত, তাদের পরিবেশন করিবে বা তাদের জন্য বিশেষ কিছু তৈরি করিবে বলিয়া অন্যেরা কিছু আগে খাইয়া লইত। তা ছাড়া মুসলমানদের মত ভোর-রাতেও তারা খাইত না। মুসলমানেরা দিনমানে জল খাইত না, অন্যেরা জল খাইত।

এই প্রয়োগের ফলে উপবাস বা একাশনের উপকারিতা সকলে বুঝিতে পায় এবং তাদের বৃত্তি উদার হয় ও একের অন্যের প্রতি ভালবাসা বাড়ে।

* ব্রত বিশেষ : সূর্যাস্ত পর্যন্ত উপবাস বিধান। চান্দ্রমাসের ত্রয়োদশী তিথির সন্ধ্যায় শিবপূজা।

আশ্রমে আমরা সকলেই নিরামিষ খাইতাম: আমার মনের দিকে চাহিয়া তারা রাজী হইয়াছিল এ কথা কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করিতেছি। রোজার দিনে মুসলমান বালকেরা মাংসের অভাব বিশেষ অনুভব করিয়া থাকিবে, কিন্তু তাদের কেউ ঘুণাক্ষরেও তা আমায় জানিতে বা বুঝিতে দেয় নাই। আনন্দ ও তৃপ্তির সহিত তারা নিরামিষ খাইত। আশ্রমের সহজ সরল জীবনের সঙ্গে বেমানান নয় এমন রুচিকর খাদ্য হিন্দু ছেলেরা তাদের তৈরি করিয়া দিত।

উপবাসের কথা বলিতে বলিতে এই বিষয়ান্তরে আমি আসিয়াছি: ভাবিয়া চিন্তিয়াই আসিয়াছি, কারণ অন্যত্র এই মধুর কথা বলার সুযোগ আমার হইত না। আর এই বিষয়ান্তর প্রবেশে আমার এক অভ্যাসের কথাও বলা হইল: সেই অভ্যাস এই যে, যে কাজ আমার কাছে করার যোগ্য মনে হয় তাতে আমি আমার সাথীদের জড়াইয়া লইতে চেষ্টা করি, এটা আমার চিরদিনের অভ্যাস। উপবাস বা একাহার এদের কাছে সম্পূর্ণ নূতন বস্তু ছিল, কিন্তু প্রদোষ ও রমজানের অছিলায় সহজেই সকলকে আমি এই সংযমের দিকে টানিতে পারিয়াছিলাম।

এভাবে আশ্রমে সংযমের হাওয়া সহজেই সৃষ্টি হয়। অন্য উপবাস ও একাহারেও আশ্রমের লোকেরা আমার সহিত যোগ দিত। আমার বিশ্বাস এর ফল শুভ হইয়াছিল। সংযমের প্রভাব সকলের ওপর কতটা হইয়াছিল এবং কামভাব বশে আনার পক্ষে উপবাসাদি কতটা তাদের সহায় হইয়াছিল সে কথা জোর দিয়া কিছু বলিতে পারি না। তবে নিজের অনুভব হইতে বলিতে পারি যে, উপবাসাদির ফলে কি স্বাস্থ্যের দিক হইতে কি আত্মসংযমের দিক হইতে আমি অত্যন্ত লাভবান হইয়াছিলাম। কিন্তু ইহাও আমি জানি যে উপবাস ও অনুরূপ সংযমাদির প্রভাব সকলের ওপর সমান হইবে এমন কোন কথা নাই।

তখনই কেবল উপবাস ইন্দ্রিয়দমনের সহায় যখন ইন্দ্রিয়দমনার্থে করা হয়। আমার কোন কোন বন্ধুর অভিজ্ঞতা এই যে, উপবাসের পরে তাঁদের কামভাব ও জিহ্বার লোভ আরও তীব্র হইয়াছে। তার অর্থ ইন্দ্রিয়দমনের ব্যাকুল আগ্রহ হইতে উপবাস করিলেই ফল লাভ হয়, অন্যথায় তা বৃথা। গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের এই শ্লোকটি এই প্রসঙ্গে চিন্তনীয়:

বিষয়া বিনিবর্ৰ্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ।
রসবর্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ততে ॥

উপবাস কালে উপবাসীর বিষয় শান্ত হয়, কিন্তু রস তার মজে না। রস মজে ঈশ্বরদর্শনে, ঈশ্বরপ্রসাদে।

অর্থাৎ সংযমের সাধনায় উপবাস এক সাধনমাত্র, তাই সব নয়। শরীরের উপবাসের সহিত মন উপবাসী না হইলে সেই উপবাস ছলনামাত্র, অনিষ্টের বাহন।

৩২

শিক্ষকরূপে

'সত্যাগ্রহের ইতিহাস'-এ যে সব কথা বলা হয় নাই বা অংশত মাত্র বলা হইয়াছে সে সব কথা এই সব প্রকরণে বলা হইতেছে এই কথা মনে রাখিলে পাঠক এই সব প্রকরণের পারস্পরিক সম্পর্ক বুঝিতে পারিবেন।

আশ্রম বড় হইল ও আশ্রমের বালক-বালিকাদের পড়াশুনার প্রশ্ন খাড়া হইল। ওখানে হিন্দু, মুসলমান, পারসী ও খ্রীস্টান যুবক ও কয়েকটি হিন্দু বালিকাও ছিল। তাদের জন্য বাহির হইতে শিক্ষক আনা সম্ভব ছিল না, আর আমি আবশ্যকও মনে করিতাম না। অসম্ভব ছিল তার কারণ উপযুক্ত শিক্ষক মেলা কঠিন ছিল, আর মিলিলেও বেশি বেতন ছাড়া জোহানিস-বর্গ হইতে একুশ মাইল দূরে কে আসিত? একে ত আমার হাতে পয়সার ছড়াছড়ি ছিল না। তা ছাড়া চলতি শিক্ষা-পদ্ধতি আমার ভাল লাগিত না বলিয়া বাহির হইতে শিক্ষক আমদানি করিতে আমি অনিচ্ছুক ছিলাম। ঠিক পদ্ধতি যে কি তা আমার জানা ছিল না; স্থির করিয়াছিলাম পরীক্ষা-প্রয়োগ দ্বারা যথার্থ পদ্ধতি শিখিয়া লইব। এইটুকু মাত্র জানিতাম যে আদর্শ অবস্থায় মাতাপিতাই কেবল প্রকৃত শিক্ষা দান করিতে সমর্থ—বাইরের সহায়তা যত কম লইয়া পারা যায় তত ভাল। টলস্টয় ফার্মকে আমি পরিবারের দৃষ্টিতে দেখিতাম এবং নিজেকে উহার পিতার স্থলবর্তী মনে করিতাম। আর তাই যুবক-যুবতীদের পড়ার দায় আমারই ছিল।

এই দৃষ্টি নিখুঁত ছিল তা নয়। জন্মাবধি বালকেরা আমার কাছে ছিল না। অন্য অবস্থায়, অন্য আবেষ্টনে তারা বাড়িয়া উঠিয়াছিল, আর সকলে এক ধর্মেরও ছিল না। পিতার স্থলবর্তী হইলেও এই অবস্থায় তাদের প্রতি পুরা সুবিচার করা সম্ভবপর ছিল কি?

কিন্তু আমি চিরকাল হৃদয়ের শিক্ষাকে অর্থাৎ চরিত্রের বিকাশকে প্রথম স্থান দিয়া আসিয়াছি। যে কোন প্রতিবেশে পালিত যে কোন বয়সের বালক-বালিকাদের কিছুটা মাত্রায় নৈতিক শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে এই দৃঢ় বিশ্বাসে তাদের সঙ্গে আমি চব্বিশ ঘণ্টা কাটাইতাম। চরিত্রগঠনকে আমি শিক্ষার বনিয়াদ মনে করিতাম। আরও মনে করিতাম যে এই ভিত দৃঢ় হইলে বালক-বালিকারা নিজেদের চেষ্টায় বা বন্ধুদের সাহায্যে অন্য সব কিছু শিখিয়া লইতে পারে।

তাহা হইলেও অল্পবিস্তর অক্ষরজ্ঞানের আবশ্যকতা যে আছে তা আমি মানিতাম আর তাই আমি ক্লাশ খুলিয়াছিলাম। মি. কেলেনবেক ও প্রাগজী দেশাই এই কাজে আমায় সাহায্য করিতেন। শরীরগঠনের আবশ্যকতা অনুভব করিতাম। সেই শিক্ষা তারা দৈনিক কর্ম হইতে পাইত। আশ্রমে চাকর ছিল না। পায়খানা হইতে শুরু করিয়া হেঁশেল পর্যন্ত সব কাজ আশ্রমবাসীদেরই করিতে হইত। অনেক ফল গাছ ছিল, সেসব দেখিতে হইত। যখনকার যা শাক-সবজি ফলাইতে হইত। মি. কেলেনবেকের খেতির দিকে ঝোঁক ছিল। কিছুদিন সরকারী আদর্শ কৃষিক্ষেত্রে থাকিয়া তিনি শিক্ষাও লাভ করিয়াছিলেন। রান্নাবান্নার কাজে না গেলে ছোটবড় সবাইকে কিছু সময় খেতে কাজ করিতে হইত। এই কাজের বেশিটা বালক-বালিকারা করিত। তাদের বড় বড় গর্ত খুঁড়িতে, গাছ কাটিতে, বোঝা বইতে হইত। এই সব কাজে তারা আনন্দ পাইত, উপযুক্ত ব্যায়াম ত হইতই। সুতরাং পৃথক ব্যায়াম বা খেলাধূলার প্রয়োজন হইত না। সময় সময় তাদের কেউ কেউ বা সকলে কাজে ফাঁকি দিতে চাহিত অথবা আলস্য করিত। কখন কখন দেখিয়াও তা আমি দেখিতাম না। তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে আমি শক্ত হইতাম ও কাজ আদায় করিতাম। দেখিতে পাইতাম অত্যন্ত চাপ দিলে ছেলেরা হাঁফাইয়া উঠিত। কিন্তু কোন দিনও বিগড়াইয়াছে বলিয়া মনে পড়ে না। শক্ত হইতাম আবার হেলায়-ফেলায় যে কাজ করিতে নাই সে কথা বুঝাইয়াও বলিতাম। তা তারা স্বীকার করিত যদিও কথাটা ভুলিয়া গিয়া ফের খেলা শুরু করিতেও বেশি সময় লাগিত না। তবুও আমাদের রথ এক রকম ভালই চলিয়াছিল বলা যাইতে পারে এবং আর কিছু হোক বা না হোক ছেলেদের দেহ সুগঠিত হইয়াছিল। আশ্রমে অসুখ-বিসুখ বড় একটা হইত

না, যদ্যপি অনেকাংশে উহা উত্তম জল, উত্তম বায়ু ও সময়মত আহারের দান ছিল।

হাতের শিক্ষা সম্বন্ধেও এখানে দুই একটি কথা বলা আবশ্যক। আমাদের লক্ষ্য ছিল প্রত্যেক কিশোরকে কোন-না-কোন হাতের কাজ শিখাইব। এই উদ্দেশ্যে মি. কেলেনবেক এক ট্রেপিস্ট মঠে থাকিয়া চপ্পল তৈরী করা শিখিয়া আসেন। তাঁর কাছ হইতে ও কাজ আমি শিখিয়া লইয়াছিলাম। যে সব বালক ও কাজ শিখিতে রাজী হইয়াছিল তাদের তা আমি শিখাইয়াছিলাম। মি. কেলেনবেক ছুতারের কাজও কিছুটা জানিতেন। আর এক জন আশ্রমকর্মীও এই কাজ জানিতেন। তাই এই কাজও অল্পস্বল্প শেখানো হইত। প্রায় সকল ছেলেরাই রান্না করিতে শিখিয়াছিল।

বালকদের কাছে এই সব কাজ নূতন ছিল। স্বপ্নেও কোন দিন তারা ভাবে নাই একদিন তারা এই সব কাজ শিখিবে। তার কারণ ভারতীয় বালকেরা দক্ষিণ আফ্রিকায় কেবল প্রাথমিক অক্ষরজ্ঞানের শিক্ষাই পাইত।

টলস্টয় আশ্রমের পত্তনেই আমরা ঠিক করিয়া লইয়াছিলাম যে যে কাজ শিক্ষকেরা করিবেন না ছেলেদের সেই কাজ করিতে বলা হইবে না। ছেলেরা যে কাজ করিত তাদের সঙ্গে কোন শিক্ষকও সেই কাজ করিত। সুতরাং বালকেরা যাই শিখিত খুশী মনে শিখিত।

চরিত্রগঠন ও অক্ষরজ্ঞানের কথা পরের প্রকরণে বলা হইবে।

অক্ষরজ্ঞান

বালকদের শারীরিক শিক্ষার সহিত কিছুটা কারিগরি শিক্ষা দানের চেষ্টা টলস্টয় আশ্রমে কিভাবে আরম্ভ হইয়াছিল পূর্ব প্রকরণে সে কথা একটু বলা হইয়াছে। যতটা চাহিয়াছিলাম ততটা না হইলেও এই দিকে অল্পবিস্তর সফলতা অবশ্যই লাভ হইয়াছিল।

কিন্তু অক্ষরজ্ঞান দেওয়ার কাজটা উহা অপেক্ষা কঠিন ছিল। তার জন্য যে তোড়জোড় দরকার, যে লেখাপড়া জানা আবশ্যক তা আমাদের ছিল না। আর নিজের কথায়, যতটা সময় দেওয়ার আগ্রহ আমার ছিল ততটা

দেওয়া সম্ভব ছিল না। শরীরশ্রমে দেহ ক্লান্ত হইয়া যাইত আর শরীর যখন বিশ্রাম চাহিত সেই সময়েই ক্লাশ লইতে হইত। তাই সতেজ দেহমনের বদলে ঘুমে-ঢলা দেহটাকে কোনমতে এই কাজে লাগাইতাম। খেতের ও ঘরের কাজে সকাল বেলাটা যাইত। অতএব দুপুরের খাওয়ার ঠিক পরে স্কুল বসিত। ইহা অপেক্ষা সুবিধাজনক সময় পাওয়া যাইত না।

পুঁথি-শিক্ষার জন্য তিন ঘণ্টার বেশি দেওয়া হইত না। বালকদের তাদের মাতৃভাষা হিন্দী, তামিল, গুজরাটী ও উর্দুর মারফত শেখানো হইত। ইংরেজী পড়ানো হইত। তা ছাড়া গুজরাটী হিন্দু বালকদের সংস্কৃতও একটু শেখানো হইত। হিন্দী সকলকেই পড়িতে হইত। ইতিহাস, ভূগোল ও গণিতের সাধারণ জ্ঞান দেওয়া হইত। তামিল ও উর্দু আমি পড়াইতাম। তামিল শিখিয়াছিলাম জাহাজে ও জেলে। পোপ-এর লেখা উৎকৃষ্ট 'তামিল স্বয়ং-শিক্ষক'-এ আমার তামিলের তালিম শেষ হইয়াছিল। উর্দুর দৌড় ছিল একবারের সমুদ্রযাত্রায় উর্দু লিপির যতটা পরিচয় হওয়া সম্ভব ততটা আর মুসলমান বন্ধুদের কাছে শেখা আরবী ও ফারসী কিছু শব্দ। স্কুলে যতটুকু পড়িয়াছিলাম তা-ই ছিল সংস্কৃতের পুঁজি। গুজরাটীর বিদ্যাও তথৈবচ।

এই সম্বল দিয়াই আমার কাজ চালাইতে হইত। আমার সহকারীদের লেখাপড়ার পুঁজি ছিল আরও সরেস। তা হোক, দেশের নানা ভাষার প্রতি আমার মমতা ও ভালবাসা, নিজের শিক্ষণ-শক্তিতে আত্মবিশ্বাস, ছাত্রদের অজ্ঞানতা ও সর্বোপরি তাদের উদারতা এই সব মিলিয়া আমার ঘাটতি পূর্তি হইয়া গিয়াছিল।

দক্ষিণ আফ্রিকায় জন্ম বলিয়া তামিল ছাত্রেরা তামিল খুবই কম জানিত। অক্ষরজ্ঞানও তাদের ছিল না। সুতরাং অক্ষরপরিচয় আমাকেই করাইতে হইত। ব্যাকরণের সাধারণ সূত্রও আমিই শিখাইতাম। কাজটা সহজ ছিল। তামিল কথাবার্তায় যে আমি তাদের কাছে সহজেই হার মানিতাম এ কথা তারা জানিত, আর ইংরেজী-না-জানা কোন তামিল আমার কাছে আসিলে আমাদের দুইয়ের দোভাষী তারাই হইত। তবুও আমাদের রথ দিব্য চলিত তার কারণ আমার অজ্ঞতা ঢাকিবার চেষ্টা কখনও আমি করিতাম না। আমি আসলে যা তার বেশি কোন দিকেই আমি নিজকে জাহির করি নাই। অতএব ভাষাজ্ঞানে মহাদিগ্‌গজ হইলেও তাদের

ভক্তি ও ভালবাসা কোনদিনও আমি খোয়াই নাই। এর তুলনায় মুসলমান ছেলেদের উর্দু পড়ানো সহজ কাজ ছিল। অক্ষরজ্ঞান তাদের ছিল। পাঠে রস সৃষ্টি করা ও হাতের লেখা সুন্দর হয় সে দিকে দৃষ্টি রাখা ছিল আমার কাজ।

এই সব কিশোর-যুবকদের প্রায় সকলেই নিরক্ষর ও স্কুলে না-পড়া ছিল। পড়াইতে পড়াইতে দেখিতে পাইয়াছিলাম যে তাদের আলস্য দূর করা, পড়ায় রুচি সৃষ্টি করা ও পড়ার ওপর নজর রাখা ছাড়া আমার বিশেষ কিছু করার ছিল না। এইটুকুমাত্রে সন্তুষ্ট ছিলাম বলিয়া নানা বয়সের নানা বিষয়ের পড়ুয়াদের একই ক্লাশে একই সঙ্গে পড়াইতে পারিয়াছিলাম।

পাঠ্যপুস্তকের গুণগান যখন তখন শোনা যায়; আমি কিন্তু পাঠ্য-পুস্তকের অভাব অনুভব করি নাই। যে সব বই ছিল, মনে পড়ে না তাদেরও ব্যবহার বেশি করিয়াছিলাম। ছেলেদের ওপর বহু বইয়ের বোঝা চাপানোর আবশ্যকতা আমি অনুভব করি নাই। আমার বরাবরের বিশ্বাস, শিক্ষকই বালকের প্রকৃত পাঠ্যপুস্তক। বই হইতে শিক্ষকেরা যা শিখাইয়াছিলেন তার বেশি কিছু মনে নাই; মুখে মুখে তাঁরা যা শিখাইয়াছিলেন তা আজও আমার মনে আছে।

বালকেরা চোখ দিয়া যত না শেখে তার চাইতে ঢের বেশি শেখে বিনা আয়াসে কানে শুনিয়া। আমার মনে পড়ে না কোনও বই আগাগোড়া আমি ছাত্রদের পড়াইয়াছিলাম। নানা বই পড়িয়া যা আমি আত্মসাৎ করিয়া লইয়াছিলাম তা নিজের কথায় আমি তাদের সামনে ধরিতাম: আমার বিশ্বাস আজও সে সব কথা তাদের মনে আছে। বই পড়িয়া বিষয় ধরিতে তাদের কষ্ট হইত, কিন্তু আমি মুখে যা বলিতাম তা তারা চট্ করিয়া ধরিয়া লইত ও আমাকে বলিয়া যাইত। পড়িতে বলিলে তারা হাঁফাইয়া উঠিত কিন্তু আমার কথা তারা আগ্রহে শুনিত, অবশ্য যদি কোনও কারণে আমার কথা নীরস না হইত। আমার কথা শুনিয়া তাদের মনে যে প্রশ্ন জাগিত তা হইতে তাদের গ্রহণশক্তির পরিমাপ আমি পাইতাম।

৩৪

আত্মিক শিক্ষা

বালকদের শরীর ও মনের শিক্ষার জন্য যে খাটুনি খাটিয়াছিলাম তাহা অপেক্ষা অধিক খাটুনি খাটিয়াছিলাম তাদের আত্মার শিক্ষার জন্য। আত্মার বিকাশের জন্য ধর্মগ্রন্থের আশ্রয় আমি লই নাই। আমি বিশ্বাস করিতাম (আজও করি) যে, যে ধর্মে যার জন্ম সেই ধর্মের মূল কথা জানা ও সেই ধর্মের মোটামুটি শাস্ত্রজ্ঞান তার থাকা উচিত। তাই সেই জ্ঞান দেওয়ার যথাসাধ্য ব্যবস্থা করিয়াছিলাম। কিন্তু আমি জানিতাম যে বুদ্ধির শিক্ষারই তা অঙ্গ। আত্মার শিক্ষা এক পৃথক বস্তু এ কথা টলস্টয় আশ্রমের বালকদের শিক্ষা হাতে নেওয়ার অনেক আগেই আমি জানিতাম। আত্মার বিকাশ মানে চরিত্রগঠন, ঈশ্বরের জ্ঞান লাভ, আত্মজ্ঞান লাভ। এই শিক্ষা দেওয়ার জন্য বিশেষ প্রযত্ন আবশ্যক। আমি জানিতাম, এই শিক্ষা বিহনে যুবকদের শিক্ষা অঙ্গহীন ত হয়ই, ক্ষতিরও কারণ হইতে পারে।

আত্মজ্ঞান তথা সন্ন্যাস চতুর্থ আশ্রমের ব্যাপার এই ভুল ধারণা যে লোকের আছে তা আমি জানি। কিন্তু এ কথা কে না জানে যে এই অমূল্য বস্তু যারা চতুর্থ আশ্রমের জন্য মুলতবী রাখে তারা কোন কালেও আত্মজ্ঞান লাভ করে না, উল্টা বৃদ্ধাবস্থায় শোচনীয় দ্বিতীয় বাল-অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া সংসারের বোঝা হয়। আমার বেশ মনে আছে, ছাত্রদের যখন পড়াইতাম সেই সময়ে অর্থাৎ ১৯১১-১২ সনে আমার ভাবনা এইরূপ ছিল যদিও ঠিক এই ভাষায় তখন তা আমি ব্যক্ত করি নাই।

আত্মার এই শিক্ষা কিভাবে দেওয়া যায় ঠিক করিয়া উঠিতে পারিতেছিলাম না। বালকদের ভজন গাওয়াইতাম, নীতিকথা পড়িয়া শুনাইতাম। কিন্তু তাতে আমার সন্তোষ ছিল না। তাদের সঙ্গে যতই মিশিতেছিলাম ততই স্পষ্ট বুঝিতে পাইতেছিলাম যে এই জ্ঞান পুঁথির কথায় দেওয়া যায় না। শরীরের শিক্ষা শরীর খাটাইয়া, বুদ্ধির শিক্ষা বুদ্ধি চালনা করিয়া শিখিতে হয়, তদ্রূপ আত্মার শিক্ষা আত্মার বিকাশ করিয়া শিখিতে হয়। শিক্ষকের জীবন ও আচরণ আত্মার বিকাশের সেই দর্পণ। তাই বালকেরা দূরেই থাকুক বা সামনেই থাকুক শিক্ষকের সতত সাবধানে চলা কর্তব্য।

শত যোজন দূরে থাকিয়াও নিজের আচরণ দ্বারা শিক্ষক আপন শিষ্যের আত্মাকে উর্ধ্বগামী করিতে পারে। আমি যদি নিজে মিথ্যা বলি আর বালকদের সত্য বলিতে বলি ত সে সেষ্টা ব্যর্থ। ভীরু গুরুর শিষ্য বীর হইতে পারে না। ব্যভিচারী গুরুর শিষ্য সংযমী হয় না। অতএব আমি দেখিতে পাইলাম যে বালক-বালিকাদের কাছে আমার সতত দৃষ্টান্ত হইতে হইবে। এইরূপে আমার ছাত্ররাই আমার শিক্ষক হইয়া গিয়াছিল—নিজের জন্য না হোক তাদের জন্যই আমার ভাল হইতে ও ভাল থাকিতে হইবে এই শিক্ষা আমার হয়। স্থতরাং টলস্টয় আশ্রমে আমি যে আরও বেশি শমদমের পথে আগাইয়া গিয়াছিলাম তার জন্য বহুলাংশে আমি এই সব বালক-বালিকাদের কাছে ঋণী।

একটি ছেলে বড়ই উৎপাত করিত, মিথ্যা বলিত, কাউকে পরোয়া করিত না, অন্য ছেলেদের সহিত মারামারি করিত; এক দিন তার উৎপাত মাত্রা ছাড়াইয়া যায়। আমি অত্যন্ত রাগিয়া যাই। ছেলেদের আমি কখনও মারিতাম না। কিন্তু সেদিন আমি ধৈর্য খোয়াইলাম। তার কাছে গেলাম। বুঝাইলাম। কোন কথাই সে শুনিল না। আমাকে ধোঁকা দিতে সে চেষ্টা করিল। সামনে রুল ছিল। তা তুলিয়া লইলাম, তার বাহুতে আঘাত করিলাম। আমি তখন কাঁপিতেছিলাম। তা সে লক্ষ্য করিয়া থাকিবে। আমাকে এইরূপে এর আগে তাদের কেউ কখনও দেখে নাই। বালকটি কাঁদিয়া ফেলিল। মাফ চাহিল। রুলের বাড়ির যাতনায় সে কাঁদিয়াছিল তা নয়। সতের বছরের তাগড়া মদ্দ ইচ্ছা করিলে ওই ঘা আমাকে ফিরাইয়া দিতে পারিত। কিন্তু আমার রুলে সে দেখিতে পায় আমার বেদনা। এই ঘটনার পরে আর কোন দিন সে আমার কথা অমান্য করে নাই। কিন্তু সেই বাড়ি মারার বেদনা আজও আমায় বিঁধে। আমি সখেদে ভাবি সেদিন তার কাছে আমি আত্মার পরিচয় দেই নাই, দিয়াছিলাম পশুত্বের পরিচয়।

মারধর করার অমি বরাবর বিরোধী। একবার কেবল আমি আমার কোন ছেলেকে মারিয়াছিলাম। অতএব রুল মারাটা সঙ্গত হইয়াছিল কি অসঙ্গত তা আজও ঠিক করিয়া উঠিতে পারি নাই। সম্ভব কাজটা অনুচিত হইয়াছিল, কেন না রাগের মাথায় তা আমি করিয়াছিলাম আর শাস্তি দেওয়ার মনোভাব ছিল। উহা যদি কেবল আমার বেদনার অভিব্যক্তি

হইত তবে দোষের হইত না মনে করা যাইতে পারে। কিন্তু এই ক্ষেত্রে ভাবনা মিশ্র ছিল।

এর পরে ছেলেদের সংশোধনের উপায়ের কথা আমি ভাবিতে থাকি, আর অপেক্ষাকৃত ভাল উপায়ও আমি খুঁজিয়া পাই। এই ব্যাপারে সেই উপায়ের শরণ লইলে ফল কি হইত তা আমি বলিতে পারি না। ব্যাপারটা ওই যুবক অল্প দিনে ভুলিয়া গিয়াছিল। আমার মনে হয় না খুব বেশি সংশোধন তার হইয়াছিল। কিন্তু ছাত্রের প্রতি শিক্ষকের কর্তব্য যে কি তা এই ঘটনা হইতে আমি অধিকতর স্পষ্টরূপে বুঝিতে পাই।

এই ঘটনার পরে কখন কখন যে ছেলেরা নষ্টামি-দুষ্টামি করে নাই তা নয়, করিয়াছে কিন্তু আমি দণ্ডের আশ্রয় লই নাই। এইভাবে বালকদের আত্মিক শিক্ষা দেওয়ার প্রযত্ন হইতে আমি নিজে আত্মার গুণের অধিকতর পরিচয় লাভ করিয়াছিলাম।

৩৫

ভালমন্দে

টলস্টয় আশ্রমে মি. কেলেনবেক এমন একটা বিষয়ের প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন যে কথা পূর্বে আমি কখনও ভাবি নাই। পূর্বে বলিয়াছি যে আশ্রমে কয়েকটি বেয়াড়া ছেলে ছিল। বদখেয়াল ছেলেও দুই একটি ছিল। আমার তিন ছেলে ও অন্য ছেলেরা ওই সব ছেলেদের সঙ্গে সব সময় মেলামেশা করিত। কিন্তু মি. কেলেনবেকের ভাবনা ছিল আমার ছেলেদের জন্য। ও সব বখাটে ছেলেদের সঙ্গ তাদের করিতে হয় বলিয়া আর থাকিতে পারিলেন না, একদিন আমাকে বলিলেন, 'আপনার এই ভাবটা আমি বুঝতে পাচ্ছি না। ও সব গুঁছা ছেলেদের সঙ্গে আপনার ছেলেদের মেলামেশার একটাই পরিণাম হতে পারে: ওসব বখাটেদের ছোঁয়াচে এরাও বখে যাবে।'

এই কথার উত্তর দিতে মুহূর্তও আমার ভাবিতে হইয়াছিল কিনা সে আমার মনে নাই, তবে যে কথা বলিয়াছিলাম তা আমার মনে আছে। বলিয়াছিলাম, 'আমার ছেলেদের ও এই বখাটেদের মধ্যে ব্যবধান আমি কি করে করি? দুইয়ের প্রতিই আমার দায়িত্ব এখন সমান। আমি ডেকেছিলাম

বলেই না এরা এসেছিল। কিছু পয়সা দিয়ে যদি এদের চলে যেতে বলি ত এরা জোহানিসবর্গে গিয়ে আগের মতই চলতে থাকবে। এখানে এসে তারা আমার উপকার করেছে এ কথা যদি তারা ও তাদের মা-বাপ ভাবে ত তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। এখানে এসে যে তাদের কষ্ট ভুগতে হচ্ছে তা আপনিও দেখছেন আর আমিও দেখছি। কিন্তু আমার ধর্ম সুস্পষ্ট। তাদের এখানে রাখাই আমার কর্তব্য। তাই আমার ছেলেরাও তাদের সঙ্গে মিশবে। তা ছাড়া, আমার ছেলেরা অন্যদের অপেক্ষা উঁচু এই ভেদভাব কি আজ থেকেই তাদের আমায় শেখাতে বলেন? এরূপ ভাব তাদের মগজে ঢোকালে তাদের বিপথে চালনা করা হবে। যেমন আছে তেমন থাকে ত তারা ঠিক গড়ে উঠবে, নিজেদের মত নিজেরা ভালমন্দ বেছে নিতে শিখবে। আর এদের মধ্যে সত্যই কোন গুণ থাকে ত তার পরশ তাদের সাথীদেতেও লাগবে এ কথাই বা কেন না আমরা মনে করব? সে যাই হোক তাদের এখানে আমার রাখতেই হবে। তার ফল যদি বিপরীত হয় তবুও।

মি. কেলেনবেক মাথা নাড়িলেন।

আমার মনে হয় না পরীক্ষার ফল খারাপ হইয়াছিল। আমার ছেলেদের কোন ক্ষতি হইয়াছিল এ কথাও আমি স্বীকার করি না। দেখিতে পাইয়াছি, উল্টা লাভই হইয়াছিল। তারা অন্য অপেক্ষা কিছু বিশেষ এই ভাবের লেশও যদি তাদের অন্তরে থাকিয়া থাকিবে ত তা নিঃশেষে দূর হইয়া গিয়াছিল; সকলের সঙ্গে তারা মিশিতে শিখিয়াছিল। তাদের পরীক্ষা হইয়াছিল, শৃঙ্খলাবোধ জন্মিয়াছিল।

এই ও এরূপ অন্য অনুভব হইতে আমার বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, সন্তানের ওপর মাতাপিতার তথা অভিভাবকের সতর্ক দৃষ্টি থাকে ত ভালমন্দ এক সাথে থাকিলে আর এক সাথে পড়িলেও ভালোদের কোন ক্ষতি হয় না। ঘরের ছেলেমেয়েদের তুকতাকে ও আলগোছে রাখিলে শুদ্ধ ও নির্মল হইয়া উঠিবে আর বাইরে যাইতে দিলেই বখাটে হইবে এমন কোন কথা নাই। তবে এ কথা ঠিক যে যেখানে নানা রকমের বালক-বালিকা এক সঙ্গে থাকে ও পড়ে সেখানে মাতাপিতার ও শিক্ষকের পরীক্ষা হয়: তাদের অনুক্ষণ সতর্ক থাকিতে হয়।

৩৬

প্রায়শ্চিত্তে উপবাস

বালকবালিকাদের ঠিক ঠিক লালনপালন করা, লেখাপড়া শেখানো যে কী কঠিন কাজ সেই অনুভব দিন দিন বাড়িতেছিল। শিক্ষক ও অভিভাবক হিসাবে তাদের হৃদয়ে আমার প্রবেশ করিতে হইত, তাদের সুখ-দুঃখের ভাগী হইতে হইত, তাদের নানা সমস্যার সমাধান করিতে হইত ও উছলিয়া-পড়া তাদের যৌবনতরঙ্গকে ঠিক পথে পরিচালনা করিতে হইত।

জেল হইতে কিছু সত্যাগ্রহী মুক্ত হইলে টলস্টয় আশ্রমে লোক খুবই কম ছিল। অবশিষ্টদের প্রায় সকলেই ফিনিক্সে ছিল। অতএব আশ্রম ফিনিক্সে লইয়া যাই। সেখানে আমার অগ্নিপরীক্ষা হয়।

ওই সময়ে আমি কখনও থাকিতাম জোহানিসবর্গে আর কখনও ফিনিক্সে। আশ্রম হইতে খবর আসিল যে দুই জনের ভীষণ পতন হইয়াছে। আমি তখন জোহানিসবর্গে। সত্যাগ্রহের মহান্ সংগ্রামে হার হইয়াছে এরূপ খবর আসিলেও আমি এতটা চমকাইতাম না; এই খবরে আমার মাথায় যেন আকাশ ভাঙিয়া পড়িল। সেই দিনই ট্রেনে ফিনিক্স রওনা হইলাম। আমার মনের অবস্থা মি· কেলেনবেক লক্ষ্য করিয়াছিলেন। আমাকে তিনি একলা ছাড়িতে ভরসা পাইলেন না; আমার সঙ্গী হইলেন। ফিনিক্স হইতে তিনিই খবর লইয়া আসিয়াছিলেন।

আমার কর্তব্য যে কি তা রাস্তায় আমি দেখিতে পাই অথবা এ কথা বলাই ঠিক হইবে যে দেখিতে পাইয়াছি বলিয়া মনে হইয়াছিল। আমার মনে হইল যে আশ্রিতের বা পোষ্যের পতনের জন্য তার অভিভাবক বা শিক্ষক অল্পবিস্তর দায়ী। এই ঘটনায় আমার দায়িত্ব আমি দিনের আলোর মত দেখিতে পাইলাম। আমার সহধর্মিণী আগেই আমাকে সতর্ক করিয়া দিয়াছিল। কিন্তু বিশ্বাস আমার সহজ বৃত্তি বলিয়া তাঁর কথায় আমি আমল দিই নাই। মনে হইল এই পতনের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিলে আমার বেদনা পতিতেরা বুঝিতে পারিবে এবং কত বড় অন্যায় যে তারা করিয়াছে সেই বোধও তাদের হইবে। অতএব সাতদিন উপবাস করার ও সাড়ে চার মাস একাহারে থাকার ব্রত লইলাম। মি· কেলেনবেক আমাকে নিরস্ত করার চেষ্টা করেন। কিন্তু আমি শুনিলাম না। পরে তিনি প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজনীয়তা বুঝিতে

পারেন এবং ব্রত পালনে আমার সঙ্গী হওয়ার জন্য ব্যাকুল হন। তাঁর নির্মল ভালবাসার দাবি উপেক্ষা করার উপায় আমার ছিল না।

সংকল্পে মনের ভার হাল্কা হইল। ওদের ওপর যে ক্রোধ হইয়াছিল তা শান্ত হইল, কৃপা ক্রোধের স্থান লইল। এই ভাবে ট্রেনেই মন হাল্কা করিয়া ফিনিক্সে পৌঁছিলাম। যা জানার ছিল খোঁজখবর করিয়া জানিয়া লইলাম।

আমার উপবাসে সকলের কষ্ট হয় বটে কিন্তু আশ্রমের আবহাওয়া তার ফলে শুদ্ধ হইয়া যায়। পাপ করা যে ভয়ানক বস্তু এ কথা সকলে বুঝিতে পায় এবং ছাত্রছাত্রী ও আমার সম্পর্ক আরও বেশি সহজ সরল ও মধুর হয়।

এই ঘটনারই জের হিসাবে কিছু দিন পরে আমার চৌদ্দ দিনের উপবাস করিতে হইয়াছিল। আমার বিশ্বাস, তার ফল আশার অতিরিক্ত ভাল হইয়াছিল।

এই ঘটনা হইতে ইহা আমি প্রমাণ করিতে চাই না যে ছাত্র দোষ করিলেই শিক্ষকের উপবাস করিতে হইবে। তবে আমার বিশ্বাস এই যে, অবস্থা বিশেষে উপবাসের মত কঠোর পথ প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ আশ্রয় করা যাইতে পারে। কিন্তু তার জন্য দুই বস্তু আবশ্যক—বাছবিচার ও অধিকার। যেখানে গুরুশিষ্যের সম্পর্ক পবিত্র ভালবাসার সম্পর্ক নয়, যেখানে শিষ্যের দোষে গুরুর অন্তর ডুকরাইয়া না কাঁদে, যেখানে গুরুর প্রতি শিষ্যের ভক্তি নাই, সেখানে উপবাস ব্যর্থই নয়, হানিকরও বটে। এইরূপ উপবাস বা একাহারের কথায় তর্ক উঠিতে পারে; কিন্তু গুরু যে শিষ্যের দোষের জন্য কমবেশি দায়ী এই কথায় তর্কের স্থান নাই।

প্রথম উপবাসে আমাদের দুই জনের কাহারও কোন কষ্ট হয় নাই। সেবারে আমার কোন কাজ বাদ যায় নাই, গতিও কাজের মন্দ হয় নাই। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে ওই তপশ্চর্যার সময়ে আমি নিষ্ঠাবান ফলাহারী ছিলাম। দ্বিতীয় বা চৌদ্দ দিনের উপবাসের শেষের দিকে আমার রীতিমত কষ্ট হইয়াছিল। রামনামের মহিমা তখন আমার সঠিক জানা ছিল না, আর তাই ঠিক সেই অনুপাতেই কষ্ট সহ্য করার শক্তি আমার কম ছিল। যতই বিস্বাদ লাগুক, যতই বমির ভাব হোক, উপবাসকালে যে প্রচুর জল খাইতে হয় উপবাসের এই কলাও আমার জানা ছিল না। তার জন্যও উপবাস কষ্টের হইয়াছিল। আর একটা কারণও ছিল: প্রথম উপবাস

বিনা কষ্টে ও শান্তিতে শেষ হইয়াছিল বলিয়া চৌদ্দ দিনের উপবাসকালে তেমনটা সাবধানও ছিলাম না। প্রথম উপবাসের সময় প্রত্যহ কুনে পদ্ধতিতে কটিস্নান করিতাম। দ্বিতীয় উপবাসের সময়ে দুইতিন দিন কটিস্নান করার পরে তা বন্ধ করিয়া দিই। জল বিস্বাদ লাগিত ও খাইলে বমির ভাব হইত বলিয়া জল খুব কম খাইতাম। তার কারণ গলা এতটা শুকাইয়া গিয়াছিল ও ক্ষীণ হইয়াছিল যে কথা ফিসফিস করিয়া মাত্র বাহির হইত। তা হইলেও প্রয়োজনীয় লেখার কাজ শেষ দিন তক ঠিক ঠিক করিয়াছিলাম। আর রামায়ণাদিও শেষ দিন পর্যন্ত শুনিয়াছিলাম। কোন বিষয়ে মত দেওয়া আবশ্যক হইলে মতও দিতে পারিতাম।

৩৭

গোখেল সাক্ষাৎকার

দক্ষিণ আফ্রিকার অনেক কথা এখন আমি ছাড়িয়া যাইতেছি। দক্ষিণ আফ্রিকার সত্যাগ্রহের অন্তে (১৯১৪) গোখেলের নির্দেশমত লণ্ডনের পথে আমি দেশে রওনা হই। সেটা জুলাই মাস ছিল। আমার সঙ্গে কস্তুরবা ও মি. কেলেনবেক ছিলেন।

সত্যাগ্রহ লড়াইয়ের সময়ে আমি তৃতীয় শ্রেণীতে চলাফেরা করিতে শুরু করিয়াছিলাম। তাই স্টীমারেও আমি তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী ছিলাম। কিন্তু ওই লাইনের স্টীমারের তৃতীয় শ্রেণীতে ও আমাদের উপকূলবর্তী স্টীমারের তথা আমাদের ট্রেনের তৃতীয় শ্রেণীতে ব্যবধান অনেক। আমাদের ওখানকার লাইনে শোয়াবসার জায়গা মেলা ভার; পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কথা না তোলাই ভাল। পক্ষান্তরে লণ্ডন যাত্রায় জায়গার অভাব ছিল না, আর সব কিছু ছিল তকতকে পরিষ্কার। কোম্পানী আমাদের জন্য বিশেষ সুবিধা করিয়া দিয়াছিল: অন্য যাত্রীরা অসুবিধা না করে তার জন্য আমাদের জন্য পৃথক্ এক পায়খানার ব্যবস্থা ছিল। তাতে তালা লাগাইয়া চাবী আমাদের দিয়াছিল। আমরা ফলাহারী বলিয়া খাজাঞ্চীর ওপর আমাদিগকে ফল ও বাদাম ইত্যাদি দেওয়ার নির্দেশ ছিল। তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের সাধারণত ফল দেওয়া হয় না, বাদাম ইত্যাদি শুকনা ফল ত নয়ই। এই সব সুবিধার কারণ আমাদের আঠার দিনের সমুদ্রযাত্রা আরামে কাটিয়াছিল।

এই ভ্রমণের কোন কোন কথা উল্লেখ করার যোগ্য। মি. কেলেনবেকের দূরবীনের অতিশয় শখ ছিল। একটি কি দুইটি দামী দূরবীন তাঁর সঙ্গে ছিল। দূরবীনের কথায় আমাদের মধ্যে প্রত্যহ তর্ক হইত। আমি তাঁকে বুঝাইতে চেষ্টা করিতাম যে আমরা যে সাদাসিধা আদর্শ জীবন যাপন করিতে চাই তার সহিত এইরূপ বিত্তের সঙ্গতি নাই। একদিন কথা-কাটাকাটিটা একটু তিতো হয়। সেই সময়টায় আমরা আমাদের কেবিনের আলো-বাতাসের ফোকরের (পোর্টহোল) কাছে দাঁড়ানো ছিলাম।

বলিলাম, 'এ নিয়ে তকরার না করে দূরবীনটা সমুদ্রে ফেলে দিলেই ত ল্যাঠা চুকে যায়।'

মি. কেলেনবেক বলিলেন, 'ঠিক বলেছেন, ও আপদ ফেলে দিন।'

'তবে ফেলছি।'

মি. কেলেনবেক সঙ্গে সঙ্গে বলিলেন, 'ফেলুন।'

দূরবীন ফেলিয়া দিলাম। উহা সাত পাউণ্ড দামের ছিল। কিন্তু উহার মূল্য দামে ততটা ছিল না যতটা ছিল উহার প্রতি মি. কেলেনবেকের টানে। কিন্তু উহার জন্য মি. কেলেনবেক কোন দিনও আক্ষেপ করেন নাই।

আমাদের মধ্যে এমন ব্যাপার অনেক ঘটিয়াছিল। উদাহরণ স্বরূপ একটা উল্লেখ করা গেল।

সত্যের পথে চলার আন্তরিক চেষ্টা করিতাম বলিয়া এভাবে আমরা নিত্য নূতন জিনিস শিখিতে পাইতাম। সত্যের পথ আশ্রয় করিলে ক্রোধ, স্বার্থ, দ্বেষ ইত্যাদি আপনা হইতেই শান্ত হইয়া আসে কেন না শমযম বিনা সত্য লাভ হয় না। অন্তরে যার রাগ ও দ্বেষের গরল, সরল ও সত্যবাদী হইলেও সে সত্যের দর্শন পায় না। সুখ-দুঃখ, রাগ-দ্বেষ ইত্যাদি দ্বন্দ্বের অতীত না হইলে সত্যের সাধনায় সিদ্ধিলাভ হয় না।

উপবাস সাঙ্গ হওয়ার পরে বেশি দিন যাইতে না যাইতে, আগের শক্তি ফিরিয়া না পাইতে পাইতে আমাদের যাত্রা শুরু হয়। ক্ষুধা বাড়াইবার ও হজমের সহায়তার জন্য আমি জাহাজের ডেকে পায়চারি করিতাম। কিন্তু অতটুকু হাঁটাতেই আমার পায়ের কবজিতে ব্যথা হয়। বিলাতে পৌঁছিলাম। দেখিলাম ব্যথা ত কমে নাইই বাড়িয়া গিয়াছে। ডা. জীবরাজ মেহতার সঙ্গে সেখানে আমার পরিচয় হয়। উপবাস ও ব্যথার ইতিহাস তাঁকে

বলি। তিনি বলেন, 'কিছু দিন পুরা বিশ্রাম দরকার। নয়ত বরাবরের মত খোঁড়া হয়ে যাওয়ার ভয় রয়েছে।'

তখন আমি বুঝিতে পাই যে উপবাসের পরে সাত-তাড়াতাড়ি বল ফিরিয়া পাওয়ার চেষ্টা করিতে নাই, বেশি খাওয়ার লোভ করিতে নাই: উপবাস করার সময় অপেক্ষা উপবাস ভাঙ্গার সময়ে অধিক সতর্ক এবং বুঝিবা অধিক সংযমী হইতে হয়।

যুদ্ধ যে কোন দিন বাধিতে পারে এ কথা আমরা মদীরা (Madeira)-য় শুনিতে পাই। ইংলিশ চ্যানেলে জাহাজ যখন পৌঁছিল খবর পাইলাম লড়াই শুরু হইয়া গিয়াছে। জাহাজ কিছু সময় আটক থাকিল। চ্যানেলের যেখানে-সেখানে বিস্ফোরক পোঁতা হইয়াছিল। তার মধ্য দিয়া জাহাজ লইয়া যাওয়া শক্ত কাজ ছিল। তাই জাহাজ দুই এক দিন দেরীতে সাউথেম্পটনে পৌঁছে।

যুদ্ধ বাধিয়াছিল ৪ঠা অগস্ট। আমরা লণ্ডনে পৌঁছিয়াছিলাম ৬ই অগস্ট।

৩৮

যুদ্ধে যোগ

লণ্ডনে গিয়া জানিতে পাইলাম যে, গোখেল শরীর শোধরাইবার জন্য প্যারিসে যাইয়া আটকিয়া পড়িয়াছেন, প্যারিসের সহিত লণ্ডনের যোগাযোগ ছিন্ন হইয়াছে আর তিনি যে কবে ফিরিবেন তার কোন ঠিকঠিকানা নাই। তাঁর সহিত দেখা না করিয়া দেশে রওনা হইতে পারিতেছিলাম না।

এই সময়ে কি করি? যুদ্ধে আমার কর্তব্য কি? এই সব প্রশ্ন মনে উঁকিঝুঁকি মারিতেছিল। আমার জেলের সাথী সোরাবজী আতাজনিয়া তখন বিলাতে ব্যারিস্টারি পড়িতেছিলেন। বাছা সত্যাগ্রহীদের তিনি একজন ছিলেন। ব্যারিস্টার হইলে দক্ষিণ আফ্রিকায় তিনি আমার স্থান লইতে পারিবেন এই ভাবনা হইতে তাঁকে ব্যারিস্টারি পড়ার জন্য বিলাতে পাঠানো হইয়াছিল। ডাক্তার প্রাণজীবন মেহতা তাঁর খরচ দিতেন। তাঁর মারফতে ডাক্তার জীবরাজ মেহতা ও অন্য যাঁরা তখন বিলাতে পড়িতেন তাঁদের সহিত

যোগাযোগ করি ও আমার কথা বলি। আলোচনায় বিলাত ও আয়রলণ্ড প্রবাসী ভারতীয়দের সভা ডাকা স্থির হয়। আমার মনের কথা ওই সভায় আমি বলি।

বলিয়াছিলাম: বিলাতপ্রবাসী ভারতীয়দের যুদ্ধে কিছু করা দরকার। ইংরেজ ছাত্রেরা সেনাদলে ভরতি হইতেছে। এই অবস্থায় ভারতীয়দের পিছাইয়া থাকা চলে না। আমার প্রস্তাবের বিরুদ্ধে এই সব যুক্তি উপস্থিত করা হইয়াছিল: আমাদের ও ইংরেজদের অবস্থায় আকাশ-পাতাল তফাত, আমরা গোলাম, তারা প্রভু। গোলাম প্রভুর যুদ্ধে স্বেচ্ছায় কিরূপে যোগ দিতে পারে? গোলামি হইতে যারা বাঁচিতে চায় তারা প্রভুর দুর্যোগের সুযোগ লইয়া গোলামির অন্ত করিবে না কেন! কিন্তু তখন ওই কথা আমার ভাল লাগে নাই। লাগিবেই বা কেন! দুইয়ের অবস্থায় যে ব্যবধান ছিল তা বুঝিতাম। তবে আমি মনে করিতাম না যে ইংরেজ আমাদের একেবারে গোলাম করিয়া রাখিয়াছে। ইংরেজ শাসনপদ্ধতি যত-না দোষী তার চাইতে ইংরেজ আমলারা ব্যক্তিগতভাবে বেশি দোষী আর এই দোষ প্রেম দিয়া দূর করা যায় এই ছিল তখন আমার দৃষ্টি। এ কথাও মনে করিতাম যে ইংরেজের মারফতে ও সহায়তায় যদি আমাদের অবস্থা আমরা ভাল করিতে চাই তবে তাদের বিপদে সাহায্য করিয়া সেই সহায়তা আমাদের পাইতে হইবে। শাসনপদ্ধতি মন্দ ত ছিলই, তবে এখন তাহা যেমন আমার কাছে অসহ্য লাগে তখন তেমন অসহ্য মনে হইত না। আজ ইংরেজের পদ্ধতির ওপর বিশ্বাস হারাইয়া আমি ইংরেজ রাজের সহিত সহযোগিতা বন্ধ করিয়াছি, তদ্রূপ সেই কালেই ওই বন্ধুরা ইংরেজ পদ্ধতি ও ইংরেজ আমলাদের ওপর আস্থা হারাইয়াছিলেন। তাই তাঁদের পক্ষে সহায়তা করা সম্ভব ছিল না।

তাঁরা মনে করিলেন যে ওটাই ছিল নির্ভয়ে ভারতের দাবি উপস্থিত করার ও নিজেদের অবস্থা ফিরাইয়া লওয়ার উত্তম সুযোগ। ইংরেজের বিপদকে আমাদের সুযোগ করা উচিত নয়, বরং যুদ্ধকালে আমাদের দাবি উপস্থিত না করাই আমার কাছে শোভন ও দূরদৃষ্টিতে লাভদায়ক মনে হইয়াছিল। অতএব প্রস্তাবে আমি অটল থাকি ও যাঁরা স্বেচ্ছাসেবক হইতে রাজী ছিলেন তাঁদের নাম দিতে বলি। বেশ ভাল সংখ্যায় নাম পাওয়া যায়—প্রায় সকল প্রদেশের ও সকল ধর্মের লোকের।

আমাদের ইচ্ছা জানাইয়া লর্ড ক্রু-কে পত্র দিলাম। পত্রে এ কথাও বলিয়াছিলাম যে প্রয়োজন হইলে এম্বুলেন্স কর্মের শিক্ষা গ্রহণ করিতে আমরা তৈরি আছি। কিছু ইতস্তত করিয়া লর্ড ক্রু আমাদের প্রস্তাবে রাজী হন এবং সাম্রাজ্যের ওই বিপদের সময়ে সেবা দিতে প্রস্তুত হইয়াছি বলিয়া আমাদের ধন্যবাদ জানান।

প্রসিদ্ধ ডাক্তার কেন্টলীর অধীনে সেবা-শুশ্রূষার প্রাথমিক শিক্ষা আমাদের আরম্ভ হয়। ছয় সপ্তাহের ছোট শিক্ষাক্রম ছিল। ওই সময় মধ্যে সেবা-শুশ্রূষার সকল কাজের জ্ঞান আমরা লাভ করিয়াছিলাম। ক্লাসে আমরা প্রায় আশি জন ছিলাম। ছয় সপ্তাহ পরে পরীক্ষা হয়। একজন ছাড়া সকলে পাস হয়। এদের সামরিক কুচ-কাওয়াজের ব্যবস্থা সরকারেব তরফ হইতে করা হয়। কর্নেল বেকারের ওপর এই দায়িত্ব পড়ে।

লণ্ডনের সে এক রূপ। ভয়ের লেশও কোথাও নাই। সাধ্যমত সাহায্য করিতে সকলে ব্যগ্র। সক্ষম লোকেরা কুচ-কাওয়াজে নিযুক্ত। করিতে চাহিলে অশক্ত, বৃদ্ধ ও স্ত্রীলোকদেরও কাজের অভাব ছিল না। যুদ্ধে জখম সেনাদের জন্য জামাকাপড় কাটিতে, সেলাই করিতে ও ব্যাণ্ডেজ বানাইতে তারা লাগিয়া গিয়াছিল। নারীদের ক্লাব 'লাইসিয়ম' সৈনিকদের পোশাক তৈরি করিয়া দেওয়ার কাজে নিজের সকল শক্তি নিয়োগ করিয়াছিল। শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু এই ক্লাবের সভ্য ছিলেন। এই কাজে তিনি অন্তর ঢালিয়া দিয়াছিলেন। এই সূত্রে তাঁর সহিত আমার পরিচয় হয়। মাপ-মত-কাটা কাপড়ের স্তূপ আমার সামনে রাখিয়া বলিয়াছিলেন যতটা পারেন সেলাই করাইয়া দিবেন।

তাঁর আজ্ঞা সানন্দে মানিয়া লইয়াছিলাম। সেবা-শুশ্রূষার তালিমের অবকাশে যতটা পারা গিয়াছিল সেলাই করাইয়া ফেরত দিয়াছিলাম।

৩৯

এক ধর্মসমস্যা

যুদ্ধে কাজ করার জন্য আমরা কিছু লোক একত্র হইয়া সরকারের কাছে আমাদের নাম পাঠাইয়াছি এই খবর দক্ষিণ আফ্রিকায় পৌঁছিলে সেখান হইতে সঙ্গে সঙ্গে আমার কাছে দুইটি তার আসে। উহার একটা ছিল

পোলকের। তিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 'আপনার এই কার্যটা আপনার অহিংসা ধর্মের উল্টা কাজ নয় কি?'

একরূপ জানাই ছিল এরূপ তার আসিবে কারণ এই বিষয়ে 'হিন্দ স্বরাজ'-এ আমি আলোচনা করিয়াছি এবং দক্ষিণ আফ্রিকার বন্ধুদের সহিতও যখন-তখন আলোচনা করিতাম। যুদ্ধের অনীতির কথায় আমরা সকলেই একমত ছিলাম। আমার নিম-খুনকারীর বিরুদ্ধেই যখন আমি মামলা রুজু করিতে দেই নাই তখন যুদ্ধে আমার আদৌ যোগ দেওয়া চলে কি? বিশেষ, সেই যুদ্ধে যে যুদ্ধের কোন্ পক্ষ যে দোষী তা জানা নাই? বোঅর যুদ্ধে আমি যোগ দিয়াছিলাম তা বন্ধুরা জানিতেন কিন্তু তাঁরা ধরিয়া লইয়াছিলেন যে তার পরে আমি আমার মত বদলাইয়াছি।

আসলে জিনিসটা ছিল এই: যে বিচারপ্রভাবে বোঅর যুদ্ধে যোগ দিয়াছিলাম সেই বিচারের প্রেরণায়ই এই যুদ্ধে যোগ দিয়াছিলাম। যুদ্ধে যোগ দিব আর অহিংসাও পালন করিব এই দুই যে এক সঙ্গে চলিতে পারে না তা আমি স্পষ্ট জানিতাম। কিন্তু কর্তব্য যে কি তা সব সময় ঠিক ঠিক বুঝা যায় না। সত্যের পূজারীর অনেক সময় হোঁচট খাইতে হয়।

অহিংসা ব্যাপক বস্তু। আমরা হিংসার আগুনে ঘেরা অসহায় জীব। 'জীব খেয়ে জীব বাঁচে' এই বাক্য মিথ্যা নয়। বাহ্য হিংসা না করিয়া মানুষের ক্ষণকালও বাঁচার উপায় নাই। আহারে পানে উঠিতে বসিতে সর্ব ক্রিয়ায় ইচ্ছায় অনিচ্ছায় কিছু না কিছু হিংসা মানুষ করেই। যে মানুষ অনুকম্পা বশে সর্ব কর্ম করে, ক্ষুদ্র হইতেও ক্ষুদ্র জীবকে পর্যন্ত হনন না করিয়া উল্টা বাঁচাইতে চাহে এবং এইভাবে হিংসার বেড়াজাল হইতে মুক্ত হওয়ার মহান্ প্রযত্ন করে, সে সত্যই অহিংসার পূজারী। এরূপ মানুষের নানা বৃত্তি দিন দিন অধিক সংযমমুখী হয় এবং তার অনুকম্পা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। তাহা হইলেও দেহধারীর পক্ষে বাহ্য হিংসা হইতে পুরাপুরি বাঁচার উপায় নাই।

তা ছাড়া, অদ্বৈত ভাবনা অহিংসার ভিত্তি বলিয়া একের পাপ অন্য সবেতেও বর্তে, আর তাই কোন মানুষই হিংসার ছোঁয়াচ হইতে পুরাপুরি বাঁচিতে পারে না। সমাজে থাকিলে সমাজের হিংসার ভাগী ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক হইতেই হয়। দুই দেশে যুদ্ধ বাধিলে অহিংসায় বিশ্বাসী মানুষের ধর্ম যুদ্ধ আটকানো। এই ধর্ম পালন করা যার পক্ষে সম্ভব নয়, বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার শক্তি যার নাই, বিরোধ করার অধিকার যার নাই, সে

যুদ্ধে যোগ দিবে এবং যোগ দেওয়া সত্ত্বেও নিজকে, দেশকে ও দুনিয়াকে যুদ্ধ হইতে বাঁচাইবার আন্তরিক চেষ্টা করিবে।

ইংরেজ সাম্রাজ্যের সহায়তায় নিজের অর্থাৎ ভারতবাসীর অবস্থা ফিরাইয়া লইব, এই ছিল আমার ভাব। ইংলণ্ডে ছিলাম; ব্রিটিশ নৌবহরের ছায়াতলে সুরক্ষিত ছিলাম। সেই বলের সুবিধা লইতেছিলাম মানে তাতে বিদ্যমান হিংসার সাক্ষাৎ ভাগীদার হইতেছিলাম। অতএব সাম্রাজ্যের সহিত সম্পর্ক রাখিতে ও উহার পতাকাতলে থাকিতে হইলে এই তিন পথের যে কোন্ একটি আমার আশ্রয় করার ছিল: যুদ্ধের খোলাখুলি বিরোধ করিয়া সাম্রাজ্য যতদিন যুদ্ধের পথ না ছাড়ে ততদিন সত্যাগ্রহের নীতি অবলম্বনে উহাকে বয়কট করা, অথবা অমান্য করা চলে এরূপ আইন অমান্য করিয়া জেলে যাওয়া, অথবা সাম্রাজ্যের যুদ্ধে শরিক হইয়া হিংসার সম্মুখীন হওয়ার শক্তি ও যোগ্যতা অর্জন করা। এই শক্তি ও যোগ্যতা আমার ছিল না, তাই আমার মনে হইল যুদ্ধে যোগ দেওয়া ছাড়া আমার পথ নাই।

হাতিয়ার হাতে যারা লড়ে আর সেই লড়িয়েদের যারা সাহায্য করে অহিংসার দৃষ্টিতে এই দুইয়ের মধ্যে আমি ব্যবধান দেখি না। যে মানুষ লুটেরাদের কাজ করে—তাদের বোঝা বয়, লুটের সময়ে তাদের পাহারার কাজ করে, জখম হইলে তাদের সেবা করে, লুটের অপরাধে সে মানুষ লুটেরাদের সমানই দোষী। তদ্রূপ, যুদ্ধে আহত সৈনিকদের যারা সেবা-শুশ্রূষা করে, হইলই বা সেবা, যুদ্ধের দোষ হইতে তা মুক্ত নহে।

পোলকের তার পাওয়ার পূর্বেই বিষয়টা এভাবে আমি চিন্তা করিয়া দেখিয়াছিলাম। তার পাওয়ার পরে জন কয়েক বন্ধুর সহিত আমার প্রশ্নটা আলোচনা করি এবং কর্তব্যবোধে যুদ্ধে সহায়তা করার সিদ্ধান্ত করি। আজও আমার মনে হয় না আমার ওই যুক্তিতে কোনও ভুল ছিল। আর তাই ব্রিটিশ সাম্রাজ্য সম্পর্কে আমার তখনকার ধারণা মত যে কাজ করিয়াছিলাম তার জন্য আমার কোন অনুতাপ নাই।

আমার ওই কাজ যে ঠিকই হইয়াছিল এ কথা তখনও যে আমি আমার সকল বন্ধুদের বুঝাইতে পারি নাই সে কথা আমি জানি। প্রশ্নটা সূক্ষ্ম। মতভেদের অবকাশ এখানে আছে। এই জন্যই অহিংসায় বিশ্বাসী ও জীবনের সকল ক্ষেত্রে এই ধর্ম পালনে প্রযত্নকারী ব্যক্তিদের কাছে আমার কথা সাধ্যমত স্পষ্ট করিয়া ধরিলাম। পূর্বাপরের খাতিরে সত্যের পূজারীর

কিছু করিতে নাই। আমার বিচারই ঠিক এই ভাব হইতে কোন কিছু তার আঁকড়াইয়া থাকা চলে না ; আমারও ভুল হইতে পারে সতত এই ভাব তার থাকা চাই, আর যদি দেখা যায় যে ভুল হইয়াছে তবে যে কোন বিপদ উপেক্ষা করিয়া তা স্বীকার করা ও তার প্রায়শ্চিত্ত করা তার কর্তব্য।

৪০

খুদে সত্যাগ্রহ

কর্তব্যজ্ঞানে এভাবে যুদ্ধে শরিক হইয়াছিলাম। কিন্তু সাক্ষাৎ কর্ম করা আমার কপালে ছিল না। তাহাই নয়, অমন বিপদের দিনেও ছোটখাট সত্যাগ্রহ পর্যন্ত করিতে হইয়াছিল।

আমাদের নাম মঞ্জুর ও তালিকাভুক্ত হইলে আমাদের পুরাদস্তুর কুচ-কাওয়াজ শেখানোর জন্য এক ফৌজী অফিসার নিযুক্ত হইয়াছিলেন, সে কথা পূর্বে বলিয়াছি। আমাদের সকলের ধারণা ছিল যে ট্রেনিং সংক্রান্ত ব্যাপারে মাত্র তিনি আমাদের প্রধান, অন্য সব ব্যাপারে আমি প্রধান : ‘আভ্যন্তরীণ নিয়ম-শৃঙ্খলার জন্য দল আমার কাছে দায়ী অর্থাৎ অধিনায়ক আমার মারফত তাদের সহিত লেনদেন করিবেন। কিন্তু ওই অফিসারের স্বরূপ প্রথম দিনেই বুঝা গিয়াছিল।

সোরাবজী আতাজনিয়া চৌকস লোক ছিলেন। তিনি আমায় সতর্ক করিয়া দেন। বলেন, ‘ভাই, সাবধান। মনে হয় এই লোকটি আমাদের ওপর মুরুব্বিয়ানা করতে চায়। তাঁর কর্তৃত্ব আমাদের ওপর চলবে না। শিক্ষক বলে তাঁকে মানতে তৈরি। কিন্তু ওই যে ছোকরাদের তিনি আমাদের কুচ-কাওয়াজ শেখাবার কাজে লাগিয়েছেন তারাও মনে করে তারা আমাদের মনিব।’

অক্সফর্ডের ছাত্র এই সব যুবকরা আমাদের অধিনায়ক কর্তৃক শিক্ষক ও উপনায়ক রূপে নিযুক্ত হইয়াছিল। অধিনায়কের মুরুব্বিয়ানা আমিও লক্ষ্য করিয়াছিলাম। সান্ত্বনা দিয়া সোরাবজীকে আমি নিশ্চিন্ত থাকিতে বলিলাম। কিন্তু সহজে নিরস্ত হইবার পাত্র তিনি ছিলেন না।

তিনি বলেন, ‘আপনি ভোলানাথ। এরা মিঠে কথায় আপনাকে ঠকাবে, আর যখন আপনার চোখ খুলবে তখন আমাদের ডেকে বলবেন—

চল সত্যাগ্রহ করিগে। ফলে আপনারও দুর্ভোগ হবে আর সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও।'

উত্তরে আমি বলিলাম, 'আমার সাথে জুটে দুর্ভোগ ছাড়া আর কিছু কোনও দিন আপনাদের মিলেছে কি? আর সত্যাগ্রহীদের জন্ম কি ঠকার জন্যই নয়? অতএব অধিনায়ক ঠকায় ত ঠকাক। ভাল, হাজারো বার কি আপনাদের আমি বলিনি যে, যে লোক ঠকায় অন্তে নিজেই সে ঠকে?'

সোরাবজী হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন ও বলিলেন, 'বেশ, তবে ঠকতে থাকুন। কোন দিন সত্যাগ্রহে মরবেন, আর অভাগা আমাদেরও সঙ্গে টানবেন।'

এই কথায় অসহযোগ প্রসঙ্গে স্বর্গীয়া মিস এমিলি হবহাউস আমাকে যা লিখিয়াছিলেন সে কথা মনে পড়িতেছে: 'সত্যের জন্য এক দিন আপনাকে ফাঁসি যেতে হয় ত আমি আশ্চর্য হব না। ঈশ্বর আপনাকে ঠিক পথে নিন ও রক্ষা করুন।'

অফিসারের নিযুক্ত হওয়ার ঠিক পরেই সোরাবজীর সহিত আমার এই কথা হইয়াছিল। দিন কয়েক যাইতে না যাইতে অফিসারের সহিত ছাড়াছাড়ির উপক্রম হইল। চৌদ্দ দিনের উপবাসের ধাক্কাটা তখনও আমি ঠিক সামলাইয়া উঠিতে পারি নাই। আমাদের কুচ-কাওয়াজ আরম্ভ হইল। আমার থাকার স্থান হইতে কুচ-কাওয়াজের ছাউনি ছিল মাইল দুই। এই পথটা প্রায়ই আমি হাঁটিয়া যাইতাম। ফলে প্লুরিসী (ফুসফুসের প্রদাহ) হইল। বিছানা লইলাম। এই অবস্থায় শনিবারের অর্ধেক দিন আমায় ক্যাম্পে কাটাইতে হইত। অন্যেরা ওখানেই থাকিত। আমি ঘরে ফিরিয়া আসিতাম। এখানে সত্যাগ্রহের প্রসঙ্গ উপস্থিত হয়।

অধিনায়ক নিজের কর্তৃত্বটা একটু বেশি চালাইতে থাকেন। তিনি সাফ বলিয়া দেন যে কি সামরিক কি অসামরিক সব বিষয়েই তিনি আমাদের মুখ্য। আর তাঁর ক্ষমতার সাক্ষাৎ আঁচও আমরা পাই। সোরাবজী হন্তদন্ত হইয়া আমার কাছে আসেন। অধিনায়কের বাড়াবাড়ি সহ্য করিতে তিনি মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি বলেন, 'সব হুকুম আপনার মারফতে চাই। এখনও আমরা কুচ-কাওয়াজের ছাউনিতে, তাতেই অদ্ভুত অদ্ভুত হুকুম জারি হচ্ছে। আমাদের ও ওই সব ইন্স্ট্রাক্টর-করে-আনা ছোকরাদের

মধ্যে আপত্তিকর ব্যবধান করা হচ্ছে। এভাবে বেশি দিন চলতে দেওয়া যায় না। অফিসারের সঙ্গে বোঝাপড়া করে নিতে হয়। নয়ত এখানেই ইতি। ভারতীয় ছাত্র ও অন্য যে সব লোক এই দলে যোগ দিয়েছে তারা এই সব খামখেয়াল হুকুম সইবে কেন। প্রতিষ্ঠা বাড়াবার জন্য যে কাজে লেগেছি তাতে যদি আত্মসম্মানই খোয়া যায় ত সে কি রকম?'

অধিনায়কের কাছে যাই। যে সব নালিশ পাইয়াছিলাম তাঁকে জানাই। পত্রে তিনি আমাকে জানান যে, অভিযোগ লিখিতভাবে করিতে হইবে এবং অভিযোগকারীদের বলিতে হইবে যে অভিযোগ নায়েব-নায়কদের (সেকসন কম্যাণ্ডার) কাছে করিতে হইবে। তারা তা ইন্‌স্ট্রাক্টরদের হাতে অধিনায়কের সামনে পেশ করিবে।

জবাবে আমি জানাই যে ক্ষমতার লোভ আমার নাই। লস্করী দৃষ্টিতে আমি সাধারণ সিপাহী বই নই, তবুও দলের প্রধান বলিয়া আমাকে দলের বেসরকারী প্রতিনিধিরূপে স্বীকার করিয়া লওয়া কর্তৃপক্ষের উচিত। দলের মত না লইয়া নায়েব-নায়ক নিযুক্ত করাতে দলে অসন্তোষ দেখা দিয়াছে, তাই নায়েব-নায়ক সরানো হউক। আর অধিনায়কের অনুমোদনসাপেক্ষ তাদের নূতন নায়েব-নায়ক বাছিয়া লইতে দেওয়া হউক এই মর্মে যে অভিযোগ আমার কাছে আসিয়াছিল তাও অধিনায়ককে জানাই।

অধিনায়ক এই প্রস্তাব আমল দিলেন না। তিনি আমাকে বলেন যে দল তার উপ-নায়ক বাছিয়া লইবে ইহা লস্করী কানুনের বিরুদ্ধ-প্রস্তাব। আর যারা নিযুক্ত হইয়াছে তাদের সরানো হইলে নিয়মানুবর্তিতা বলিয়া কিছু থাকিবে না।

সভা করিলাম। সত্যাগ্রহ করা ঠিক হইল। সত্যাগ্রহের পরিণাম যে অতি ভয়ংকর হইতে পারে তা বুঝাইয়া বলিলাম। তাহা হইলেও প্রায় সকলে সত্যাগ্রহের কথায় সায় দিল। সভায় প্রস্তাব পাশ হইল—বর্তমান উপ-নায়কদের না সরাইলে ও দলকে নূতন উপ-নায়ক বাছিয়া লইতে না দিলে আমাদের দল কুচ-কাওয়াজে ও ক্যাম্পে যাওয়া বন্ধ করিবে।

আমার প্রস্তাব অগ্রাহ্য করাতে যে আমি অতিশয় অসন্তুষ্ট হইয়াছি অধিনায়ককে সে কথা জানাইলাম। আরও বলিলাম যে ক্ষমতা আমি চাই না, চাই সাধ্যমত সেবা করিতে। এ কথাও উল্লেখ করিয়াছিলাম যে বোঅর যুদ্ধে দক্ষিণ আফ্রিকার বাহক দলে আমি ক্ষমতার পদে না

থাকিলেও কর্নেল গেলওয়ে ও আমাদের দলের মধ্যে কখনও মন-কষাকষি হয় নাই এবং কর্নেল গেলওয়ে আমার কাছ হইতে দলের ইচ্ছা জানিয়া লইয়া সব কিছু করিতেন। পত্রের সঙ্গে প্রস্তাবের নকলও পাঠাইয়াছিলাম।

অধিনায়ক সবই অগ্রাহ্য করেন। তাঁর মনে হয়, সভা করিয়া প্রস্তাব পাস করিয়া আমাদের দল ফৌজী দৃষ্টিতে ঘোরতর অন্যায় কার্য করিয়াছে।

এর পরে সব কথা জানাইয়া আমি ভারতসচিবকে পত্র দিই। সঙ্গে প্রস্তাবের নকল পাঠাই। পত্রের উত্তরে আমাকে তিনি জানান যে, দক্ষিণ আফ্রিকার স্থিতি অন্যরকম ছিল, ইংলণ্ডে উপ-নায়ক নিয়োগের অধিকার অধিনায়কের। তাহা হইলেও উপ-নায়ক নিয়োগের প্রশ্নে ভবিষ্যতে অধিনায়ক আপনার সুপারিশ বিবেচনা করিবেন।

তারপর অনেক লেখালেখি চলে। কিন্তু সেই অপ্রিয় প্রসঙ্গের জের এখানে টানিয়া লাভ নাই। এ কথা বলিলেই জিনিসটা স্পষ্ট হইবে যে ওই অভিজ্ঞতা আমাদের ভারতের প্রতিদিনের অভিজ্ঞতারই অনুরূপ ছিল। কিছুটা ভয় দেখাইয়া ও কিছুটা কূট-কৌশলে অধিনায়ক আমাদের দলে ভাঙ্গন সৃষ্টি করেন। ছলবলের বশ হইয়া জন কয়েক প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে।

এই সময়ে নেটলী হাসপাতালে সহসা বহু আহত সৈনিক আসিয়া যায়। তাদের সেবা-শুশ্রূষার জন্য আমাদের গোটা দলের ডাক পড়ে। অধিনায়ক যাদের নিজের দিকে টানিতে পারিয়াছিল তারা নেটলী যায়। অন্যেরা গেল না। ইণ্ডিয়া আপিস দেখিল ব্যাপারটা সুবিধার নয়। আমি বিছানায় শোয়া ছিলাম কিন্তু দলের সহিত যোগাযোগ ছিল। উপ-ভারতসচিব মি. রবার্টস্ অনুগ্রহপূর্বক আমার কাছে আসেন। যারা নেটলী যায় নাই আমাকে তিনি তাদিগকে বুঝাইয়া সুঝাইয়া নেটলী পাঠাইতে বলেন। তিনি বলেন যে তারা পৃথক্ দলরূপে যাইবে। কেবল নেটলী হাসপাতালে তারা অধিনায়কের অধীনে কাজ করিবে, অতএব সম্মানহানির কোন প্রশ্ন ওঠে না। তারা গেলে সরকার সন্তুষ্ট হইবে আর যে বহু সংখ্যক আহত আসিয়াছে তাদের সেবা-শুশ্রূষা হইবে। এই প্রস্তাব আমার ও সঙ্গীদের কাছে সঙ্গত মনে হয়। অতএব পূর্বে যারা যায় নাই তারা নেটলী গেল।

কেবল আমি থাকিলাম দূরে, দাঁতে ঠোঁট কামড়াইয়া বিছানায় পড়িয়া।

৪২

গোখেলের উদারতা

ইংলণ্ডে আমার প্লুরিসী হইয়াছিল সে কথা আগে বলিয়াছি। সেই সময়ে গোখেল লণ্ডনে ফিরিয়া আসেন। আমরা (কেলেনবেক ও আমি) প্রায়ই তাঁর কাছে যাইতাম। যুদ্ধের কথাই বেশি হইত। জার্মানীর ভূগোল কেলেনবেকের নখদর্পণে ছিল। ইউরোপের নানা স্থানে তিনি ঘুরিয়াছিলেন। যুদ্ধের প্রধান প্রধান স্থানের নক্সা আঁকিয়া গোখেলকে তিনি অবস্থা বুঝাইতেন।

আমার প্লুরিসী হইলে তাহাও এক আলোচনার বিষয় হইয়া দাঁড়ায়। আহারের প্রয়োগ চলিতে ছিলই। তখন চীনাবাদাম, কাঁচা ও পাকা কলা, কমলালেবু, ওলিভ অয়েল, টমেটো, আঙ্গুর ইত্যাদি আমি খাইতাম। দুধ, ভাত, রুটি, ডাল ইত্যাদি মোটেই খাইতাম না।

ডাক্তার জীবরাজ মেহতা চিকিৎসা করিতেন। তিনি আমাকে বার বার দুধ ও ভাত খাইতে বলেন। কথাটা গোখেলের কানে পর্যন্ত পৌঁছে। ফলাহারের সম্বন্ধে আমি যা বলিতাম তার ওপর তাঁর তেমন আস্থা ছিল না। তিনি জোর দিয়া বলিলেন যে স্বাস্থ্যের কথায় ডাক্তারের ব্যবস্থা মানিয়া চলা আমার উচিত।

গোখেলের কথা উপেক্ষা করা আমার পক্ষে শক্ত ছিল। অত্যন্ত পীড়াপীড়ি করিলে কথাটা ভাবিয়া দেখার জন্য তাঁর কাছ হইতে চব্বিশ ঘণ্টা সময় চাহিয়া লই। এই অবস্থায় আমার কর্তব্য কি সে সম্বন্ধে বাসস্থানে ফিরিবার কালে কেলেনবেকের সহিত আলোচনা করি। আহারের প্রয়োগে তিনি আমার সহচর ছিলেন। পরীক্ষা তাঁর ভাল লাগিয়াছিল। তা হইলেও বুঝিতে পাইলাম যে শরীরের খাতিরে প্রয়োগে দাঁড়ি টানি ত অন্যায় হইবে না এই তাঁর মনোভাব। তাই আপন অন্তর-বাণীর শরণ লওয়া ছাড়া পথ ছিল না।

রাত্রি চিন্তায় কাটিল। সব প্রয়োগ যদি ছাড়িয়া দিই তবে এত কাল এই বিষয়ে যে মত পোষণ করিয়াছি তাহাই ত ত্যাগ করা হইবে—আমার এই চিন্তাধারায় আমি কোন খুঁত দেখিতে পাইলাম না। প্রশ্ন ছিল, গোখেলের ভালবাসার অনুরোধে নিজেকে কতটা নোয়ানো চলে আর স্বাস্থ্যের

প্রয়োজন যাকে বলা হয় তার জন্যই বা প্রয়োগে কতটা হেরফের করা যায়। অবশেষে ঠিক করিলাম, মুখ্যত ধর্মভাবনা হইতে যে সব প্রয়োগ আরম্ভ করিয়াছি তা ছাড়িব না আর যে সবের মূলে মিশ্র ভাবনা রহিয়াছে সেখানে ডাক্তারের কথামত চলিব। দুধ মুখ্যত ধর্মভাবনা হইতে ছাড়িয়াছিলাম —কলিকাতায় গো-মহিষের উপর যে নিষ্ঠুর ক্রিয়া চলে তা আমার চোখে ভাসিত। মাংসের মত পশুর দুধও মানুষের খাদ্য নয় এই ভাবও ছিল। তাই দুধ না ছাড়ার কথায় অটল থাকার সংকল্প করিয়া সকালে উঠিলাম। এই নিশ্চয়ে মনের ভাব হাল্কা হইয়া গেল। ভয় ছিল গোখেল জিনিসটা কিভাবে নিবেন। সঙ্গে এই বিশ্বাসও ছিল যে আমার সংকল্প তিনি তাচ্ছিল্য করিয়া উড়াইয়া দিবেন না।

কেলেনবেন ও আমি সন্ধ্যায় ন্যাশনাল ক্লাবে গোখেলের কাছে যাই। দেখিতেই জিজ্ঞাসা করেন, 'ডাক্তারের ব্যবস্থা মেনে চলবেন ঠিক করেছেন ত?'

বিনম্র দৃঢ়তার সহিত বলিলাম, 'সবই আমি করব, কেবল এই মিনতি যে একটা বিষয়ে আপনি পীড়াপীড়ি করবেন না—দুধ, দুধের পদার্থ ও মাংস আমি খাব না। তাতে যদি দেহপাত হয় হবে। ওটাকে আমি ধর্ম মনে করব।'

'এ কি আপনার অন্তিম নিশ্চয়?' গোখেল জিজ্ঞাসা করিলেন।

জবাবে বলিলাম, 'আমি এখানে নাচার, অন্য কোন উত্তর দেওয়ার উপায় আমার নেই। জানি আপনি কষ্ট পাবেন। কিন্তু আমি ক্ষমা ভিক্ষা চাই।'

একটু বেদনায় কিন্তু গভীর স্নেহে গোখেল বলিলেন, 'আপনার সংকল্প আমার ভাল লাগছে না। এতে আমি ধর্ম দেখতে পাচ্ছি না। কিন্তু আর আমি পীড়াপীড়ি করব না।' এই কথার পরে জীবরাজ মেহতার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, 'গান্ধীকে আর বিরক্ত করবেন না। তিনি যতটুকু আপনার কথা মানতে পারেন সেই সীমা মধ্যে যা করার করুন।'

ডাক্তার অসন্তোষ প্রকাশ করিলেন, কিন্তু উপায় আর কিছু তাঁর ছিল না। হিং-ফোড়ন দেওয়া মুগের মণ্ড ব্যবস্থা করিলেন। দুই এক দিন খাইলাম, বেদনা বাড়িয়া গেল। সহিল না। ফের ফলাহার শুরু করিলাম। বাহ্য চিকিৎসা ডাক্তারের চলিতেছিল। তাতে একটু উপশম হইল। কিন্তু আমার এটা নয় ওটা নয়-এর দরুন তিনি বড় অসুবিধায় পড়িয়াছিলেন।

এর মধ্যে অক্টোবর-নবেম্বরের লণ্ডনের কুয়াশা সহ্য করিতে না পারিয়া গোখেল ভারতে চলিয়া যান।

৪২

ফুসফুস প্রদাহ কিভাবে সারে

ফুসফুসের ব্যথা কমিতেছিল না বলিয়া একটু ভাবনা হইয়াছিল। আমি জানিতাম ঔষধে নয় বরং আহারের হেরফেরে ও বাহ্য উপচারে উহা অবশ্য দূর হইবে।

১৮৯০ সনে ডাক্তার অ্যালিসনের সঙ্গে আমার পরিচয় হইয়াছিল। তিনি নিরামিষাশী ছিলেন। খাদ্য পরিবর্তন দ্বারা তিনি চিকিৎসা করিতেন। তাঁকে ডাকি। ভাল করিয়া আমাকে পরীক্ষা করেন। দুধ কেন ত্যাগ করিয়াছি সে কথা তাঁকে বলি। আমাকে আশ্বস্ত করিয়া তিনি বলেন, 'দুধের কোনই দরকার নেই। আর আমি ত আপনাকে কিছুদিন কোন স্নেহপদার্থ খেতেই দেব না।' এই বলিয়া তিনি আমাকে আটার রুটি, মূলা, পেয়াজ, বীট, অন্য কন্দ ও শাক এবং ফল ব্যবস্থা করেন। শাকসবজি চিবাইয়া খাইতে না পারিলে ভাল করিয়া কুচাইয়া লইয়া খাইতে বলেন। ফলের মধ্যে মুখ্যত কমলালেবুর উপর তিনি জোর দিয়াছিলেন।

দিন তিনেক এই ব্যবস্থামত চলিয়াছিলাম। কিন্তু কাঁচা সবজি আমার ঠিক সহিল না। এই প্রয়োগের ঠিক ঠিক পরীক্ষা করার মত শরীর আমার পটু ছিল না, আর কাঁচা সবজি খাইতে তেমন ভরসাও পাইতেছিলাম না।

ডাক্তার অ্যালিসন আমাকে ঘরের সব জানালা চব্বিশ ঘণ্টা খোলা রাখিতে, ঈষদুষ্ণ জলে স্নান করিতে, ব্যথার জায়গায় তেল মালিশ করিতে ও পনর হইতে ত্রিশ মিনিট খোলা হাওয়ায় পায়চারি করিতে বলেন। এই ব্যবস্থা আমার ভাল লাগে।

ঘরের জানালাগুলি এমন ধরনের ছিল যাতে পুরা খোলা রাখিলে ঘরে বৃষ্টির জল ঢুকিত। তা ছাড়া ওপরের আলো-খিড়কিও খোলার উপায় ছিল না। তাই গোটা কাচ ভাঙ্গাইয়া চব্বিশ ঘণ্টা হাওয়া চলাচলের ব্যবস্থা করিয়া লইলাম। বৃষ্টির ছাট ঘরে ঢুকিতে না পায় এমন ভাবে জানালা খুলিয়া রাখিতাম।

এই সব করাতে শরীর কিছুটা ভাল হইল। কিন্তু পুরাপুরি সারিল না।

লেডী সিসিলিয়া রবার্টস্ কখন কখন আমাকে দেখিতে আসিতেন। তাঁর সহিত আত্মীয়তা জন্মিয়াছিল। আমি দুধ খাই এই তাঁর আকাঙ্ক্ষা ছিল। দুধ আমি খাইতাম না বলিয়া দুধের গুণ আছে এমন পদার্থের খোঁজ তিনি করিতেছিলেন। তাঁর কোন বন্ধু তাঁকে 'মল্টেড মিল্ক'-এর কথা বলেন ও অজানিতে তাঁকে আশ্বাস দেন যে পদার্থটা রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় তৈরি চূর্ণমাত্র, দুধের নামগন্ধ তাতে নাই। আমি জানিতাম আমার ধর্মভাবনার ওপর লেডী সিসিলিয়ার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল। তাই, ওই চূর্ণ আমি জলে গুলিয়া খাই। দুধের স্বাদ জিভে ধরা পড়ে। আমার দশাটা হইল 'চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে'-এর মত—বোতলে আঁটা বস্তুপরিচয় হইতে দেখিতে পাইলাম পদার্থটা দুধে তৈরি।

এই কথাটা লেডী সিসিলিয়াকে জানাইয়া তাঁকে লিখিলাম এর জন্য যেন তিনি বিব্রত বোধ না করেন।

খবর পাইতেই উতলা হইয়া তিনি আমার কাছে আসেন ও খেদ প্রকাশ করেন। এ কথাও জানান যে তাঁর বন্ধু বোতলে আঁটা লেবেলটা দেখেন নাই। তাঁকে আশ্বস্ত করিলাম; এত করিয়া যোগাড় করা তাঁর জিনিসটা ব্যবহার করিতে পারিলাম না বলিয়া তাঁর ক্ষমা চাহিলাম। আরও বলিলাম যে অজানিতে দুগ্ধ-চূর্ণ খাইয়াছি বলিয়া আমার আপসোস নাই আর প্রায়শ্চিত্ত করারও কোন প্রশ্ন নাই।

লেডী সিসিলিয়ার সহিত পরিচয়ের অন্য অনেক মধুর স্মৃতির কথা বাদ দিয়া যাইতেছি। বিপদের সময়ে, হতাশার দিনে এরূপ মহৎ আশ্রয় জীবনে আমি বহু বার লাভ করিয়াছি। এরূপ মধুর সখ্যেও ঈশ্বর-বিশ্বাসী দেখে ঈশ্বরের কৃপা: দুঃখরূপ কটুতিক্ত ওষুধ ভগবান ব্যবস্থা করেন ত তার সঙ্গে সখ্যের মধুর অনুপানও দেন।

ডাক্তার অ্যালিসন আবার যখন আমাকে দেখিতে আসিয়াছিলেন তখন অনেক বাধা-নিষেধ তুলিয়া লন। শুকনা ফলের অর্থাৎ চীনা-বাদামের স্নেহ বা ওলিভ-অয়েল খাইতে বলেন। কাঁচা সবজি না রুচিলে সিদ্ধ করিয়া ভাতের সঙ্গে খাইতে বলেন। এই পরিবর্তনে আমার অনেকটা সুবিধা হয়। কিন্তু অসুখ তাতে পুরাপুরি সারিল না। সাবধানে থাকিতে হইত; বেশির ভাগ সময় শুইয়াই কাটাইতাম।

ডাক্তার মেহতা সময় সময় আসিয়া দেখিয়া যাইতেন। 'আমার ব্যবস্থা-মত চলেন ত এখনও আমি ভাল করে দিতে পারি' প্রতি বারই তিনি এ কথা বলিতেন।

এই সময়টায় এক দিন মি. রবার্টস্ আসেন ও আমাকে দেশে যাওয়ার জন্য সবিশেষ অনুরোধ করিয়া বলেন, 'এই অবস্থায় আপনার নেটলী যাওয়া কিছুতেই চলবে না। কিছুদিন পরে কড়া শীত পড়বে। আমার বিশেষ অনুরোধ আপনি দেশে যান ; সেখানে গেলে আপনার অসুখ সম্পূর্ণ সেরে যাবে। ততদিন যদি যুদ্ধ চলে ত সাহায্য করার নানা সুযোগ সেখানেও আপনি পাবেন । সে সুযোগ যদি নাও মিলে আপনি এখানে যা করেছেন তা কিন্তু আমার দৃষ্টিতে নগণ্য নয়।'

এই পরামর্শ মানিয়া লইলাম ও দেশে রওনা হওয়ার আয়োজন করিলাম।

৪৩
রওনা

ভারতে যাওয়ার জন্য মি. কেলেনবেক আমার সঙ্গে বিলাতে আসিয়াছিলেন। বিলাতে আমরা একসাথেই ছিলাম। আর এক সঙ্গেই রওনা হওয়ার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু জর্মনদের ওপর গুপ্ত পুলিশের নজর বড় কড়া ছিল তাই কেলেনবেক ছাড়পত্র (পাসপোর্ট) পাইবেন কিনা এই বিষয়ে আমার ঘোর সন্দেহ ছিল। ছাড়পত্রের জন্য আমি খুব চেষ্টা করিয়াছিলাম। মি. কেলেনবেক ছাড়পত্র পাইলে মি. রবার্টস্ নিজেও খুশী হইতেন। বড়লাটকে এই জন্য তিনি তারও করিয়াছিলেন। কিন্তু লর্ড হার্ডিং সোজা কথায় সাফ জবাব দেন: 'সখেদে বলতে হচ্ছে, ভারত সরকার এরূপ ঝুঁকি নিতে অক্ষম।' কথাটা যে অযৌক্তিক নয় তা আমরা সকলেই বুঝিয়াছিলাম।

কেলেনবেকের সহিত ছাড়াছাড়িটা আমার খুব বিঁধিয়াছিল। কিন্তু বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে আমার যতটা লাগিয়াছিল তার চাইতে ঢের বেশি লাগিয়াছিল তাঁর। ভারতে আসিতে পাইলে আজ তিনি চাষী ও তাঁতির সাদাসিধা জীবন যাপন করিতেন। এখন তিনি দক্ষিণ আফ্রিকায় নিজের পূর্বেকার জীবন যাপন করিতেছেন, স্থপতির ব্যবসা জোর চালাইতেছেন।

তৃতীয় শ্রেণীর টিকেট কেনার চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু পি. এণ্ড ও. জাহাজে তৃতীয় শ্রেণী নাই বলিয়া দ্বিতীয় শ্রেণীতে আসিতে হইয়াছিল।

দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে সঙ্গে-আনা কিছু মেওয়া সঙ্গে লইলাম। কারণ টাটকা ফল জাহাজে মিলে, শুকনা ফল মিলে না।

ডাক্তার জীবরাজ মেহতা আমার পাঁজরে মীড্‌ঝ প্লাস্টার আঁটিয়া দিয়া বলিয়া দিয়াছিলেন যে রেড সী-তে (লোহিত সাগরে) পৌঁছিবার পূর্বে যেন তা না খুলি। কোন রকমে দুই দিন ওই যাতনা ভুগিয়াছিলাম, কিন্তু তার বেশি আর পারা গেল না। বেশ খানিকটা কসরত করিয়া প্লাস্টারটা খুলিয়া ফেলি, ইচ্ছামত নাওয়া-ধোওয়ার স্থবিধা করিয়া লই।

মুখ্যত শুকনা ও টাটকা ফল খাইতাম। শরীর দিন দিন ভাল হইতেছিল : স্থয়েজ খালে পৌঁছিতে পৌঁছিতে অনেকটা স্থস্থ বোধ করি। শরীর অবশ্য তখনও দুর্বল ছিল তথাপি ভয় দূর হইয়া যায় ও ব্যায়ামের মাত্রা আস্তে আস্তে বাড়াইতে থাকি। আমার বিশ্বাস শুদ্ধ ও নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়ার দরুন এই উন্নতি ঘটিয়াছিল।

পূর্ব অভিজ্ঞতার বা অন্য কোন কারণে কিনা তা বলিতে পারি না, এই যাত্রায় ইংরেজ ও ভারতীয় যাত্রীদের মধ্যে যেরূপ ব্যবধান লক্ষ্য করিয়াছিলাম তেমন ব্যবধান দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে আসার সময়েও দেখি নাই। দূরত্ব সেখানেও ছিল কিন্তু এখানকার দূরত্বটা অন্য ধরনের ছিল। দুইচার জন ইংরেজের সহিত কথা হইত কিন্তু 'নমস্কার, কেমন আছেন?' এর বেশি কথা আগাইত না। দক্ষিণ আফ্রিকার স্টীমারে যেরূপ মনখোলা আলাপ বহু বার হইয়াছে এই যাত্রায় তেমনটা হয় নাই বলিলেই চলে। আমার মনে হয়, জ্ঞাতে অজ্ঞাতে দুইয়ের মনের ক্রিয়া ছিল এই—একের ভাব ছিল আমি শাসক জাতির লোক, আর অন্যের ভাব ছিল আমি পরাধীন জাতির লোক। কতক্ষণে দেশে পৌঁছিব, এই আবহাওয়া হইতে মুক্তি পাইব, এই জন্য মন ব্যাকুল হইয়াছিল।

এডেনে জাহাজ পৌঁছিল। মনে হইল যেন দেশেই পৌঁছিয়াছি। এডেন-ওয়ালাদের সঙ্গে দক্ষিণ আফ্রিকাতেই ভাল সম্পর্কের সৃষ্টি হইয়াছিল : ডারবনে কেকোবাদ কাওয়সজী দীনশা ও তাঁর পত্নীর সহিত ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা জন্মিয়াছিল।

আর দিন কয়েক মধ্যে আমরা বোম্বাই পৌঁছিয়া যাই। কোথায় কথা ছিল ১৯০৪ সনে দেশে ফিরিব আর কোথায় ফিরিলাম তার দশ বছর পরে। আনন্দে মন তাই দোল খাইতেছিল।

গোখেল বোম্বাইতে স্বাগত-অভ্যর্থনার আয়োজন করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁর শরীর ভাল ছিল না, তবুও তিনি ওই জন্য বোম্বাইতে আসিয়াছিলেন। দেশে ফিরিয়া তাঁতে মিলিয়া যাইব, নিজের কাঁধের বোঝা নামাইয়া দিব এই আনন্দে ভারতে ফিরি, কিন্তু বিধাতার লিখন ছিল আর এক।

৪৪

আমার ওকালতি

ভারতে আসার পরে আমার জীবনের গতি যে দিকে ঘোরে তা বলার আগে আমার দক্ষিণ আফ্রিকার জীবনের যে সব কথা ভাবিয়া চিন্তিয়া বাদ দিয়াছি তার দুইচারটি বলা দরকার।

জন কয়েক উকিল বন্ধু আমার ওকালতির কথা লোকের সামনে ধরিতে বলিয়াছেন। সে সম্বন্ধে এত কথা বলার আছে যে সব বলিতে গেলে একখানি বই হইয়া যাইবে; বিষয়ান্তরে যাওয়া হইবে। কিন্তু সত্যের প্রয়োগের সহিত যে সব কথার যোগ রহিয়াছে তেমন দুইচারটির বর্ণনা করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

আমার মনে পড়ে পূর্বেই আমি বলিয়াছি যে ওকালতি ব্যবসায়ে অসত্যের আশ্রয় আমি কোন দিনও লই নাই; বেশির ভাগটা ওকালতি আমি সেবাভাব হইতে করিয়াছি, গাঁট-খরচার অতিরিক্ত কিছু আমি তার জন্য লই নাই, কখন কখন নিজ গাঁট হইতে দিয়াছি। মনে করিয়াছিলাম এই সম্বন্ধে এর অধিক বলা অনাবশ্যক। কিন্তু বন্ধুরা আরও চান। তাঁরা মনে করেন যে ওকালতি ব্যবসায়ে কিভাবে সত্যের পথে চলিয়াছি সংক্ষেপে হইলেও তার কিছুটা বিবরণ দেই ত তাতে উকিল সমাজের উপকার হইবে।

স্কুলে পড়ার সময়ে শুনিয়াছিলাম যে মিথ্যা না বলিলে ওকালতি করা চলে না। মিথ্যার সহায়ে প্রতিষ্ঠা লাভের বাসনা অথবা পয়সা রোজগারের ইচ্ছা আমার ছিল না বলিয়া ওই কথার কোন ছাপ আমার ওপর পড়ে নাই।

আমার এই নীতির পরীক্ষা দক্ষিণ আফ্রিকায় অনেক বার হইয়াছিল। কত বারই দেখিতে পাইয়াছি প্রতিপক্ষের সাক্ষীদের শেখানো-পড়ানো হইয়াছে। আমি যদি আমার মক্কেলকে বা তার সাক্ষীদের মিথ্যা বলিতে এতটুকু উৎসাহ দিতাম ত মক্কেলের জয় হইত। কিন্তু এই লোভে কখনও আমি ভুলি নাই। একটা মামলার কথাই মাত্র মনে পড়ে যে স্থলে মোকদ্দমা জেতার পরে আমার মনে হইয়াছিল যে মক্কেল আমাকে ঠকাইয়াছে। আমার অন্তরের কামনা সব সময় এই ছিল : মক্কেলের কেস সত্য হয় ত তার জয় হউক, আর মিথ্যা হয় ত সে হারুক। মোকদ্দমা জিতিয়া দিব এই শর্তে কোন কেস আমি কখনও লইয়াছি বলিয়া আমার মনে পড়ে না। মক্কেল হারুক কি জিতুক আমার মজুরি আমি চাহিতাম, কমও নয় আর বেশিও নয়। নূতন মক্কেলকে আগেই বলিয়া লইতাম, 'কেস মিথ্যা হয় ত আমায় দেবেন না। সাক্ষীকে শেখানো-পড়ানোর আশা আমার কাছে করবেন না।' শেষটায় আমার এতটা সুনাম হইয়াছিল যে মিথ্যা কেস আমার কাছে আসিতই না। এমন মক্কেলও আমার ছিল যারা খাঁটি কেস আমাকে দিত আর যাতে মিথ্যার ছোঁয়াচ থাকিত তা দিত অন্য উকিলকে।

একটা কেসে আমার অগ্নিপরীক্ষা হইয়াছিল, এই কেসটা ছিল আমার বাছা মক্কেলদের এক জনের। কেসটা খুব জটিল হিসাব-নিকাশের ছিল। আর চলিয়াও ছিল অনেক দিন ধরিয়া। ভাগে ভাগে ভিন্ন ভিন্ন আদালতে উহার শুনানি হইয়াছিল। শেষটায় কোর্ট ওই কেসের হিসাবপত্র পরীক্ষার ভার হিসাবদক্ষ এক সালিসীর হাতে দেয়। সালিসদের রায়ে আমার মক্কেলের পুরা জিত হয়। কিন্তু সালিসদের হিসাবে নগণ্য হইলেও মস্ত একটা ভুল ছিল : যে অঙ্ক যাওয়ার কথা খরচের ঘরে তা তাঁরা ভুলে দেখান জমার ঘরে। প্রতিপক্ষ সালিসের ফয়সালা নাকচ করিয়া দেওয়ার জন্য আপীল করে, কিন্তু এই কারণে নয়, অন্য কারণে। আমি মক্কেলের দিকের ছোট উকিল ছিলাম। বড় উকিল সালিসের ভুল লক্ষ্য করিয়াছিলেন কিন্তু সালিসের ভুল স্বীকার করিতে মক্কেল বাধ্য নয় এই ছিল তাঁর অভিমত। নির্ঘাত যা নিজ মক্কেলের বিরুদ্ধে যাইবে এমন কোন কিছু স্বীকার করা উকিলের ধর্ম নয় এই কথা তিনি জোর দিয়া বলেন। আমি ভুলটা স্বীকার করার ওপরই জোর দিই।

বড় উকিল বলেন, 'সে স্থলে কোর্ট গোটা ফয়সালাটা রদ করে দেবে তার বার-আনা সম্ভাবনা রয়েছে। কোন বিবেচক উকিল তার মক্কেলকে এমন ফ্যাসাদে ফেলতে পারে না। অন্তত আমি এই ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত নই। কেসের যদি আবার শুনানি হয় তবে মক্কেল ত খরচান্ত হবেই আর পরিণাম তার কি হবে তাও বলা শক্ত।'

মক্কেলের সামনেই আমাদের এই কথাবার্তা হয়।

আমি বলি, 'আমার মনে হয় কি মক্কেলের কি আমাদের উভয়েরই এই ঝুঁকি নেওয়া কর্তব্য। আমরা না হয় ভুলটা না-ই স্বীকার করলাম, কিন্তু কোর্টের নজরে এলে কোর্ট যে তা নাকচ করবে না তার নিশ্চয়তা কোথায় ? তা ছাড়া, ভুল স্বীকার করলে মক্কেলের ক্ষতি হয় ত হানি কি ?'

বড় উকিল বলেন, 'কিন্তু ভুলটা আমরা আদবে স্বীকার করব কেন ?'

'আমরা স্বীকার না করলে যে কোর্টের দৃষ্টিতে পড়বে না বা প্রতিপক্ষ সে দিকে আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে না তার ভরসা কি ?'—উত্তরে আমি বলি।

'বেশ, এই কেসের বাদানুবাদ আপনি করবেন ত ? ভুল স্বীকার করার শর্তে আমি কোর্টে হাজির হতে রাজী নই', বড় উকিল জোর দিয়া এ কথা বলেন।

নম্রভাবে আমি বলি, 'আপনি যদি না দাঁড়ান, আর মক্কেল চান ত দাঁড়াতে আমি প্রস্তুত আছি। ভুল যদি স্বীকার না করা হয় তবে আমার মনে হচ্ছে এই কেস থেকে আমাকে সরে দাঁড়াতে হবে।'

এই বলিয়া আমি মক্কেলের দিকে তাকাই। তিনি একটু বিব্রত বোধ করেন। আরম্ভ হইতেই কেসটাতে আমি ছিলাম। আমার উপর তাঁর পুরা বিশ্বাস ছিল। আমার স্বভাব তিনি ভালভাবে জানিতেন। তিনি বলেন, 'বেশ, তবে আপনিই আদালতে দাঁড়াবেন। ভুল স্বীকার করবেন। কপালে থাকে, হেরে যাই যাব। সত্যের সহায় ভগবান।'

আমি খুশী হইলাম। জানিতাম তিনি এমনটাই বলিবেন। বড় উকিল আবার আমায় সাবধান করিলেন। আমার জেদ-এর জন্য অনুকম্পা করিলেন আবার ধন্যবাদও জ্ঞাপন করিলেন।

আদালতে যা হইয়াছিল তা পরের প্রকরণে বলিব।

৪৫

চালাকি ?

আমার পরামর্শ যে সমীচীন ছিল সে বিষয়ে আমার সংশয় ছিল না। কিন্তু কেসটা ঠিকমত চালাইতে পারিব কিনা সে বিষয়ে মনে ততটা ভরসা ছিল না। এরূপ শক্ত কেসের বাদানুবাদ বরিষ্ঠ (সুপ্রীম) আদালতের সামনে করা আমার কাছে অত্যন্ত ঝুঁকির কাজ মনে হইয়াছিল। ন্যায়াধীশের সামনে যখন দাঁড়াই তখন বুক ধড়ফড় করিতেছিল।

হিসাবের ওই ভুলের কথা পাড়িতেই একজন বিচারপতি বলিয়া ওঠেন :

'একি ধোঁকাবাজি নয়, মি· গান্ধী ?'

রাগে আমি জ্বলিতেছিলাম। যাতে চাতুরীর লেশও ছিল না তাতে চাতুরীর আরোপ! অসহ্য বোধ হইল।

'আরম্ভেই যেখানে বিচারক বিরূপ সেখানে এমন শক্ত কেস জেতার সম্ভাবনা কোথায়' মনে মনে বলিলাম। রাগ চাপিয়া ধীরভাবে বলিলাম :

'আশ্চর্য, সবটা কথা না শুনেই আপনি চাতুরীর আরোপ করছেন!'

'আরোপ নয়, ইঙ্গিতমাত্র'—উত্তরে বিচারপতি বলিলেন।

জবাবে বলিলাম, 'যাকে আপনি ইঙ্গিত বলছেন, আমার কাছে তা আরোপ মনে মচ্ছে। আমার কথা আগে শুনুন, সংশয়ের হেতু দেখতে পান ত তখন আরোপ অবশ্যই করবেন।'

শান্তস্বরে বিচারক বললেন, 'আপনার কথায় বাধা দিয়েছি বলে আমি দুঃখিত। আপনার কথা বুঝিয়ে বলুন।'

বস্তুটা স্পষ্ট করিয়া দেওয়ার মত মালমসলা আমার ছিল। বিচারক ওরূপ সন্দেহ করিয়াছিলেন বলিয়া শুরু হইতেই আমার বক্তব্যের দিকে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সক্ষম হই আর তাতে আমার ভরসা বাড়িয়া যায়। ব্যাপারটা সবিস্তরে বুঝাইয়া বলি। ধীরভাবে বিচারকেরা আমার কথা শোনেন ও বুঝিতে পারেন যে ভুলটা সেরেফ অসাবধানতার কারণ হইয়াছে। অতএব তাঁদের মনে হয় যে এত পরিশ্রমে তৈরী রায়টাকে বাতিল করা যায় না।

বিপক্ষের উকিল ধরিয়া লইয়াছিলেন যে ভুল স্বীকার করায় তাঁর কাজ সহজ হইয়াছে, অনেক তর্কবিতর্কের দরকার হইবে না। কিন্তু বিচারকেরা

কথায় কথায় তাঁকে বাধা দিতে থাকেন কেন না তাঁরা স্পষ্ট দেখিতে পাইয়াছিলেন যে অনবধানতা জনিত ওই ভুল সহজেই সংশোধন করিয়া লওয়া যাইতে পারে। বিপক্ষের উকিল রায়টাকে বাতিল করানোর অনেক চেষ্টা করেন। কিন্তু যে বিচারক আরম্ভে সংশয় প্রকাশ করিয়াছিলেন তিনি ইতিমধ্যে স্পষ্টত আমার পক্ষে আসিয়া গিয়াছিলেন।

তিনি জিজ্ঞাসা করেন, 'মি. গান্ধী যদি ভুল স্বীকার না করতেন তবে আপনি কি করতেন?'

'যে বিচক্ষণ হিসাব-নবিশ আমরা নিযুক্ত করেছি তাঁর চাইতে নিপুণ হিসাব-পরীক্ষক আমরা কোথায় পেতাম?'

বিচারক আরও বলেন, 'কোর্ট ধরে নিচ্ছে আপনার কেস আপনি খুবই ভালভাবে জানেন। যে ভুল অতি দক্ষ হিসাব-পরীক্ষকের হতে পারে এরূপ ভুলের অতিরিক্ত কোন ভুল যদি আপনি দেখাতে না পারেন তা হলে এই মামুলী ভুলের জন্য বাদী-বিবাদীকে ফের কেস চালানোর দোকর খরচায় ফেলতে কোর্ট প্রস্তুত নয়। যে ভুল সহজে ঠিক করে নেওয়া যায় তার জন্য নূতন শুনানির আদেশ দেওয়া চলে না।'

আর তাই উকিলের আপত্তি অগ্রাহ্য হয়। সংশোধিত রায় কোর্ট বহাল রাখিয়াছিলেন অথবা সালিসকে ভুল সংশোধন করিতে বলিয়াছিলেন তা আমার সঠিক মনে নাই।

আমার হর্ষের সীমা ছিল না। মক্কেল ও বড় উকিলও খুশী হইয়াছিলেন। আর সৎ পথে থাকিয়াও যে ওকালতি করা যায় এই বিশ্বাস আমার দৃঢ় হইল।

কিন্তু পাঠক মনে রাখিবেন যে পয়সার জন্য করা ওকালতির মূলে যে গলদ রহিয়াছে তা সততার ওকালতি দিয়া ঢাকা যায় না।

৪৬

মক্কেল হয় সহকর্মী

নাতাল ও ট্রান্সভালের ওকালতির নিয়মে ব্যবধান ছিল। এডভোকেট ও এটর্নীতে প্রভেদ থাকিলেও নাতালে দুইই সকল কোর্টে ওকালতি করিতে পাইত। ট্রান্সভালে বোম্বাই-এর মত ভেদ ছিল। ব্যারিস্টারের

সেখানে সব কিছু এটর্নীর মারফত করিতে হইত। এডভোকেটের অথবা এটর্নীর সনদ লইয়া ব্যারিস্টার তথায় ইচ্ছামত ব্যবসা করিতে পারে। নাতালে আমি এডভোকেটের ও ট্রান্সভালে এটর্নীর সনদ লইয়াছিলাম। এডভোকেট হইলে ভারতীয়দের প্রত্যক্ষ সম্পর্কে আসার সুযোগ আমি পাইতাম না। তা ছাড়া, গোরা এটর্নী আমাকে কেস দিবে দক্ষিণ আফ্রিকার আবহাওয়া তেমন ছিল না।

কিন্তু ট্রান্সভালেও এটর্নীরা ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে ওকালতি করিতে পারিত। কোন ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে কেস চালাইতে চালাইতে আমি বুঝিতে পাই যে আমার মক্কেল আমাকে ঠকাইয়াছে। দেখিলাম, সাক্ষীর কাঠগড়ায় তাঁর ভাঙিয়া পড়িবার মত অবস্থা হইয়াছে। তাই বাদানুবাদ না করিয়া ম্যাজিস্ট্রেটকে আমি মক্কেলের বিরুদ্ধে কেস খারিজ করিয়া দিতে বলি। ম্যাজিস্ট্রেট খুশী হন। মিথ্যা কেস আমাকে দিয়াছেন বলিয়া মক্কেলকে আমি বকি। মিথ্যা কেস আমি নেই না এ কথা তিনি জানিতেন। সেই কথা তাঁকে মনে করাইয়া দিলে তিনি নিজের অন্যায় স্বীকার করেন। আমার মনে হয় তাঁর বিরুদ্ধে রায় দিতে বলিয়াছিলাম বলিয়া আমার ওপর তিনি রাগ করেন নাই।

সে যাই হোক, আমার ওরূপ আচরণের দরুন আমার ওকালতির কোন ক্ষতি হয় নাই, বরং আমার কাজ সহজ হইয়া গিয়াছিল। ইহাও আমি দেখিতে পাইয়াছিলাম যে সত্যের এইরূপ আরাধনার হেতু উকিল সমাজে আমার প্রতিষ্ঠা বাড়িয়া গিয়াছিল এবং কালো হইলেও তাঁদের কিছু-সংখ্যকের ভালবাসা আমি পাইয়াছিলাম।

ওকালতিতে আমার আর একটা দস্তুর দাঁড়াইয়া গিয়াছিল—নিজের অজ্ঞতা কখনও আমি মক্কেল অথবা উকিলদের কাছে ঢাকিতাম না। কোন কেস বুঝিয়া উঠিতে না পারিলে মক্কেলকে অন্য উকিলের কাছে যাইতে বলিতাম। তবুও যদি কেস আমাকেই দিত তবে প্রবীণ কোন উকিলের পরামর্শ লইয়া কাজ করার প্রস্তাব করিতাম। এই অকপট আচরণের কারণ মক্কেলদের অখণ্ড ভালবাসা ও অটুট বিশ্বাস আমি লাভ করিয়াছিলাম। বড় উকিলের পরামর্শ লওয়ার জন্য দেয় ফী মক্কেলরা খুশী মনে দিত। এই বিশ্বাস ও ভালবাসা দশের কাজে আমার মস্তবড় সহায় হইয়াছিল।

দক্ষিণ আফ্রিকায় আমার ওকালতি যে লোকসেবার নিমিত্ত ছিল সে কথা পূর্ব প্রকরণে বলিয়াছি। লোকের বিশ্বাস কুড়ানো লোকসেবার জন্য প্রয়োজন ছিল। পয়সা লইয়া করা আমার ওকালতিকে উদারমনা ভারতীয়েরা সেবা বলিয়া বর্ণনা করিতেন। নিজেদের অধিকারের জন্য তাদিগকে যখন আমি জেলের কষ্ট ভুগিতে বলিয়াছিলাম তখন তাদের অনেকে তাতে বিচার পূর্বক সাড়া দেওয়ার অপেক্ষা আমার প্রতি শ্রদ্ধা ভালবাসা বশত সাড়া দিয়াছিল।

এই কথা লিখিতে লিখিতে ওকালতির আরও অনেক মধুর স্মৃতি মনে পড়িতেছে। শত শত মক্কেল মক্কেল হইতে বন্ধু হইয়া গিয়াছিলেন, দশের সেবায় আমার সহকর্মী হইয়াছিলেন। আর তাঁদের সংসর্গে আমার কঠিন জীবন মধুর হইয়াছিল।

৪৭

মক্কেল কিভাবে জেল হইতে বাঁচে

পারসী রুস্তমজীর ভালভাবে পরিচয় এর আগেই পাঠক পাইয়াছেন। একাধারে তিনি আমার মক্কেল ও সাথী ছিলেন, অথবা এ কথাও বলা চলে যে, তিনি প্রথমে আমার বন্ধু হন আর পরে বিশ্বাসভাজন মক্কেল। আমি তাঁর এতটা বিশ্বাসের পাত্র ছিলাম যে ঘরের কথায়ও তিনি আমার পরামর্শ চাহিতেন ও সেমতে চলিতেন। অসুখ হইলে তিনি আমার শরণ লইতেন এবং আমাদের জীবনধারায় অতি বড় ব্যবধান থাকিলেও নিজের বেলায় আমার ব্যবস্থা মত তিনি চলিতেন।

একবার এই বন্ধু ভারি বিপদে পড়েন। আপন ব্যবসায়েরও অনেক কথা তিনি আমাকে বলিতেন। একটা কথা জানিয়া-বুঝিয়াই তিনি আমার কাছ হইতে লুকাইয়াছিলেন। বোম্বাই ও কলিকাতা হইতে অনেক মাল তিনি আমদানি করিতেন ও অনেক সময় শুল্ক ফাঁকি দিতেন। শুল্ক বিভাগের সকল অফিসারদের সহিত তাঁর খুব ভাব ছিল তাই তাদের কেউ ঘুনাক্ষরেও তাঁকে সন্দেহ করিত না। তিনি যে চালান দেখাইতেন সে মতে শুল্ক ধার্য হইত। এমনও হইতে পারে, তিনি যে ফাঁকি দেন কোন কোন অফিসার তা দেখিয়াও দেখিত না।

কিন্তু অখা ভাগতের কথা 'কাঁচা পারা খেলে তা ফুটে বেরুবে' কি মিথ্যা হইতে পারে? পারসী রুস্তমজীর চুরি ধরা পড়িল। আমার কাছে তিনি দৌড়িয়া আসিলেন। তাঁর চোখ হইতে জল গড়াইতেছিল। বলিলেন, 'ভাই, আপনাকে আমি ধোঁকা দিয়েছি। আজ আমার পাপ ধরা পড়েছে। আমি শুল্ক ফাঁকি দিয়েছি। এখন জেলে যেতে হবে। সর্বনাশ উপস্থিত। এই বিপদ থেকে এক আপনিই আমায় বাঁচাতে পারেন। কোন কিছু আপনার কাছ থেকে কখনও লুকইনি। কিন্তু ব্যবসায়ের এসব ফাঁক-ফন্দির কথা কোন্ মুখে আপনাকে বলব বলে বলিনি। এখন পস্তাচ্ছি।'

সান্ত্বনা দিয়া বলিলাম, 'আপনাকে বাঁচানো ভগবানের হাতে। আমার রীতি-নীতি আপনি জানেন। দোষ স্বীকার করলে যদি ছাড়ানো যায় ত সে চেষ্টা করে দেখতে পারি।'

ভালমানুষ এই পারসীর মুখ ফ্যাকাশে হইয়া গেল।

'আপনার কাছে স্বীকার করছি, তাতে কি হবে না?' রুস্তমজী শেঠ বলেন।

শান্তস্বরে বলি, 'আপনি দোষ আমার কাছে করেননি, করেছেন সরকারের কাছে। আমার কাছে স্বীকার করলে কি হবে?'

'আপনি যা বলবেন তা-ই আমি করব, তবুও আমার পুরাতন উকিল অমুকের সঙ্গে একবার কথা বলবেন না কি? তিনিও আমার বন্ধু।' পারসী রুস্তমজী বলেন।

খোঁজ-খবরে জানা গিয়াছিল যে শুল্ক ফাঁকি দেওয়ার ব্যাপারটা অনেক দিন হইতে চলিতেছে। যে চুরি ধরা পড়িয়াছিল তা তুচ্ছ মাত্র ছিল। আমরা তাঁর উকিলের কাছে গেলাম, কাগজপত্র দেখিয়া তিনি বলিলেন, 'জুরির বিচার হবে। নাতালের জুরি ভারতীয়কে খালাস দেবে সে ভরসা কম। তবে আশা ছাড়ছি না।'

এই উকিলের সহিত আমার তেমন পরিচয় ছিল না। পারসী রুস্তমজীই তাঁকে বলিলেন, 'আপনার পরামর্শের জন্য বাধিত, তবে এই কেসে আমি মি. গান্ধী যেমন বলবেন তেমনটা চলব। ওঁর সঙ্গে আমার জানাশোনা আরও অধিক। অবশ্য দরকার মত তিনি আপনার পরামর্শ নেবেন।'

এইভাবে কৌঁসিলীর কথা চাপা দিয়া আমরা রুস্তমজীর দোকানে গেলাম। আমি বুঝাইয়া বলিলাম, 'এটা কোর্টে নিয়ে যাওয়ার মত কেস নয়।

কেস চালানো কি না-চালানো সে বিচার শুল্ক বিভাগের অফিসারদের হাতে। তাদেরও চলতে হবে এটর্নী-জেনারেলের নির্দেশ মতে। দুইয়ের কাছেই আমি যেতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু তাঁরা জানেন না এমন ফাঁকি দেওয়ার কথাও আমার স্বীকার করতে হবে। আপনি তাঁদের বলুন, যে অর্থদণ্ড তাঁরা ধার্য করবেন তা দিতে আপনি প্রস্তুত আছেন। আমার খুব বিশ্বাস এতে তাঁরা রাজী হবেন। রাজী না হয় ত জেলে যাওয়ার জন্য আপনার তৈরী হতে হবে। আমি মনে করি লজ্জা জেলে যাওয়ায় নয়, লজ্জা চুরি করায়। লজ্জার কাজ ত করা হয়ে গেছেই। জেলে যেতে হয় ত মনে করবেন প্রায়শ্চিত্ত করছেন। আর কখনও চুরি করব না এই প্রতিজ্ঞা করা হচ্ছে সত্যিকার প্রায়শ্চিত্ত।'

বলিতে পারি না আমার কথা রুস্তমজীর ভাল লাগিয়াছিল কিনা। তিনি সাহসী পুরুষ ছিলেন। কিন্তু এই ব্যাপারে তিনি সাহস হারাইয়াছিলেন। প্রতিষ্ঠা তাঁর যাইতে বসিয়াছিল। এত কষ্টে, এত যত্নে যে ইমারত তিনি গড়িয়াছিলেন তা ধুলায় মিশায় ত তিনি কোথায় দাঁড়াইবেন?

তিনি বলেন, 'আমি ত বলেছি যে আমি আপনার হেফাজতে। যা করতে চান করুন।'

এই কেসে আমি আমার অনুনয়-বিনয়ের সকল শক্তি নিয়োগ করিয়াছিলাম। অফিসারের সহিত দেখা করিয়া শুল্ক ফাঁকি দেওয়ার সব কথা তাঁকে নির্ভয়ে বলিয়াছিলাম। যত কিছু খাতাপত্র সব দেখাইব বলিয়াছিলাম। পারসী রুস্তমজী যে অতিশয় অনুতপ্ত তাও বলিয়াছিলাম।

অফিসার আমাকে বলেন, 'এই বুড়ো পারসীকে আমার ভাল লাগে। দুঃখ এই যে সে বোকামি করে ফেলেছে। কিন্তু আপনি ত জানেন আমার কর্তব্য কি। এটর্নী-জেনারেল যেমন বলবেন তেমন আমার করতে হবে। অতএব আপনার সর্বশক্তি নিয়োগ করে তাঁকে বোঝান।'

আমি বলিলাম, 'পারসী রুস্তমজীকে কাঠগড়ায় দাঁড় করাবার জেদ না করেন ত আমি কৃতজ্ঞ থাকব।'

এই অভয় অফিসারের কাছে পাইলাম। এটর্নী-জেনারেলের সহিত পত্র লেখালেখি করিলাম। দেখাও তাঁর সঙ্গে করিলাম। বলিতে কি, আমার অকপট আচরণে তিনি মুগ্ধ হইয়াছিলেন, আর আমি কোন কথা লুকাই নাই এই বিশ্বাস তাঁর জন্মিয়াছিল।

আমার অধ্যবসায় ও অকপট ভাবে তুষ্ট হইয়া তিনি আমায় সার্টিফিকেট দিয়াছিলেন ; 'দেখছি 'না' বলে আপনার হাত থেকে পার পাওয়ার জো নেই'—মনে নাই এই কেস বা অন্য কেস সম্পর্কে এ কথা বলিয়াছিলেন।

পারসী রুস্তমজীর বিরুদ্ধের মামলা আপোসে মিটিয়া যায়। যত শুল্ক ফাঁকি দেওয়ার কথা তিনি স্বীকার করিয়াছিলেন তার দ্বিগুণ টাকা আদায় করিয়া মামলা তুলিয়া লওয়ার হুকুম হয়।

তাঁর ওয়ারিসান ও সহ-ব্যবসায়ীদের সতর্ক-সংকেত রূপে শুল্ক ফাঁকি দেওয়ার এই কাহিনী রুস্তমজী লিখিয়া কাচের ফ্রেমে আঁটিয়া তাঁর আপিসে লটকাইয়া দিয়াছিলেন।

'সত্যিকার বৈরাগ্য এ নয়, শ্মশান বৈরাগ্য' এই কথা বলিয়া রুস্তমজীর ব্যাপারী বন্ধুরা আমায় সাবধান করিয়াছিলেন।

এ কথা তাঁকে বলিলে রুস্তমজী শেঠ উত্তরে বলিয়াছিলেন, 'আপনাকে ঠকালে আমার গতি কি হবে?'

আত্মকথা : পঞ্চম ভাগ

১

প্রথম অনুভব

ফিনিক্স হইতে যারা রওনা হইয়াছিল আমার আসার পূর্বে তারা দেশে পৌঁছিয়া গিয়াছিল। আগে আমার পৌঁছানোর কথা ছিল। কিন্তু যুদ্ধের কাজে লাগার দরুন লণ্ডনে আটকিয়া গিয়াছিলাম বলিয়া সব কিছু ওলট-পালট হইয়া যায়। আর যখন দেখিলাম কবে যে দেশে ফিরিতে পারিব তার ঠিকানা নাই তখন ভাবনা হইল ফিনিক্সের লোকেরা কোথায় ওঠে ও কোথায় থাকে। সকলে এক সঙ্গে থাকিলে এবং ফিনিক্স আশ্রমের জীবন যাপন করিলে ভাল হয় এই ছিল আমার চেষ্টা। এমন কোন আশ্রম জানা ছিল না যেখানে তাদের উঠিতে বলিতে পারিতাম। তাই আমি তাদের এণ্ডরুজের সহিত দেখা করিতে ও তিনি যেখানে বলেন সেখানে যাইতে লিখি।

কাংড়ী গুরুকুলে প্রথমে তাদের থাকার ব্যবস্থা হয়। স্বর্গগত শ্রদ্ধানন্দজী আপন সন্তানের মত তাদের রাখিয়াছিলেন। তারপরে তারা শান্তিনিকেতনে যায়। কবি ও তাঁর সাথীরা তেমনই আদরে তাদের গ্রহণ করেন। এই দুই স্থানে তারা যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিল তা তাদের ও আমার পক্ষে খুব লাভদায়ক হইয়াছিল।

'কবিবর, শ্রদ্ধানন্দজী ও শ্রীসুশীল রুদ্র এঁরা আপনার ত্রিদেব' এ কথা সময় সময় আমি এণ্ডরুজকে বলিতাম। দক্ষিণ আফ্রিকায় যখন তিনি গিয়াছিলেন এই তিনের কথা অনুক্ষণ আমায় শুনাইতেন। দক্ষিণ আফ্রিকার অতি মধুর নানা স্মৃতির মত এণ্ডরুজের মুখে-শোনা এই ত্রয়ীর হৃদয়-ঢালা গুণগানের স্মৃতি আজও আমার মনে জাগরূক। স্বভাবতই তিনি ফিনিক্স পরিবারকে সুশীল রুদ্রের ওখানেও রাখিয়াছিলেন। রুদ্রের আশ্রম ছিল না। বাড়ী তাঁর নিজেরই ছিল। সেই বাড়ী তিনি ফিনিক্স পার্টিকে সঁপিয়া দিয়াছিলেন। তাঁর বাড়ীর লোকেরা ফিনিক্স পার্টির লোকেদের প্রথম দিনেই এতটা আপন করিয়া লইয়াছিল যে তাদের মনেই হইতে দেয় নাই যে তারা ফিনিক্সে নয়।

বোম্বাই বন্দরে পৌঁছিয়া জানিতে পাই যে ফিনিক্স পার্টি শান্তিনিকেতনে আছে। গোখেলের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যত তাড়াতাড়ি পারা যায় শান্তিনিকেতনে যাওয়ার জন্য অধীর হইয়া উঠিলাম।

আমার অভ্যর্থনার জন্য যে দুই সভা হইয়াছিল তার এক সভায় আমাকে ছোটখাট একটু সত্যাগ্রহ করিতে হইয়াছিল। মি জেহাঙ্গীর পেটিটের বাড়ীর সম্বর্দ্ধনার উত্তর গুজরাটীতে দিতে আমার হিম্মতে কুলায় নাই। ওই রাজমহলের মত স্থান আর ওই চোখ-ধাঁধানো জাঁকজমক: আমার মনে হইল গিরমীটিয়াদের বহু দিনের সহচর আমি যেন সেখানে এক গেঁয়ো। আমার এখনকার পোশাকের তুলনায়, গায়ে আঙরাখা, মাথায় ফেটা তখনকার পোশাক অনেকটা ভব্য ছিল। তা হইলে কি হয়, ওই চাকচিক্যের সমাজে আমার মনে হইয়াছিল আমি অপাংক্তেয়। তাহা হইলেও সার ফিরোজশাহ মেহতার ছায়াতলে একরকম ভালভাবেই কাজটা সমাপন করিলাম।

গুজরাটীদের সভা ত ছিলই। স্বর্গীয় উত্তমলাল ত্রিবেদী এই সভার উদ্যোক্তা ছিলেন। এই সভার কার্যক্রমের কতকটা আভাস পূর্বেই পাইয়াছিলাম। গুজরাটী বলিয়া মি. জিন্না সভায় আসিয়াছিলেন। তিনিই সভাপতি ছিলেন কি প্রধান বক্তা সে কথা এখন আমার মনে নাই। তিনি তাঁর ছোট্ট মধুর ভাষণ ইংরেজীতে দেন। আবছা আবছা মনে পড়ে অন্য বক্তাদের অনেকেই ইংরেজীতে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। আমার বলার পালা আসিলে গুজরাটীতেই আমি বলিয়াছিলাম। দুই-চার শব্দে এ কথাও বলিয়াছিলাম যে গুজরাটী ও হিন্দুস্থানীর আমি পক্ষপাতী। গুজরাটীদের সভায় ইংরেজীতে বলার প্রতিবাদও নম্রভাবে করিয়াছিলাম। বাধবাধ অবশ্যই ঠেকিতেছিল। দীর্ঘদিনের প্রবাসের পরে ফেরত অনভিজ্ঞ আমার পক্ষে চলিত রীতির বিরোধ করা কতটা সঙ্গত হইবে এই অস্বস্তির ভাব ত মনে ছিলই। কিন্তু ইহা দেখিয়া আমি খুশী হই যে, আমার গুজরাটীতে বলাটাকে কেউ ভিন্ন অর্থে নেন নাই আর আমার প্রতিবাদও সকলে সহিয়া লইয়াছিলেন।

এই সভার অভিজ্ঞতা হইতে আমার মনে বিশ্বাস জন্মে যে আমার নূতন বিচারধারা দেশবাসীর কাছে ধরিতে আমার বেগ পাইতে হইবে না।

বোম্বাইতে দুই এক দিন গেল। তারপর এই প্রাথমিক অনুভব লইয়া গোখেল দর্শনে পুনায় যাই। সেখানে তিনি আমাকে ডাকিয়াছিলেন।

২

গোখেলের কাছে পুনায়

বোম্বাই পৌঁছাইতেই গোখেল আমাকে বলিয়া পাঠান, 'গবর্নর আপনার সহিত দেখা করতে চান। বোম্বাই ত্যাগের পূর্বেই তাঁর সঙ্গে দেখা করা ভাল হবে।' তাই তাঁর সঙ্গে দেখা করিতে যাই। মামুলী কথার পরে তিনি বলেন:

'একটা অনুরোধ। সরকারের বিরুদ্ধে কিছু করার আগে আমার সঙ্গে দেখা করবেন, কথা বলবেন।'

জবাবে আমি বলি:

'এ কথা দেওয়া আমার পক্ষে খুবই সহজ। কারণ সত্যাগ্রহীর ধর্ম আমি মেনে চলি—কারো বিরুদ্ধে কিছু করার আগে তাঁর কাছ থেকে তাঁর কথা বুঝে নিই আর যতটা পারি তাঁর সহিত সহমত হতে চেষ্টা করি। দক্ষিণ আফ্রিকায় বরাবর আমি এই নিয়ম মেনে চলেছি। এখানেও তা-ই করব।'

লর্ড উইলিংডন ধন্যবাদ জানাইয়া বলেন:

'যখনই দেখা করা দরকার মনে করেন, আসবেন। দেখতে পাবেন জেনে বুঝে সরকার কোন অন্যায় করতে চায় না।'

বলিলাম, 'এই বিশ্বাসই ত আমার অবলম্বন।'

পুনায় গেলাম। সেই মহামূল্য সাক্ষাৎকারের পুরা বিবরণ দেওয়া অসম্ভব। গোখেল ও তাঁর সরভেণ্ট অব ইণ্ডিয়া সোসাইটীর সভ্যেরা আমাকে প্রেমধারায় স্নান করান। মনে পড়ে সকল সদস্যদের তিনি পুনায় ডাকিয়া আনিয়াছিলেন। তাঁদের সঙ্গে নানা বিষয়ে দিলখোলা কথা হইয়াছিল।

গোখেলের অন্তরের বাসনা ছিল আমি সোসাইটীর সভ্য হই। আমারও ইচ্ছা ছিল। কিন্তু সদস্যদের মনে হয় যে সোসাইটীর আদর্শ ও কর্মপদ্ধতি হইতে আমার আদর্শ ও কর্মপদ্ধতি পৃথক্। অতএব আমাকে সভ্য করিয়া লওয়ার কথায় তাঁদের মনে ভয় ছিল। গোখেল মনে করিতেন যে নিজ আদর্শে আমি দৃঢ় হইলেও অন্যের আদর্শের সহিত আমি নিজেকে মানাইয়া লইয়া তাঁদের সঙ্গে মিলিয়া যাইতে পারি।

তিনি বলেন, 'কিন্তু আমাদের সভ্যেরা আজও আপনার মানিয়ে নেওয়ার স্বভাবের পরিচয় পাননি। এঁরা নিজেদের আদর্শে অটল, স্বভাবে স্বতন্ত্র ও

বিচারে দৃঢ়। আমি আশা করি এঁরা আপনাকে নেবেন। না যদি নেন, তবুও জানবেন যে আপনার ওপর এঁদের শ্রদ্ধা ও ভালবাসা কম নয়। এই অটুট ভালবাসায় পাছে ফাটল দেখা দেয় তাই তাঁরা সাবধান হচ্ছেন, ঝুঁকি নিচ্ছেন না। তা হোক, আপনি সোসাইটীর নিয়মবদ্ধ সভ্য হোন বা না হোন আমার দৃষ্টিতে আপনি সভ্যই।'

আমি আমার ইচ্ছার কথা গোখেলকে বলি। 'সোসাইটীর সভ্য হই বা না হই আশ্রম স্থাপন করে ফিনিক্সের সঙ্গীদের নিয়ে আমার বসে যেতে হবে। গুজরাটী বলে গুজরাটের মারফতে দেশের সেবা করার সর্বোত্তম সুযোগ আমি পাব এই আমার বিশ্বাস। তাই আমার ইচ্ছা গুজরাটের কোথাও বসব।' আমার প্রস্তাবটা গোখেলের ভাল লাগে। তিনি বলেন, 'তাই আপনি করুন। সভ্যদের সঙ্গে আপনার আলোচনার ফল যা-ই হোক আশ্রমের জন্য যে টাকা লাগে আমার কাছে চাইবেন। আমি মনে করব ও আশ্রম আমারই।'

আমার আনন্দের সীমা ছিল না। টাকা সংগ্রহের ঝঞ্ঝাট হইতে বাঁচিলাম, নিজের দায়িত্বে করিতে হইবে না, দিশাহারা হইলে দিশা দেখাইবার মানুষ মাথার ওপর আছে, এই ভাবিয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। মস্ত বোঝা কাঁধ হইতে নামিয়া গেল।

গোখেলে স্বর্গীয় ডাক্তার দেবকে ডাকিয়া বলিয়া দেন, 'সোসাইটীর বইয়ে গান্ধীর নামে হিসাব খুলুন। তাঁর আশ্রমের জন্য তথা সার্বজনিক কাজের জন্য যখনই টাকা চাইবেন পাঠাবেন।'

পুনা হইতে শান্তিনিকেতন যাওয়ার জন্য তৈরী হইতেছিলাম। আগের দিন রাত্রে গোখেল বাছা বাছা জন কয়েক বন্ধুর এক পার্টির ব্যবস্থা করেন। আমি যে খাদ্য তখন খাইতাম সেই খাদ্যের অর্থাৎ শুকনা ও টাটকা ফলের ব্যবস্থা অন্যদের জন্যও করেন। তাঁর ঘরের কয়েক পা দূরে পার্টির স্থান হইয়াছিল। ওইটুকু আসার মতও তাঁর শরীরের অবস্থা ছিল না। কিন্তু না আসিয়াও থাকিতে পারিলেন না। আসার জন্য ব্যাকুল হইলেন। আসিলেনও, কিন্তু মূর্ছা গেলেন। ধরাধরি করিয়া তাঁকে ঘরে নিতে হইল। এমনটা কখন কখন তাঁর হইত। সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিতেই খবর পাঠাইলেন পার্টি যেন চলে, বন্ধ করা না হয়।

পার্টির মানে ছিল আশ্রমের অতিথি-ঘরের পাশেকার অঙ্গনে গদিতে

বসিয়া চীনা বাদাম, খেঁজুর ও টাটকা ফল খাওয়া ও মনখোলা আলাপ আলোচনা করা ও একে অন্যকে জানাচেনা।

কিন্তু তাঁর ওই মূর্ছা আমার জীবনের সামান্য ঘটনা মাত্র ছিল না।

ধমক ?

বিধবা বৌদির ও আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে দেখা করার জন্য পুনা হইতে রাজকোট ও পোরবন্দর যাই।

দক্ষিণ আফ্রিকার সত্যাগ্রহের সময়ে আমার বেশভূষা যতটা সম্ভব গিরমীটিয়াদের মত করিয়া লইয়াছিলাম। ইংলণ্ডেও ঘরে ওই পোশাকই পরিতাম। বোম্বাইয়ে আমি কাঠিয়াওয়াড়ী পোশাক শার্ট, ধুতি, কোট ও সাদা চাদর পরিয়া নামিয়াছিলাম। এই সবই ছিল ভারতীয় মিলের কাপড়ের। বোম্বাই হইতে তৃতীয় শ্রেণীতে যাওয়ার ছিল। মনে হইল ওই ফেটা ও কোটের ঝঞ্ঝাটে দরকার কি। তাই তা বাদ দিলাম। আট কি দশ আনা দামের একটা কাশ্মিরী টুপি কিনিলাম। এরূপ পোশাক-পরা লোককে লোকে আলবত গরীব মনে করিবে।

প্লেগের মড়কের কারণ তখন বীরমগাম বা বঢ়বান-এ (আমার মনে নাই কোথায়) তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের পরীক্ষা করা হইত। আমার একটু জ্বর ছিল। নিরীক্ষক আমার নাড়ী দেখে। শরীরে তাপ ছিল বলিয়া রাজকোটে সরকারী ডাক্তারের কাছে যাওয়ার হুকুম করে ও আমার নাম টুকিয়া লয়।

বোম্বাই হইতে কেউ তার করিয়াছিল যে আমি বঢ়বান হইয়া যাইতেছি। তাই সেখানকার প্রসিদ্ধ লোকসেবক দরজী মোতীলাল স্টেসনে আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসেন। বীরমগামের চুঙ্গির (আমদানি-রপ্তানির উপর মাসুল) ও তার দরুন লোকের যে দুর্ভোগ ভুগিতে হয় সে কথা তিনি আমাকে জানান। শরীরটা ভাল ছিল না বলিয়া কথা বলার ইচ্ছা ছিল না। সংক্ষেপে জিজ্ঞাসা করি :

'আপনি জেলে যেতে তৈরী আছেন ?'

মনে করিয়াছিলাম, না ভাবিয়া না চিন্তিয়া উৎসাহের বশে যুবকেরা

যেমন বলে মোতীলালও তেমন বলিতেছে। কিন্তু তার কথায় দৃঢ়তা লক্ষ্য করিলাম।

"আমরা নিশ্চয় জেলে যাব, আপনি যদি পরিচালনা করেন। কাঠিয়াওয়াড়ী বলে আপনার ওপর আমাদের দাবী আছে। এখন আপনাকে আমরা এখানে নামতে বলতে পারি না। কিন্তু ফেরার সময় আপনাকে নাবতে হবে। এখানকার যুবকদের কাজ ও উৎসাহ দেখে আপনি খুশী হবেন। যখন ডাকবেন আপনার ডাকে আমরা সাড়া দেব।'

মোতীলাল আমার মন কাড়িয়া লইলেন। তাঁর সহকর্মীরা তাঁর গুণ কীর্তন করিয়া বলিল:

'আমাদের এই ভাই দরজী বটেন। আপন কাজে তিনি চৌকস। দিনে এক ঘণ্টা কাজ করেই তিনি মাসে পনের টাকা রোজগার করেন। তাতেই তাঁর চলে যায়। বাকী সময় তিনি দশের কাজে দেন। লেখাপড়া-জানা আমাদের তিনি পথ দেখান, হেঁট মাথায় আমরা সেই পথে চলি।'

পরে মোতীলালের খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আমি আসিয়াছিলাম। আর দেখিতে পাইয়াছিলাম যে, তাঁর যে গুণগান তাঁর সহকর্মীরা করিয়াছিল তাতে অতিশয়োক্তি আদৌ ছিল না। সত্যাগ্রহ আশ্রম স্থাপিত হইলে প্রতিমাসে দিন কয়েক তিনি আশ্রমে থাকিতেন, আশ্রমের ছোটদের সেলাইর কাজ শিখাইতেন ও আশ্রমের সেলাইর কাজ করিয়া দিতেন। বীরমগামের কথা দৈনিক আমায় বলিতেন। যাত্রীদের সেখানে যে হয়রানি ভুগিতে হইত তা তাঁর কাছে অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল। এই মোতীলাল ভরাযৌবনে অসুখে চলিয়া গেল; তাঁর অভাবে বঢ়বান অনাথ হইল।

রাজকোটে পৌঁছিবার পরদিন সকালে নির্দেশ মত আমি হাসপাতালে যাই। ওখানে আমি অজানা ছিলাম না। ডাক্তার লজ্জা পাইলেন ও পরীক্ষককে দোষ দিলেন। আমার মনে হইয়াছিল অকারণ তিনি ওই অফিসারের দোষ ধরিয়াছিলেন। অফিসার নিজ কর্তব্য করিয়াছিলেন। তিনি আমাকে চিনিতেন না। আর চিনিলেই বা কি, যে নির্দেশ তিনি দিয়াছিলেন তা দেওয়া তাঁর কর্তব্য ছিল। ডাক্তার অনুরোধ করিয়া বলেন আপনি আসিবেন না, আমি পরীক্ষা করার জন্য আপনার বাড়ী লোক পাঠাইব।

ওরূপ অবস্থায় তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের পরীক্ষা করা আবশ্যক। বড়-

লোকেরা তৃতীয় শ্রেণীতে চলেন ত পদমর্যাদা। তাঁদের যাই হোক, তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের যে সব নিয়ম মানিয়া চলিতে হয় সে সব তাঁদের স্বেচ্ছায় মানিয়া চলা উচিত। আর অফিসারদের অবশ্য কর্তব্য সকলের সহিত সমান ব্যবহার করা। কিন্তু আমার অভিজ্ঞতা এই যে, তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের রেল-কর্মচারীরা মানুষ মনে করে না, মনে করে ভেড়া। তাদের সহিত তুই-তোকারি ছাড়া কথা কয় না। কথার পৃষ্ঠে কথা বলিলে তা তাদের অসহ্য হয়—ওরা যেন তাদের হুকুমের চাকর। কর্মচারীরা তাদের মারেধরে, লোটে : হয়রানির একশেষ করিয়া টিকেট দেয়, ফলে ট্রেন অনেক সময় তাদের ফেলিয়া চলিয়া যায়। আর এই সবের জন্য না করিতে হয় তাদের জবাবদিহি আর না পাইতে হয় শাস্তি। এই সবই আমার নিজের দেখা কথা। লেখাপড়া-জানা কিছু ধনী লোক স্বেচ্ছায় গরীব বনিয়া যখন তৃতীয় শ্রেণীতে যাতায়াত করিবে, গরীবেরা যে সুখ-সুবিধা পায় না সেই সুখ-সুবিধা লইতে অস্বীকার করিবে এবং এই রকম অসুবিধা, লাঞ্ছনা, অবিচার, অপমান ঘটিতেই পারে এ কথা ধরিয়া না লইয়া তার বিরুদ্ধে লড়িবে তখনই কেবল এই সবের অন্ত হইবে।

কাঠিয়াওয়াড়ের যেখানেই আমি গিয়াছিলাম সেখানেই বীরমগামের চুঙ্গি-তদন্তের উৎপাতের কথা শুনিতে পাইয়াছিলাম। তাই লর্ড উইলিংডনকে আমি যে কথা দিয়াছিলাম তদনুযায়ী আমি অবিলম্বে কাজ করার সংকল্প করিলাম। এই বিষয় সংক্রান্ত যত তথ্য সংগ্রহ করিতে পারিলাম করিলাম ও পড়িলাম। দেখিতে পাইলাম অভিযোগ সত্য। বোম্বাই সরকারকে সব কথা জানাইয়া পত্র দিলাম। লর্ড উইলিংডনের প্রাইভেট সেক্রেটারীর সহিত দেখা করিলাম। লর্ড উইলিংডনের সঙ্গেও। তিনি সহানুভূতি জানাইলেন কিন্তু দোষটা দিল্লীর কাঁধে চাপাইলেন। সেক্রেটারী বলিলেন, 'আমাদের হাতে থাকলে কবে এই চুঙ্গি তুলে দিতাম। আপনি দিল্লীর শরণ নিন।'

ওপরওয়ালা সরকার দিল্লীকে ব্যাপারটা জানাইলাম। দিল্লী পত্রপ্রাপ্তি স্বীকার করিল, তার অধিক কিছু করিল না। যখন লর্ড চেমসফর্ডের সহিত দেখা করার প্রসঙ্গ আসে অর্থাৎ প্রায় দুই বছরের লেখালেখির পরে, প্রতিকার মিলে। তাঁকে কথাটা বলিতে তিনি অবাক্ হন। বীরমগামের ব্যাপারের কিছুই তিনি জানিতেন না। আমার কথা ধীরভাবে তিনি

শোনেন, টেলিফোনে তখনই বীরমগাম সংক্রান্ত কাগজপত্র তলব করেন এবং আমাকে বলেন যে কর্তৃপক্ষ বা আমলারা আমার অভিযোগের সন্তোষজনক উত্তর দিতে না পারিলে চুঙ্গি তুলিয়া দিবেন। এই সাক্ষাৎকারের কিছু দিন পরে বীরমগামের চুঙ্গি তুলিয়া লওয়ার খবর আমি সংবাদপত্রে দেখিতে পাই।

এই ঘটনাতে আমি দেখিয়াছিলাম ভারতে সত্যাগ্রহের পূর্বাভাস। এরূপ মনে করার হেতু এই: বীরমগামের সম্বন্ধে বোম্বাই সরকারের সেক্রেটারীর সহিত আমার যখন কথা হয় তখন তিনি আমাকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছিলেন যে কাঠিয়াওয়াড়ের বগসার-এ আমি যে বক্তৃতা দিয়াছিলাম উহার নকল তাঁর কাছে আছে। উহাতে সত্যাগ্রহের কথা বলিয়াছিলাম বলিয়া তিনি অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন:

'এ কি শাসানো নয়?' আর এ কথাও বলিয়াছিলেন, 'আপনি কি মনে করেন এমন প্রবল সরকার ধমকে মাথা নোয়াবে?'

উহার উত্তরে আমি বলিয়াছিলাম:

'শাসানো ওটা নয়! ওটা লোক-জাগৃতি। যে পথে লোকে নিজেদের দুঃখ দূর করতে পারে সে পথ দেখানো আমার জীবনধর্ম। যে দেশ স্বাধীন হতে চায় তার জানা চাই কোন্ পথে তা আসতে পারে। সাধারণত দেখা যায় অন্তে লোকে হিংসার পথ আশ্রয় করে। সত্যাগ্রহ পূর্ণ অহিংসার পথ। সত্যাগ্রহ কি ভাবে করতে হয় আর তার সীমাই বা কোথায় আমি মনে করি লোককে সেই শিক্ষা দেওয়া আমার কর্তব্য। ইংরেজ সরকার শক্তিশালী, সে বিষয়ে আমার কোন সংশয় নেই। কিন্তু সত্যাগ্রহও যে অব্যর্থ অস্ত্র এই বিষয়েও আমার সংশয় নেই।'

ঝানু সেক্রেটারী মাথা নাড়িয়া বলেন, 'দেখা যাবে।'

শান্তিনিকেতন

রাজকোট হইতে শান্তিনিকেতনে যাই। শিক্ষক ও ছাত্রেরা আমায় প্রেম-ধারায় স্নান করান। আড়ম্বরহীনতায়, কলায় ও প্রেমে অভ্যর্থনা দিব্য রূপ ধারণ করিয়াছিল। কাকা কালেলকরের সহিত ওখানে আমার পরিচয় হয়।

১৯১৫ সনে ভারতে প্রত্যাবর্তনের পর (কস্তুরবা সহ)

খেড়া সত্যাগ্রহ কালে

কালেলকরকে কেন লোকে 'কাকাসাহেব' বলিত তা তখন আমি জানিতাম না। পরে আমি জানিতে পাই যে কেশবরাও দেশপাণ্ডে (আমি যখন বিলাতে ছিলাম তখন তিনিও সেখানে ছিলেন। আমাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব জন্মিয়াছিল) বরোদা রাজ্যে 'গঙ্গানাথ বিদ্যালয়' নামে বিদ্যালয় চালাইতেন। বিদ্যালয়ে পরিবারের আবহ সৃষ্টি করার জন্য শিক্ষকদের 'কাকা', 'মামা', 'আন্না' ইত্যাদি নামকরণ করিয়াছিলেন। এভাবে কালেলকরের নাম হয় 'কাকা', ফড়কে হন 'মামা', হরিহর শর্মা হন 'আন্না'। অন্য শিক্ষকদেরও এমনটা সব নামকরণ হইয়াছিল। পরে কাকার বন্ধু আনন্দানন্দ ও মামার মিত্র পটবর্ধন (আপ্পা) এই পরিবারে যোগ দিয়াছিলেন। এই পরিবারের এই পাঁচজনই একের পর এক আমার সাথী হইয়াছিলেন। দেশপাণ্ডেকে লোকে 'সাহেব' বলিয়া ডাকিত। সাহেবের স্কুল বন্ধ হইয়া গেলে এই পরিবার ছন্নছাড়া হইয়া যায়। তা হইলেও আধ্যাত্মিক যোগ তাঁদের বজায় ছিল। দেওয়া নাম তাঁরা ছাড়েন নাই।

বিভিন্ন সংস্থার কার্যকলাপের অভিজ্ঞতা লাভের জন্য কাকাসাহেব বাহির হইয়া পড়েন। এই উদ্দেশ্যেই সেই সময়টায় তিনি শান্তিনিকেতনে ছিলেন। ওই গোষ্ঠীর আর একজনও ওখানে তখন ছিলেন—চিন্তামন শাস্ত্রী। দুই জনেই এঁরা সংস্কৃত পড়াইতেন।

ফিনিক্স পরিবারের থাকার পৃথক্ ব্যবস্থা শান্তিনিকেতনে করা হইয়াছিল। মগনলাল গান্ধী এই পরিবারের সঞ্চালক ছিলেন। ফিনিক্স আশ্রমের সব নিয়ম ঠিকমত পালন করা হইত—তিনি নিজে পালন করিতেন আর অন্যেরাও করিতেন। দেখিতে পাইয়াছিলাম আপন প্রেম, জ্ঞান ও অধ্যবসায় গুণে শান্তিনিকেতনের সকলের হৃদয় মগনলাল জয় করিয়াছিলেন।

এণ্ডরুজ ত ছিলেনই, পিয়ার্সনও ছিলেন। জগদানন্দবাবু, নেপালবাবু, সন্তোষবাবু, ক্ষিতিমোহনবাবু, নগেনবাবু, শরৎবাবু ও কালিবাবুর সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় আমার হইয়াছিল।

আমার যেমন স্বভাব, ছাত্র ও শিক্ষকদের সহিত ঝাঁ করিয়া এক হইয়া গেলাম। স্বাবলম্বনের কথা পাড়িয়া শিক্ষকদের বলিলাম—ছাত্র-শিক্ষক আপনারা যদি রাঁধুনি বামুন বিদায় করিয়া নিজেরা রান্নাবান্না করেন তা হইলে ছাত্রদের দৈহিক ও নৈতিক কল্যাণের দৃষ্টিতে আপনারা হেঁসেল চালাইতে পাইবেন আর তাতে ছাত্রেরা স্বাবলম্বনের সাক্ষাৎ শিক্ষা লাভ

করিবে। দুইএকজন মাথা নাড়েন। অন্য সকলে প্রস্তাব সাগ্রহে অনুমোদন করেন। নূতন সব কিছু ত যুবকদের ভাল লাগেই। প্রস্তাবটা তারা স্বাগত করিল। আর সে মতে কাজও শুরু হইল। এই বিষয়ে কবিগুরুর মত জিজ্ঞাসা করিতে তিনি আমায় বলিয়াছিলেন, শিক্ষকেরা রাজী হইলে তাঁহার কোন আপত্তি নাই। ছাত্রদের তিনি বলিয়াছিলেন, 'স্বরাজের এটা চাবি।'

পরীক্ষা সফল করার জন্য পিয়ার্সন প্রাণপাত পরিশ্রম করিতে থাকেন। তাঁর উৎসাহের অবধি ছিল না। ছাত্রদের এক দল সবজি কুটিত, অন্য এক দল চাল বাছিত ও ধুইত। রান্নাঘর ও উহার আশপাশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার কাজ খগেনবাবু ও অন্য কয়েকজন নিয়াছিলেন। কোদাল হাতে তাঁদের কাজ করিতে দেখিয়া আমার হৃদয় আনন্দে নাচিত।

কিন্তু এই মেহনতের কাজ সওয়া-শত ছাত্র ও তাদের শিক্ষকেরা এত সহজে লুফিয়া লইবে এটা আশা করা যায় না। তাই প্রতিদিন আলোচনা হইত। কিছু লোক অল্পদিনেই হাঁপাইয়া ওঠে। পিয়ার্সন সহজে ছাড়িবার পাত্র ছিলেন না। হাসিমুখে এটা-ওটা রান্নার কাজ তিনি করিয়া যাইতেছিলেন। ডেক, গামলা ও কড়া ইত্যাদি বড় বাসনকোসন তিনিই মাজিতেন। বাসন মাজা-ঘষার শ্রম লাঘব করার জন্য কয়েকজন ছাত্র তাদের কাজের জায়গায় সেতার আলাপ করিত। যে কোন কাজ ছাত্রেরা উৎসাহভরে করিত। গোটা শান্তিনিকেতন মৌচাকের গুঞ্জনে ভরিয়া উঠিয়াছিল।

এইরূপ পরিবর্তনের কাজ একবার আরম্ভ হয় ত আগাইয়া চলিতেই থাকে। ফিনিক্স পরিবারের লোকেরা নিজেদের রান্নাবান্না নিজেরাই করিত। কেবল তা-ই নয়, তাদের রান্নার ব্যাপার অতীব সাদামাঠা ছিল। মসলার বালাই ছিল না বলিয়া ভাত ডাল তরকারি সব কিছু এমন কি আটার জিনিস পর্যন্ত তারা ভাপে সিদ্ধ করিয়া লইত। বাংলা রান্নার পদ্ধতি বদলানোর উদ্দেশ্যে দুই-একজন শিক্ষক ও জনকয়েক ছাত্র মিলিয়া এরূপ এক রান্নাশালা চালু করিয়াছিল।

এই পরীক্ষা কিছু দিন পরে বন্ধ হইয়া যায়। আমার মনে হয় এই পরীক্ষা দিন কয়েক চালাইয়া বিশ্ববিখ্যাত এই প্রতিষ্ঠানের কোন হানি হয় নাই; কোন কোন পরীক্ষার দ্বারা শিক্ষকেরা লাভবানই হইয়াছিলেন।

ঠিক ছিল শান্তিনিকেতনে কিছু দিন থাকিব। কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা

ছিল আর এক। এক সপ্তাহ যাইতে না যাইতে পুনা হইতে তার আসে গোখেলের দেহাবসান হইয়াছে। শান্তিনিকেতন শোকে ডুবিল। সকলে আমার কাছে দুঃখ জানাইতে আসিল। মন্দিরে বিশেষ সভা হইল। সেই অনুষ্ঠান ভাবগম্ভীর ছিল। সেই দিনই আমি পুনা রওনা হই। সঙ্গে পত্নী ও মগনলাল ছিল। অন্য সকলে শান্তিনিকেতনেই থাকে।

এণ্ডরুজ বর্ধমান পর্যন্ত সঙ্গে আসিয়াছিলেন। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 'ভারতবর্ষে সত্যাগ্রহ করার প্রসঙ্গ আসবে বলে আপনার মনে হয় কি? আসে ত সে কবে?'

উত্তরে বলিয়াছিলাম, 'এ কথার জবাব দেওয়া কঠিন। এক বছর আমি কিছু করব না। এক বছর আমি ঘুরে বেড়াব, সার্বজনিক কোন প্রসঙ্গে মত গঠন করব না, মত ব্যক্ত করব না—এই কথা গোখেল আমার কাছ থেকে নিয়েছিলেন। এই কথা আমি অক্ষরে অক্ষরে পালন করব। এই এক বছরের অন্তেও ঝট্ করে কথা বলব না। তাই আমার মনে হয় বছর পাঁচেকের মধ্যে সত্যাগ্রহের উপলক্ষ্য আসবে না।'

এখানে এ কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, 'হিন্দ্ স্বরাজ'-এ আমি যে মত ব্যক্ত করিয়াছি সে সম্বন্ধে গোখেল পরিহাস করিয়া বলিতেন, 'এক বছর আপনি ভাবতে থাকুন, তখন দেখবেন আপনার চিন্তার বদল হয়েছে।'

তৃতীয় শ্রেণীর লাঞ্ছনা

বর্ধমান হইতে আমাদের তৃতীয় শ্রেণীর টিকেট কেনার ছিল। তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীর যে কিরূপ দুর্ভোগ ভুগিতে হয় তা ওখানে টের পাইয়াছিলাম। টিকেট চাহিলাম; জবাব পাইলাম তৃতীয় শ্রেণীর টিকেট এত আগে দেওয়া হয় না। স্টেশন মাস্টারের কাছে গেলাম। তাঁর কাছে যাওয়াটাই কি সহজ ব্যাপার ছিল? কোন ব্যক্তি দয়া করিয়া দেখাইয়া দেন, ওদিক দিয়া যান। তাঁর কাছ হইতেও অনুরূপ কথাই শুনিলাম। টিকেটের খিড়কি খুলিলে টিকেট কিনিতে গেলাম। কিন্তু সহজে পাওয়ার ছিল না। জোয়ান যাত্রীরা একে একে ঢুকিতেছিল আর আমার মত যারা তাদের পিছনে ঠেলিয়া দিতেছিল। প্রায় প্রথমে গিয়া প্রায় সকলের শেষে টিকেট পাইয়াছিলাম।

গাড়ী আসিল। জোয়ান লোকেরা ঢুকিয়া পড়িল। যারা গাড়ীতে ছিল আর যারা উঠিতে চাহিতেছিল তাদের মধ্যে বচসা ও ধাক্কাধাক্কি চলিল। আমরা তিনে প্লাটফর্মের এদিকে-ওদিকে দৌড়াদৌড়ি করিলাম, সব কামরা হইতেই এক জবাব মিলিল, 'এখানে জায়গা নেই।' গার্ডের কাছে গেলাম। সে বলিল, 'যেখানে পারেন উঠুন, নয়ত পরের গাড়ী ধরবেন।'

মিনতির স্বরে বলিলাম, 'জরুরি কাজে যাচ্ছি।' এই কথায় কান দিবার তার সময় ছিল না। হার মানিলাম। মগনলাল বলিল, 'যেখানে পারেন উঠে পড়ুন।' তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী আমরা স্বামীস্ত্রী 'ইণ্টর' ক্লাশে উঠিলাম। গার্ড চাহিয়া দেখিল।

সে আসানসোল স্টেশনে বাড়তি ভাড়া উসুল করিতে আসিল। তাকে বলিলাম, 'আমাদের জায়গা দেওয়া আপনার কর্তব্য ছিল। কোথাও উঠতে পাইনি বলে এখানে উঠেছি। তৃতীয় শ্রেণীতে জায়গা দিন, সেখানে চলে যাচ্ছি।'

গার্ড সাহেব বলিল, 'তর্ক করবেন না। জায়গা আমার দেওয়ার নেই। পয়সা দিন নয়ত নেমে যেতে হবে।'

যে প্রকারেই হোক পুনা পৌঁছিতে হইবে। অতএব গার্ডের সঙ্গে ঝগড়া করার অবকাশ ছিল না। বাড়তি ভাড়া দিলাম। একদম পুনা তক্ বাড়তি পয়সা আদায় করিল। অন্যায়টা কাঁটার মত বিঁধিল।

সকালে মোগলসরাই পৌঁছিলাম। মগনলাল তৃতীয় শ্রেণীতে আমাদের জন্য বসার জায়গা করিয়া রাখিয়াছিল। আমরা সেখানে গেলাম। টিকেট কলেক্টরকে সব কথা বলিলাম। মোগলসরাইয়ে আমরা তৃতীয় শ্রেণীর গাড়িতে চাপিয়াছি এই প্রমাণপত্র তার কাছে চাহিলাম। দিতে সে অস্বীকার করিল। বাড়তি পয়সা ফিরতির জন্য রেল বোর্ডের কাছে পত্র লিখিলাম। তার জবাবে বোর্ড জানাইল, 'সার্টফিকেট বিনা বাড়তি পয়সা ফেরত দেওয়ার নিয়ম নাই। তবে আপনার বেলায় ফেরত দেওয়া যাচ্ছে। বর্ধমান থেকে মোগলসরাই পর্যন্তকার বাড়তি পয়সা ফেরত দেওয়া যাবে না।'

এর পরের তৃতীয় শ্রেণীর ভ্রমণের অভিজ্ঞতা আমার এত অধিক যে তা বলিতে গেলে এক বই হইয়া যাইবে। কিন্তু দুইচারিটি প্রাসঙ্গিক কথার উল্লেখ করা ছাড়া বেশি বলার অবসর এই কথায় হইবে না। শরীর অপটু

বলিয়া তৃতীয় শ্রেণীতে যাতায়াত আমার বন্ধ করিতে হইয়াছে। সেই বেদনা ভয়ানক বিঁধিয়াছিল আর যত দিন আছি বিঁধিবে।

রেলকর্মচারীদের যা-তা ব্যবহারের ত কথা নাই-ই। তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীর দুর্ভোগের জন্য তাদের নিজেদের উগ্রতা, নোংরাপনা, স্বার্থপরতা ও অজ্ঞতাও কম দায়ী নহে। দুঃখ এখানে যে তারা যে উগ্র ব্যবহার করে, গাড়ীটাকে আস্তাকুড় করিয়া তোলে, নিজেদের স্বার্থ ছাড়া কিছু দেখে না, অনেক সময় দেখা যায় যে এই বোধটা পর্যন্ত তাদের নাই। আমরা শিক্ষিতেরা তাদের কথা ভাবি না এ তারই ফল।

ক্লান্ত শরীরে কল্যাণ জংশনে পৌঁছিলাম। স্টেশনের কল হইতে জল আনিয়া মগনলাল ও আমি স্নান করিয়া লইলাম। ভাবিতেছিলাম পত্নীর স্নানের কি করা যায়। এই সময়ে সর্ভেণ্ট অব ইণ্ডিয়া সোসাইটীর শ্রীকাউল আমাকে দেখিতে পাইয়া আমার কাছে আসেন। তিনিও পুনা যাইতেছিলেন। স্নানের জন্য কস্তুরবাকে দ্বিতীয় শ্রেণীর স্নানঘরে লইয়া যাওয়ার কথা বলিলেন। তাঁর ওই সৌজন্যের সুযোগ লইতে বাধিতেছিল। দ্বিতীয় শ্রেণীর স্নানঘরে স্নান করার অধিকার আমার স্ত্রীর নাই সেই খেয়াল আমার ছিল। কিন্তু শেষটায় দেখি না দেখি করিয়া অনুচিত সুবিধা তাকে লইতে দেই। পত্নী দ্বিতীয় শ্রেণীর স্নানঘরে স্নান করিতে ইচ্ছুক ছিল তা নয়, কিন্তু সত্যের প্রতি আমার টান অপেক্ষা স্ত্রীর প্রতি স্বামীর টান অধিক প্রবল হইল। তাই না উপনিষদ বলিয়াছে—সত্যের মুখ মোহরূপ স্বর্ণ আবরণে ঢাকা।

৬

চাইলাম, পাইলাম না

পুনায় পৌঁছিলাম। উত্তরক্রিয়া ইত্যাদি শেষ হইলে আমাদের সামনে প্রশ্ন খাড়া হইল এখন সোসাইটী কিভাবে চলিবে, আর আমি উহার সদস্য হইব কিনা। সদস্য হওয়া না-হওয়ার প্রশ্নে আমি অতীব সতর্কে কাজ করিয়াছিলাম। গোখেল থাকা কালে সোসাইটীভুক্ত হওয়ার আবশ্যকতা আমার ছিল না; তাঁর আজ্ঞা ও ইচ্ছা অনুসারে চলিলেই হইত। আর তাহাই হইত আমার মনের মত ব্যবস্থা। ভারতের ঝড়ো সমুদ্রে তরী ভাসাইবার

মুখে আমার কাণ্ডারীর দরকার ছিল। গোখেলে আমি সেই কাণ্ডারী পাইয়াছিলাম, নিশ্চিন্ত ছিলাম। কাণ্ডারী চলিয়া গেলেন, দেখিলাম নিজের পায়েই দাঁড়াইতে হইবে। জিনিসটা ভাল না লাগিলেও মনে হইল সোসাইটীর সভ্য হওয়ার চেষ্টা করা আমার কর্তব্য। ভাবিলাম গোখেলের আত্মা তাতে প্রসন্ন হইবে। তাই মন স্থির করিলাম: সংকোচ দূরে ঠেলিয়া সদস্যদের ভয় দূর করার কাজে লাগিলাম।

এই সন্ধিক্ষণে সোসাইটীর প্রায় সকল সদস্য পুনায় আসিয়াছিলেন, তাঁদের আমার কথা বলিলাম; আমা হইতে যে ডর নাই তা বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম। কিন্তু দেখা গেল সভ্যেরা একমত নহেন। এক পক্ষ আমাকে সদস্য করিতে চাহিতেছিল, অন্য পক্ষ করিতেছিল উহার ঘোর বিরোধ। দেখিতে পাইয়াছিলাম আমার ওপর দুই পক্ষেরই টান সমান, তবে আমার প্রতি টান অপেক্ষা সোসাইটীর প্রতি কর্তব্যবোধ বুঝি বা একটু বেশি ছিল, অন্তত আমার ওপরে টানের অপেক্ষা কম ত নয়ই। কাজেই আলোচনায় কোথাও কোন তিক্ততা ছিল না। প্রশ্নটা ছিল তত্ত্বের, ব্যক্তির নয়। বিরোধী পক্ষের মনে হইয়াছিল যে আমার ও তাঁদের দৃষ্টি নানা বিষয়ে উত্তর-দক্ষিণের মত বিপরীত, সুতরাং তাঁদের আশঙ্কা হইয়াছিল যে আমাকে সদস্য করিয়া লইলে যে উদ্দেশ্যে সোসাইটীর স্থাপনা হইয়াছে তা পণ্ড হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। স্বভাবতই তাদের কাছে তা অসহ্য ছিল।

অনেক আলোচনার পরে ঠিক হয় পরের কোন সভায় এই বিষয়ে নির্ণয় করা যাইবে।

বাসস্থানে ফিরিতেছিলাম। মনে নানা প্রশ্ন ঘুরপাক খাইতেছিল: ভোট-বলে সভ্য হওয়া কি আমার পক্ষে ইষ্টের হইবে? গোখেলের প্রতি আমার আনুগত্যের এই কি চিহ্ন? আমার বিরুদ্ধে যদি ভোট যায় ত সে অবস্থায় আমি কি লোকের দৃষ্টিতে সোসাইটীকে ছোট করার নিমিত্ত হইব না? স্পষ্ট দেখা যাইতেছে আমাকে সভ্য করিয়া নেওয়ার প্রশ্নে জোর মতভেদ রহিয়াছে। যতদিন এই মতভেদ থাকিবে ততদিন সোসাইটীতে যোগ দেওয়ার আগ্রহ না করাই সঙ্গত আর তাই আগ্রহ না করিয়া বিরোধী পক্ষকে অসুবিধা হইতে বাঁচানো আমার কর্তব্য। এটাই হইবে গোখেলের প্রতি আমার আনুগত্যের যথার্থ নিদর্শন। অকস্মাৎ এই সিদ্ধান্তে আমি পৌঁছিয়া গেলাম, আর পত্র দ্বারা শাস্ত্রী মহাশয়কে অনুরোধ জানাইলাম যে

আমাকে সদস্য করার জন্য স্থগিত সভা আর যেন তিনি না ডাকেন। বিরোধী পক্ষ আমার সংকল্পে অতীব প্রসন্ন হইলেন। কর্তব্য-সংকটে তাঁরা পড়িয়াছিলেন। তাঁরা বাঁচিলেন। তাঁদের সহিত আমার সম্পর্ক আরও মধুর হইল। সভ্য হওয়ার আবেদন ফিরাইয়া লইলাম না ত সোসাইটীর আমি খাঁটী সভ্য হইলাম।

অভিজ্ঞতা হইতে দেখিতে পাইতেছি যে মামুলী সদস্য না হইয়া ভালই করিয়াছিলাম, আর যাঁরা বিরোধ করিয়াছিলেন তাঁরা সঙ্গত কাজই করিয়াছিলেন। তাঁদের পথ ও আমার পথ যে ভিন্ন ছিল তা অভিজ্ঞতা হইতে সুস্পষ্ট হইয়াছে। কিন্তু এই মতভেদ ফুটিয়া উঠিলেও আমাদের মধ্যে মন-কষাকষি বা তিক্ততা জন্মে নাই। মতভেদ সত্ত্বেও আমরা ভাই ও বন্ধুই থাকিয়া গিয়াছি, আর সোসাইটীর পুনা-গৃহ আমার তীর্থস্থানই রহিয়া গিয়াছে।

সদস্যের ছাপ আমার নাই বটে, কিন্তু অন্তরে আমি সদস্যই। লৌকিক সম্বন্ধ অপেক্ষা আধ্যাত্মিক সম্বন্ধ বহু গুণ শ্রেষ্ঠ। আধ্যাত্মিক সম্বন্ধ বিনা লৌকিক সম্বন্ধ প্রাণশূন্য দেহের সমান।

কুম্ভমেলা

এর পরে ডাক্তার প্রাণজীবনদাস মেহতার সহিত দেখা করার জন্য রেঙ্গুনে যাই। পথে কলিকাতায় স্বর্গীয় ভূপেন্দ্রনাথ বসুর বাটীতে উঠি। বাংলার অতিথিসেবা কী পর্যন্ত যাইতে পারে তার পরিচয় এখানে পাইয়াছিলাম। আমি তখন ফলাহারী ছিলাম। কলিকাতার বাজারে মিলে এমন যতকিছু শুকনা ও টাটকা ফল যোগাড় করা হইয়াছিল। সারারাত ধরিয়া বাড়ীর মেয়েরা পেস্তা আদি জলে ভিজাইয়া তার ছাল ছাড়াইয়াছিলেন। আর ভারতীয় পদ্ধতিতে যত পরিপাটি করিয়া তৈরি করা যায় তত পরিপাটি করিয়া টাটকা ফল তৈরি করিয়াছিলেন। আমার সঙ্গীদের —পুত্র রামদাসও সঙ্গে ছিল—জন্য কত কী যে পদ রান্না হইয়াছিল! এই আন্তরিক অতিথিসেবা ভাল লাগিয়াছিল ত বটেই, দুই-তিনজন অতিথির

কারণে বাড়ীর সব লোক সারাদিন ব্যস্ত ছিল ইহাতে অস্বস্তি বোধ করিয়া‧‧ ছিলাম।

রেঙ্গুনের জাহাজে ডেক প্যাসেঞ্জার ছিলাম। আদরের আধিক্যে বন্ধুগৃহে অস্বস্তি বোধ করিয়াছিলাম, আর জাহাজে জীবন অতিষ্ঠ হইয়াছিল সাধারণ যে সুবিধা না হইলে চলে না সেই সুবিধার অভাবে। স্নানের জায়গাটা এমন ছিল যে তাকে স্নানের জায়গা বলা চলে না: এমন নোংরা যে সেখানে তিষ্ঠানোই কঠিন। পায়খানাটা ছিল নরককুণ্ড সমান। মলমূত্র মাড়াইয়া বা ডিঙাইয়া তথায় যাইতে হইত।

অবস্থাটা অসহ্য ছিল। জাহাজের প্রধান কর্মকর্তার কাছে গেলাম। আমার কথায় লোকটি কান দিল না। নোংরার ও দুর্গন্ধের অবধি ছিল না। যদি বা একআধটু কমতি ছিল যাত্রীদের অবিবেচনায় তা পূরতি হইয়া গিয়াছিল: তারা শোয়া-বসার জায়গায় যেখানে-সেখানে থুথু, বিড়ি-তামাকের অবশেষ, খাদ্যের এঁটো ফেলিতেছিল। গোলমালের কথা নাই বলিলাম। কত বেশি জায়গা দখল করা যায় সেই ফিকিরে সকলে ছিল। নিজেদের জন্য যতটা জায়গা দখল করিয়াছিল তার অধিক মালপত্তর দিয়া আটকাইয়াছিল। এইরূপ কষ্টে আমাদের দুই দিন কাটাইতে হইয়াছিল।

রেঙ্গুনে পৌঁছিবার পরে কোম্পানীর এজেন্টকে অব্যবস্থার কথা জানাই। ওই পত্রের ও ডাক্তার মেহতার এই দিকে চেষ্টার কারণে ফেরার সময় ডেকে তেমন কষ্ট ভুগিতে হয় নাই।

রেঙ্গুনেও দেখিতে পাইয়াছিলাম যে আমার ফলাহারের দরুন বাড়ীর লোকদের কিছুটা অধিক হয়রান হইতে হয়। তবে ডাক্তার মেহতার গৃহ বলিতে গেলে আমারই গৃহ ছিল সুতরাং ফলের রকমারি কিছু কমাইতে পারিয়াছিলাম। কিন্তু এত পদের বেশি খাইব না এমন সীমা বাঁধা ছিল না বলিয়া নানা প্রকারের ফল আসিলেও বাধা দিতাম না। রকম রকম বস্তু দেখিতে ভাল লাগিত আর খাইতেও ভাল লাগিত। খাওয়ার নির্দিষ্ট সময় ছিল না। শেষ খাওয়া সকাল সকাল খাইয়া লইতে চাহিতাম তাই খুব বেশি দেরী হইত না। তবুও আটটা-নয়টা হইয়া যাইত।

বার বছরে একবার হরদ্বারে কুম্ভমেলা হয়। ১৯১৫-তে কুম্ভের যোগ ছিল। কুম্ভে যাওয়ার আগ্রহ ছিল না। তবে গুরুকুলে মহাত্মা মুনশী-রামজীর দর্শনের আকাঙ্ক্ষা ছিল। গোখেলের সেবক-সমাজ বড় একটি

দল কুম্ভে পাঠাইয়াছিল। শ্রীহৃদয়নাথ কুঞ্জরু ওই দলের ব্যবস্থাপক ও স্বর্গীয় দেব প্রধান চিকিৎসক ছিলেন। ওই দলের সহায়তার জন্য ফিনিক্স পার্টিকে কুম্ভে পাঠাইবার অনুরোধ পাইয়াছিলাম। আমার আগেই ফিনিক্স পার্টি লইয়া মগনলাল শান্তিনিকেতন হইতে হরদ্বারে পৌঁছিয়া গিয়াছিল।

কলিকাতা হইতে হরদ্বারে যাইতে কষ্টের একশেষ হইয়াছিল। গাড়ীতে সময় সময় আলো পর্যন্ত ছিল না। সাহারানপুর হইতে ত যাত্রীদের মালগাড়ী বা পশু-গাড়ীতে গাদাইয়া লওয়া হয়। গাড়ীর ছাত ছিল না, আর মেঝেটা ছিল পাত-লোহার। সুতরাং আরামের অন্ত ছিল না—দুপুরের ঝা ঝা রৌদ্রে মাথা পুড়িত আর তপ্ত লোহায় পায়ের তলা জ্বলিত। দেখিয়াছিলাম ওই অবস্থায়ও পিপাসা-কাতর ধর্মবিশ্বাসী হিন্দু 'মুসলমান জল' পান করে নাই। 'হিন্দু জল'-এর অপেক্ষা করিত। এই হিন্দুই অসুস্থ হইলে ডাক্তারের ব্যবস্থা মত মদ্য বা মাংসসার রহিয়াছে এমন ওষুধ বা মুসলমান অথবা খ্রীষ্টান কম্পাউণ্ডরের দেওয়া জল জিজ্ঞাসাবাদ না করিয়া বিনা দ্বিধায় খাইয়া থাকে।

শান্তিনিকেতনে থাকার সময়েই বুঝিতে পারিয়াছিলাম ভারতে ভাঙ্গীর কাজ আমাদের বিশেষ কাজ হইবে। কোন ধর্মশালায় তাঁবু খাটাইয়া সেবকদের থাকার ব্যবস্থা হইয়াছিল। পায়খানার জন্য ডাক্তার দেব গর্ত খোঁড়াইয়াছিলেন। গর্তের মল ডাক্তার দেব মেথর দিয়া সরাইতেন। এরূপ উপলক্ষ্যে পয়সা দিয়াও প্রয়োজন মত মেথর পাওয়া যায় না। ডাক্তার দেবকে আমি বলি যে ফিনিক্স পার্টির লোকেরা গর্তের মল মাটি চাপা দিবে ও ফেলিবার ব্যবস্থা করিবে। আনন্দে ডাক্তার দেব আমার প্রস্তাবে রাজী হন। কাজটা চাহিয়া লইয়াছিলাম আমি আর উহার তাল সামলাইয়াছিল মগনলাল গান্ধী। তাঁবুতে বসিয়া দর্শন দেওয়া ও যারা দেখা করিতে আসিত—আর আসিতও অনেকে—তাদের সহিত ধর্ম বা অন্য বিষয়ের আলোচনা করা আমার মুখ্য কর্ম হইয়াছিল। নাইতে যাইতাম ত সেখানেও দর্শনার্থীর ভিড়, খাইতে বসিতাম ত তখনও মানুষের সার। মুহূর্তও একান্তে থাকিতে পাইতাম না। হরদ্বারে বুঝিতে পাই যে দক্ষিণ আফ্রিকায় আমি যে অল্প-স্বল্প সেবা করিয়াছিলাম তার গভীর প্রভাব সারা ভারতের লোকের ওপর হইয়াছে।

আমি যেন জাঁতার দুই পাটার মধ্যে পড়িয়াছিলাম—পরিচয় না দিলে

অগনতি তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীর যে কষ্ট ভুগিতে হয় সেই কষ্ট ভুগিতে হইত আর পরিচয় দিলে দর্শনার্থীর পাগলপ্রায় অধীরতায় জীবন অতিষ্ঠ হইত। এই দুইয়ের কোন্‌টা যে অধিক করুণার বিষয় ছিল অনেক সময় তা আমি ভাবিয়া পাই না। তৃতীয় শ্রেণীর কষ্টে অসুবিধা আমার হইত বটে কিন্তু রাগ কখনও হইত না। তাহা হইতে আমার লাভই হইত। কিন্তু দর্শনার্থীদের অন্ধ ভক্তি আমাকে প্রায়ই উত্যক্ত করিয়া তুলিত।

ঘোরাফেরার শক্তি সেই সময়ে আমার ছিল আর ভাগ্যবশত লোকের কাছে তেমন পরিচয়ও আমার ছিল না সুতরাং তাদের দৃষ্টি এড়াইয়া ইচ্ছামত যেখানে সেখানে ঘুরিয়া বেড়াইতে পারিতাম। ওই ঘোরাঘুরির সময় যাত্রীদের মধ্যে ধর্মভাবনা অপেক্ষা চঞ্চলতা, ভণ্ডামি ও নোংরামি আমি অধিক দেখিতে পাইয়াছিলাম। পিঁপড়ের ঝাঁকের মত কুম্ভে সাধুদের ভিড় হইয়াছিল ঃ দেখিয়া মনে হইয়াছিল রাবড়ি মালপো খাওয়ার জন্যই তাদের জন্ম।

এখানে আমি পাঁচ-পা গাই দেখিয়াছিলাম। অবাক্ হইয়াছিলাম। ভিতরের কথা জানিত এমন লোকেরা আমার ভুল ভাঙ্গিয়াছিল, বিস্ময় দূর করিয়াছিল। দুষ্ট লোভী লোকের উহা কারসাজি। গাইয়ের কাঁধ চিরিয়া জ্যান্ত কোন বাছুরের পা কাটিয়া জুড়িয়া দিয়া এই ধোঁকার সৃষ্টি করে। আর কসাইয়ের এই ডবল কুক্রিয়া দ্বারা দুষ্ট লোকেরা সরলবিশ্বাসী মানুষের পয়সা লোটে। পাঁচ-পা গাই দেখার লোভ কোন্ হিন্দুর না হয়? আর কোন্ হিন্দু না তা দেখিয়া গদগদ চিত্তে সাধ্যমত দান করিবে?

কুম্ভের দিন আসিল। ধন্য হইলাম। এ নয় যে হরদ্বারে আমি পুণ্য সঞ্চয় করিতে গিয়াছিলাম। পুণ্য কুড়াইবার জন্য তীর্থ করার মোহ কোনদিনও আমার ছিল না। যে সতের লাখ লোক ওখানে আসিয়াছিল বলিয়া প্রকাশ তাদের সকলেই ভণ্ড ছিল বা তামাসা দেখিতে আসিয়াছিল এ কি কখনও সম্ভব? তাদের মধ্যে অসংখ্য মানুষ পুণ্য করিতে, শুদ্ধ হইতে আসিয়াছিল এতে আমার কোনই সন্দেহ নাই। এইরূপ শ্রদ্ধা আত্মাকে কতটা ওপরে তোলে তা বলা অসম্ভব না হইলেও কঠিন।

রাতে শুইলাম ত গভীর চিন্তা আমায় ঘিরিল—চলুক না চারদিকে ভণ্ডামি তবু তারই মধ্যে পবিত্র আত্মাও আছে, ঈশ্বরের দরবারে তাঁরা সাজার পাত্র বলিয়া গণ্য হইবেন না; এই দিনে হরদ্বারে আসা যদি পাপের

হয় ত প্রকাশ্যে সে কথা বলিয়া হরদ্বার আমার ত্যাগ করিতে হয়। কুম্ভ উপলক্ষ্যে আসা ও কুম্ভের দিনে এখানে থাকা যদি পাপের না হয় তবে কোন না কোন কঠিন ব্রত লইয়া চলতি পাপের প্রায়শ্চিত্ত করা কর্তব্য, আত্মশুদ্ধি করা উচিত। ব্রতের ভিত্তিতে আমার জীবন রচিত বলিয়া এরূপ মনে হওয়া স্বাভাবিকই ছিল। মনে পড়িল কলিকাতায় ও রেঙ্গুনে যাঁদের গৃহে উঠিয়াছিলাম আমার দরুন তাঁদের অনাবশ্যক খাটুনির কথা। অতএব আমার খাদ্যবস্তুর সংখ্যা বাঁধিয়া লওয়ার ও শেষ খাওয়া সন্ধ্যার আগে শেষ করার সংকল্প করিলাম। আমি পরিষ্কার দেখিতে পাইলাম যে, খাদ্যবস্তুর সংখ্যা বাঁধিয়া না লইলে ভবিষ্যতেও আমি আমার গৃহস্বামীদের হয়রানির কারণ হইব এবং লোকের সেবা করার জায়গায় লোকের সেবা আমি লইতে থাকিব। অতএব ব্রত গ্রহণ করিলাম ভারতে থাকাকালে চব্বিশ ঘণ্টায় পাঁচ বস্তুর বেশি খাইব না আর সন্ধ্যার পরে খাইব না। এই দুই সংকল্পে যে যে অসুবিধা হইতে পারে তা ভালরূপ ভাবিয়া দেখিয়া লইয়াছিলাম। আর ব্রতে কোথাও ফাঁক না থাকে সে দিকেও দৃষ্টি ছিল। অসুখ হইলে ওষুধ হিসাবে এই বস্তু ওই বস্তু খাইব কি খাইব না, ওষুধ-পথ্যকে খাদ্য বলা চলে কিনা এই সব প্রশ্ন তলাইয়া দেখিয়া প্রতিজ্ঞা করিলাম যে চব্বিশ ঘণ্টায় পাঁচের অধিক খাদ্যবস্তু গ্রহণ করিব না।

তের বছর হইল এই ব্রত লইয়াছি। কঠিন পরীক্ষা এই ব্রতে আমার দিতে হইয়াছে। কিন্তু ব্রত যেমন আমাকে যাচাই করিয়া লইয়াছে তেমনি তা আমাকে ঢালের মত রক্ষাও করিয়াছে। আমার বিশ্বাস এই ব্রতের কারণে আমার আয়ু কিছুটা বৃদ্ধি পাইয়াছে, এবং নানা অসুখের হাত হইতে আমি রক্ষা পাইয়াছি।

৮

লক্ষ্মণঝোলা

বিশালবপু মহাত্মা মুনশীরামের দর্শন পাইলাম, তাঁর গুরুকুল দেখিলাম। শান্তি পাইলাম। হরদ্বারের গোলমাল আর গুরুকুলের শান্তি এই দুইয়ের ব্যবধান মুহূর্তে ধরা পড়িল।

মহাত্মার অপার ভালবাসায় অভিভূত হইয়াছিলাম। আমার সেবা করিয়া

যেন ব্রহ্মচারীদের মন উঠিতেছিল না। এখানে রামদেবজীর সহিত পরিচয় হয়। কত শক্তি ও সামর্থ্যের যে তিনি আধার তাঁকে দেখামাত্র তা বুঝিতে পাই। কোন কোন বিষয়ে মতভেদ থাকিলেও আমাদের মধ্যে গাঢ় বন্ধুত্ব জমিয়াছিল।

গুরুকুলে শিল্প-শিক্ষার ব্যবস্থা করার বিষয়ে রামদেবজী ও অন্য শিক্ষকদের সহিত খুব আলোচনা হইয়াছিল। গুরুকুল হইতে চলিয়া আসিবার কালে বেদনা অনুভব করিয়াছিলাম।

লক্ষ্মণঝোলার প্রশংসা অনেকের কাছে শুনিয়াছিলাম। লক্ষ্মণঝোলা হৃষীকেশ হইতে কিছু দূরে। হরদ্বার ত্যাগের পূর্বে লক্ষ্মণঝোলা যেন অবশ্যই আমি দেখি এই অনুরোধ বহু বন্ধু করিয়াছিলেন। হৃষীকেশে যাওয়ার সংকল্প মনে ছিলই। পায়ে হাঁটিয়া দুই দিনে দুই দফায় এই দুই তীর্থে গিয়াছিলাম।

হৃষীকেশে অনেক সন্ন্যাসী দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। আমার প্রতি তাঁদের এক জনের খুব টান জন্মে। ফিনিক্স পার্টি আমার সঙ্গে ছিল, তাদের তিনি নানা কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন।

আমাদের মধ্যে ধর্মের আলোচনা হইয়াছিল। ধর্মের প্রতি আমার তীব্র আকাঙ্ক্ষা তিনি লক্ষ্য করিয়াছিলেন। গঙ্গাস্নান করিয়া যখন ফিরিতে-ছিলাম তখন তিনি দেখিতে পান যে আমার মাথায় টিকি ও দেহে পইতা নাই। তিনি বলেন :

'আস্তিক হয়ে আপনি না রেখেছেন টিকি, না পরেছেন পইতে। এতে আমি বড় দুঃখ পাচ্ছি। এই দুই হিন্দুর বাহ্য চিহ্ন। যে কোন হিন্দুর এ দুটি ধারণ করা কর্তব্য।'

এই দুই কেন ছাড়িয়াছিলাম সেই ইতিহাস এই। পোরবন্দরের কথা। তখন আমার বয়স দশ। দেখিতাম ওখানকার ব্রাহ্মণ বালকদের পইতায় ঝোলানো চাবির গোছা ঝন্‌ঝন্‌ শব্দে বাজিত। আমার হিংসা হইত। তেমনটা করার জন্য আমার খুব ইচ্ছা হইত। তখন কাঠিয়াওয়াড়ের বৈশ্য সমাজে পইতার রেওয়াজ ছিল না। প্রথম তিন বর্ণের লোকদের পইতা পরা কর্তব্য এমনটা আন্দোলন তখন শুরু হইয়াছিল। তার ফলে গান্ধী গোষ্ঠীর কেউ কেউ পইতা লইয়াছিল। যে ব্রাহ্মণ আমাদের তিন ভাইকে রামরক্ষা শ্লোক শিখাইতেন তাঁর হাতে আমাদের পইতা হয়। যদিও আমার

চাবির গোছা রাখার কোনই দরকার ছিল না তবুও একগোছা চাবি পইতায় বাঁধিয়া তা আমি দেখাইয়া বেড়াইতাম। কিছু দিন পরে পইতা যখন ছিঁড়িয়া যায় আর নূতন পইতা লওয়া হয় নাই; মোহ উহার দূর হইয়াছিল কিনা বলিতে পারি না।

বড় হইলে কি ভারতে কি দক্ষিণ আফ্রিকায় হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধুরা আবার পইতা লওয়ার জন্য আমাকে ধরাধরি করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁদের যুক্তিতে আমি কোন সার খুঁজিয়া পাই নাই। শূদ্র পইতা পরিতে পায় না ত অন্য বর্ণ তা পরিবে কেন? যে বাহ্য বস্তুর রেওয়াজ আমাদের গোষ্ঠীতে ছিল না তা ধারণ করার পক্ষে কোন সবল যুক্তি আমি দেখিতে পাই নাই। পইতা বলিয়া পইতায় আমার কোন আপত্তি ছিল না, কিন্তু কেন যে তা পরিব সে কারণ দেখিতে পাইতেছিলাম না।

বৈষ্ণব বলিয়া গলায় আমার কণ্ঠী ছিল। টিকি গুরুজনদের কথায় রাখিতে হইত। খালি মাথায় দেখিলে গোরারা হাসিবে, জঙ্গলী মনে করিবে, এই ভয়ে (এমনটাই তখন আমার মনে হইয়াছিল) বিলাত যাওয়ার সময় আমি টিকি বাদ দিয়াছিলাম। এই দুর্বলতারই কারণে দক্ষিণ আফ্রিকায় আমি আমার ভাইপো ছগনলালকে তার ধর্মবিশ্বাসে সুতরাং মর্মেও আঘাত দিয়া টিকি কাটিয়া ফেলিতে বাধ্য করিয়াছিলাম, যদিও বাহানাটা ছিল এই যে টিকি রাখিলে দশের কাজে তা বাধক হইবে।

এই বৃত্তান্ত দিয়া স্বামীকে আমি স্পষ্ট বলিয়াছিলাম:

'পইতা আমি পরব না। অগণিত হিন্দু পইতা না পরলেও হিন্দু বলে গণ্য হয় তাই পইতা পরার আবশ্যকতা আমি দেখি না। তা ছাড়া, পইতা নেওয়ার অর্থ পুনরায় জন্ম নেওয়া, অর্থাৎ আপন সংকল্পে আপনি শুদ্ধ হওয়া, উর্ধ্বগামী হওয়া। হিন্দু সমাজের ও ভারতবর্ষের এই পতিত অবস্থায় মহান্ ভাবের চিহ্ন এই পইতা ধারণ করার অধিকার আমাদের কোথায়? হিন্দু সমাজ অস্পৃশ্যতার পাপ যখন ধুয়ে ফেলবে, উচ্চ-নীচ ভেদভাব ভুলে যাবে, যে সব দোষ আমাদের পেয়ে বসেছে তা দূর করবে, চারদিকে যে অধর্ম ও ভণ্ডামি চলেছে তা থেকে মুক্ত হবে, তখন পইতা লওয়ার অধিকার তার জন্মাবে। তাই পইতা নেওয়ার কথায় মন সাড়া দিচ্ছে না তবে টিকি রাখার সম্বন্ধে আপনি যা বলেছেন তা নিশ্চয় ভেবে দেখব। টিকি আমার ছিলও। লজ্জা ও ভয়ের কারণ তা আমি কেটে ফেলেছি। মনে হচ্ছে

তা ধারণ করা উচিত। আমার সঙ্গীদের সহিত এই কথা আলোচনা করব।'

পইতার কথায় যা বলিয়াছিলাম তা স্বামীর ভাল লাগে নাই। পইতা ধারণের বিরুদ্ধে যে যুক্তি আমি দিয়াছিলাম তাঁর দৃষ্টিতে তা-ই ছিল পইতা ধারণের পক্ষে যুক্তি। পইতার বিষয়ে হৃষীকেশে যে মত ব্যক্ত করিয়াছিলাম আজও আমার প্রায় তাহাই মত। যতদিন ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম থাকিবে ততদিন প্রত্যেক ধর্মের কোন এক বাহ্য নিশানার আবশ্যকতা সম্ভবত থাকিবে। কিন্তু যখন বাহ্য চিহ্ন আড়ম্বরমাত্র হইয়া দাঁড়ায় অথবা অন্য ধর্ম অপেক্ষা নিজ ধর্মকে উঁচু সপ্রমাণ করার উপায়রূপে ব্যবহৃত হয় তখন তা ত্যাজ্য হওয়ার যোগ্য হয়। আমি মনে করি না পইতা এখন হিন্দুধর্মকে ওপরে তোলার সাধন। তাই পইতার বিষয়ে আমি উদাসীন।

আমার পক্ষে টিকি ত্যাগ করাটা লজ্জার বিষয় ছিল। সুতরাং বন্ধুদের সহিত আলোচনা করিয়া শিখা রাখার সংকল্প করি।

এবার লক্ষ্মণঝোলার কথায় ফিরিয়া যাই: হৃষীকেশ ও লক্ষ্মণঝোলার প্রাকৃতিক শোভা মন কাড়িয়া লইল। আমাদের পূর্বজদের প্রকৃতির সৌন্দর্য দেখার ও সেই সৌন্দর্যকে ধর্মভাবে মণ্ডিত করার অদ্ভুত দূরদর্শী নিপুণতার কথা স্মরণ করিয়া তাঁদের চরণে আমার মাথা লুটাইয়া পড়িল।

কিন্তু এই রমণীয় স্থান দেখিয়া শান্তি পাইলাম না—কি অবস্থাই না মানুষ তার করে! হরদ্বারের মত হৃষীকেশের রাস্তা ও গঙ্গার সুন্দর কিনারাও মানুষ নোংরা করে। গঙ্গার পবিত্র জল দূষিত করিতেও তাদের বাধে না। মানুষের যাওয়া-আসার স্থান বাদ দিয়া একটু দূরে পায়খানায় বসিলেও হয়, তা নয় সেই সব জায়গায়ই বসে। এই দৃশ্য অন্তরে ভীষণ লাগিয়াছিল।

দেখিতে পাইলাম লক্ষ্মণঝোলা গঙ্গার ওপরে লোহার ঝুলানো পুল বই কিছুই নয়। লোকের কাছে শুনিয়াছিলাম পূর্বে ওখানে সুন্দর দড়ির সাঁকো ছিল। কোন দানশীল মাড়োয়ারীর মাথায় বুদ্ধি গজাইল দড়ির ঝোলা ফেলিয়া দিয়া লোহার পুল করিয়া দেওয়া যাক। বহু অর্থ ব্যয়ে পুল তৈরি করিয়া তার চাবি সে ব্যক্তি গবর্নমেণ্টের হাতে সঁপিয়া দেয়! দড়ির সাঁকো দেখি নাই অতএব জানি না তা কেমন ছিল। তবে বলিতে পারি যে ওই আবেষ্টনে লোহার পুল অত্যন্ত বেমানান ও শূচক্ষুল মনে হইয়াছিল। তখন আমি রাজভক্ত প্রজা

ছিলাম, তাহা হইলেও তীর্থার্থীদের পুলের চাবি সরকারের হাতে দেওয়া রাজভক্ত আমার কাছেও অসহ্য বোধ হইয়াছিল।

পুলের ওপারে স্বর্গাশ্রম। তা আরও অধিক দুঃখদ দৃশ্য। টিনে তৈরি আস্তাবলের মত গৃহসমষ্টির নাম দেওয়া হইয়াছে স্বর্গাশ্রম। লোকের মুখে শুনিয়াছিলাম সাধকদের জন্য ওগুলি তৈরি হইয়াছে। এখন প্রায় কেউ সেখানে ছিল না। উহার পাশের মুখ্য গৃহে যারা ছিল তাদের দেখিয়াও মন খুশী হইয়াছিল তা নয়।

কিন্তু হরদ্বারের অনুভব আমার জীবনের অমূল্য সম্পদ্ হইয়া যায়। কোথায় বসিব আর কি করিব এই বিষয়ের নির্ণয়ের পক্ষে হরদ্বারের অভিজ্ঞতা খুব কাজে আসিয়াছিল।

৯

আশ্রম স্থাপন

কুম্ভে যাওয়ার আগে আর একবার আমি হরদ্বারে গিয়াছিলাম।

সত্যাগ্রহ আশ্রমের প্রতিষ্ঠা হয় ১৯১৫ সনের ২৪শে মে। শ্রদ্ধানন্দজী আমাকে হরদ্বারে বসিতে বলিয়াছিলেন। কলিকাতার কয়েকজন বন্ধু বৈদ্যনাথধামে বসার পরামর্শ দিয়াছিলেন। অন্য অনেকের খুব আগ্রহ ছিল আমি রাজকোটে বসি। কিন্তু আমি যখন অহমদাবাদ হইয়া যাইতেছিলাম তখন অহমদাবাদে বসার জন্য অনেকে পীড়াপীড়ি করিয়া বলেন যে তাঁরা আশ্রমের খরচের ভার লইবেন। আশ্রমের জন্য বাড়ী দেখিয়া দিবেন।

আমার মন অহমদাবাদের দিকে ঝোঁকে। গুজরাটী বলিয়া গুজরাটী ভাষার মাধ্যমে দেশের প্রকৃষ্ট সেবা করিতে পারিব এইরূপ আমার মনে হয়। এক সময়ে অহমদাবাদ হাত-তাঁতের কেন্দ্র ছিল তাই মনে হইয়াছিল ওখানে চরকার কাজ চলিবে। অহমদাবাদ রাজধানী বলিয়া ওখানকার ধনীলোকের কাছ হইতে অন্য জায়গা হইতে অধিক আর্থিক সাহায্য পাওয়া যাইবে এই আশাও মনে ছিল।

অহমদাবাদের বন্ধুদের সহিত অন্য সব কথার মধ্যে অস্পৃশ্যদের সম্বন্ধেও কথা হয়। বন্ধুদের সাফ বলি যে আশ্রমে রাখার যোগ্য অস্পৃশ্য পাই ত আশ্রমে রাখিব।

'আপনি যেমন চান তেমন অন্ত্যজ আপনি কোথায় পাবেন?' এই কথায় কোন বৈষ্ণব বন্ধু নিজ মনকে সান্ত্বনা দেন।

শেষ পর্যন্ত অহমদাবাদে বসাই ঠিক করিলাম।

থাকার ঠাঁইয়ের ব্যাপারে অহমদাবাদের ব্যারিস্টার শ্রীজীবনলাল দেশাই সর্বাপেক্ষা অধিক সাহায্য করিয়াছিলেন। তাঁর কোচরব-এর বাংলা তিনি ভাড়া দিতে চান ও আমরা নিতে রাজী হই।

প্রথম প্রশ্ন ছিল আশ্রমের নাম নির্ণয়। বন্ধুদের মত জানিতে চাহিলাম। সেবাশ্রম, তপোবন ইত্যাদি নাম পাওয়া যায়। সেবাশ্রম নামটা ভাল লাগিয়াছিল। কিন্তু নামটাতে সেবার রূপনির্দেশ ছিল না। মনে হইল তপোবন নাম রাখা যাইবে না তার কারণ তপশ্চর্যা আমার প্রিয় হইলেও তপস্যার জন্য আমরা বসিতেছিলাম না, তা ছাড়া নামটাও ছিল একটু বেশি জাঁকালো। আমাদের করার ছিল সত্যের সন্ধান ও আরাধনা, রাখার ছিল সত্যের আগ্রহ, ভারতবাসীর সামনে ধরার ছিল দক্ষিণ আফ্রিকায় যে পদ্ধতিতে কাজ করিয়াছিলাম সেই পদ্ধতি ও পরখ করার ছিল তা এখানে কতটা ব্যাপক রূপ ধরে সেই বস্তু। তাই আমি ও আমার সাথীরা 'সত্যাগ্রহ আশ্রম' নাম দেওয়া ঠিক করি। এই নামে আমাদের লক্ষ্য ও তাতে পৌঁছার পদ্ধতির রূপ ঠিক ঠিক ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

আশ্রমের জন্য নিয়মাবলী দরকার ছিল। অতএব কতকগুলি নিয়ম মুসাবিদা করিয়া নানা ব্যক্তির নিকট তার নকল পাঠাইয়া অভিমত চাহিয়াছিলাম। যে সকল অভিমত পাইয়াছিলাম তার মধ্যে সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিমতের কথা আমার মনে আছে। নিয়মগুলি সার গুরুদাসের পছন্দ হইয়াছিল। তবে তিনি বলিয়াছিলেন যে যুবকদের মধ্যে বিনয়ের বিশেষ অভাব দেখা যায় তাই বিনয় নানা ব্রতের একটি হওয়া আবশ্যক। বিনয়ের অভাব আমিও লক্ষ্য করিয়াছিলাম। কিন্তু বিনয়কে ব্রত বলিয়া গ্রহণ করিলে বিনয় বিনয় থাকিবে না এই আশঙ্কা আমার হইয়াছিল। বিনয়ের পূর্ণ অর্থ শূন্যতা। অন্য ব্রতের সহায়ে শূন্য হইতে হয়। শূন্যতা মানে মোক্ষাবস্থা। মুমুক্ষুর তথা সেবকের প্রতি কার্যে যদি নম্রতা অর্থাৎ নিরভিমানতা না থাকে ত সে মুমুক্ষু নয়, সেবক নয়। সে স্বার্থপর, সে অহংকারী।

আশ্রমে এই সময়ে প্রায় তেরজন তামিল ছিল। পাঁচটি তামিল বালক

আমার সঙ্গে দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে আসিয়াছিল। অন্যেরা ভারতের নানা ভাগ হইতে জুটিয়াছিল। সবে মিলিয়া স্ত্রীপুরুষে আমরা পঁচিশ জন ছিলাম।

এইভাবে আশ্রমের পত্তন হয়। একই হেঁসেলে আমরা খাইতাম, একই পরিবারের লোকের মত চলিতে চেষ্টা করিতাম।

১০

কষ্টিপাথরে

আশ্রম স্থাপনার মাস কয়েক মধ্যে এক অভাবনীয় পরীক্ষায় আমার পড়িতে হয়। ভাই অমৃতলাল ঠক্করের এই পত্র পাইলাম: 'এক গরীব সৎ অন্ত্যজ পরিবার আপনার আশ্রমে থাকতে চায়। তাদের নেবেন কি?'

চমকিয়া উঠিলাম। ঠক্কর বাপার মত ব্যক্তির সুপারিশ লইয়া এত শীঘ্র কোন অন্ত্যজ পরিবার আশ্রমে আসার অনুমতি চাহিবে এ কথা আমি মোটেই ভাবি নাই। পত্র সঙ্গীদের দেখাইলাম। খুশী হইয়া সকলে বলিল, 'খুব ভাল হবে।'

পরিবারের সকলে আশ্রমের নিয়মমত চলিতে রাজী থাকে ত তাদের আশ্রমে লইতে আমরা প্রস্তুত এ কথা আমি ভাই অমৃতলাল ঠক্করকে জানাইলাম।

দূদাভাই, তার পত্নী দানী বহেন আসিল। আর আসিল তাদের একরত্তি কন্যা হামাগুড়ি দেওয়া লক্ষ্মী। দূদাভাই বোম্বাইতে শিক্ষকের কাজ করিত। আশ্রমের সকল নিয়ম মানিয়া চলিতে তারা রাজী হইল। আশ্রমে তাদের লওয়া হইল।

আশ্রমের সহায়ক বন্ধু মহলে হইচই পড়িয়া গেল। কুয়া হইতে জল তোলার পক্ষে অসুবিধা হইতে লাগিল। কুয়াটা এজমালি ছিল। বাংলার অংশীদাররা বাগড়া দিতে লাগিল। জেলওয়ালা* বলিতে শুরু করিল তোমাদের বালতির জলের ছিটায় আমি অশুচি হইয়া যাইব। গালিগালাজ আর দূদাভাইকে মারধর আরম্ভ করিল। সকলকে আমি বলিয়া দিয়াছিলাম গালাগালি গায়ে মাখিবে না কিন্তু জল তুলিতেও ছাড়িবে না। চুপটি করিয়া

* জেল—কুয়া হইতে জল তোলার চামড়ার তৈরি বড় পাত্র।

গালি সহিতে দেখিয়া জেলওয়ালা লজ্জা পাইল, গালাগালি করা বন্ধ করিল।

কিন্তু আর্থিক সাহায্য একদম বন্ধ হইয়া গেল। আশ্রমের নিয়ম পালন করার মত যোগ্য অন্ত্যজ পরিবার মিলিবে না বলিয়া যে বন্ধু ধরিয়া লইয়াছিলেন তিনি ভাবিতেই পারেন নাই যে এমন পরিবার আসিয়া জুটিবে।

টাকা বন্ধ ত হইলই। সাথে সাথে এ কথাও শোনা গেল যে আমাদের একঘরে করিবে। সঙ্গীদের সহিত কথাবার্তা বলিয়া ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলাম যে, আমাদের একঘরে করা হইলেও, কোথাও হইতে কোন সহায়তা না আসিলেও, আমরা অহমদাবাদ ছাড়িয়া যাইব না; অন্ত্যজদের বস্তিতে গিয়া তাদের সঙ্গে থাকিব; সাহায্য যদি বা যা আসে তা দিয়া চালাইব নয়ত মজুরি করিব।

শেষটায় অবস্থা এমন দাঁড়াইল যে মগনলাল আমাকে নোটিশ দিল, 'সব ফুরিয়ে গেছে। আসছে মাসের খরচ আমাদের নেই।'

বিনা উদ্‌বেগে বলিলাম, 'সে স্থলে অন্ত্যজদের ওখানে গিয়ে থাকব।'

এইরূপ সংকটে এর আগেও পড়িয়াছিলাম। যখনই বিপদে পড়িয়াছি শেষ মুহূর্তে ঈশ্বর সাহায্য করিয়াছেন। মগনলালের নোটিশ পাওয়ার দিন কয়েক পরে একদিন সকালবেলা একটি ছেলে আসিয়া বলিল, 'বাইরে মোটর দাঁড়িয়ে আছে। এক শেঠ আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।' তাঁর কাছে গেলাম। শেঠ বলিলেন, 'আমার ইচ্ছা আশ্রমকে কিছু সাহায্য করি। নেবেন?'

'অবশ্যই নেব। বলতে কি এখন আমাদের হাতে কিছুই নেই।'

'কাল এই সময়ে আমি আসব। আপনি তখন থাকবেন ত?'

'হাঁ, থাকব।'

শেঠ চলিয়া গেলেন।

পরদিন নির্দিষ্ট সময়ে মোটর আসিয়া দাঁড়াইল। ভেপুর শব্দ হইল। বালকেরা আসিয়া খবর দিল। শেঠ ভিতরে আসিলেন না। দেখা করিতে গেলাম। আমার হাতে ১৩,০০০ টাকার নোট দিয়া ভদ্রলোক চলিয়া গেলেন।

এই সাহায্য পাইবার আশা আমি করি নাই। আর সাহায্য করার ধরনও ছিল অদ্ভুত। এর পূর্বে আশ্রমে কখনও তিনি আসেন নাই। মনে

পড়ে একবার তাঁকে দেখিয়াছিলাম। না আশ্রমে আসা, না কিছু জিজ্ঞাসা করা, সাহায্য দেওয়া ও চলিয়া যাওয়া। এরূপ অভিজ্ঞতা ওই আমার প্রথম। এই দানে অন্ত্যজ বস্তিতে যাওয়ার প্রশ্ন থাকিল না। প্রায় এক বছরের মত আমরা নিশ্চিন্ত হইলাম।

বাহিরের মত আশ্রমের ভিতরেও ঝড় বহিতেছিল। যদিও দক্ষিণ আফ্রিকায় অন্ত্যজেরা আমাদের বাড়ীতে আসিত, থাকিত, খাইত, তা হইলে কি হয়, আশ্রমে অন্ত্যজ পরিবারের থাকাটা আমার পত্নীর কি অন্য স্ত্রীলোকদের ভাল লাগিত না। দানী বহেনের উপর তাদের ভাবটা বিরূপ না হইলেও উপেক্ষার যে ছিল তা আমার সজাগ চোখেকানে ধরা পড়িত। টাকা বন্ধ হওয়ার ভয়টা আমার কাছে মোটেই দুর্ভাবনার বিষয় ছিল না। কিন্তু ভিতরের এই অসন্তোষ আমার পক্ষে সহ্য করা কঠিন হইয়াছিল। দূদাভাই লেখাপড়া সামান্য জানিত, তবে সে বেশ বুদ্ধিমান ছিল। তার ধৈর্য আমার ভাল লাগিয়াছিল। কখন কখন সে চটিয়া যাইত বটে তবে মোটের ওপর তার সহনশক্তিতে আমি মুগ্ধ হইয়াছিলাম। আমি তাকে বুঝাইয়া বলিয়াছিলাম যে ছোটখাট অপমান যেন সে গায়ে না মাখে। তাহাই সে করিত আর দানী বহেনকেও মানাইয়া লইত।

এই পরিবারকে আশ্রমে শামিল করিয়া লওয়াটা আশ্রমের পক্ষে খুব শিক্ষাপ্রদ হইয়াছিল। আশ্রমে যে অস্পৃশ্যতার ঠাঁই নাই ইহা সকলে পরিষ্কার বুঝিতে পায়। যারা আশ্রমে সাহায্য করিতে চাহিত তারা বুঝিয়া-শুনিয়া কাজ করার সুযোগ পায় আর ফলে আশ্রমের কাজ অনেকটা সহজ হইয়া যায়। ইহা সত্ত্বেও আশ্রমের দিন দিন বাড়িয়া-চলা খরচের মোটা অংশ গোড়া হিন্দুরাই যোগাইয়া আসিয়াছে। ইহা হইতে স্পষ্ট দেখা গিয়াছে যে অস্পৃশ্যতা মূলেই অনেকটা ঘায়েল হইয়াছে। অন্য ভাল প্রমাণ আরও অনেক আছে। তবে যে আশ্রমে অন্ত্যজদের সহিত আহার পর্যন্ত চলে সে আশ্রমে সনাতনী হিন্দুরা বিনা কুণ্ঠায় অর্থ সাহায্য করে ইহা কিছু তুচ্ছ প্রমাণ নহে।

এই সম্পর্কেই আশ্রমে যে আর একটা জিনিস স্পষ্ট হইয়াছিল, যে সব বাধা-বিঘ্ন পার হইতে হইয়াছিল—সত্যের প্রয়োগের সেই সব আবশ্যিক কথার বর্ণনা বাদ দিয়া যাইতে বাধ্য বলিয়া আমি দুঃখিত। এই ত্রুটি পরের প্রকরণগুলিতেও থাকিবে। অনেক গুরুত্বপূর্ণ কথা আমার বাদ দিতে

হইবে কারণ সে সবের সহিত সম্বন্ধ ছিল এমন অনেকে বাঁচিয়া আছেন। মনে হইতেছে তাঁদের অনুমতি বিনা তাঁদের নাম ও যে সব কথার সহিত তাঁদের সম্পর্ক ছিল সে সব কথা বলা সঙ্গত হইবে না। তাঁদের সম্মতি লওয়া ও সময় সময় তাঁদের সম্বন্ধে যা লিখিব তা তাঁদের কাছে পাঠাইয়া যাচাই করিয়া লওয়া সম্ভব হইবে না। আর তা আত্মকথার সীমার বাইরেকার কথাও বটে। অতএব আমার ভয়, এর পরের কথা আমার দৃষ্টিতে সত্যের সাধকের পক্ষে জানার যোগ্য হইলেও, অপূর্ণ রূপেই মাত্র দেওয়া যাইবে। তাহা হইলেও আমার ইচ্ছা ও আশা এই যে, ভগবান পৌঁছিতে দেন ত অসহযোগের যুগ পর্যন্ত পৌঁছিয়া যাইব।

১১
গিরমীট প্রথা রদ

ভিতর-বাহিরের যে সকল ঝড়ের মধ্য দিয়া আরম্ভে আশ্রমের চলিতে হইয়াছিল সে কথা ক্ষণকাল স্থগিত রাখিয়া অন্য যে কার্যে তখন হাত দিতে হয় তা সংক্ষেপে বলিয়া লইব।

পাঁচ কি তার কম বছরের একরারে যে সব মজুর ভারত হইতে বাইরে মজুরি করিতে যাইত তাদের গিরিমীটিয়া বলা হইত। নাতালের গিরিমীটিয়াদের বার্ষিক তিন পাউণ্ড কর দিতে হইত। স্মার্ট-গান্ধী চুক্তি অনুসারে ১৯১৪ সালে সেই কর উঠিয়া যায়, কিন্তু গিরমীট প্রথা চলিতে থাকে।

১৯১৬ সনের মার্চ মাসে ভারতভূষণ পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য কেন্দ্রীয় বিধান সভায় এই প্রশ্ন তোলেন এবং প্রস্তাব স্বীকার করিয়া লইয়া লর্ড হার্ডিঞ্জ ঘোষণা করেন যে, 'যথা সময়ে' এই প্রথা রদ করার প্রতিশ্রুতি তিনি সম্রাটের নিকট হইতে পাইয়াছেন। কিন্তু আমার মনে হইল যে এরূপ আমতা-আমতা কথার ওপর নির্ভর করা যায় না, এবং দেরী না করিয়া উহা রদ করানোর আন্দোলন শুরু করা আবশ্যক। ভারত তার কর্তব্যে অবহেলা না করিলে এই প্রথা অনেক আগেই উঠিয়া যাইত। এ কথাও মনে হইয়াছিল যে, আন্দোলনের উপযুক্ত সময় উপস্থিত আর আন্দোলন করিলে সহজেই এই প্রথা রদ হইয়া যাইবে। কয়েকজন নেতার সহিত দেখা করিলাম;

সংবাদপত্রে লিখিলাম। দেখিতে পাইলাম জনসাধারণ অবিলম্বে এই প্রথার উচ্ছেদ চায়। এই ব্যাপারে সত্যাগ্রহ করা চলে কিনা এরূপ জিজ্ঞাসা মনে জাগে। মন বলে কেন নয়? নিশ্চয় করা চলে। কিন্তু তার পথ কি তা আমি জানিতাম না।

ভাইসরয় ইতিমধ্যে 'যথা সময়ে'-এর অর্থ স্পষ্ট করিয়া দেন, বলেন যে 'ইহার বদলে অন্য ব্যবস্থা যখন করা যাবে তখন এই প্রথা রঁদ করা হবে।'

তাই ভারতভূষণ পণ্ডিত মালব্যজী ১৯১৭ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে গিরমীটিয়া প্রথা বিনা বিলম্বে রদ করা হোক এইরূপ প্রস্তাব আনার অনুমতি চান। লর্ড চেমসফর্ড তা নামঞ্জুর করিয়া দেন। এই প্রসঙ্গে আমার ভারত-পরিক্রমা আরম্ভ হয়।

মনে হইল যে আন্দোলন শুরু করার পূর্বে ভাইসরয়ের সহিত কথা বলা সঙ্গত হইবে। দেখা করিতে চাহিলাম, সঙ্গে সঙ্গে তিনি তারিখ দিলেন। সেই সময়ে মি· মেকী (এখন সার জন মেকী) তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারী ছিলেন। মি· মেকীর সহিত আমার ভাল ভাব হয়। লর্ড চেমসফর্ডের সহিত সন্তোষজনক কথা হয়। সঠিক করিয়া কিছু না বলিলেও তিনি আশ্বাস দেন যে তিনি চেষ্টা করিবেন।

বোম্বাই হইতে আমার কার্য শুরু হয়। ইম্পিরিয়ল সিটীজেনশিপ এসোসিয়েশনের নামে মি· জাহাঙ্গীর পেটিট সভা ডাকেন। সভার প্রস্তাব মুসাবিদা করার জন্য এক বৈঠক বসে। সেই বৈঠকের সদস্য ছিলেন ডা. রীড, মি· (এখন সার) লল্লুভাই শামলদাস, মি· নটরাজন প্রভৃতি। মি· পেটিট ত ছিলেনই। নির্ণয় করার ছিল গিরমীটিয়া প্রথা তুলিয়া দেওয়ার জন্য সরকারকে কত দিনের মিয়াদ দেওয়া হইবে। 'যত শীঘ্র সম্ভব', '৩১শে জুলাইয়ের মধ্যে' ও 'অবিলম্বে' এই তিন প্রস্তাব বৈঠকে আলোচিত হয়। ৩১শে জুলাই-প্রস্তাব আমার ছিল। আমি নির্দিষ্ট তারিখের পক্ষে ছিলাম, কেন না সেই তারিখের মধ্যে কিছু না হইলে পরের কর্তব্য ঠিক করার ছিল। লল্লুভাই 'অবিলম্বে'-প্রস্তাবের পক্ষে ছিলেন। তাঁর যুক্তি ছিল এই যে, '৩১শে জুলাই' অপেক্ষা 'অবিলম্বে' কম সময় বোঝায়। বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিলাম যে, 'অবিলম্বে'-এর অর্থ জনসাধারণ বুঝিবে না; জনসাধারণকে যদি কাজে টানিতে হয় ত তার সামনে সঠিক শব্দ

ধরা আবশ্যক। 'অবিলম্বে'-র অর্থ তারা যে যার মত করিবে। সরকার করিবে এক, জনসাধারণ করিবে আর এক। '৩১শে জুলাই'-এর অর্থ সকলে একই করিবে। আর ওই তারিখ মধ্যে সরকার কিছু না করে ত তখন পরের কর্মপন্থা ভাবিয়া লওয়া যাইবে। আমার কথা ডা. রীডের পছন্দ হয়। লল্লুভাইও অবশেষে তা মানিয়া লন। প্রস্তাবে '৩১শে জুলাই' পর্যন্ত মিয়াদ দেওয়া হয়। বোম্বাই জনসভায় ওই মর্মে প্রস্তাব পাস হয়। সারা ভারতেও জনসভায় ওই প্রস্তাব পাস হয়।

শ্রীমতী জয়াজী পেটিটের অক্লান্ত পরিশ্রমে মহিলাদের এক ডেপুটেশন ভাইসরয়ের কাছে যায়। লেডী টাটা, ৺ দিলশাদ বেগম প্রভৃতি ওই ডেপুটেশনের সদস্যা ছিলেন। অন্যদের নাম আমার মনে নাই। ডেপুটেশনের ফল খুব ভাল হইয়াছিল। ভাইসরয় তাঁদের আশ্বাস দিয়াছিলেন।

করাচী, কলিকাতা ও অন্যান্য জায়গায়ও আমি গিয়াছিলাম। সব জায়গায় ভাল সভা হইয়াছিল, আর উৎসাহও খুব দেখা গিয়াছিল। আন্দোলন আরম্ভ করার সময় আমার ভরসা ছিল না এতটা সাড়া পাওয়া যাইবে।

তখনকার দিনে আমি একা চলাফেরা করিতাম অতএব নানা অপূর্ব অভিজ্ঞতার সুযোগ আমার মিলিত। গোয়েন্দা বিভাগের লোক অনুক্ষণ পিছনে লাগিয়া থাকিত। কিন্তু আমার কিছুই লুকানোর ছিল না বলিয়া তারা আমায় জ্বালাতন করিত না আর আমিও তাদের ঘাঁটাইতাম না। আমার ভাগ্যের কথা ছিল তখনও আমি 'মহাত্মা' পদবী পাই নাই যদিও আমার পরিচয় পাইলে লোকে অনেক সময় ওই ধ্বনি করিত।

একবার গোয়েন্দারা কয়েকটি স্টেশনে আমায় জ্বালাতন করে, টিকেট দেখিতে চায় ও নম্বর টুকিয়া লয়। কথাটি না বলিয়া আমি তাদের সকল প্রশ্নের জবাব দিতেছিলাম। সহযাত্রীরা ধরিয়া লইয়াছিল এই ব্যক্তি সাধু বা ফকির। প্রতি স্টেশনে গোয়েন্দারা আসিয়া বিরক্ত করিতেছে দেখিয়া যাত্রীরা চটিয়া যায় ও তাদের গালি দিতে থাকে। তারা ধমকাইয়া বলে, 'বেচারা সাধুকে কেন তোমরা খামকা বিরক্ত করছ?' আর আমাকে তারা বলে, 'এই বদমাশদের টিকেট দেখাবেন না।'

আমি শান্তভাবে তাদের বলি, 'এরা টিকেট দেখছে তাতে আমার কি আর কষ্ট। এদের কর্তব্য এরা করছে।' যাত্রীদের আমার কথা ভাল লাগে

নাই। আমার প্রতি দয়া তাদের আরও বাড়িয়া যায় এবং নির্দোষ লোকের ওপর অত্যাচার করিতেছে বলিয়া তাদের খুব নিন্দা করে।

গোয়েন্দাদের উৎপাত আর তেমন কি ছিল! বস্তুত তৃতীয় শ্রেণীতে চলাই ছিল বাস্তবিক অতীব কষ্টের। লাহোর হইতে দিল্লী যাইতে ভোগের একশেষ হইয়াছিল। করাচী হইতে লাহোরের পথে কলিকাতায় যাইতেছিলাম। লাহোরে গাড়ী বদলাইতে হয়। গাড়ীতে উঠিতে পারিতেছিলাম না। যারা পারিল গায়ের জোরে ঢুকিল। অন্য অনেকে দরজা বন্ধ দেখিয়া জানালা দিয়া গাড়ীর ভিতরে গেল। নির্দিষ্ট তারিখে কলিকাতায় আমার না পৌঁছিলেই নয়। ওই ট্রেনে উঠিতে না পারিলে ঠিক সময়ে কলিকাতায় পৌঁছা সম্ভব ছিল না। উঠিতে পারিব এই আশা আমি ছাড়িয়া দিয়াছিলাম। কেউ আমায় তাদের কামরায় লইতেছিল না। অবশেষে এক জোয়ান মদ্দ কুলি আমায় বলে, 'বার আনা দেন ত জায়গা করে দিতে পারি।' বলি, 'পার ত নিশ্চয় বার আনা দেব।' বেচারা যাত্রীদের মিনতি করিল কিন্তু যাত্রীদের মন গলিল না। ট্রেন ছাড়ে ছাড়ে। এক কামরার যাত্রীরা বলে, 'জায়গা এখানে নেই। তবে ঢুকিয়ে দিতে পার ত দাও। দাঁড়িয়ে থাকতে হবে কিন্তু।' কুলি আমায় বলে, 'কি বলেন?' সম্মতি জানাই। খিড়কির ভিতর দিয়া কুলি আমায় তুলিয়া দেয়। বার আনা সে রোজগার করে।

রাত কষ্টে যায়। অন্য সব যাত্রীরা কোনমতে বসার জায়গা পায়। ওপরের বাঙ্কের শিকল ধরিয়া দুই ঘণ্টা আমার দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কাটে। 'বসছেন না কেন? বসছেন না কেন?' বলিয়া জন কয়েক যাত্রী আমায় বিরক্ত করিতে থাকে। 'জায়গা থাকলে ত বসব' এই কথা তাদের বুঝাইয়া বলি। কিন্তু আমি দাঁড়াইয়া আছি দেখিয়া তাদের অস্বস্তি বোধ হয়, যদিও ওপরের বাঙ্কে তারা টানটান লম্বা হইয়া শুইয়াছিল। বার বার তারা বিরক্ত করিতেছিল আর তেমন শান্তভাবেই আমি উত্তর দিতেছিলাম। এতে তারা ক্ষান্ত হয়। আমার নাম ধাম জিজ্ঞাসা করে। নাম বলিলে তারা লজ্জিত হয়। মাফ চাহিয়া বসার জায়গা করিয়া দেয়। মনে পড়িয়া যায় 'সবুরে মেওয়া ফলে' এই লোকোক্তি। ভয়ানক ক্লান্ত হইয়াছিলাম। মাথা ঘুরিতেছিল। আর যখন পারা যাইতেছিল না তখন ভগবান জায়গা করিয়া দেন।

কোনমতে এইভাবে দিল্লীতে পৌঁছি। দিল্লী হইতে কলিকাতায়

যাই। কাশিমবাজারের মহারাজের বাড়ীতে উঠিয়াছিলাম। কলিকাতার জনসভার সভাপতি তিনিই হইয়াছিলেন। করাচীতে যেমন কলিকাতায়ও তেমন লোকের উৎসাহ উথলিয়া পড়িয়াছিল। জন কয়েক ইংরেজ সভায় আসিয়াছিল।

৩১শে জুলাইর আগে সরকার গিরমীটিয়া প্রথা রদ করার কথা ঘোষণা করে।

১৮৯৪ সনে এই প্রথার বিরুদ্ধে আমি প্রথম দরখাস্ত মুসাবিদা করি। তখনই ভাবিয়াছিলাম, সার ডব্লু. ডব্লু. হাণ্টার যে প্রথাকে 'আধা-গোলামি' বলিয়াছিলেন তা একদিন উঠিয়া যাইবে।

১৮৯৪ সনের শুরু করা এই প্রচেষ্টায় অনেকে সাহায্য করিয়াছিলেন। কিন্তু এ কথা না বলিলেই নয় যে সত্যাগ্রহের সম্ভাবনায় এই প্রথার উচ্ছেদ আগাইয়া গিয়াছিল।

ইহার বিশেষ বিবরণ ও যাঁরা এই আন্দোলনে যোগ দিয়াছিলেন তাঁদের কথা পাঠক দক্ষিণ আফ্রিকার সত্যাগ্রহের ইতিহাসে দেখিতে পাইবেন।

১২

নীলের দাগ

চম্পারণ রাজা জনকের ভূমি। চম্পারণে যেমন অনেক আম-বাগান তেমন ১৯১৭ সনে অনেক নীল-ক্ষেত ছিল। আইনত চম্পারণের চাষীকে নিজ জমির কুড়ির তিন ভাগ জমিতে জোতদারের জন্য নীলের চাষ করিতে হইত। ইহাকে 'তিনকাঠিয়া' বলা হইত কারণ কুড়ি কাঠার তিন কাঠায় নীলের চাষ করিতে হইত।

চম্পারণে যাওয়ার আগে চম্পারণের নাম পর্যন্ত জানিতাম না, তা যে কোথায় তাহা জানিতাম না। নীলচাষের খবরও প্রায় জানা ছিল না। নীলের ঢেলা দেখিয়াছিলাম। কিন্তু তা যে চম্পারণে হইত আর তার বাবত হাজারো চাষীর দুঃখ ভুগিতে হইত সে কথা ঘুণাক্ষরেও জানিতাম না।

চম্পারণের চাষী রাজকুমার শুক্লও নীলের মইয়ে দলিত-মথিত হইয়াছিল। তার বুকে সেই জ্বালা জ্বলিতেছিল। আর তার ওই জ্বালা তাকে অন্য

চাষীদের তপ্ত নীলের দাগ ধুইয়া-মুছিয়া নিশ্চিহ্ন করার জন্য পাগল করিয়া তুলিয়াছিল।

লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসে (১৯১৬) গিয়াছিলাম। সেখানে সে আমায় ধরিয়া বসে। 'উকিল বাবু আপনাকে আমাদের দুঃখের কথা বলবেন' এ কথা সে বার বার বলিতেছিল ও আমাকে চম্পারণে যাওয়ার জন্য নিমন্ত্রণ জানাইতেছিল। এই উকিল বাবু ছিলেন বিহারের সেবা-জীবনের প্রাণ ও চম্পারণে আমার প্রিয় সাথী ব্রজকিশোর প্রসাদ। রাজকুমার শুক্ল তাঁকে আমার তাঁবুতে লইয়া আসে। তাঁর পরনে কাল আলপাকার আচকান, পাতলুন ইত্যাদি ছিল। তাঁকে দেখিলাম : মনে কোনই ছাপ পড়িল না। সরলপ্রাণ চাষীদের লুটে খায় এই ব্যক্তি তেমনই কোন উকিল সাহেব হইবেন এরূপ আমার মনে হইয়াছিল। তাঁর মুখে চম্পারণের কাহিনী একটু শুনি ও আমার যেমন অভ্যাস বলি, 'নিজের চোখে না দেখে এ বিষয়ে কোন কথা বলতে পারছি না। কংগ্রেসে প্রস্তাব আনুন। অনুগ্রহ করে এখন আমাকে এতে টানবেন না।' রাজকুমার শুক্ল কংগ্রেসের সহায়তা কিছুটা ত চাহিতই। চম্পারণের প্রশ্নে সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া ব্রজকিশোরবাবু কংগ্রেসে প্রস্তাব আনেন এবং একমতে তা পাস হয়।

রাজকুমার শুক্ল খুশী হইল কিন্তু নিরস্ত হইল না। সে চাহিতেছিল চম্পারণের চাষীদের দুঃখ নিজ চোখে আমি দেখি। তাকে বলি, 'আমার ভ্রমণতালিকায় চম্পারণকেও নিয়ে নিচ্ছি ; দুই-এক দিন দেব।' সে বলে, 'এক দিনই যথেষ্ট। একটিবার চোখে দেখেন ত বস্।'

লক্ষ্ণৌ হইতে আমি কানপুরে যাই। সেখানেও সে ঠিক হাজির। 'য়হাঁসে চম্পারণ বহুত নজদীক হায়, এক দিন্ দে দো।' 'এখনকার মত আমায় ক্ষমা করুন। কথা দিচ্ছি যাব।' এই বলিয়া নিজকে আরও অধিক বাঁধিয়া ফেলি।

আশ্রমে গেলাম ত সেখানেও পাছু পাছু রাজকুমার শুক্ল। 'এবার বলুন কবে যাবেন ?' বলিলাম, 'বেশ, অমুক তারিখে কলকাতা যাচ্ছি। ওখানে এসে আমায় নিয়ে যাবেন।' জানিতাম না কোথায় যাইব, কি করিব, কি দেখিব।

কলিকাতায় ভুপেনবাবুর বাড়ীতে পৌঁছিয়া দেখি সে আগেই আসিয়া সেখানে আড্ডা গাড়িয়াছে। এই অজ্ঞ, অমার্জিত কিন্তু দৃঢ়-সংকল্পী কৃষক আমার মন জয় করিয়া লইল।

১৯১৭ সনের প্রথম দিকে আমরা দুই জন, চাষীর সঙ্গে চাষীর মতই, কলিকাতা হইতে রওনা হইলাম। কোন্ ট্রেন ধরিতে হইবে জানিতাম না। রাজকুমার যে ট্রেনে লইয়া গেল তাতে আমরা গেলাম। সকালে পাটনা পৌঁছিলাম।

পাটনায় ওই আমার প্রথম যাওয়া। পাটনায় এমন পরিচিত কেউ ছিল না যার বাড়ীতে উঠিতে পারি। মনে করিয়াছিলাম নেহাত গেঁয়ো হইলেও বড়দের সঙ্গে রাজকুমার শুক্লের যোগাযোগ আছে। ট্রেনে রাজকুমারের ওজন কিছুটা বুঝিতে পাই। পাটনায় পৌঁছিবার পরে তার দৌড় যে কি তা স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম। দুনিয়া যে কি তা সাদাসিধা সরল রাজকুমার জানিত না। যাদের সে বন্ধু মনে করিত তারা তার বন্ধু ছিল না। রাজকুমার তাদের দৃষ্টিতে আশ্রিত লোকের অধিক কিছু ছিল না। চাষী মক্কেল ও উকিলের মধ্যে বর্ষার ভরা গঙ্গার এপার-ওপার ব্যবধান ছিল।

রাজকুমার শুক্ল আমাকে রাজেন্দ্রবাবুর বাড়ী লইয়া যায়। রাজেন্দ্রবাবু পুরী কি অন্য কোথাও গিয়াছিলেন। বাড়ীতে দুই এক জন চাকর ছিল। তারা আমাদের দিকে ফিরিয়াও তাকাইল না। কিছু খাওয়ার বস্তু সঙ্গে ছিল। খেজুর দরকার ছিল। বেচারা রাজকুমার বাজার হইতে তা আনিয়া দিল।

বিহারে তখন ছুত-অছুতের ভাব ছিল। চাকরেরা কুয়াতে থাকাকালে আমার কুয়া হইতে জল তোলার উপায় ছিল না। আমি কোন্ জাতের লোক তারা তা জানিত না, সুতরাং আমার বালতির ছিটায় তাদের অপবিত্র হওয়ার ভয় ছিল। রাজকুমার আমাকে ভিতরের পায়খানায় যাইতে বলিল। সঙ্গে সঙ্গে চাকর বাইরের পায়খানা দেখাইয়া দিল। এই সব আমার গা-সহা হইয়া গিয়াছিল তাই এতে আমি অবাক্ হই নাই। আর রাগও আমার হয় নাই। চাকরেরা তাদের ধর্ম পালন করিতেছিল, রাজেন্দ্রবাবুর প্রতি নিজেদের কর্তব্য পালন করিতেছিল।

এই মজার অভিজ্ঞতায় রাজকুমার শুক্লের ওপর আমার শ্রদ্ধা বাড়িয়া গেল আর তেমনি বাড়িল তার সম্বন্ধে আমার জ্ঞান। দেখিতে পাইলাম রাজকুমার আমায় চালাইতে পারিবে না। লাগাম নিজ হাতে লইলাম।

১৩

বিহারী সরলতা

মৌলানা মজরুল হক যখন বিলাতে ব্যারিস্টারি পড়িতেন তখন তাঁর সহিত আমার পরিচয় হয়। ১৯১৫ সনে কংগ্রেসের বোম্বাই অধিবেশনে (সে বছর তিনি মুসলিম লীগের সভাপতি ছিলেন) তাঁর সহিত দেখা হইলে পুরাতন পরিচয়ের কথা বলিয়া তিনি আমাকে পাটনায় গেলে তাঁর বাড়ীতে উঠিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। সেই আমন্ত্রণের সূত্র ধরিয়া মজরুল হক সাহেবকে চিঠি পাঠাই ও যে কাজে গিয়াছিলাম তা জানাই। পত্র পাওয়া মাত্র নিজের মোটর লইয়া তিনি আসেন ও তাঁর বাড়ীতে লইয়া যাওয়ার জন্য বিশেষ আগ্রহ করেন। তাঁকে ধন্যবাদ জানাই এবং আমার মত নূতন লোকের পক্ষে রেল গাইড দেখিয়া আমার গন্তব্যের গাড়ী ঠিক করা কঠিন এই কথা বলিয়া তাঁকে আমি আমার গন্তব্যের প্রথম গাড়ী ধরাইয়া দিতে অনুরোধ করি। রাজকুমার শুক্লের সহিত কথা বলিয়া তিনি বলেন যে প্রথমে মুজফফরপুর যাওয়া আমার পক্ষে ভাল হইবে। সন্ধ্যায় তথাকার গাড়ী ছিল। সেই ট্রেনে তিনি আমায় তুলিয়া দেন।

সেই সময়ে আচার্য কৃপলানী মুজফফরপুরে ছিলেন। হায়দরাবাদে যখন গিয়াছিলাম তখন তাঁর সহিত পরিচয় হইয়াছিল। তাঁর মহান্ ত্যাগের, সাদাসিধা জীবনের আর তাঁর দেওয়া টাকায় যে ওখানকার আশ্রম চলে এ সব কথা ডা· চোইথরামের কাছে শুনিয়াছিলাম। মুজফফরপুর সরকারী কলেজের তিনি অধ্যাপক ছিলেন। আমার যাওয়ার কিছু আগে তিনি কাজে ইস্তফা দিয়াছিলেন। তাঁকে তার করি। ট্রেন মাঝরাতে মুজফফরপুর পৌঁছে। অত রাতেও ছাত্রসমেত তিনি স্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। তাঁর ঘর-সংসার ছিল না। প্রফেসর মলকানীর সঙ্গে থাকিতেন। সেখানে তিনি আমাকে লইয়া যান। অতএব বস্তুত আমি মলকানীর অতিথি হই। সেই দিনে গবর্নমেণ্ট কলেজের প্রফেসরের পক্ষে আমার মত লোককে আশ্রয় দেওয়া অসাধারণ ব্যাপার ছিল।

প্রফেসর কৃপলানী বিহারের, বিশেষ ত্রিহুত বিভাগের, ঘোর দুঃখের কথা আমায় বলেন এবং আমার কাজ যে কঠিন তারও আভাস দেন। বিহারীদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে তিনি আসিয়াছিলেন। আমার ওখানে যাওয়ার

উদ্দেশ্য সম্বন্ধে পূর্বেই তিনি বন্ধুদের সহিত কথা বলিয়াছিলেন। সকালবেলা জন কয়েক উকিল আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসেন। তাঁদের মধ্যে রামনবমীবাবুর কথা আমার মনে আছে। তাঁর আগ্রহ দেখিয়া তাঁর ওপর আমার নজর পড়িয়াছিল।

তিনি বলেন, 'যে কাজের জন্য আপনি এখানে এসেছেন তা এখানে (প্রফেসর মলকানীর গৃহে) থেকে হতে পারে না। আমাদের মত কারো গৃহে আপনার থাকতে হবে। গয়াবাবু এখানকার নামকরা উকিল। তাঁর হয়ে আমি অনুরোধ করছি আপনি তাঁর বাড়ী আসুন। সরকারকে আমরা সকলে ভয় করে চলি। তবুও যতটা সাধ্য আমরা আপনাকে সাহায্য করব। রাজকুমার শুক্ল আপনাকে যা বলেছে মোটামুটি তা সবই ঠিক। দুঃখের কথা আমাদের অগ্রণীরা আজ এখানে উপস্থিত নন। বাবু ব্রজকিশোর প্রসাদ ও রাজেন্দ্র প্রসাদকে তার করেছি। শীঘ্রই তাঁরা এসে যাবেন। তাঁরা সব কিছু আপনাকে বলতে পারবেন ও সহায়তা করতে পারবেন। দয়া করে আপনি গয়াবাবুর বাড়ী উঠে আসুন।'

এই অনুরোধ উপেক্ষা করার উপায় ছিল না। কি জানি আমাকে ঠাঁই দিয়া গয়াবাবু যদি ফ্যাসাদে পড়েন এই সংকোচও আবার আমার মনে ছিল। গয়াবাবু সেই সংকোচ দূর করেন। তাঁর বাড়ী গেলাম। তাঁর ও বাড়ীর অন্য সবের প্রাণঢালা ভালবাসা পাইলাম।

দ্বারভাঙ্গা হইতে ব্রজকিশোরবাবু আর পুরী হইতে রাজেন্দ্রবাবু আসিলেন। দেখিলাম, লক্ষ্ণৌ-এ যে ব্রজকিশোরবাবুকে দেখিয়াছিলাম এই ব্রজকিশোরবাবু সেই ব্রজকিশোরবাবু নহেন। এখন তাঁতে দেখিলাম বিহারীদের স্বভাবসুলভ বিনয়, সাধাসিধা ভাব, সুজনতা ও অসাধারণ শ্রদ্ধা। হৃদয় আমার কানায় কানায় ভরিয়া গেল। ব্রজকিশোরবাবুর ওপর বিহারের উকিলদের আস্থা দেখিয়া আমি যুগপৎ আশ্চর্য ও আনন্দিত হইয়াছিলাম।

অল্প দিন মধ্যে এই সব বন্ধুদের সহিত আমার জীবনব্যাপী বন্ধুত্ব গড়িয়া ওঠে। ব্রজকিশোরবাবু তথ্য দিয়া আমাকে অবস্থা বুঝাইলেন। গরীব চাষীদের মামলা তিনি করিতেন। আমি যখন সেখানে গিয়াছিলাম তখন তাঁর হাতে অমন দুইটা মামলা ছিল। এমন কোন মামলায় জিতিলে গরীবদের জন্য কিছু করা গেল ভাবিয়া নিজের মনকে তিনি সান্ত্বনা দিতেন।

কখন কখন কেসে হারও হইত। সে স্থলেও সরল চাষীদের কাছ হইতে ফী লইতেন। ত্যাগী হইলেও ব্রজকিশোরবাবু কি রাজেন্দ্রবাবু বিনা সংকোচে ফী লইতেন। ফী না লইলে তাঁদের সংসার চলিবে না আর সে অবস্থায় করার মত সহায়তা তাঁরা গরীবদের করিতে পারিবেন না এই ছিল তাঁদের যুক্তি। উকিলেরা যে ফী লইত এবং বাংলা ও বিহারের ব্যারিস্টারদের ফীর আজগবী মাত্রার কথা শুনিয়া আমি অবাক্ হইয়াছিলাম।

এই বিষয়ে আমি তাঁদের কটু সমালোচনা করিয়াছিলাম। আমাকে ভালবাসেন বলিয়া তা তাঁরা গায়ে মাখেন নাই। আর ভুলও বুঝেন নাই।

কর্ম সম্পর্কে বন্ধুদের বলিলাম, 'এই সব কেস পড়ে মনে হচ্ছে এ সব কেস কোর্টে নেওয়া বন্ধ করতে হবে। এরূপ কেস কোর্টে নিয়ে প্রায় কোনই লাভ নেই। যেখানে রায়তেরা পিষে যাচ্ছে, ভয়ে জুজু হয়ে আছে, সেখানে কোর্টে ধরনা দিয়ে কি হবে। তাদের ভয় দূর করাই হবে তাদের প্রকৃত সহায়তা করা। এই তিনকাঠিয়া প্রথা যত দিন রদ না হচ্ছে ততদিন আমাদের সোয়াস্তি নেই। ভেবেছিলাম দুই দিন থাকব, দেখব ও বলে যাব। কিন্তু দেখতে পাচ্ছি এ কাজে দু' বছরও লাগতে পারে। প্রয়োজন হলে এতটা সময়ও দিতে আমি তৈরি আছি। এর জন্য যা করতে হবে তা বোঝবার চেষ্টা করছি। কিন্তু আপনাদের সহায়তা আমার চাই।'

দেখিলাম ব্রজকিশোরবাবু অতি ঠাণ্ডা মেজাজের লোক। ধীরভাবে তিনি বলিলেন, 'সাধ্যমত আমরা সাহায্য করব। কি রকম সহায়তা চান তা বুঝিয়ে বলুন।'

দুপুর রাত পর্যন্ত আমাদের কথা চলে।

আমি বলিলাম, 'আপনাদের আইনের জ্ঞান আমার কাজে বড় একটা আসবে না। আপনাদের কাছ থেকে আমি মুহরীর ও দোভাষীর কাজ চাইব। এ কাজে জেলেও যেতে হতে পারে। আপনারা ততটা এগুতে পারেন ত আনন্দের কথা। কিন্তু ততটা এগুতে না চান এগুবেন না। কিন্তু উকিলের স্থানে আপনাদের কেরানী হতে ও ব্যবসা অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ রাখতে বলে আমি আপনাদের কাছে কম চাইছি না। এখানকার হিন্দী বুঝতে আমার কষ্ট হয়। দলিলপত্র কৈথীতে নয় ত উর্দুতে লেখা। তা আমি পড়তে পারব না। ওসবের অনুবাদ আপনারা করে দেবেন, এ আমি আপনাদের কাছ থেকে চাই। পয়সা দিয়ে এ সব কাজ

করানো আমাদের সাধ্যের বাইরে। সেবা-ভাব হতে বিনা পয়সায় এসব হওয়া চাই।'

ব্রজকিশোরবাবু সবটা জিনিস অবিলম্বে বুঝিয়া লইলেন। তিনি একবার আমাকে জেরা করিতেছিলেন, আর একবার সঙ্গীদের। তাঁদের কত জনের সেবা আমার কত দিন দরকার হবে, পালাক্রমে করিলে চলিবে কিনা ইত্যাদি খুঁটিনাটি তিনি জানিয়া লইলেন। পরে উকিলদের জিজ্ঞাসা করিলেন তাদের কে কতটা ত্যাগ করিতে পারিবেন।

শেষে তিনি বলিলেন, 'আপনি আমাদের কাছ থেকে যে কাজ চান আমরা এতজন তা করতে প্রস্তুত আছি। আমাদের যাকে যত দিন থাকতে বলবেন, থাকব। জেলে যাওয়ার কথাটা নূতন। সে শক্তি লাভের চেষ্টা করব।'

১৪

অহিংসার দর্শন

আমাদের সামনে দুই কাজ ছিল: চাষীর অবস্থা জানা, আর নীলকরদের বিরুদ্ধে তাদের নালিশ কি তা শোনা। এই জন্য হাজারো চাষীর সহিত কথা কওয়া আবশ্যক ছিল। কিন্তু আমার মনে হইল কৃষকদের কাছে যাওয়ার আগে নীলকরদের কথা শোনা ও বিভাগীয় কমিশনরের সহিত দেখা করা আমার অবশ্য কর্তব্য। দেখা করিতে চাহিলাম। সম্মতি পাইলাম।

নীলকর সংঘের সেক্রেটারী আমাকে সোজা বলিয়া দিলেন যে, আমি বাইরের লোক, রায়ত ও মালিকদের ব্যাপারে আমার নাক গলানো অনুচিত। তবুও যদি আমার কিছু বলার থাকে তবে তা আমি লিখিয়া জানাইতে পারি। ভদ্রভাবে তাঁকে আমি বলিলাম যে আমি নিজকে বাইরের লোক মনে করি না এবং চাষীরা যদি চায় তবে তাদের অবস্থার খোঁজখবর নেওয়ার পূর্ণ অধিকার আমার আছে।

কমিশনরের সহিত দেখা করিলাম। তিনি আমাকে ধমকাইলেন এবং ভাল চাই ত দেরী না করিয়া যেন ত্রিহুত ছাড়িয়া চলিয়া যাই এই বলিয়া শাসাইলেন।

সহকর্মীদের সব কথা জানাইয়া বলিলাম যে সম্ভবত আমার অনুসন্ধানে সরকার বাধা দিবে এবং যে সময়ে আসিবে ভাবিয়াছিলাম তার আগেই হয়ত জেলে যাওয়ার পালা আসিবে। গ্রেপ্তার করে ত মোতিহারীতে আর সম্ভব হইলে বেতিয়ায় গ্রেপ্তার হওয়া ভাল হইবে। অতএব যত তাড়াতাড়ি পারা যায় ওই দুই জায়গায় আমার যাইতে হইবে।

চম্পারণ ত্রিহুত বিভাগের এক জেলা। মোতিহারী উহার সদর। রাজকুমার শুক্লের বাড়ী ছিল বেতিয়ায়। উহার আশপাশের কুঠির চাষীদের অবস্থা সর্বাপেক্ষা খারাপ ছিল। তাদের অবস্থা আমাকে দেখাইবার লোভ রাজকুমার শুক্লের ছিল। আমারও ততটাই আগ্রহ ছিল।

অতএব সাথাদের লইয়া সেই দিনই আমি মোতিহারী রওনা হই। মোতিহারীতে গোরখবাবু তাঁর বাড়ীতে আশ্রয় দেন ও সেই স্থান ধর্মশালা হইয়া ওঠে। আমাদের সকলের জায়গা কোনমতে সেখানে হয়। যে দিন ওখানে পৌঁছিয়াছিলাম সেই দিনই শুনিতে পাই ওখান হইতে পাঁচ মাইল দূরে এক চাষীর ওপর অত্যাচার হইয়াছে। ঠিক হয় পরের দিন ভোরে বাবু ধরণীধর প্রসাদের সঙ্গে ওই চাষীর কাছে আমরা যাইব। তদনুযায়ী হাতিতে চড়িয়া আমরা রওনা হই। গুজরাটে যেমন গো-গাড়ীর চলন চম্পারণে প্রায় তেমন হাতির চলন। আধা রাস্তা গিয়াছি ত পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেন্টের লোক পিছন হইতে আসিয়া আমাদের ধরিল ও বলিল, 'সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব আপনাকে সেলাম জানিয়েছেন।' ব্যাপারটা বুঝিলাম। ধরণীবাবুকে গন্তব্যে যাইতে বলিয়া আমি গুপ্তচরের ভাড়াটে গাড়ীতে গিয়া বসিলাম। চম্পারণ ত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে এই নোটিশ সে আমার ওপর জারি করিল। আমাকে সে আমার বাসস্থানে লইয়া গেল ও নোটিশে আমার সই চাহিল। নোটিশে আমি লিখিয়া দেই যে আমার তদন্ত শেষ না হওয়ার আগে চম্পারণ ছাড়িয়া আমি যাইব না। আদেশ অমান্য করার অভিযোগে পরের দিন কোর্টে হাজির হওয়ার শমন পাইলাম।

সারা রাত জাগিয়া যেখানে যেখানে পত্র লেখার ছিল লিখিলাম ও যে সব পরামর্শ দেওয়ার ছিল ব্রজকিশোরবাবুকে দিলাম।

নোটিশ ও শমনের কথা চারদিকে ছড়াইয়া পড়ে। লোককে বলিতে শোনা যায় যে অমনটা দৃশ্য মোতিহারীতে তার আগে কেউ কখন দেখে

নাই। গোরখবাবুর বাড়ী ও কাছারি লোকে লোকারণ্য। যা যা করার ছিল্য ভাগ্যে রাতেই করিয়া ফেলিয়াছিলাম। তাই ভিড়কে বাগ মানানোর কাজে মন দিতে পাই। এ ব্যাপারে আমার সঙ্গীদের অশেষ সহায়তা লাভ করি। আমি যেখানে যাইতেছিলাম সেখানেই দলে দলে লোক আমার পিছনে ছুটিতেছিল। তাদের শান্ত রাখার কাজে তাঁরা লাগিয়া যান।

আমার ও কলেক্টর, ম্যাজিস্ট্রেট, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আদি রাজকর্মচারীদের মধ্যে এক রকমের মিত্রতা জন্মে। সরকারী নোটিসের বিরুদ্ধে আমি আদালতে লড়িতে পারিতাম। তা না করিয়া সেই সব আমি মানিয়া লইয়াছিলাম। রাজকর্মচারীদের সহিত আমি মিষ্ট ব্যবহার করিতাম। তা হইতে তারা দেখিতে পায় যে তাদের সহিত আমার ব্যক্তিগত কোন বিরোধ নাই, আমার বিরোধ অহিংসার পথে তাদের আদেশের বিরুদ্ধে। এতে তাদের উদ্বেগ দূর হইয়া যায় এবং জ্বালাতন না করিয়া উল্টা ভিড় নিয়মনে খুশী মনে তারা আমাকে ও আমার সঙ্গীদের সহায়তা করে। কিন্তু সাথে সাথে ইহাও তারা পরিষ্কার বুঝিতে পায় যে তাদের কর্তৃত্ব ফুরাইয়াছে, ক্ষণকালের তরে হইলেও লাঠির ভয় খোয়াইয়া লোকে তাদের নূতন বান্ধবের প্রেমে মজিয়াছে, তার আওতাধীন হইয়াছে।

মনে রাখিতে হইবে যে চম্পারণে আমার পরিচয় ছিল না। চাষীরা লেখাপড়ার ধার ধারিত না। চম্পারণ গঙ্গার ওপারে ঠিক হিমালয়ের তরাইয়ে নেপালের গাঁ-ঘেঁষা স্থান—ভারতের অন্যান্য অংশ হইতে বিচ্ছিন্ন। না জানিত লোকে কংগ্রেসের নাম না ছিল কংগ্রেসের কোন সভ্য। যদিবা কেউ কংগ্রেসের নাম জানিত, ভুলেও সেই নাম সে মুখে আনিত না, সভ্য হওয়া ত দূরের কথা। সেখানে এখন কংগ্রেস ও কংগ্রেসসেবকদের যথার্থ প্রবেশ ঘটিল—নামে নহে সত্যিকার কাজে।

নামের দিকে আমাদের দৃষ্টি ছিল না, লক্ষ্য ছিল কাজ—ফাঁকা কথা নয়, ছাঁকা কাজ। কংগ্রেস সরকারের ও সরকারের সরকার নীলকরদের চক্ষুশূল ছিল অতএব বন্ধুদের সহিত পরামর্শ করিয়া ঠিক করিলাম কংগ্রেসের নামে কিছু করা হইবে না। কংগ্রেস বলিতে তারা বুঝিত উকিলদের খাওয়া-খাওয়ি, আইনের কারচুপিতে আইনের ফাঁক, বোমা, সন্ত্রাস, খুন-খারাপি আর ছলছুতা। তাদের এই ধারণা দূর করা আবশ্যক ছিল।

তাই আমরা ঠিক করি কংগ্রেসের নাম আমরা লইব না, কংগ্রেস সংস্থার কথা লোককে বলিব না ; কংগ্রেসকে নাইবা জানিল তারা নামে, তার কাজ যদি করে বস্, আর কি চাই।

অতএব কংগ্রেসের পক্ষ হইতে খোলাখুলিভাবে বা গোপনে ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতে এখানে কোন লোক আসে নাই। হাজার হাজার কৃষকের মন জয় করার শক্তি রাজকুমার শুক্লের ছিল না। এঁর আগে কোন দিন কেউ তাদের মধ্যে রাজনৈতিক কাজ করে নাই। চম্পারণের বাইরের দুনিয়ার খবর এরা জানিত না। তাহা হইলেও আমাকে তারা জন্মজন্মান্তরের বন্ধুরূপে গ্রহণ করিয়াছিল। সুতরাং তাদের সহিত আমার ওই মিলনকে আমি ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার, অহিংসার সাক্ষাৎকার, সত্যের সাক্ষাৎকার বলি ত অতিশয়োক্তি করা হইবে না, ঠিক কথাই বলা হইবে।

কোন্ পুণ্যে ওই সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছিলাম যখন ভাবি ত মনে হয় লোকের প্রতি ভালবাসারূপ সুকৃতিরই তা ফল। আর এই ভালবাসার উৎস হইতেছে অহিংসার ওপর আমার অটল বিশ্বাস।

চম্পারণের ওই দিন আমার জীবনের স্মরণীয় দিন, কৃষক ও আমার জীবনের পুণ্য তিথি।

আইনের দৃষ্টিতে কাঠগড়ায় আমি দাঁড়াইয়াছিলাম বটে, কিন্তু কাঠগড়ায় বস্তুত দাঁড়াইয়াছিল সরকার নিজে। আমার জন্য কমিশনর যে ফাঁদ পাতিয়াছিল তাতে তাঁর সরকারই ধরা পড়িয়াছিল।

১৫

মোকদ্দমা তুলিয়া লইল

কেস উঠিল। সরকারী উকিল, ম্যাজিস্ট্রেট ও অন্য রাজকর্মচারীদের অস্বস্তির অবধি ছিল না। কি যে করিবেন তা তাঁরা ভাবিয়া পাইতেছিলেন না। সরকারী উকিল ম্যাজিস্ট্রেটকে বার বার বলিতেছিলেন কেস মুলতবি রাখুন। তাঁর কথায় বাধা দিয়া ম্যাজিস্ট্রেটকে সবিনয়ে বলি যে কেস মুলতবি করার কোন হেতু নাই কারণ চম্পারণ ছাড়িয়া যাওয়ার আদেশ যে আমি অমান্য করিয়াছি তা আমি স্বীকার করিব। এই বলিয়া ছোট্ট যে বিবৃতি আমি প্রস্তুত করিয়াছিলাম তা পড়িয়া গেলাম :

'মনে হতে পারে আমার ওপর জারি-করা ১৪৪ ধারা আমি অমান্য করেছি। কেন যে এই দেখতে-গুরুতর কর্ম আমার করতে হয়েছে আদালতের অনুমতিক্রমে সেই সম্বন্ধে একটি ছোট্ট বিবৃতি আমি পেশ করছি। সবিনয়ে বলব যে আইন অমান্য এটা নয়, প্রশ্নটা হচ্ছে স্থানিক সরকার ও আমার মধ্যে মতভেদের প্রশ্ন। জনকল্যাণ ও দেশসেবার জন্য আমি এখানে এসেছি। নীলকরেরা রায়তদের সঙ্গে ঠিক ব্যবহার করছে না বলে তারা আমার সহায়তা চেয়েছে, আসার জন্য পীড়াপীড়ি করেছে তাই এখানে আমার আসতে হয়েছে। অবস্থাটা নিজের চোখে না দেখলে সহায়তা করা যায় না। তাই অবস্থা বুঝতে, সম্ভব হলে সরকার ও নীলকরদের সাহায্যে তা বুঝতে এসেছি। অন্য কোন উদ্দেশ্য আমার নেই, আর আমি মনে করি না আমার আসাতে শান্তিভঙ্গের অথবা খুনখারাপির ভয় রয়েছে। এই দিকে আমার উত্তম অভিজ্ঞতা আছে। কিন্তু সরকার জিনিসটা দেখছেন আর এক দৃষ্টিতে। সরকারের অসুবিধা আমি বুঝতে পারি, আর এ কথাও আমি মানি যে যে খবর সরকার পেয়েছে সে মতে সরকার কাজ করেছে। আইন মানতে ইচ্ছুক প্রজার পক্ষে আদেশটা মেনে নেওয়ার ইচ্ছা হওয়া স্বাভাবিক আর তেমন ইচ্ছা আমার হয়েও ছিল। কিন্তু আমার মনে হল, তা যদি করি ত যে কর্তব্যের ডাকে এসেছি তার উল্টা কাজ করা হবে। আমি মনে করি তাদের সঙ্গে থেকেই কেবল আমি আজ তাদের সেবা করতে পারি। তাই স্বেচ্ছায় চম্পারণ ছেড়ে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। এই ধর্ম-সংকটে চম্পারণ থেকে আমাকে সরানোর দায়িত্ব আমি সরকারের ওপর না চাপিয়ে পারছি না। ভারতবর্ষের জনজীবনে আমার যে স্থান তাতে আমার পক্ষে বিনা ভাবনা-চিন্তায় কোন দৃষ্টান্ত স্থাপন করা উচিত নয় এ কথা আমি ভালভাবেই জানি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, যে অনাস্থষ্টি ব্যবস্থাধীনে আমরা রয়েছি তাতে আমার অবস্থায় পড়া লোকের পক্ষে একটা মাত্রই সম্মানজনক পথ খোলা রয়েছে আর তা-ই আমি আশ্রয় করছি অর্থাৎ আদেশ অমান্য করে তার দণ্ড হাসিমুখে বরণ করছি।

'যে দণ্ড আমাকে দেবেন তা লঘু করার উদ্দেশ্যে এই বয়ান পেশ করছি না, করছি এ কথা বলার জন্য যে আইনে প্রতিষ্ঠিত সরকারের অবমাননা করার জন্য আমি আদেশ অমান্য করি নাই, করেছি তা থেকে উচ্চতর আইন অর্থাৎ অন্তরাত্মার নির্দেশ মান্য করার জন্য।'

এর পরে শুনানি মুলতবী রাখার কোন হেতু ছিল না। কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেট ও উকিল এমনটা ভাবিতেও পারেন নাই, তাই অপ্রস্তুত হইলেন। ম্যাজিস্ট্রেট রায় স্থগিত রাখিলেন। ইতিমধ্যে বিস্তৃত বিবরণ দিয়া ভাইসরয়কে, পাটনার বন্ধুদের ও পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যজী প্রভৃতিকে সব কথা তারে জানাইয়াছিলাম।

সাজা গ্রহণের জন্য কোর্টে যাইব কি তার পূর্বেই ম্যাজিস্ট্রেট লিখিয়া জানান যে ছোটলাটের নির্দেশ অনুসারে কেস তুলিয়া লওয়া হইয়াছে এবং কলেক্টরও পত্র দ্বারা জানান যে তদন্ত করিতে চাহিলে তদন্ত করিতে কোন বাধা নাই আর তদন্তের কাজে রাজকর্মচারীদের সহায়তা দরকার হইলে সেই সহায়তাও পাওয়া যাইবে। আমরা কেউ ভাবিতে পারি নাই যে এত তড়িঘড়ি শুভ ফল ফলিবে।

কলেক্টর মি. হেককের সহিত দেখা করিলাম। দেখিয়াছিলাম তিনি ন্যায় করিতে ইচ্ছুক ভাল লোক। কোন কাগজপত্র বা অন্য কিছু আবশ্যক হইলে তা তিনি আমায় চাহিয়া লইতে বলেন এবং তাঁর সহিত দেখা করা প্রয়োজন হইলে যে কোন সময় দেখা করিতে বলেন।

অহিংস আইন-অমান্যে এইভাবে দেশের হাতেখড়ি হয়। স্থানীয় ও ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের সংবাদপত্রে এই ব্যাপারের খুব আলোচনা হয়। আর তার ফলে চম্পারণের ও আমার তদন্তের দেশজোড়া আশাতিরিক্ত প্রচার হয়।

সরকারের নিরপেক্ষতা তদন্তের পক্ষে আবশ্যক ছিল। সংবাদপত্রে তদন্তের খবর বা সেই সম্পর্কে সম্পাদকীয় মন্তব্যের প্রকাশ দরকার ছিল না। বস্তুত চম্পারণের অবস্থা এমনই জটিল ও পলকা ছিল যে.অতি-উৎসাহী সমালোচনায় অথবা অতিরঞ্জিত রিপোর্ট প্রকাশে আমার কাজে বিঘ্ন ঘটিতে পারিত। অতএব বড় বড় সংবাদপত্রের সম্পাদকদের আমি অনুরোধ করিয়াছিলাম যে তাঁরা যেন সংবাদদাতা না পাঠান; দরকারী খবর সময় সময় আমি নিজেই দিব।

আমি বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে সরকার আমাকে ওখানে থাকিতে দিয়াছে বলিয়া নীলকরেরা চটিয়া গিয়াছে। ইহাও বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে মুখে না বলিলেও রাজকর্মচারীরা ভিতরে ভিতরে জ্বলিতেছিল, সুতরাং মিথ্যা অথবা ভুল ধারণা জন্মিতে পারে এমন খবর বাহির হইলে তাদের

গায়ের জ্বালা আরও বাড়িবে আর সেই হল্কা আমার গায়ে না লাগিয়া লাগিবে গিয়া গরীব ভয়ে-মরা চাষীদের গায়ে ও তার ফলে তাদের ঠিক ঠিক অবস্থা জানার পক্ষে আমার ব্যাঘাত জন্মিবে।

এতটা সাবধান হইলেও নীলকরেরা আমার পিছনে লাগিয়াছিল, সংবাদ-পত্রে আমার ও আমার সঙ্গীদের নামে নানা মিথ্যা রটনা করিয়াছিল। কিন্তু আমার অতীব সতর্কতার কারণ ও নেহাত তুচ্ছ ব্যাপারে পর্যন্ত সত্য পালন হেতু তাদের সব শর ব্যর্থ হয়।

ব্রজকিশোরবাবুর নামে না রটাইয়াছিল এমন কুৎসা ছিল না। কিন্তু যতই তারা তাঁর নিন্দা করিতেছিল ততই তাঁর প্রতিষ্ঠা বাড়িতেছিল।

অমনটা পলকা (সহজেই অনর্থ ঘটিতে পারে এমন) অবস্থায় অন্য প্রদেশের নেতাদের ডাকা আমার সঙ্গত মনে হয় নাই। 'দরকার হলে ডাকবেন, যাব' এই ভরসা মালব্যজী আমায় পত্রে দিয়াছিলেন। তাঁকেও আমি কষ্ট দেই নাই। এই লড়াইকে আমি রাজনৈতিক রূপ লইতে দেই নাই। কিন্তু নেতাদের নিকট ও বড় বড় সংবাদপত্রে সময় সময় আমি রিপোর্ট পাঠাইতাম—প্রকাশের জন্য নয়, তাদের অবগতির জন্য। অরাজনৈতিক কর্মকে, হইলই বা তার উদ্দেশ্য রাজনৈতিক, রাজনৈতিক রূপ দিলে তার ক্ষতি হয়, আর রাজনীতির বাইরে রাখিলে লাভ হয় অভিজ্ঞতা হইতে ইহা আমি দেখিয়াছি।* যে কোন ক্ষেত্রের নিঃস্বার্থ সেবায় অন্তে যে দেশের রাজনৈতিক লাভ হয় চম্পারণ লড়াই হইতে এ কথার প্রমাণ মিলে।

১৬

কার্যপদ্ধতি

চম্পারণ তদন্তের বিবরণ মানে চম্পারণের রায়তদের ইতিহাস বর্ণন। এরূপ বৃত্তান্তের স্থান এই সব প্রকরণে নাই। তাহা হইলেও চম্পারণের তদন্ত মানে সত্য ও অহিংসার মস্ত বড় প্রয়োগ। এই দৃষ্টি হইতে ওই প্রয়োগের সহিত যুক্ত নানা কথার যতটুকু দেওয়া প্রয়োজন ততটা সপ্তাহে সপ্তাহে আমি

* মূলে এরূপ আছে: চম্পারণ লড়াই হইতে স্পষ্ট বোঝা যায় যে শুদ্ধ লোকসেবার প্রত্যক্ষ-রূপে না হইলেও পরোক্ষভাবে রাজনীতি থাকেই।

দিতেছি। উহার পূর্ণ বিবরণ জানিতে ইচ্ছুক পাঠককে বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদের 'চম্পারণ সত্যাগ্রহ' পড়িতে বলি।

এখন এই প্রকরণের বিষয়ে প্রবেশ করি। গোরখবাবুর বাড়ীতে থাকিয়া তদন্ত চালানো সম্ভব ছিল না কারণ সেই অবস্থায় বেচারা গোরখবাবুকে বাড়ী ছাড়িয়া অন্যত্র যাইতে হইত। ভাড়ায় বাড়ী পাওয়া শক্ত ছিল কারণ আমাদের মত লোকদের বাড়ী ভাড়া দেওয়ার সাহস মোতিহারীর লোকের মধ্যে তখনও আসে নাই। কিন্তু চতুর ব্রজকিশোরবাবু অনেকটা খোলা জায়গা সমেত একটা বাড়ী ভাড়ায় নেন; সকলে আমরা সেখানে উঠিয়া যাই।

একেবারে বিনা পয়সায় কাজ চালানো সম্ভব ছিল না। দশের কাজের জন্য দশের কাছ হইতে টাকার আবেদন করার রেওয়াজ তখন ছিল না। ব্রজকিশোরবাবুও তাঁর সঙ্গীরা প্রায় সকলেই উকিল ছিলেন। যখনকার যা খরচ তাঁরা নিজেদের পকেট হইতে দিতেন। বন্ধুদের কাছ হইতেও কিছু লইতেন। তাঁদের দৃষ্টি ছিল এই যে পয়সা যাদের আছে তারা অন্যের কাছে হাত পাতিতে যাইবে কেন। আমি ঠিক করিয়াছিলাম যে চম্পারণের কৃষকদের নিকট হইতে একটি কড়িও লইব না। তার কদর্থ হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। এই তদন্তের জন্য দেশের জনসাধারণের কাছে টাকা না চাহিবার সংকল্পও আমি করিয়াছিলাম। কারণ সেই স্থলে তদন্ত সর্বভারতীয় অথবা রাজনৈতিক রূপ ধারণ করিত। বোম্বাই হইতে বন্ধুরা তার করেন যে তাঁরা পনের হাজার টাকা পাঠাইতে চান। ধন্যবাদ দিয়া তাঁদের জানাই যে টাকা নিতে আমি অসমর্থ। ঠিক করিয়াছিলাম, ব্রজকিশোরবাবু ও অন্য বন্ধুরা চম্পারণের বাইরের ধনী বিহারীদের কাছ হইতে যা যোগাড় করিতে পারিবেন তাতে না কুলাইলে বাকীটা আমার বন্ধু ডাক্তার প্রাণজীবন মেহতার নিকট হইতে লইব। ডাক্তার মেহতা বলিয়া রাখিয়াছিলেন যে যখন যে টাকা চাহিব তিনি পাঠাইবেন। অতএব টাকার প্রশ্নে আমি নিশ্চিন্ত হইয়াছিলাম। চম্পারণের গরিবানা দেখিয়া স্থির করিয়াছিলাম যে যত কম খরচে পারা যায় কাজ চালাইব। সুতরাং বেশি টাকার দরকার ছিল না। আর বস্তুত বেশি টাকা খরচও হয় নাই। মনে পড়ে সবসুদ্ধ দুইতিন হাজারের অধিক লাগে নাই। আরও মনে আছে যে যে টাকা পাওয়া গিয়াছিল তারও শ' কয়েক বাঁচিয়া গিয়াছিল।

আমার সঙ্গীদের থাকা-খাওয়ার ধরনটা প্রথম দিকে একটু কিম্ভুত-কিমাকার ছিল। তা লইয়া যখন-তখন আমি ঠাট্টা-পরিহাস করিতাম। উকিলদের রান্না আলাদা আলাদা হইত: প্রত্যেকের পৃথক্ পাচক ছিল। অনেক সময় রাতের আহার তাঁরা দুপুর রাতে করিতেন। এই মহাশয়েরা অবশ্য নিজেদের খরচেই থাকিতেন, তবু তাঁদের ওই অনিয়ম ও অব্যবস্থা আমার কাছে বিসদৃশ লাগিত। বন্ধুদের সহিত আমার ভাব এত গভীর ছিল যে ভুল-বোঝাবুঝির ভয় ছিল না। আমার বাক্যবাণ তাঁরা হাসিমুখে সহিতেন। অবশেষে ঠিক হয় যে ঠাকুর-চাকর বিদায় করিয়া সকলে এক হেঁশেলে খাইবেন এবং সব কিছু সময়মত করিবেন। নিরামিষ সকলে খাইতেন না। কিন্তু দুইটা হেঁশেলে খরচ বেশি তাই এক নিরামিষ রান্নারই ব্যবস্থা হয়। আহারও সাদাসিধা করা হয়।

এই ব্যবস্থার ফলে খরচ অনেক কমিল, সময় বাঁচিল ও কাজের দম বাড়িল। কাজের জন্য প্রচুর সময় ও শক্তির দরকারও ছিল। বয়ান লিখাইতে কৃষকেরা দলে দলে আসিত। সঙ্গে তাদের আত্মীয়-স্বজনও আসিত। কাজেই বাড়ী ও সংলগ্ন বাগান লোকে ভরিয়া যাইত। দর্শনার্থীর হাত হইতে আমাকে বাঁচাইবার অনেক চেষ্টা করিয়াও আমার সঙ্গীরা ব্যর্থ হইতেন। তাই নির্দিষ্ট সময়ে বার কয়েক আমার দেখা দিতে হইত। বয়ান কমপক্ষে পাঁচ-সাত জনে লিখিয়া লইতেন। তবু দিনের শেষে অনেকে বিফল হইয়া ফিরিত। সকলের বয়ান লিখিয়া লওয়া দরকারও হইত না। কারণ একই ধরনের কথা অনেকে বলিত, তবু তাদের সন্তোষের জন্য কথা শুনিতে হইত, তাদের আগ্রহ উপেক্ষা করা যাইত না।

বয়ান যাঁরা লিখিয়া লইতেন তাঁদের কতকগুলি নিয়ম অনুসরণ করিতে হইত: কৃষকদের জেরা করা হইত। জেরাতে যে আটকাইয়া যাইত তার বয়ান নাকচ করা হইত। মূলেই অধিক মনে হইলে সে বয়ান অগ্রাহ্য হইত। এইভাবে বয়ান যাচাই করিয়া লওয়াতে সময় কিছু বেশি লাগিত বটে কিন্তু বয়ান অকাট্য হইত।

বয়ান লিখিয়া লওয়ার সময় গুপ্তচর বিভাগের কোন না কোন অফিসার উপস্থিত থাকিত। ইচ্ছা করিলে তাদের আসা বন্ধ করা যাইত। কিন্তু শুরুতেই ঠিক করিয়া লইয়াছিলাম যে তাদের আসা ত বন্ধ করিবই না, উল্টা তাদের সহিত ভাল ব্যবহার করিব, এবং সম্ভবপর হইলে যে খবর

তারা চাহিবে তা দিব। তাতে আমাদের ক্ষতি ত হয়ই নাই বরং তাদের সাক্ষাতে বয়ান লওয়াতে লোকের মনে সাহসের সঞ্চার হইয়াছিল। লোকে গুপ্তচরদের অতিশয় ভয় করিত বলিয়া তাদের সাক্ষাতে দেওয়া বয়ানে অতিরঞ্জনের সম্ভাবনা কম ছিল। মিথ্যা বলিলে গুপ্তচরেরা তাদের ফ্যাসাদে ফেলিতে পারে এই ভয়ে তারা সাবধান হইয়া কথা বলিত।

না চটাইয়া নম্রতা দিয়া নীলকরদের জয় করিয়া লইব এই আমার লক্ষ্য ছিল তাই তাদের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ যা পাইতাম তাদের লিখিয়া জানাইতাম আর তাদের সঙ্গে দেখাও করিতাম। নীলকর সংঘেও আমি যাইতাম, রায়তদের অভিযোগ তাদের জানাইয়া সে সম্বন্ধে তাদের কথা শুনিতাম। নীলকরদের কেউ কেউ আমাকে ঘৃণা করিত, কেউ কেউ উদাসীন ছিল, অন্য কেউ কেউ আমার সহিত সবিনয় ব্যবহার করিত।

১৭

সঙ্গীদের সম্বন্ধে

ব্রজকিশোরবাবু-রাজেন্দ্রবাবু এই জুটির তুলনা হয় না। তাঁদের আত্মসমর্পণে আমি এমনই বাঁধা পড়িয়াছিলাম যে তাঁদের জিজ্ঞাসা না করিয়া আমি এক পাও আগাইতাম না। তাঁদের শিষ্যই বলুন বা সাথা বলুন, শম্ভুবাবু, অনুগ্রহবাবু, ধরণীবাবু, রামনবমীবাবু প্রভৃতি উকিলেরা সর্ব সময় আমার সঙ্গে থাকিতেন। বিন্ধ্যাবাবু ও জনকধারীবাবুও সময় সময় থাকিতেন। এঁরা সকলেই বিহারের লোক ছিলেন। কৃষকদের জবানবন্দি নেওয়া ছিল তাঁদের মুখ্য কাজ।

প্রফেসর কৃপলানী ত আমাদের সঙ্গে জুটিয়াছিলেনই। সিন্ধী হইলে কি হয়, বিহারী অপেক্ষা তিনি কম বিহারী ছিলেন না। যে প্রদেশে থাকা হয় সেই প্রদেশের লোকের সহিত বেমালুম মিশিয়া যাওয়ার শক্তি আমি ক্বচিৎ দুইচার জনে দেখিয়াছি। আচার্য কৃপলানী তেমন কতিপয়ের একজন। তিনি যে অন্য প্রদেশের তাঁকে দেখিয়া এ কথা বোঝার উপায় ছিল না। তিনি ছিলেন আমার হেড দারোয়ান, দর্শনার্থীদের হাত হইতে আমাকে রক্ষা করা তাঁর তখন জীবনধর্ম ও জীবনকর্ম হইয়া গিয়াছিল। ভিড় রুখিতে কখনও তিনি হাসি-ঠাট্টার আশ্রয় লইতেন, আবার কখনও বা অহিংস হুমকির।

রাত হইলে তাঁর অধ্যাপনা শুরু হইত; ইতিহাসের কথা ও কাহিনী দিয়া সঙ্গীদের চিত্তবিনোদন করিতেন আর কোন ভীরু লোক আসিয়া যাইত ত তাকে বাহাদুর বানাইতেন।

মৌলানা মজরুল হক যখনই-ডাকিব-তখনই-পাইবদের তালিকায় নিজ নাম দিয়া রাখিয়াছিলেন। মাসে দুই একবার তিনি দেখা দিয়া যাইতেন। তখনকার তাঁর জাঁকালো আমিরী জীবন আর আজিকার তাঁর সাদাসিধা জীবন এই দুইয়ে ব্যবধান আকাশপাতাল। আমাদের সহিত তিনি যেভাবে মিশিতেন তাতে আমাদের মনে হইত তিনি আমাদেরই একজন, কিন্তু তাঁর বাবুয়ানি দেখিয়া অন্যের মনে হইত তিনি আমাদের নহেন।

অভিজ্ঞতা বাড়িলে বুঝিতে পাইলাম যে গ্রামে শিক্ষার বিস্তার বিনা চম্পারণে স্থায়ী কোন কাজ করা যাইবে না। গ্রামবাসীদের মূর্খতা দেখিয়া মন দমিয়া যাইত। গাঁয়ের বালকেরা হয় টৈ টৈ করিয়া ফিরিত নয়ত মা বাপ দুই পয়সার জন্য সারাদিনের মত তাদের নীলকরদের কাজে পাঠাইত। পুরুষের মজুরি উপরে ছিল দশ, মেয়েদের ছিল ছয়, আর বালকদের ছিল তিন পয়সা। চার আনা কারো রোজগার হইত ত সে মনে করিত পাওয়া পাইয়াছে।

সঙ্গীদের সহিত কথা বলিলাম। আরম্ভে ছয় গ্রামে বালকদের জন্য স্কুল খোলা সাব্যস্ত হইল। শর্ত তার ছিল: গ্রামের অগ্রণীদের স্কুল-গৃহ ও শিক্ষকদের খোরাক যোগাইতে হইবে। অন্য সব খরচ আমাদের। তখনকার দিনে কৃষকদের হাতে নগদ পয়সা বড় একটা ছিল না কিন্তু চালটা গমটা দেওয়ার শক্তি তাদের ছিল। আর বস্তুত তা দেওয়ার আগ্রহও তারা দেখাইয়াছিল।

শিক্ষক কোথায় পাওয়া যাইবে এটা মস্ত বড় প্রশ্ন ছিল। অল্প বেতনে বা বিনা বেতনে উত্তম স্থানীয় শিক্ষক পাওয়া কঠিন ছিল। মামুলী শিক্ষকের হাতে বালকদের দেওয়ার ইচ্ছা আমার ছিল না। লেখাপড়ায় খাটো হোক কিন্তু চরিত্রে দড় হওয়া চাই এই ছিল আমার দৃষ্টি।

বিনা পয়সায় শিক্ষাদান করিবে এরূপ লোকের জন্য আপীল করিলাম। সঙ্গে সঙ্গে সাড়া পাইলাম। শ্রীগঙ্গাধররাও দেশপাণ্ডে বাবাসাহেব সোমন ও পুণ্ডলীককে পাঠাইলেন। বোম্বাই হইতে অবন্তিকাবাই গোখেল আসিলেন। দক্ষিণ হইতে আসিলেন আনন্দীবাই। আমি ছোটেলাল,

সুরেন্দ্রনাথ ও পুত্র দেবদাসকে ডাকিয়া আনিলাম। এই সময়ে মহাদেব দেশাই, তার পত্নী দুর্গাবাই এবং নরহরি পরীখ ও তার পত্নী মণিবেন আসিয়া আমার সঙ্গে জোটে। কস্তুরবাকেও আমি ডাকিয়া আনিয়াছিলাম। এইভাবে এক উত্তম শিক্ষকগোষ্ঠী গঠিত হয়। অবন্তিকাবাই ও আনন্দীবাই লেখা-পড়া ভালই জানিতেন। কিন্তু দুর্গাবাই ও মণিবেন সামান্য গুজরাটী মাত্র জানিত। কস্তুরবা লেখাপড়া প্রায় জানিতই না। হিন্দীভাষী বালকদের তবে এরা কি ভাবে পড়াইবে ?

বোনদের বুঝাইয়া বলিলাম যে বালকদের ব্যাকরণ শিখাইতে হইবে না, শিখাইতে হইবে উত্তম চালচলন; যোগ-বিয়োগ শিখাইতে হইবে না, দেখাইতে হইবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কি ভাবে থাকিতে হয় তাহা। তাঁদের আরও বলিয়াছিলাম যে হিন্দী, গুজরাটী ও মারাঠী অক্ষরে ব্যবধান তারা যতটা মনে করে ততটা নয়। তা ছাড়া, প্রথম শ্রেণীতে অআ-কখ ও ১ হইতে ৯ পর্যন্ত লিখানোর প্রশ্ন ছিল। তা কিছু কঠিন ব্যাপার নয়। এর ফলে বোনেদের ক্লাসে খুব ভাল কাজ হইয়াছিল। তাঁদের আত্ম-বিশ্বাস জন্মিয়াছিল। কাজে তাঁরা আনন্দ পাইয়াছিল। অবন্তিকাবাইর পাঠশালা আদর্শ পাঠশালা হইয়াছিল। তাঁর পাঠশালায় তিনি প্রাণমন ঢালিয়া দেন। যোগ্যতাও ছিল তাঁর খুব। গ্রামের স্ত্রীলোকদের কাছে এই সব মহিলারা আমাদের পৌছার সেতু হইয়াছিলেন।

ছোটদের একটু লেখাপড়া শিখাইলাম আর আমাদের কাজ শেষ হইল অমনটা আমাদের নজর ছিল না। গ্রামে নোংরার অন্ত ছিল না। গলির যেখানে-সেখানে ময়লা-জঞ্জাল, কুয়ার আশপাশে কাদা ও দুর্গন্ধ, আঙ্গিনার দিকে তাকাইলে গা ঘিন ঘিন করিত। বয়স্কদের পরিচ্ছন্ন থাকার পাঠ শেখানো আবশ্যক ছিল। মানুষের শরীরে খোস-পাঁচড়া ও দাদ। সুতরাং লোকের স্বাস্থ্যের দিকে নজর দিয়া তাদের জীবনের অন্য সকল প্রশ্নে প্রবেশ করা আমাদের লক্ষ্য হইল।

এই কাজে ডাক্তারের সাহায্য দরকার ছিল। তাই সরভেন্ট অব ইণ্ডিয়া সোসাইটীর কাছে ডাক্তার দেবের সেবা চাহিলাম। প্রীতির সম্পর্ক ত আমাদের মধ্যে ছিলই। সঙ্গে সঙ্গে তিনি ছয় মাসের জন্য আসিতে রাজী হইলেন। শিক্ষক ও শিক্ষিকারা তাঁর নির্দেশে চলিতেন।

সকলের ওপর স্পষ্ট নির্দেশ ছিল তারা যেন নীলকরদের বিরুদ্ধে কোন

কথায় না পড়ে, রাজনীতি হইতে দূরে থাকে। কারো কোন অভিযোগ করার থাকে ত তাকে যেন আমার কাছে পাঠায়, কেউ যেন আপন গণ্ডির বাইরে এক পাও না যায়। অদ্ভুত নিষ্ঠার সহিত চম্পারণের সাথীরা এই সব নিয়ম পালন করিয়াছিলেন। কেউ কোন দিন নির্দেশের উল্টা কিছু করিয়াছিলেন বলিয়া মনে পড়ে না।

১৮
গ্রামপ্রবেশ

প্রায় সর্ব ক্ষেত্রেই স্কুলের ভার একজন পুরুষ ও একজন মহিলার ওপর দেওয়া হইয়াছিল। এই স্বেচ্ছাসেবকরা রোগীদের ওষুধ দিতেন ও স্বাস্থ্য-ব্যবস্থার দিকে নজর দিতেন। স্ত্রীলোকের সহিত ব্যবহার স্ত্রীলোকের মারফত করিতে হইত।

চিকিৎসার কারবারটা খুব সহজ ছিল। রেড়ির তেল, কুইনিন ও গন্ধক মলম সব স্কুলে মজুত থাকিত। জিভে ক্লেদ দেখা গেলে বা জিভ খরখরে হইলে অথবা কোষ্ঠ বদ্ধ হইলে রেড়ির তেল দেওয়া হইত। জ্বরে প্রথমে রেড়ির তেল দিয়া পরে কুইনিন ব্যবস্থা করা হইত। খোস-পাঁচড়া বা ফোড়া হইলে স্থানটা ভাল করিয়া ধোয়ার পরে মলম লাগানো হইত। রোগীকে ওষুধ বাড়ী লইয়া যাইতে দেওয়া হইত না। অসুখ কঠিন হইলে বা বোঝা না গেলে সেই রোগীকে ডাক্তার দেবকে দেখানো হইত। ডাক্তার দেব নির্দিষ্ট দিনে পালাক্রমে ভিন্ন ভিন্ন স্কুলে যাইতেন।

এই সহজসিধা চিকিৎসার সুযোগ লোকে খুব লইত। ব্যামো ঘরে ঘরেও ছিল না আর এমন কঠিনও ছিল না যে বিশেষজ্ঞ না হইলে চলে না এ কথা মনে রাখিলে এই চিকিৎসা-ব্যবস্থাকে হাসিয়া উড়াইয়া দেওয়া যাইবে না। আর লোকের সুবিধার দিক হইতে দেখা যায় ত বলিতে হইবে তাদের খুবই উপকার হইয়াছিল।

অনাময়ের কাজটা কঠিন ছিল। ময়লা-আবর্জনা কেউ সাফ করিতে চাহিত না। এমনকি যারা ক্ষেত-মজুর তারাও এ কাজ করিতে নারাজ ছিল। কিন্তু ডাক্তার দেব নিরাশ হওয়ার লোক ছিলেন না। ডাক্তার দেব ও

স্বেচ্ছাসেবকেরা একটা গ্রামকে ঝকঝকে-তকতকে পরিষ্কার করিয়া আদর্শ রূপ দেওয়ার নিমিত্ত শক্তিনিয়োগ করেন। গ্রামের অলিগলি তাঁরা ঝাট দেন, লোকের উঠানের ময়লা আবর্জনা দূর করেন, কুয়ার আশপাশের খাত-গর্ত ভরেন, ও কাদা সরান। সেবাদল গঠন করিয়া নিজেদের এই কাজ নিজেরা করার জন্য অন্তরের আবেদন চালিয়া গ্রামবাসীদের ডাকেন। এতে লজ্জায় পড়িয়া কোন কোন গাঁয়ের লোক এদিকে মন দিয়াছিল। কোন কোন স্থানের লোকেরা উৎসাহভরে নিজেদের মেহনতে আমার মোটর যাওয়ার রাস্তা পর্যন্ত তৈয়ার করিয়াছিল। এই সব মধুর স্মৃতির সহিত লোকের নিশ্চেষ্ট জড়তার বেদনাদায়ক ছবিও মনে জাগে। মনে পড়ে কোন কোন স্থানে লোকে এই কাজে বিমুখ হইয়াছিল।

একটা অভিজ্ঞতার কথা যা এর পূর্বে স্ত্রীলোকদের অনেক সভায় আমি বলিয়াছি এখানে উল্লেখ করা অন্যায় হইবে না। ভীতিহরবা একটি ছোট্ট গ্রাম। এই গাঁয়ে আমাদের স্কুল ছিল। উহার পাশে আরও খুদে একটি গাঁও ছিল। সেখানে আমি গিয়াছিলাম। কয়েকটি স্ত্রীলোকের পরনে অত্যন্ত ময়লা শাড়ী দেখিতে পাই। কস্তুরবাকে বলি এদের জিজ্ঞাসা কর এরা কাপড় ধোয় না কেন। এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে তাদের একজন কস্তুরবাকে নিজের কুড়েতে লইয়া যায় ও বলে, 'এখানে পেটারা দেখছ কি? না আছে পেটারা, না আছে কাপড়। পরনে যা দেখছ এটাই আমার একমাত্র কাপড়। এবার বল এটা ধুই কি করে? মহাত্মাজীকে বলো কাপড় দিতে। তখন আমি রোজ নাইব রোজ কাপড় বদলাব।'

এমন কুড়ে ভারতে এই একটিই নয়। ভারতে বহু গ্রামে যা দেখা যায় এইটি তার নমুনা। না আছে ঝাঁপি, না আছে পেটারা, না আছে কাপড়-লতা; লজ্জা ঢাকার এক ছেঁড়া কাপড় ছাড়া আর কিছুই সেখানে নাই ভারতে এমন কুড়ের সংখ্যা অগণন।

আর এক অভিজ্ঞতার কথাও এখানে বলার মত। চম্পারণে বাঁশ ও ঘাসের অভাব নাই। ভীতিহরবার লোকেরা বাঁশ-ঘাস দিয়া স্কুল-ঘর তৈরি করিয়া দিয়াছিল। কেউ সেই ঘর পুড়াইয়া দিয়াছিল—লোকে সন্দেহ করিয়াছিল পড়শী নীলকরদের লোকেদের ওই কাজ। মনে হইল আবার বাঁশ-ঘাসে ঘর তৈরি করা ঠিক হইবে না। ওই স্কুল শ্রীসোমন ও কস্তুরবা চালাইতেন। শ্রীসোমন ঠিক করেন ইটের ঘর তৈরি করিবেন। নিজে

তিনি কাজে লাগিয়া যান। তাঁর উৎসাহ অন্যেতে অর্সে আর দেখিতে দেখিতে পাকা ঘর খাড়া হয়। ঘর ফের আগুনে পোড়ার ভয় দূর হয়।

এইভাবে পাঠশালার, স্বাস্থ্যবিধানের ও রোগীসেবার কাজের দরুন স্বেচ্ছাসেবকদের ওপর লোকের বিশ্বাস ও ভক্তি বাড়িয়া যায় ও লোকে তাঁদের কথা শুনিতে থাকে।

কিন্তু সখেদে বলিতে হইতেছে যে এই কাজকে স্থায়ী রূপ দেওয়ার সাধ আমার অপূর্ণ রহিয়া গিয়াছে। স্বেচ্ছাসেবকেরা নির্দিষ্ট কিছু দিনের জন্য আসিয়াছিলেন। নূতন সেবক পাওয়া কঠিন হইল। বিহারে ওই কর্মের জন্য যোগ্য স্থায়ী কর্মী পাওয়া গেল না। চম্পারণের কাজ শেষ হইতেই বাইরে ইতিমধ্যে যে কাজ দানা বাঁধিয়া উঠিতেছিল আমাকে কাড়িয়া লইল। তা হইলেও ওই ছয় মাসে যে কাজ হইয়াছিল তার শিকড় এতটা গভীরে পৌঁছিয়াছিল যে এক ভাবে না এক ভাবে তার প্রভাব আজও বিদ্যমান।

১৯

উজ্জ্বল দিক্

এক দিকে পূর্ব পূর্ব প্রকরণে কথিত সমাজসেবার কাজ চলিতেছিল, অন্য দিকে লোকের দুঃখের কথা লিখিয়া নেওয়ার কাজ দ্রুত অগ্রসর হইতেছিল। হাজার হাজার লোকের বয়ানের ফল না ফলিয়া যায় কি? আমার কাছে লোকের ভিড় যতই বাড়িতেছিল নীলকরদের ক্রোধের মাত্রা ততই চড়িতেছিল। এবং যাতে আমার তদন্তকার্য পণ্ড হয় তাঁর জন্য তারা প্রাণপণ করিতেছিল।

এক দিন এই মর্মে বিহার সরকারের পত্র পাইলাম, 'আপনার তদন্ত বেশ কিছু দিন চলেছে; এবার তা শেষ করে বিহার থেকে গেলে হয় না?' পত্রের ভাষা মোলায়েম হইলেও ইঙ্গিতটা সুস্পষ্ট ছিল।

উহার জবাবে আমি জানাই যে তদন্তে কিছু সময় ত লাগিবেই। আর তা শেষ হইলেও যত দিন না লোকের দুঃখ দূর হইবে ততদিন বিহার হইতে চলিয়া যাওয়ার ইচ্ছা আমার নাই। এ কথাও আমি বলি যে তদন্ত শেষ করার দুই উপায় রহিয়াছে: এক রায়তদের কথা সত্য এ কথা মানিয়া লইয়া

তাদের দুঃখ দূর করা, নয়ত তাদের অভিযোগ মিথ্যা না-ও হইতে পারে ধরিয়া লইয়া সরকারী তদন্ত কমিটী নিযুক্ত করা।

লেফটেনেণ্ট গবর্নর স্যার এডওয়ার্ড গেট আমাকে ডাকিয়া পাঠান। তদন্ত কমিটী নিযুক্ত করিতে চান এ কথা জানাইয়া তিনি আমাকে উহার সদস্য হইতে বলেন। সদস্যদের নাম দেখিলাম; বন্ধুদের সহিত পরামর্শ করিলাম এবং এই শর্তে সভ্য হইতে রাজী হইলাম যে তদন্তকালে বন্ধুদের সহিত আমার পরামর্শ করার এখতিয়ার থাকিবে, সদস্য হইলেও রায়তদের প্রতিনিধিত্ব আমার বজায় থাকিবে এবং কমিটীর সুপারিশ অসঙ্গত মনে হইলে তার বিরুদ্ধে রায়তদের পথ প্রদর্শনের অধিকার আমার থাকিবে।

শর্তগুলি সার এডওয়ার্ড গেটের কাছে সঙ্গত মনে হয়। তাতে তিনি রাজী হন ও কমিটী ঘোষণা করেন। স্বর্গীয় সার ফ্র্যাঙ্ক স্লাই কমিটীর চেয়ারম্যান ছিলেন।

কমিটী দেখিতে পায় যে রায়তদের সব অভিযোগ খাঁটী। কমিটীর সুপারিশ এই ছিল: রায়তদের কাছ হইতে নীলকরেরা জুলম করিয়া যে টাকা আদায় করিয়াছিল তার এক নির্দিষ্ট ভাগ তাদের ফেরত দিতে হইবে এবং আইন করিয়া তিনকাঠিয়া প্রথা উচ্ছেদ করিতে হইবে।

এক মতে কমিটীর সিদ্ধান্ত হওয়ার ও উহার সুপারিশ অনুযায়ী ভূমি-আইন পাস হওয়ার পিছনে সার এডওয়ার্ড গেটের অনেকটা হাত ছিল। তিনি যদি দৃঢ় না হইতেন এবং নিজের সকল নিপুণতা এই ব্যাপারে নিয়োগ না করিতেন তবে সুপারিশও একমত হইত না, আর ভূমি-আইনও পাস হইত না। নীলকরদের প্রভূত ক্ষমতা ছিল। রিপোর্ট সত্ত্বেও ভূমি-আইন বিলের তারা শক্ত বিরোধ করিয়াছিল। কিন্তু সার এডওয়ার্ড গেট আগাগোড়া দৃঢ় ছিলেন, এবং কমিটীর সুপারিশ অনুসারে সব কিছু করিয়াছিলেন।

এভাবে শত বছরের তিনকাঠিয়া প্রথা রদ ও সেই সঙ্গে নীলকরদের রাজত্বের অবসান হয়: দলিত কৃষক নিজ শক্তির কতকটা পরিচয় পায় এবং নীলের দাগ ধুইলেও উঠিবে না এই কুসংস্কার দূর হয়।

ইচ্ছা ছিল বছর কয়েক গঠনকর্ম চালাইব, স্কুলের সংখ্যা বাড়াইব, গ্রামে আরও নিবিড়ভাবে প্রবেশ করিব। সেই ক্ষেত্রও প্রস্তুত হইয়াছিল। কিন্তু পূর্বে পূর্বে যেমন এখনও তেমন ঈশ্বর আমার ইচ্ছামত কাজ হইতে দিলেন না। আমি ভাবিলাম এক আর দৈবের বিধান হইল আর এক।

২০

শ্রমিকের সংসর্গে

চম্পারণে কমিটীর কাজ গুটাইতেছিলাম। এর মধ্যে মোহনলাল পাণ্ড্যা ও শঙ্করলাল পরীখের পত্র পাইলাম যে খেড়া জেলায় ফসল মারা গিয়াছে, লোকের খাজনা দেওয়ার শক্তি নাই। ওখানে যাইয়া অবস্থা দেখিয়া লোকদের পরিচালনা করার অনুরোধ তাঁরা করেন। আপন চক্ষে না দেখিয়া পরামর্শ দেওয়ার ইচ্ছা, শক্তি বা সাহস আমার ছিল না।

ঠিক তখনই শ্রীমতী অনুসূয়া বাইয়ের পত্র পাই। তাতে অহমদাবাদের মজুরদের অবস্থার কাহিনী ছিল। মজুরদের মজুরি কম ছিল। মজুরি বাড়াইবার আন্দোলন অনেক দিন হইতে চলিতেছিল। সুযোগ মত তাদের পরিচালনা করার ইচ্ছা আমার ছিল। দেখিতে ছোট এই কাজও অত দূর হইতে চালনা করিতে আমার ভরসা হইত না। অতএব ফুরসত মিলিতেই আগে আমি অহমদাবাদে যাই। মনে ছিল, অল্প দিনে ওই দুই স্থানের অবস্থা দেখিয়া চম্পারণে ফিরিয়া গঠনকর্ম দেখাশুনা করিব।

কিন্তু এমন কাজ হাতে আসিল যে চম্পারণে ফিরিয়া যাওয়া সম্ভব হইল না। যে সব স্কুল খোলা হইয়াছিল একে একে উঠিয়া গেল। সঙ্গীদের ও আমার সকল আকাশ-কুসুম শূন্যে মিলাইল।

এই সব সুখস্বপ্নের একটা ছিল গোসেবা। পাঠশালা ও গ্রাম-উন্নতির কাজ ছাড়া গোসেবার কাজেও হাত দিয়াছিলাম। ভ্রমণ প্রসঙ্গে আমি দেখিতে পাই যে গোরক্ষা ও হিন্দী-প্রচারের ইজারা যেন মারওয়াড়ীরা লইয়াছিল। কোন মারওয়াড়ী ভদ্রলোক বেতিয়ায় তাঁর ধর্মশালায় আমায় আশ্রয় দিয়াছিলেন। ওখানকার অন্য মারওয়াড়ী বন্ধুদের কৃপায় গোশালার কর্মে আমার আগ্রহ জন্মে। গোরক্ষার প্রশ্নে আজ আমার যে মত তা তখন গঠিত হইয়াছিল আর কর্মের কাঠামোও ঠিক সেই সময়েই মনে রচিত হইয়াছিল। গোরক্ষা বলিতে গোবর্ধন, গোজাতির উন্নতি সাধন, বলদকে দিয়া উহার শক্তির অধিক কাজ না করানো, গোশালাকে আদর্শ দুগ্ধালয়ে রূপান্তরিত করা ইত্যাদি বুঝায়। মারোয়াড়ী বন্ধুরা বলিয়াছিলেন এই কাজে তাঁরা সাধ্যমত সহায়তা করিবেন। কিন্তু চম্পারণে স্থির হইয়া বসিতে পাইলাম কই যে সেই কাজ হাতে লইব। চম্পারণে সেই গোশালা আজও

আছে তবে আদর্শ দুগ্ধালয় তা হয় নাই। বলদ হইতে চম্পারণে আজও তার শক্তির অতীত কাজ আদায় করা হয়। নামে হিন্দু আজও বলদকে নিষ্ঠুরভাবে মারে আর নিজ ধর্মে কলঙ্ক লেপে।

আমার সেই সংকল্প অপূর্ণ থাকিয়া গিয়াছে এই বেদনা বুকে অনুক্ষণ বিঁধে, আর যখনই চম্পারণে যাই এবং মায়োয়াড়ী ও বিহারী বন্ধুদের মৃদু তিরস্কার শুনি তখনই বুকচেরা দীর্ঘশ্বাস খোঁটা দিয়া আমায় বলে—এমন আচমকা ছেড়ে দিলে কাজটা!

কোনও না কোন রূপে শিক্ষার কাজ অনেক স্থানে চলিতেছে, কিন্তু গোসেবার জড় জমিতে পায় নাই বলিয়া তা আশানুরূপ অগ্রসর হয় নাই।

খেড়ার ব্যাপারে কি করা যায় এই আলোচনা যখন চলিতেছিল তখন অহমদাবাদের শ্রমিকদের কাজ আমি হাতে লই।

আমি অত্যন্ত ফাঁপরে পড়িয়াছিলাম। শ্রমিকদের দাবি সঙ্গত ছিল। লড়াইয়ের এক দিকে ছিলেন শ্রমিকদের প্রতিনিধি শ্রীমতী অনসূয়া বাই আর অন্য দিকে মিলমালিকদের অগ্রণী তাঁর সহোদর শ্রীঅম্বালাল সারাভাই। মিলমালিকদের সহিত আমার সম্পর্ক মধুর ছিল। তাঁদের সঙ্গে লড়া আমার পক্ষে বিষম ব্যাপার ছিল। তাঁদের সহিত কথা বলিলাম। শ্রমিকদের দাবি ন্যায্য কি অন্যায্য এই বিচার সালিসের হাতে তাঁদের দিতে অনুরোধ করিলাম। কিন্তু তাঁরা বলিয়া দিলেন মালিক-মজুর প্রশ্নে সালিসির স্থান নাই।

মজুরদের আমি ধর্মঘট করিতে বলি। তার আগে মজুর ও মজুর-নেতাদের সঙ্গে আমি খুব মেলামেশা করিয়াছিলাম। ধর্মঘট করার শর্ত তাহাদিগকে বুঝাইয়া বলিয়াছিলাম। শর্তগুলি এই:

১। কোন অবস্থায় হিংসা করা যাইবে না।

২। কাজে যাইতে ইচ্ছুক মজুরদের গায়ের জোরে আটকানো চলিবে না।

৩। ভিক্ষায় নামা যাইবে না।

৪। এবং ধর্মঘট যত দিনই চলুক শক্ত থাকিতে হইবে। হাতে পয়সা না থাকিলে মজুরি করিয়া পেটের ভাত কামাইতে হইবে।

এই সব শর্ত বুঝিয়া শ্রমিকনেতারা মানিয়া লইলেন। শ্রমিকদের সভা হইল। তাতে ঠিক হইল যে যতদিন তাদের দাবি মানা না হইবে অথবা

তা ন্যায্য কি অন্যায্য সে বিচার সালিসে না দেওয়া হইবে ততদিন তারা কাজে যাইবে না।

এই ধর্মঘট প্রসঙ্গে শ্রীবল্লভভাই প্যাটেল ও শ্রীশঙ্করলাল ব্যাঙ্কারকে আমি ঘনিষ্ঠরূপে চিনিতে পাইয়াছিলাম। শ্রীমতী অনসূয়া বাইয়ের সঙ্গে আগেই আমার ভাল পরিচয় হইয়াছিল।

সবরমতী নদীর পাড়ে একটা গাছের তলায় মজুরদের দৈনিক সভা হইত। হাজার হাজার মজুর উপস্থিত হইত। আমি আমার বক্তৃতায় তাদের প্রতিজ্ঞার কথা, শান্তিভঙ্গ না করার কথা, আত্মসম্মান না খোয়ানোর কথা মনে করাইয়া দিতাম। 'এক টেক' * চিহ্নিত পতাকা লইয়া শহরের রাস্তায় তারা শান্তিতে মিছিল করিত ও পরে সভায় আসিত।

ধর্মঘট একুশ দিন চলিয়াছিল। ওই সময়টায় মধ্যে মধ্যে আমি মিলমালিকদের সহিত কথা বলিতাম ও শ্রমিকদের প্রতি সুবিচার করিতে বলিতাম। তাঁরা বলিতেন, 'আমাদেরও টেক—পণ নাই কি? মালিক ও শ্রমিকদের মধ্যে বাপ-বেটা সম্বন্ধ···এর মধ্যে তৃতীয় এসে নাক গুঁজবে তা কি করে হয়? সালিসের স্থান এখানে কোথায়?'

২১

আশ্রমে উঁকি

শ্রমিকদের বিবাদের কথা বলার আগে আশ্রমে এক বারটি উঁকি মারা দরকার। চম্পারণে থাকা কালেও আশ্রম ভুলিতে পারি নাই। মধ্যে মধ্যে ঢু মারিতাম।

আশ্রম তখন অহমদাবাদের লাগাও ছোট গ্রাম কোচরবে ছিল। কোচরবে প্লেগ লাগে। দেখিলাম আশ্রমের ছোটরা ওখানে নিরাপদ নয়। আশ্রমে নিজেরা যতই পরিষ্কার থাকি না কেন আশপাশের নোংরার ছোঁয়াচ হইতে বাঁচার উপায় ছিল না। কোচরবের লোকদের স্বাস্থ্যের নিয়ম পালন করাইবার বা তাদের সেবা করার শক্তি আমাদের ছিল না।

শহর ও গ্রামের আওতার বাইরে অথচ যাতায়াতের অসুবিধা হয় এত

* টেক—পণ

দূরেও নয় এমন জায়গায় আশ্রম হওয়া চাই এই ছিল আমাদের লক্ষ্য। এক দিন নিজ জমিতে আশ্রম হইবে এই লক্ষ্য ত ছিলই।

প্লেগে আমি দেখিতে পাইলাম কোচরব ছাড়িয়া যাওয়ার নোটিস। অহমদাবাদের ব্যাপারী শ্রীপুঞ্জাভাই হীরাচাঁদ আশ্রমের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসিয়াছিলেন। শুদ্ধ সেবাভাব হইতে আশ্রমের ছোট বড় নানা সেবা তিনি করিতেন। অহমদাবাদের কাজকারবারের তাঁর বেশ অভিজ্ঞতা ছিল। আশ্রমের জন্য উপযুক্ত জমি তাড়াতাড়ি খুঁজিয়া দেওয়ার ভার তিনি লইলেন। কোচরবের উত্তরে ও দক্ষিণে আমি তাঁর সঙ্গে ঘুরিয়া দেখিলাম। পরে উত্তরে তিনচার মাইল দূরে জমির সন্ধান তাঁকে করিতে বলিলাম। এখন যেখানে আশ্রম সেই স্থানটা তিনিই খুঁজিয়া দিয়াছিলেন। স্থানটা জেলের কাছে ছিল বলিয়া আমার লোভ হইল। সত্যাগ্রহ আশ্রমের লোকদের কপালে জেল ত লাগিয়া থাকিবেই এই জন্যই জায়গাটা ভাল লাগিয়াছিল। আশপাশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এমন স্থান দেখিয়া জেলের জায়গা ঠিক করা হয় এ কথা আমি জানিতাম।

দিন আটেক মধ্যে জমির বেচাকেনা শেষ হয়। জমিতে ঘর ছিল না, গাছপালাও ছিল না। তবুও নদীর কিনারে ও একান্ত ছিল বলিয়া জায়গাটা বড়ই সুবিধার ছিল।

ঠিক করা গেল যতদিন স্থায়ী ঘর-দোর না উঠিবে ততদিন তাঁবুতে থাকিব ; রান্নার জন্য কেবল টিনের চালা তোলা হইবে।

আস্তে আস্তে আশ্রমে লোক বাড়িতেছিল। ছোট বড় মিলিয়া আমরা এখন চল্লিশ জন হইলাম। সকলেই আমরা এক পাকে খাইতাম। নূতন জায়গায় যাওয়ার গোটা কল্পনাটা ছিল আমার আর তাকে রূপ দেওয়ার পুরা দায় ছিল মগনলালের।

স্থায়ী ঘরদোর না হওয়া পর্যন্ত আমাদের অসুবিধার অবধি ছিল না। বর্ষাকাল সামনে ছিল। জিনিসপত্র চার মাইল দূর হইতে আনিতে হইত। বহু কালের পতিত জমি তাই সাপের ভয় ছিল। কাজেই কচি ও ছোটদের লইয়া থাকা বেশ খানিকটা ঝুঁকির বিষয় ছিল। সাপ মারা হইবে না নিয়ম ছিল, তা বলিয়া এ নয় যে সাপের ভয় আমাদের কারো ছিল না বা নাই।

হিংস্র প্রাণী নাশ না করার ব্রত আমরা ফিনিক্স, টলস্টয় আশ্রম ও

সবরমতী এই তিন জায়গায়ই সাধ্যমত পালন করিয়াছি। তিন জায়গায়ই পতিত জমিতে বসতি গড়া হইয়াছিল। তিন জায়গায়ই সাপ বিছার উপদ্রব ছিল। তা হইলেও আজ পর্যন্ত কোন জীবন নাশ হয় নাই এতে আমার মত ঈশ্বরবিশ্বাসী তাঁর কৃপাই দেখিতে পায়। ঈশ্বর পক্ষপাত করেন না, মানুষের সাধারণ ব্যাপারে নাকও গলান না এমন ব্যর্থ ফ্যাকড়া যেন কেউ তুলিবেন না। এই কথা ও আমার অন্য নানা অনুভবের বিষয় অন্য ভাবে ব্যক্ত করার ভাষা আমার নাই। আমি জানি তাহা বর্ণনার ও বোধের অতীত। তবুও যদি বেচারা মানুষ সেই অনুভব কথায় ধরিতে চায় ত নিজের তোতলা কথায়ই তা তার প্রকাশ করিতে হইবে। বলিতে গেলে সাপ বিছা না মারিয়াও পঁচিশ বছর যে বিনা বিপত্তিতে কাটিয়া গিয়াছে এটাকে আকস্মিক ঘটনা মনে না করিয়া ঈশ্বরের কৃপা মনে করা যদি কুসংস্কার হয় ত সেই কুসংস্কার আঁকড়াইয়া থাকা আমি শ্রেয় মনে করি।

শ্রমিকদের ধর্মঘট-সময়ে আশ্রমের পত্তন হইয়াছিল। আশ্রমের প্রধান উদ্যোগ তখন ছিল বোনাই। কাটুনির সন্ধান তখনও আমাদের ছিল না, তাই প্রথমে তাঁতঘর তৈরি করা হইবে ঠিক করা হয়।

২২
উপবাস

প্রথম দুই সপ্তাহ শ্রমিকদের মধ্যে খুব সাহস, খুব শান্তি ও খুব আত্মসংযম দেখা গেল। হাজারো সংখ্যায় দৈনিক তারা সভায় আসিত। পণের কথা তাদের প্রত্যহ আমি স্মরণ করাইয়া দিতাম, আর তারা চেঁচাইয়া বলিত, 'মরব তবু পণ ছাড়ব না।'

কিন্তু পরে তাদের উৎসাহে মন্দা দেখা দিল। আর দুর্বল মানুষের যা হয় হিংসার দিকে তারা ঝুঁকিল এবং কাজে যারা যাইত সেই মজুরদের হিংসা করিতে লাগিল। আমার ভয় হইল কাকে কখন বা তারা মারধর করিবে। সভায় আসা দিন দিন কমিতে থাকিল। যারা আসিত তাদের মুখেচোখে নিরাশার ভাব দেখা গেল। শেষটায় খবর পাইলাম মজুরেরা হাল ছাড়িতে বসিয়াছে। অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করিলাম। ভাবনায় পড়িলাম ওই অবস্থায় কি করা যায়। দক্ষিণ আফ্রিকার শ্রমিকদের বিরাট ধর্মঘটের

অভিজ্ঞতা আমার ছিল। কিন্তু এখানকার অবস্থা ছিল অন্য রকম। আমার কথায় শ্রমিকেরা প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল এবং আমার সামনে সেই প্রতিজ্ঞা তারা প্রতিদিন উচ্চারণ করিত। আর সেই প্রতিজ্ঞা তারা ভাঙ্গিবে! এই ভাবের মূলে আমার অভিমান কি শ্রমিকদের প্রতি ভালবাসা আর সত্যের ওপর অনুরাগ ছিল তা কে বলিবে?

সকাল বেলা। শ্রমিকদের সভায় আমি গিয়াছি। ভাবিতেছিলাম কি করি, সহসা আলো দেখিতে পাইলাম—আচম্বিতে মুখ হইতে এ কথা বাহির হইল: 'যতদিন না শ্রমিকেরা শক্ত হবে ও মিটমাট না হওয়া পর্যন্ত ধর্মঘট চালিয়ে যাবে অথবা মিল ছেড়ে চলে যাবে ততদিন আমি অন্ন স্পর্শ করব না।'

শ্রমিকদের মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। অনসূয়া বাইয়ের চোখে জল গড়াইল। শ্রমিকেরা বলিয়া উঠিল, 'আপনি নয়, উপোস করব আমরা। আপনার উপোস করা চলবে না। আমরা ক্ষমা চাই। প্রতিজ্ঞায় আমরা অটল থাকব।'

আমি বলিলাম, 'উপোস আপনাদের করতে হবে না। যে পণ করেছেন তাতে অটল থাকলেই হল। আমাদের হাতে পয়সা নেই, আর দশের কাছ থেকে ভিক্ষে করা পয়সায় শ্রমিকদের খাইয়েও আমরা ধর্মঘট চালাতে চাই না। যে মজুরি পান করুন, আর পেট চালান। তা যদি করেন ত ধর্মঘট যত দিনই চলুক আপনারা শক্ত থাকতে পারবেন। মিটমাট যতদিন না হচ্ছে, আমার উপোস চলবে।'

ম্যুনিসিপালিটীর কাজে শ্রমিকদের লাগানো যায় কিনা সেই চেষ্টায় বল্লবভাই ছিলেন। কিন্তু সেই সম্ভাবনা ছিল না। মগনলাল বলে যে আশ্রমের তাঁতশালার ভিতে বালি ফেলিতে হইবে, সে কাজে কিছু মজুরকে লাগানো যায়। শ্রমিকেরা সে প্রস্তাবে রাজী হয়। অনসূয়া বাই প্রথম ঝুড়ি বহেন আর নদী হইতে বালির ঝুড়ি-মাথায় লোকের কাতার লাগিয়া যায়। সে এক অপূর্ব দৃশ্য! শ্রমিকদের মনে বল ফিরিয়া আসিল। মজুরি চুকাইতে চুকাইতে হিসাব-নবিসেরা হয়রান হইল।

এই উপবাসে খুব বড় একটা দোষ ছিল। মালিকদের সহিত আমার সম্পর্ক মধুর ছিল সে কথা আগে বলিয়াছি। অতএব আমি জানিতাম আমার উপবাসে তাঁরা ব্যথা পাইবেন। সত্যাগ্রহী হিসাবে তাঁদের বিরুদ্ধে

আমার উপবাস করা চলে না এ কথা আমি জানিতাম। শ্রমিকদের ধর্মঘটের প্রভাবই কেবল তাঁদের ওপর প্রয়োগ করা চলিত। তাঁদের কোন ত্রুটির জন্য আমার ওই প্রায়শ্চিত্ত ছিল না, প্রায়শ্চিত্ত আমি করিতেছিলাম শ্রমিকদের দোষের জন্য। আমি শ্রমিকদের প্রতিনিধি ছিলাম সুতরাং তাদের দোষে আমি দোষী হইয়াছিলাম। মিল-মালিকদের আমি অনুরোধ-উপরোধ মাত্র করিতে পারিতাম। তাঁদের বিরুদ্ধে উপবাস করিলে তাঁদের ওপর অন্যায় চাপ দেওয়া হইত। আমি জানিতাম আমার উপবাসে তাঁদের ওপর চাপ পড়িবে। আর চাপ পড়িয়াও ছিল। তবু উপবাস না করিয়া আমার উপায় ছিল না। দোষময় হইলেও ওই উপবাস করা ধর্মত আমার কর্তব্য ছিল।

'আমার উপোসের কারণ আপনারা মোটেই টলবেন না, দরকারও নেই,' এ কথা মিল-মালিকদের আমি বুঝাইতে প্রযত্ন করিয়াছিলাম। ও কথায় তাঁরা মিঠে-কড়া বাক্যবাণ নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। করার অধিকারও তাঁদের ছিল।

হরতালের সামনে মাথা নোয়াইবেন না এই ভাব যাঁদের ছিল তাঁদের মুখ্য ছিলেন শেঠ অম্বালাল। তাঁর দৃঢ়তায় ও ছলহীন সরলতায় আমি আশ্চর্য ও মুগ্ধ হইয়াছিলাম। এহেন প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে লড়িয়া সুখ আছে। বিরোধী দলের এমন যে অগ্রণী তাঁর ওপর আমার উপবাসের অপ্রত্যক্ষ প্রভাব পড়িতেছে এই ব্যথা আমায় বিঁধিতেছিল। তা ছাড়া, তাঁর সহধর্মিণী শ্রীমতী সরলা দেবী আমাকে মায়ের পেটের ভাইয়ের মত দেখিতেন, আমার উপোসের কারণ তাঁর যে কষ্ট হইতেছিল তা আমার নিকট অসহ্য ছিল।

প্রথম দিনে অনসূয়া বাই, কয়েকজন বন্ধু ও কিছু শ্রমিক আমার সঙ্গে উপোস করে। তাদের উপোস করা উচিত নয় এ কথা তাদের বুঝাইয়া বলি। কষ্টে তাদের আমার কথায় রাজী করাইতে পারিয়াছিলাম।

এর ফলে সব দিকে অনুকূল মনোভাবের সৃষ্টি হয়। নিছক দয়াভাব হইতে মালিকপক্ষ মিটমাটের পথ খুঁজিতে থাকেন। অনসূয়া বাইর গৃহে তাঁদের আলোচনা চলিতে থাকে। শ্রীঅনন্দাশঙ্কর ধ্রুবও মধ্যে পড়েন। শেষে তাঁকে সালিস মানা হয় ও হরতাল শেষ হয়। তিন দিন মাত্র আমার উপোস করিতে হইয়াছিল। ধর্মঘট শেষে মালিকেরা শ্রমিকদের মধ্যে মিঠাই-মণ্ডা বিতরণ করিয়াছিলেন। ধর্মঘট একুশ দিন চলিয়াছিল।

মিটমাট-সভায় মালিকপক্ষ ও উত্তর বিভাগের কমিশনর উপস্থিত ছিলেন। কমিশনর শ্রমিকদের পরামর্শ দেন, 'মি· গান্ধী যেমন বলেন তোমরা তেমন চলবে।' কিছু দিন পরে এঁরই বিরুদ্ধে আমার যুঝিতে হইয়াছিল। পট পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রলোকের মনোপটও বদলিয়া গিয়াছিল। খেড়ার পাটীদারদের তিনি বলিয়াছিলেন, গান্ধীর কথা মানিও না।

এই প্রকরণে একটি মজার কিন্তু করুণ ঘটনার কথা উল্লেখ না করিলে নয়। মালিকেরা বিস্তর মিঠাই তৈরি করাইয়াছিলেন। এত লোকের মধ্যে তা কি করিয়া বিতরণ করা যায় এ এক সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ঠিক হয় যে খোলা জায়গায় যে গাছতলায় শ্রমিকেরা পণ করিয়াছিল সেই জায়গায় মিঠাই বণ্টন করা সব দিক হইতে শোভন হইবে। তা ছাড়া, অন্য উপযুক্ত বড় খোলা জায়গাও পাওয়া যাইতেছিল না! আমি ধরিয়া লইয়াছিলাম যে যে শ্রমিকেরা একুশ দিন শৃঙ্খলা মানিয়া চলিয়াছে সারি সারি দাঁড়াইয়া শান্তভাবে তারা মিঠাই লইবে, ধৈর্য হারাইয়া হুড়াহুড়ি করিবে না। কিন্তু কার্যত দেখা গেল তার বিপরীত ঃ বিতরণের সব পদ্ধতি বিফল হইল। বিতরণ দুইতিন মিনিট চলিতে না চলিতে বারবার হট্টগোল উপস্থিত হইতেছিল। শ্রমিক নেতাদের সব চেষ্টা ব্যর্থ হইল। অবশেষে গণ্ডগোল, হুড়াহুড়ি ও কাড়াকাড়ি এতদূর পৌঁছিল যে কিছু মিঠাই জনতার পায়ের তলে পড়িয়া নষ্ট হইল। ময়দানে বাঁটা বন্ধ করিতে হইল ঃ অবশিষ্ট মিঠাই কষ্টেস্থষ্টে শেঠ অম্বালালের মিরাজপুর বাংলোতে পৌঁছানো গেল। পরের বাংলোর ময়দানে তা বাঁটা হয়।

এই ঘটনার মজার দিকটা সুস্পষ্ট। উহার অন্য একটা দিক্‌ও ছিল। তাহাও দেখিয়া লওয়া প্রয়োজন। 'এক টেক' (পণ)-গাছতলায় মিঠাই বাঁটা যে কেন অসম্ভব হইয়াছিল সে বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া জানা গিয়াছিল যে মিঠাই বিতরণের রব শুনিয়া অহমদাবাদের ভিখারীরা আসিয়া সেখানে ভিড় করিয়াছিল। আর তারাই সার ভাঙিয়া মিঠাই ছিনাইয়া লওয়ার চেষ্টা করিয়াছিল। এইটা ঘটনার করুণ দিক।

আমাদের অন্নাভাব এত বেশি যে দিনদিন ভিক্ষুকের সংখ্যা বাড়িয়া চলিয়াছে আর পেটের জ্বালায় তারা আত্মসম্মান খোয়াইয়া অন্নের জন্য কাড়াকাড়ি করিতেছে। ধনীরা ভিখারীদের কাজ না দিয়া ভিক্ষায় পুষিতেছে।

২৩

খেড়া সত্যাগ্রহ

দম নেওয়ার সময়ও মিলিল না। অহমদাবাদের মিলমজুরদের হরতাল শেষ হইতেই খেড়া সত্যাগ্রহে পড়িতে হইল।

খেড়া জেলায় ফসল খুব মারা গিয়াছিল। লোক দুর্ভিক্ষের মুখামুখি হইয়াছিল। পাটীদারেরা ওই বছরের মত রাজস্ব মকুব করানোর কথা ভাবিতেছিল। শ্রীঅমৃতলাল ঠক্কর তদন্ত করিয়া রিপোর্ট দিয়াছিলেন। কৃষকদের নিশ্চিত পরামর্শ দেওয়ায় আগে কমিশনরের সহিত আমি কথা বলিয়া নিলাম। এই বিষয়ে শ্রীমোহনলাল পাণ্ড্যা ও শ্রীশঙ্করলাল পরীখ অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেছিলেন। শ্রীবিঠলভাই প্যাটেল ও সার গোকুলদাস কহানদাস পরীখের মারফতে এই ব্যাপারে বোম্বাই বিধান সভায় তাঁরা আন্দোলনও চালাইয়াছিলেন। এই প্রশ্ন লইয়া একের অধিক ডেপুটেশন গবর্নরের সহিত দেখা করিয়াছিল।

ওই সময়ে আমি গুজরাট সভার সভাপতি ছিলাম। সভা কমিশনের ও গবর্নরের কাছে আবেদন করিয়াছিল, তার পাঠাইয়াছিল। কমিশনরের ধমক পর্যন্ত হজম করিয়াছিল। তখন অফিসারেরা যে তুচ্ছতাচ্ছিল্য ও অভদ্র আচরণ করিয়াছিল তা এখন বিশ্বাসের অযোগ্য মনে হইবে।

চাষীদের দাবি এমন সঙ্গত ও এতই অল্প ছিল যে সরকার তা বিনা ওজরে মানিয়া লইতে পারিত। আইনমতে ফলন চার আনা বা তার কম হইলে সে বছর খাজনা মকুব হওয়ার কথা। সরকারী আমলাদের হিসাব মত ফলন চার আনার অধিক হইয়াছিল। চাষীদের তরফ হইতে দেখানো হইয়াছিল যে ফলন চার আনার কম হইয়াছে। সরকার তা মানিতে প্রস্তুত ছিল না। চাষী বলিল সালিস মানা হোক। সরকার মনে মনে বলিল ছোট মুখে বড় কথা। যতটা সম্ভব অনুরোধ উপরোধের পরে সঙ্গীদের সহিত আলোচনা করিয়া সত্যাগ্রহ করার পরামর্শ দিলাম।

খেড়া জেলার সেবকেরা ত ছিলেনই। ওই লড়াইতে আমার প্রধান সহায় ছিলেন শ্রীবল্লভভাই প্যাটেল, শ্রীশঙ্করলাল ব্যাঙ্কার, শ্রীমতী অনসূয়া বাই শ্রীইন্দুলাল যাজ্ঞিক ও মহাদেব প্রভৃতি। বল্লবভাইয়ের তখন আদালতে মস্ত নামডাক, প্রচুর পসার। তা ছাড়িয়া তিনি আসেন, ছাড়িয়াই বলিলাম কারণ আদালতে বস্তুত তাঁর আর ফিরিয়া যাওয়া হয় নাই।

নদিয়াদ অনাথ আশ্রমে আমরা ডেরা গাড়িয়াছিলাম। অনাথ আশ্রমে ছিলাম এর কোন বিশেষ মানে নাই। সকলের স্থান হইতে পারে এমন অপর কোন বড় খালি বাড়ী ছিল না।

নীচের প্রতিজ্ঞা-পত্রে সত্যাগ্রহীদের স্বাক্ষর লওয়া হইয়াছিল :

'আমরা জানি আমাদের গাঁয়ের ফলন চার আনার কম হয়েছে। এ কারণ আগামী ফসল পর্যন্ত খাজনা আদায় বন্ধ রাখার প্রার্থনা আমরা সরকারে জানিয়েছিলাম। সরকার আমাদের প্রার্থনায় কান দেয় নাই। অতএব নিম্নস্বাক্ষরকারী আমরা প্রতিজ্ঞা করছি যে আমরা স্বেচ্ছায় খাজনা বা উহার অনাদায়ী অংশ সরকারকে দিব না। সরকার আইন মতে খাজনা আদায়ের যে চেষ্টা করবে সে কথায় আমাদের কিছু বলার নাই; রাজস্ব অনাদায়ের ফল আমরা খুশী মনে ভুগব। আমাদের জমি সরকারে বাজেয়াপ্ত হয়, হতে দেব। তবুও নিজ হাতে পয়সা দিয়ে আমাদের কেস আমরা মিথ্যা প্রমাণ করব না অথবা আত্মসম্মান খোয়াব না। দ্বিতীয় কিস্তির আদায় গোটা জেলায় সরকার বন্ধ রাখে ত আমাদের মধ্যে যাদের দেওয়ার সঙ্গতি আছে তারা পুরোটা বা অনাদায়ী অংশ দিতে প্রস্তুত আছি। আমাদের মধ্যে যারা পারগ তারা এ কারণে খাজনা দিচ্ছে না যে তারা দিলে অপারগেরা ভয় খেয়ে নিজেদের জিনিসপত্র বেচে বা ধার করে খাজনা দেবে ও কষ্টে পড়বে। এই অবস্থায় আমরা মনে করি গরীবদের রক্ষা করা পারগদের কর্তব্য।'

এই লড়াইয়ের কথা বলার জন্য অনেক অধ্যায় দেওয়া যাইবে না। সুতরাং অনেক মধুর স্মৃতি বাদ দিয়া যাইতেছি। যাঁরা এই গুরুত্বপূর্ণ লড়াইয়ের গভীর অধ্যয়ন করিতে চান তাঁদের আমি শ্রীশঙ্করলাল পরীখ্ রচিত খেড়া সত্যাগ্রহের সবিস্তার প্রামাণিক ইতিহাস পড়িতে বলি।

২৪

'পেঁয়াজ-চোর'

চম্পারণ ভারতের এক কোণে অবস্থিত, আর ওখানকার লড়াইকে সংবাদপত্র হইতে এত তফাতে রাখা গিয়াছিল যে বাইরের লোক সেখানে যাইত না। খেদার ব্যাপার ছিল অন্যরূপ; সংবাদপত্রে দৈনিক উহার কথা ছাপা হইত।

এই নূতন বস্তু গুজরাটীদের মন কাড়িয়া লইয়াছিল। টাকা দিয়া সহায়তা করার জন্য তারা আকুল হইয়াছিল। সত্যাগ্রহ টাকা দিয়া চালানো যায় না, টাকার দরকার এই লড়াইতে খুবই কম এ কথাটা তাদের বোঝানো শক্ত হইয়াছিল। মানা করা সত্ত্বেও বোম্বাইয়ের শেঠেরা এত টাকা পাঠাইয়াছিলেন যে লড়াইয়ের শেষে কিছু টাকা বাঁচিয়া গিয়াছিল।

অন্য দিকে সত্যাগ্রহী সেনাকেও এক নূতন পাঠ পড়াইতে হইয়াছিল—সাদাসিধা চলার পাঠ। এই পাঠ পুরোপুরি তারা শিখিয়াছিল এ কথা বলা যাইবে না। তবে নিজেদের থাকা-খাওয়া ও চালচলনে অনেকটা পরিবর্তন তারা করিয়াছিল।

জিনিসটা পাটীদারদের (জোতদারদের) কাছে নতুন ছিল। গ্রামে গ্রামে গিয়া তাদের ইহার মর্ম বুঝাইতে হইয়াছিল। সবার প্রথম কাজ ছিল, আমলারা প্রজার প্রভু নয় তাদের পয়সার নোকর এ কথা তাদের মনে গাঁথিয়া দিয়া তাদের ভয় দূর করা। নির্ভয় হওয়া সত্ত্বেও যে লোকের সহিত মোলায়েম ব্যবহার করিতে হয় এ কথা তাদের বোঝানো ও অন্তর দিয়া স্বীকার করানো প্রায় অসম্ভব মনে হইয়াছিল। আমলাদের ভয় দূর হওয়ার পরে তাদের অপমানের পাল্টা জবাব দেওয়ার সাধ কার না হয়! কিন্তু সত্যাগ্রহীতে অবিনয় আর দুধে বিষ এই দুই একই পদার্থ। পাটীদারেরা বিনয়ের পাঠ ঠিকমত শেখে নাই এ কথা পরে আমি বুঝিতে পাই। অভিজ্ঞতা হইতে দেখিতে পাইয়াছি যে বিনয় সত্যাগ্রহের সব চাইতে কঠিন অঙ্গ। বিনয় মানে এখানে কেবল সময়বিশেষের নম্রতা নয়: বিনয় মানে প্রতিপক্ষের প্রতি আদরভাব, সরলভাব ও হিতকামনা পোষণ করা এবং আচরণে তাকে রূপ দেওয়া।

প্রথম দিকে লোকেরা খুব সাহস দেখাইলেও আমলাদারেরা তেমনটা যেন কঠোরতা অবলম্বন করে নাই। কিন্তু যখন তারা দেখিল লোকেরা তাদের সংকল্পে অটল তখন তারা চাপ দিতে থাকে। ক্রোকদাররা লোকের গরু বাছুর বেচিল, যে মালের ওপর চোখ পড়িল সরাইল। চারআনি নোটিশ জারি হইল। কোন কোন গ্রামের ফসল ক্ষেত হইতে সরকারের লোক তুলিয়া লইল। লোকে ভয় পাইল। কেউ কেউ খাজানা দিল। মালপত্র ধরিয়া খাজানা আদায় করে করুক এই ভাব হইতে কেউ কেউ সরকারী

লোকের সামনে এই রকম জিনিস আগাইয়া দিতে থাকে। অন্য দিকে কিছু লোক মরণপণে দৃঢ় থাকে।

এর মধ্যে শঙ্করলাল পরীখের কোন প্রজা তাঁর জমির খাজানা আদায় দেয়। হইচই পড়িয়া যায়। শঙ্করলাল পরীখ সেই জমি লোকসেবার জন্য দান করিয়া তাঁর লোক যে ভুল করিয়াছিল তার প্রায়শ্চিত্ত করেন। এই ভাবে তিনি নিজের মান বাঁচান এবং লোকের সামনে উদাহরণ স্থাপন করেন।

কোন ক্ষেতের তৈরি পেঁয়াজ ফসল আমার মতে সরকার অন্যায়ভাবে বাজেয়াপ্ত করিয়াছিল। ভয়-খাওয়া লোকের মনে সাহস ফিরাইয়া আনার জন্য মোহনলাল পাণ্ড্যার অধীনে সেই জব্দ পেঁয়াজ তুলিয়া আনিতে লোককে আমি উৎসাহ দিয়াছিলাম। আমি মনে করি তাতে আইন-ভঙ্গ করা হয় নাই। আর যদি হইতও তবু সামান্য খাজনার জন্য অতটা জমির ফসল জব্দ করা আইনের দৃষ্টিতে ঠিক হইলেও ন্যায়নীতির দৃষ্টিতে অন্যায় ছিল, লুট ছিল, আর তাই ওরূপ নোটিশ অগ্রাহ্য করাই মানুষের ধর্ম। লোকদের স্পষ্ট কথায় বলিয়াছিলাম যে ও কাজ করিলে জেল ও অর্থদণ্ড হওয়ার ভয় আছে। মোহনলাল পাণ্ড্যা ঠিক ইহাই চাহিতেছিলেন। সত্যাগ্রহের বিরোধী নয় এমন কিছু করিয়া জেল ভোগের আগে লড়াই শেষ হয় এটা তাঁর ভাল লাগিতেছিল না। তাই খেত হইতে পেঁয়াজ তুলিয়া লওয়ার কাজে তিনি অগ্রণী হইলেন। অন্য সাত আট জন তাঁর সঙ্গে ছিল।

তাঁদের না ধরিলে সরকারের মান বাঁচে কি? মোহনলাল পাণ্ড্যা ও তাঁর সঙ্গীরা গ্রেপ্তার হইলেন। এতে লোকের উৎসাহ বাড়িয়া গেল, জেল ইত্যাদি দণ্ডের ভয় দূর হইলে রাজদণ্ড ঠুঁটু হয়; লোক তাতে না দমিয়া বীর হয়। কোর্টে মোকদ্দমা দেখার জন্য লোক ভাঙ্গিয়া পড়িল। পাণ্ড্যা ও তাঁর সাথীদের দিন কয়েকের জেল হইল। আমি মনে করি কোর্ট বিচারে ভুল করিয়াছিল, পেঁয়াজ তুলিয়া লওয়ার কাজ চুরির সংজ্ঞায় পড়ে না। কিন্তু আপীল করার ইচ্ছা কাহারও ছিল না।

মিছিল করিয়া লোকে 'কয়েদী'দের জেলে আগাইয়া দেয় আর সেই দিন লোকের কাছে মোহনলাল পাণ্ড্যা 'পেঁয়াজ-চোর' এই সম্মানের খেতাব পান। আজও সেই খেতাব তিনি ভোগ করিতেছেন।

এই লড়াই কখন ও কি ভাবে শেষ হয় তা পরের প্রকরণে বলিব।

২৫

খেড়া লড়াইয়ের অন্ত

এই লড়াই বিচিত্রভাবে শেষ হয়। লোকে হাল ছাড়িয়া দিয়াছিল স্পষ্ট দেখিতেছিলাম। যারা ডাঁটো ছিল তাদের সর্বস্বান্ত করিতে আমার প্রাণ সায় দিতেছিল না। সত্যাগ্রহীর শোভন কোন পথ মিলিলে তা গ্রহণের জন্য আমি প্রস্তুত ছিলাম। এমন পথ আচমকা মিলিয়া গেল। নাদিয়াদ তালুকের মামলতদার বলিয়া পাঠান যে সঙ্গতিসম্পন্ন পাটীদারেরা খাজানা আদায় দিলে গরীবদের খাজানা মকুব করা হইবে। এই প্রস্তাব আমি লিখিতরূপে চাই ও পাই। মামলতদার নিজের তালুকের কথা বলিতে পারেন, গোটা জেলার ভার তিনি লইতে পারেন না। তাই আমি কলেক্টরকে জিজ্ঞাসা করি। উহার জবাবে তিনি লিখেন যে, মামলতদারের প্রস্তাব মত গোটা জেলায় হুকুম জারি করা হইয়াছে। সে কথা আমি জানিতাম না। দেখিতে পাইলাম এরূপ নির্দেশ জারি হইয়া থাকে ত লোকের পণ রক্ষা হইয়াছে। শপথে ওরূপ কথা ছিল। তাই ওই হুকুমে আমরা খুশী হইয়াছিলাম।

কিন্তু সত্যাগ্রহের ওরূপ অন্তে সুখী হইতে পারি নাই। যে মধুরতায় সত্যাগ্রহের অন্ত হওয়া আবশ্যক এতে সেই মধুরতা ছিল না। কলেক্টর এভাবে কাজ করিতেছিলেন যেন মিটমাটের খবরও তিনি জানিতেন না। গরীবদের বাদ দেওয়ার কথা ছিল কিন্তু তাদের কেউ বস্তুত রেহাই পাইয়াছিল কিনা সন্দেহ। গরীব কারা তা নির্ণয় করার ছিল লোকের কিন্তু সেই অধিকার খাটাইতে তারা পারে নাই। দুঃখের কথা, সেই অধিকার খাটাইবার শক্তি তাদের ছিল না। লড়াইয়ের অন্তে সত্যাগ্রহের বিজয়-উৎসব করা হয় বটে কিন্তু তাতে আমার অন্তর সাড়া দেয় নাই। দেয় নাই তার কারণ পূর্ণ বিজয়ের প্রাণবস্তু তাতে ছিল না।

সত্যাগ্রহের আরম্ভে লোকের মধ্যে যে তেজ ও শক্তি দেখা যায় সত্যাগ্রহের অন্তে তা অপেক্ষা অধিক তেজ ও শক্তি দেখা গেলেই কেবল বলা চলে যে যোগ্য অন্ত তার হইয়াছে।

তাহা হইলেও এই লড়াইয়ের নানা গৌণ ফল লোকে আজ দেখিতে পাইতেছে ও ভোগ করিতেছে। খেড়া লড়াইতে গুজরাটের রায়তদের মধ্যে চেতনা আসিয়াছিল, রাজনীতিক কর্মে তারা দীক্ষা লাভ করিয়াছিল।

বিদুষী ডা. বেসেন্টের প্রভাবশালী 'হোমরুল' আন্দোলনের ছোঁয়াচ রায়তদের লাগিয়াছিল। কিন্তু চাষীদের সহিত শিক্ষিত জনসেবকদের সত্যকার যোগাযোগ এই লড়াইয়ের সূত্রে হয়। কিভাবে চাষীদের সহিত এক হইতে হয় তা তারা ইহা হইতে শেখে। ইহাতে তারা উপযুক্ত কর্মক্ষেত্র পায় ও তাদের ত্যাগবৃত্তি বাড়ে। বল্লভভাই এই লড়াইতে নিজের পরিচয় পান এটা ছোটখাটো কথা নয়। এই লাভ যে কত বড় তার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে গত বৎসর তাঁর বন্যাপীড়িতদের সেবায় আর এই বছরের বারডোলী সত্যাগ্রহে। এই (খেড়া) লড়াইয়ের ফলে গুজরাটে নবজীবনের তেজ আসিয়াছে, নূতন উৎসাহের সঞ্চার হইয়াছে। আত্মশক্তির যে পরিচয় পাটীদারেরা পাইয়াছে তা তারা কোন কালেও ভুলিবে না। কষ্ট ও ত্যাগের পথে মানুষ নিজ ভাগ্যবিধাতা হইতে পারে এ কথা লোক বুঝিয়াছে। খেড়া সত্যাগ্রহের কারণ গুজরাটে সত্যাগ্রহের মূল দৃঢ় হইয়াছে।

তাই লড়াইয়ের ওরূপ অন্তে আমি সুখী না হইলেও খেড়ার কৃষকেরা আহ্লাদে অধীর হইয়াছিল। কারণ তারা দেখিয়াছিল যে তাদের শক্তির অনুপাতে সব কিছু তারা পাইয়াছে আর তাদের হাতে আসিয়াছে রাজশক্তির অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়িবার এক নিখুঁত অব্যর্থ অস্ত্র। সুতরাং উল্লাসের সঙ্গত কারণ তাদের ছিল।

তা সত্ত্বেও আমি বলিব যে খেড়ার কৃষকেরা সত্যাগ্রহের মর্মকথা বোঝে নাই আর ফলে তাদের কষ্ট ভুগিতে হইয়াছিল। সে কথা পরের কোন কোন প্রকরণে বলিব।

২৬

একতার আকুতি

ইউরোপে যখন মহাযুদ্ধ চলিতেছিল খেড়া সত্যাগ্রহ তখন আরম্ভ হয়। যুদ্ধের তখন সঙ্গীন ক্ষণ। ওই প্রসঙ্গে বড়লাঠ নেতাদের দিল্লীতে ডাকিয়াছিলেন। বৈঠকে যাওয়ার জন্য আমাকে বিশেষ অনুরোধ তিনি করিয়াছিলেন। আগেই বলিয়াছি যে লর্ড চেমসফর্ডের সঙ্গে আমার ভাব ছিল।

আমন্ত্রণ রক্ষার জন্য দিল্লী গেলাম। কিন্তু মৌলানা শৌকত আলী, লোকমান্য প্রভৃতি নেতাদের বৈঠকে ডাকা হয় নাই বলিয়া বৈঠকে যোগ

দিতে বাধবাধ ঠেকিতেছিল। আলী ভাইরা তখন জেলে ছিলেন। তাঁদের সহিত দুই একবার মাত্র আমার দেখা হইয়াছিল। কিন্তু তাঁদের কথা খুব শুনিয়াছিলাম। তাঁদের সেবার ও সাহসের কথা সেই সময়ে মুখে মুখে ফিরিত। হাকিম সাহেবের সঙ্গেও তখন আমার পরিচয় ছিল না। স্বর্গীয় আচার্য রুদ্র ও দীনবন্ধু এণ্ডরুজের মুখে তাঁর গুণগান শুনিয়াছিলাম। কলিকাতায় মুস্লিম লীগের বৈঠকে শোয়েব কুরেশী ও ব্যারিস্টার খাজা সাহেবের সহিত আমার পরিচয় হইয়াছিল। ডাক্তার আনসারী ও ডাক্তার আবদুর রহমানের সংস্রবেও আসিয়াছিলাম। সজ্জন মুসলমানদের সহিত মেলামেশার সুযোগ আমি খুঁজিতাম এবং চরিত্রবান দেশভক্ত অগ্রণীদের সহিত আলাপ করিয়া মুসলমান সমাজের মনোভাব বুঝিবার জন্য আমি উৎসুক ছিলাম।

হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে যে সত্যকার সখ্যতা নাই দক্ষিণ আফ্রিকাতেই বুঝিতে পাইয়াছিলাম। দুইয়ের মনের গরমিল দূর করার কোন সুযোগ কোন দিন আমি হারাই নাই। মিথ্যা স্তুতি করিয়া বা আত্মসম্মানে জলাঞ্জলি দিয়া কাউকে তুষ্ট করার স্বভাব আমার নয়। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকার অভিজ্ঞতা হইতেই আমি নিঃসন্দেহে বুঝিতে পারিয়াছিলাম আর আজও আমি মনে করি যে, হিন্দু-মুসলমানের একতার প্রশ্ন অহিংসা প্রয়োগের প্রশস্ততম ক্ষেত্র হইবে এবং আমার অহিংসার অগ্নিপরীক্ষাও হইবে ওই প্রশ্নে। প্রতি মুহূর্তে আমি অনুভব করিতেছি যে ঈশ্বর আমাকে কষ্টিপাথরে যাচাই করিতেছেন।

এই ভাব, এই চিন্তা লইয়া আমি দেশে ফিরিয়াছিলাম তাই আলী ভাইদের সহিত আলাপ-পরিচয়ে আমার মন প্রসন্ন হইয়াছিল। আমাদের সম্বন্ধ ঘন হইতেছিল। কিন্তু জমিয়া ওঠার আগেই সরকার তাঁদের জ্যান্ত কবর দিল। যখনই লিখিবার অনুমতি পাইতেন মৌলানা মহম্মদ আলী বেতুল ও হিন্দওয়ারা জেল হইতে আমাকে লম্বা চিঠি লিখিতেন। আলী ভাইদের সহিত দেখা করিতে চাহিয়াছিলাম, সেই অনুমতি পাই নাই।

আলী ভাইদের জেল হওয়ার পরে মুসলমান বন্ধুরা আমাকে কলিকাতায় মুস্লিম লীগের অধিবেশনে নিমন্ত্রণ করেন। আমাকে বলিতে বলেন। আমি বলি। বলি যে আলী ভাইদের মুক্ত করা মুসলমানদের ধর্ম। এর কিছুদিন পরে তাঁরা আমায় আলীগড় মুস্লিম কলেজে লইয়া যান।

সেখানে যুবকদের আমি দেশসেবার জন্য ফকিরের ব্রত গ্রহণ করিতে বলিয়াছিলাম।

আলী ভাইদের মুক্তির জন্য আমি সরকারের সহিত লেখালেখি করিতে থাকি। ওই প্রসঙ্গে আলী ভাইদের খিলাফত সম্বন্ধে মতামত আমি অধ্যয়ন করিয়া লই। মুসলমানদের সহিত আলোচনা করি। আমার মনে হয় যে মুসলমানদের প্রকৃত বন্ধুত্ব লাভ করিতে হইলে আলী ভাইদের ছাড়াইতে হইবে এবং খিলাফতের প্রশ্ন ন্যায়সঙ্গতভাবে মেটে সেজন্য পুরাপুরি সহায়তা করিতে হইবে। আমার কাছে খিলাফতের প্রশ্ন সহজ ছিল। উহার দোষগুণের চুলচেরা বিচার করার প্রয়োজন আমার দৃষ্টিতে মোটেই ছিল না। মুসলমানদের দাবি নীতিবিরুদ্ধ না হইলে সাহায্য করা আমার কাছে কর্তব্য মনে হইয়াছিল। ধর্মের কথায় পৃথক্ দৃষ্টি ত রহিয়াছেই। যে ধর্মে যার জন্ম তার কাছে তা শ্রেষ্ঠ। একই বস্তুতে যদি সকলের সমান বিশ্বাস হইত তবে জগতে একই ধর্ম থাকিত। কিছুদিন পরে আমি দেখিতে পাইয়াছিলাম যে খিলাফত সম্পর্কে মুসলমানদের দাবি নীতিবিরুদ্ধ ত ছিলই না, ব্রিটেনের প্রধান মন্ত্রী লয়েড জর্জ পর্যন্ত উহার ন্যায়তা স্বীকার করিয়াছিলেন। তাই আমার মনে হয় যে তাঁকে দিয়া তাঁর দেওয়া কথা মত কাজ করাইয়া লওয়া আমার কর্তব্য। এরূপ স্পষ্ট শব্দে তিনি কথা দিয়াছিলেন যে মুস্লিম দাবির আপেক্ষিক দোষগুণ বিচার না করিলেও চলিত, তবুও যে করিয়াছিলাম সে আত্মতুষ্টির জন্য।

খিলাফতের প্রশ্নে আমি মুসলমানদের সহিত যোগ দিয়াছিলাম বলিয়া বন্ধু ও সমালোচকেরা আমার খুব সমালোচনা করিয়াছেন। তবুও আমি বলিব যে আমার নির্ণয়ে ভুল হয় নাই আর যে সহায়তা আমি করিয়াছি বা আমার কথায় লোকে করিয়াছে তার জন্যও আমার কোন আপসোস নাই। আবার যদি অমনটা প্রশ্ন উপস্থিত হয় ত আবার অমনটাই করিব।

দিল্লী যাওয়ার আগেই আমি ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলাম যে মুসলমানদের দাবি ভাইসরয়ের কাছে উপস্থিত করিব। খিলাফতের প্রশ্ন পরে যে রূপ ধরিয়াছিল তখন উহার সেই রূপ ছিল না।

দিল্লীতে পৌঁছিলে বৈঠকে যোগ দেওয়ার পক্ষে অন্য এক বাধা খাড়া হইল। দীনবন্ধু এণ্ডরুজ এক নৈতিক প্রশ্ন তুলিলেন। ও সময়ে ইটালী ও ইংলণ্ডের মধ্যে গুপ্ত সন্ধি হওয়ার খবর সম্বন্ধে ব্রিটিশ সংবাদপত্রে

আলোচনা চলিতেছিল। সে কথা জানাইয়া তিনি আমায় প্রশ্ন করেন : 'ব্রিটেন যদি ইউরোপের কোন শক্তির সহিত এরূপ সন্ধি করে থাকে তবে আপনি এই বৈঠকে যোগ দিতে পারেন কি ?' ওই সন্ধির কথা আমি কিছুই জানিতাম না। দীনবন্ধুর কথাই যথেষ্ট ছিল। অতএব বৈঠকে যাওয়ার পক্ষে আমার যে বাধা রহিয়াছে সে কথা লর্ড চেমসফর্ডকে পত্র দ্বারা জানাইলাম। এই বিষয়ে তিনি আমার সহিত কথা বলিতে চাহেন। অনেক ক্ষণ তাঁর সহিত কথা হয়, তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারী মি· মেফীর সহিতও দীর্ঘ আলোচনা হয়। বৈঠকে যাইতে রাজী হই। বড়লাট যে কথা বলিয়াছিলেন তা সংক্ষেপে এই : 'ব্রিটিশ কেবিনেট যা কিছু করে ভাইসরয় তার সব কিছু জানে না আমার এ কথা আপনি অবশ্যই বিশ্বাস করবেন। ব্রিটিশ গবর্নমেণ্ট কোনদিনও ভুল করে না এমন কথা আমি বলি না। এমন দাবি কেউ করে না। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব জগতের পক্ষে মোটের ওপর হিতকর ও তার সংস্রবে ভারতের মোটের ওপর লাভ হয়েছে এ কথা মানেন ত তার এই বিপদের কালে ভারতবাসী মাত্রের তাকে সহায়তা করা কর্তব্য নয় কি ? গোপন সন্ধির কথায় ব্রিটিশ সংবাদপত্রে যা বেরিয়েছে তা আমিও দেখেছি। আপনাকে কথা দিতে পারি যে এর বেশি আমি কিছু জানি না। সংবাদপত্রে কেমন সব কাহিনী বেরয় তা ত আপনি জানেন। খবরের কাগজে এমন খবর বের হয়েছে বলে সাম্রাজ্যের এই দুর্দিনে সাহায্য না করা কি সঙ্গত হবে ? লড়াইয়ের অন্তে যত নৈতিক প্রশ্ন তোলার তুলবেন আর যত বিরোধ করার করবেন। আজ সে সময় নয়।'

যুক্তিটা নূতন ছিল তা নয়। যে প্রসঙ্গে ও যে ভাবে তা তিনি ধরিয়াছিলেন তাতে তা আমার কাছে নূতন মনে হইয়াছিল। সভায় যোগ দিতে আমি রাজী হই। খিলাফতের প্রশ্ন সম্বন্ধে স্থির করি যে পত্রে তা বড়লাটকে জানাইব।

২৭

সেনা সংগ্রহ

বৈঠকে গেলাম। বড়লাট আমাকে সৈন্য সংগ্রহের প্রস্তাব সমর্থন করিতে বিশেষ অনুরোধ করেন। হিন্দী-হিন্দুস্তানীতে বলিবার অনুমতি আমি চাই।

বড়লাট রাজী হন, তবে ইংরেজীতেও বলিতে বলেন। ভাষণ আমার দেওয়ার ছিল না। কেবল একটি বাক্য আমি বলিয়াছিলাম তার মর্ম এই: 'দায়িত্ব পুরাপুরি অনুভব করে আমি এই প্রস্তাব সমর্থন করছি।'

হিন্দুস্তানীতে বলিয়াছিলাম বলিয়া অনেকে আমাকে ধন্যবাদ দিয়াছিলেন; বলিয়াছিলেন, যতদূর মনে পড়ে এর পূর্বে কেউ কখন বড়লাটের বৈঠকে হিন্দুস্তানীতে বলে নাই। এই সাধুবাদে ও বড়লাটের সামনে উহার পূর্বে কেউ ভাষণ হিন্দুস্তানীতে দেয় নাই এ কথায় আমার জাতীয় অভিমানে ঘা লাগিয়াছিল। নিজ দেশে নিজ দেশের কথার চর্চায় নিজ ভাষা অপাঙ্‌ক্তেয় ইহা অপেক্ষা লজ্জার আর কি হইতে পারিত? আমার মত এক মনুষ্য হিন্দুস্তানীতে দুই একটি কথা বলিয়াছিল বলিয়া সাধুবাদ—এই লজ্জা রাখার ঠাঁই ছিল না। কোন্ রসাতলে যে আমরা গিয়াছি এই সাধুবাদ তার সাক্ষী।

সভায় যে বাক্যটি বলিয়াছিলাম তার গুরুত্ব আমার কাছে কম ছিল না। ওই বৈঠকের ও ওই প্রস্তাব সমর্থন করার কথা আমার ভোলার যো ছিল না। দিল্লী ছাড়ার আগে আমার একটা কাজ করার ছিল—বড়লাটকে পত্র লেখা। কাজটা সহজ ছিল না। বৈঠকে যাইতে কেন আটকাইতেছিল আর শেষটায় কেনই বা গিয়াছিলাম এবং দেশ কি চায় এই সব কথা গবর্নমেন্টের ও লোকের হিতার্থে স্পষ্ট শব্দে জানানো আমার কর্তব্য মনে হইয়াছিল।

পত্রে লোকমান্য তিলক ও আলী ভাই প্রভৃতি নেতাদের বৈঠকে না ডাকার জন্য অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলাম, লোকে কি চায় ও যুদ্ধের কারণ সৃষ্ট অবস্থা দৃষ্টে মুসলমানদের দাবির কথা বলিয়াছিলাম। এই পত্র সংবাদপত্রে প্রকাশ করার অনুমতি চাহিয়াছিলাম। খুশীমনে সেই অনুমতি বড়লাট দিয়াছিলেন।

বৈঠক শেষ হইতেই বড়লাট সিমলায় চলিয়া গিয়াছিলেন। সুতরাং পত্র সিমলায় পাঠাইতে হইয়াছিল। ডাকে দিলে পাইতে দেরী হইত। আমার দৃষ্টিতে পত্রটার গুরুত্ব ছিল। যে কোন মানুষের হাতে পত্র পাঠাইবার ইচ্ছা আমার ছিল না। কোন শুদ্ধচরিত্র ব্যক্তির হাতে পাঠাইতে পারি ত ভাল হয় এই ছিল আমার মনের আকাঙ্ক্ষা। দীনবন্ধু এণ্ড্রুজ ও সুশীল রুদ্র কেমব্রিজ মিশনের স্বর্গীয় রেভারেণ্ড আয়রলণ্ডের নাম করেন। তিনি বলেন যে পত্র পড়িতে পাইলে আর তা সঙ্গত মনে হইলে তিনি

লইয়া যাইবেন। পত্র তিনি পড়েন ; তা তাঁর ভাল লাগে এবং যাইবেন বলেন। আমি দ্বিতীয় শ্রেণীর ভাড়া সাধি। তিনি বলেন যে ইণ্টার ক্লাসে তিনি যাতায়াত করেন আর রাত্রের গাড়ী হইলেও ইণ্টার ক্লাসেই যান। তাঁর সাদাসিধা ভাব ও অকপট সরল ব্যবহারে আমি মুগ্ধ হইয়াছিলাম। আমি মনে করি এরূপ শুদ্ধ ব্যক্তির হাতে পত্র পাঠাইবার ফল ভালই হইয়াছিল। আমার পথ তাতে পরিষ্কার হইয়াছিল।

সৈন্য সংগ্রহ করা ছিল আমার অপর কর্ত্তব্য। খেডার লোকের কাছে না যাইয়া এর জন্য আর কার কাছেই বা যাইতে পারিতাম ? আর আমার সাথীদের না ডাকিয়া অন্য কাকেই বা ডাকিতে পারিতাম ? খেডাতে গিয়া প্রথমেই বল্লভভাই প্রভৃতির সঙ্গে কথা বলি। তাঁদের কেউ কেউ প্রস্তাবটা তৎক্ষণাৎ মানিয়া লইতে পারিলেন না। যাঁদের কাছে প্রস্তাব ভাল মনে হইয়াছিল তাঁরাও উহার সফলতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। যে শ্রেণীর লোককে সৈনিক হইতে বলিব ঠিক করিয়াছিলাম সরকারের প্রতি তাদের মনোভাব ভাল ছিল না। সরকারী আমলাদের জুলুমের ব্যথা তখনও তাদের বুকে বিঁধিতেছিল।

তবুও কার্য আরম্ভ করার পক্ষে সকলেই মত দেন। কাজে হাত দিতেই আমার চোখ ফুটিল। দেখিতে পাইলাম যা ভাবিয়াছিলাম অবস্থাটা ঠিক তা নয়। লড়াইয়ের সময়ে লোকে বিনা পয়সায় গাড়ী যোগাইয়াছিল, এক জন স্বেচ্ছাসেবক চাহিলে পাঁচ জন আগাইয়া আসিত। এখন পয়সা দিয়াও গাড়ী পাওয়া কঠিন হইল, স্বেচ্ছাসেবকের কথা না-ই বলিলাম। তবুও নিরস্ত হওয়ার প্রশ্নই ছিল না। ঠিক করিলাম গাড়ীতে না চড়িয়া পায়ে হাঁটিব। দিনে কুড়ি মাইল পাড়ি দিতাম। যারা গাড়ী দিত না তারা খাওয়া দিবে এই আশা করা বৃথা। আর চাইতে বাধিতেছিল। ঠিক করা গেল স্বেচ্ছাসেবকেরা প্রত্যেকে নিজের মত খাদ্যও নিজ নিজ থলিতে লইয়া বাহির হইবে। গরমের দিন ছিল তাই চাদর বা বিছানার দরকার ছিল না।

গ্রামে গ্রামে যাইতাম, সভা করিতাম। লোক আসিত। কিন্তু দুই একজনের বেশি লোক নাম লিখাইত না। 'আপনি অহিংসার কথা বলেন আবার অস্ত্র ধারণের কথাও বলছেন, এ কেমন কথা ? সরকার ভারতের জন্য কি করেছে যে তাকে সহায়তা করব ?'—এমনতর অনেক প্রশ্ন লোকে জিজ্ঞাসা করিত।

তা সত্ত্বেও ধরিয়া থাকার ফলে ধীরে ধীরে লোকে সাড়া দিতে থাকে। নামও বেশী সংখ্যায় আসিতে থাকে। আমাদের ভরসা জন্মে যে এক দল খাড়া হইলে আর এক দল পূর্ণ হইতে দেরী হইবে না। রংরুটদের কোথা রাখা হইবে ইত্যাদি বিষয়ে কমিশনারের সহিত আমার কথা চলিতেছিল।

বিভাগীয় কমিশনারেরা নিজ নিজ বিভাগে দিল্লীর দেখাদেখি বৈঠক করিতেছিলেন। গুজরাটেও এরূপ এক বৈঠক হইয়াছিল। আমি ও সাথীরা নিমন্ত্রণ পাইয়াছিলাম। গিয়াছিলাম। দিল্লীর বৈঠকে অস্বস্তি বোধ করিয়াছিলাম ত এখানকার 'জো হুকুম' আবহাওয়ায় হাঁফাইয়া উঠিয়াছিলাম। এই বৈঠকে দুই কথা বেশি বলিয়াছিলাম। স্তুতি আমার কথায় ছিল না বরং দুইচারটি শক্ত কথা শুনাইয়াছিলাম।

সৈনিক হওয়ার জন্য আহ্বান জানাইয়া প্রচারপত্র বাহির করিতাম। সৈন্য কেন যে হইতে বলি তার কারণ দর্শাইয়া তাতে বলা হইয়াছিল: 'ভারতে ব্রিটিশ শাসনের নানা কুকীর্তির সবচাইতে বড় কুকীর্তি এই যে, গোটা দেশটাকে তা আইন করে অস্ত্রহীন করেছে। এ কথা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় লেখা থাকবে। এই আইন রদ করাতে হলে অস্ত্রের ব্যবহার শেখা চাই। তা শেখার এই সুবর্ণ সুযোগ। গবর্নমেণ্টের বিপদের দিনে মধ্যবর্তী শ্রেণীর যুবকেরা উহার সাহায্যে স্বেচ্ছায় এগিয়ে এলে গবর্নমেণ্টের অবিশ্বাস দূর হয়ে যাবে; যারা অস্ত্র ধারণ করতে চায় তারা সে সুযোগ পাবে।' আমার এই যুক্তিটা কমিশনারের তেতো লাগিয়াছিল। এই কথার উল্লেখ করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন যে আমার সহিত তিনি এই প্রশ্নে একমত নহেন। তবুও বৈঠকে আমি গিয়াছিলাম বলিয়া তিনি সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন। আমি কেন যে ও কথা বলিয়াছিলাম সবিনয়ে তা আমি তাঁকে বুঝাইয়া বলিয়াছিলাম।

ওপরে বড়লাটের কাছে লিখিত যে পত্রের কথা বলিয়াছি তা ছিল এই:

'ভাল করে ভেবে দেখার পরে কেন (সে সব কথা ২৬শে এপ্রিলের পত্রে আমি আপনাকে জানিয়েছিলাম) যে বৈঠকে যোগদান করা আমার পক্ষে সম্ভব নয় এ কথা আপনাকে লিখতে আমি বাধ্য হয়েছিলাম তা আপনি জানেন। কিন্তু আপনার সহিত কথা বলার সুযোগ লাভের পরে আমার মনে হয় যে অন্য কোন কারণে না হলেও আপনার প্রতি আমার মনে যে শ্রদ্ধাভাব রয়েছে সেই কারণেই বৈঠকে আমার যোগ দিতে হয়।

আমি দেখতে পেয়েছিলাম যে লোকমান্য তিলক, মিসিস বেসাণ্ট ও আলী ভাইদের মত প্রভাবশালী জননেতাদের বৈঠক হতে বাদ দেওয়া হয়েছিল—ওটাই ছিল আমার বৈঠকে যোগদান করার পক্ষে সব চাইতে বড় বাধা। এখনও আমি মনে করি যে তাঁদের নিমন্ত্রণ না করা মস্ত বড় ভুল হয়েছে এবং সবিনয়ে বলব যে বিভিন্ন প্রদেশে এরূপ যে বৈঠক ডাকা হবে বলে শুনতে পাচ্ছি তাতে এঁদের আমন্ত্রণ করে এই ভুল সংশোধন করা উচিত হবে। এ কথাও না বলে পারছি না যে জনমতের প্রতিনিধিদের —হলই বা তাঁদের দৃষ্টি সম্পূর্ণ ভিন্ন—উপেক্ষা করা কোন সরকারের শোভা পায় না। অন্য দিকে বৈঠকের বিভিন্ন কমিটীতে লোকে মন খুলে কথা বলতে পেরেছে বলে আমি সন্তোষ বোধ করেছি। আমার নিজের কথায় বলব যে, যে কমিটীর আমি সভ্য ছিলাম সে কমিটীতে বা মূল বৈঠকে ভেবেচিন্তেই আমি আমার মত ব্যক্ত করা হতে বিরত ছিলাম। আমি অনুভব করেছিলাম যে সভায় উপস্থাপিত প্রস্তাব সমর্থন করলেই সভার উদ্দেশ্য সর্বোত্তমরূপে সাধিত হবে। আর মনেপ্রাণেই আমি প্রস্তাব সমর্থন করেছিলাম। এরই সঙ্গে পৃথক্ পত্রে সরকারের নিকট যে প্রস্তাব আমি করছি তা সরকার মেনে নেওয়া মাত্র মুখে যে কথা আমি বলেছি তা কাজে করব।

'ডোমিনিয়নসমূহের মত সাম্রাজ্যের সমান ভাগীদার নিকট ভবিষ্যতে আমরা হতে চাই বলে সাম্রাজ্যের এই বিপদের দিনে তাকে অকুণ্ঠ ও অকপট সহায়তা করা আমাদের কর্তব্য এ কথা আমি মানি। এর দ্বারা আমরা আমাদের লক্ষ্যে অধিক তাড়াতাড়ি পৌঁছে যাব এই আশায়ই যে আমরা সাহায্য করছি এ কথা বলা বাহুল্য। কর্তব্য করলে অধিকার জন্মে এই ন্যায় অনুসারে ভারতবাসীরা অতএব ধরে নিতে পারে যে আপনি আপনার ভাষণে যে সংস্কারের কথা বলেছেন সে সংস্কার মোটামুটি কংগ্রেস ও লীগের দাবির অনুরূপ হবে। আমার এই বিষয়ে সন্দেহ নেই যে এই বিশ্বাস হতেই অনেকে বৈঠকে আন্তরিক সহযোগের কথা দিয়েছেন।

'দেশবাসীর ওপর আমার কথা চলত ত আমি তাদের বলতাম, কংগ্রেস এ যাবৎ যে সব প্রস্তাব গ্রহণ করেছে তা প্রত্যাহার কর আর যতদিন যুদ্ধ চলবে ততদিন হোমরুল বা 'প্রতিনিধিক শাসন'-এর কথা মুখে এনো না। এই বিপদে যে কোন সক্ষম ব্যক্তিকে সাম্রাজ্যের জন্য আমি বলি হতে বলতাম, আর আমি বিশ্বাস করি তার ফলে ভারত সাম্রাজ্যের সর্বাপেক্ষা

অধিক পিয়ারের ভাগীদার হত এবং জাতিগত অসমতা ঘুচে যেত। কিন্তু ভারতের গোটা শিক্ষিত লোক ইহা অপেক্ষা এক অল্পফলদায়ী পথ বেছে নিয়েছে; জনসাধারণের উপর তাদের কোন প্রভাব নেই এ কথা বলা চলবে না। দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ফিরে আসা অবধি প্রতিনিয়ত আমি রায়তদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করছি; আমি জোর দিয়েই আপনাকে বলছি যে তাদের অনেকের মনে হোমরুলের বাসনা জেগেছে। কংগ্রেসের গত অধিবেশনে আমি উপস্থিত ছিলাম এবং এক নির্দিষ্ট সময় মধ্যে পার্লা-মেণ্টের জবানি ভারতকে প্রতিনিধিমূলক শাসনাধিকার দেওয়া হোক বলে যে প্রস্তাব পাস হয়েছে তাতে আমার হাত ছিল। মানি মস্ত পা বাড়ানো হয়েছে, কিন্তু অতি অল্প সময় মধ্যে হোমরুল পাওয়া যাবে এই ভরসা না আসা পর্যন্ত লোক তুষ্ট হবে না। আমি জানি এই লক্ষ্য প্রাপ্তির জন্য অনেকে যে কোন ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত : তারা এ কথাও বেশ জানে যে, সাম্রাজ্যের ভিতরে থেকে নিজেদের অন্তিম লক্ষ্য লাভ করতে হলে সাম্রাজ্যের জন্য তাদের প্রাণ দিতে হবে। লক্ষ্যে দ্রুত পৌঁছতে হলে সাম্রাজ্যকে উহার আসন্ন বিপদ হতে রক্ষা করার কাজে আমাদের মনে প্রাণে লাগা চাই। এই স্থূল কথাটা মনে না রাখলে জাতির মারাত্মক ক্ষতি হবে। এ কথা আমাদের বোঝা দরকার যে সাম্রাজ্যকে রক্ষা করার জন্য যদি আমরা কাজ করি ত সে কাজের সূত্র ধরেই হোমরুল এসে যাবে।

'তাই আমি মনে করি সাম্রাজ্যের সহায়তার জন্য যত লোক দেওয়া যায় তত লোক আমাদের দেওয়া উচিত। কিন্তু আর্থিক সহায়তার কথায় ও কথা আমি বলতে পারছি না। রায়তদের সহিত ঘনিষ্ঠ মেলামেশা আমি করেছি। তাদের মনের কথা আমি জানি : তারা মনে করে ভারত তার শক্তির অধিক আর্থিক সাহায্য সাম্রাজ্যকে করেছে। আমি জানি যে ভারতের অধিকাংশ লোকের মনের কথা আমার এই কথায় ব্যক্ত হচ্ছে।

'আমার কাছে এবং অন্য আরও অনেকের কাছে বৈঠকের অর্থ হল এমন এক সুস্পষ্ট পদক্ষেপ যার দ্বারা সাধারণ আদর্শের জন্য জীবনোৎ-সর্গ বোঝায়। কিন্তু আমাদের অবস্থা বিচিত্র। সাম্রাজ্যের হলেও আমরা সাম্রাজ্যের অংশীদার নই। ভবিষ্যতের আশায় আমরা এই সাহায্য দিচ্ছি। সে আশা যে কি তা যদি আমি স্পষ্ট ভাষায় খুলে না বলি ত

আপনার প্রতি ও দেশবাসীর প্রতি শঠতা করা হবে। আমি দর কষাকষি করছি না, তবে কি জানেন আশায় ব্যর্থ হলে লোকে হতাশ হয়।

'একটা কথা না বললে নয়। আপনি আমাদের ঘরোয়া বিবাদ মিটিয়ে ফেলতে বলেছেন। আমলাতন্ত্রের জুলুমবাজি ও অপকর্ম সয়ে নিতে হবে এ যদি আপীলের ইঙ্গিত হয় ত বলব তাতে সাড়া দেওয়া সম্ভব নয়। আমলাতন্ত্রের ব্যবস্থিত জুলুমবাজির ও অপকর্মের বিরোধ আমি ধর্মজ্ঞানে আমার সমস্ত শক্তি দিয়ে করব। আপীল আমলাতন্ত্রের কাছেই উল্টা আপনার করতে হবে : তারা যেন একটি প্রাণীর ওপরও জুলুম না করে, আর কোন দিন তারা যা না করেছে তা যেন তারা করে অর্থাৎ লোকে কি চায় তা বুঝতে চেষ্টা করে ও সে মতে চলে। ব্রিটিশ ন্যায়ের চূড়ান্ত উৎকর্ষ আমি চম্পারণে শত বছরের পুরানো অবিচারের বিরোধ করে সপ্রমাণ করেছি। খেড়ার লোকে এতকাল গবর্নমেণ্টকে অভিশাপ দিয়েছে ; আজ তারা বুঝেছে যে ক্ষমতার অধিকারী আসলে সরকার নয়, ক্ষমতার অধিকারী জনসাধারণ, যদি সত্যের জন্য দুঃখভোগ করতে তারা তৈরি হয়। সুতরাং খেড়ার লোকের মনের তিক্ততা কমে যাচ্ছে আর অন্তরে অন্তরে তারা অনুভব করছে যে এই সরকার লোকমত উপেক্ষাকারী নয় কেন না যখন বুঝতে পায় অন্যায় হয়েছে তখন সে অহিংস আইন অমান্য পর্যন্ত সয়ে নেয়। অতএব চম্পারণ ও খেড়ার কর্ম দ্বারা স্পষ্টত ও প্রত্যক্ষ ভাবে আমি যুদ্ধের বিশেষ সেবা করেছি। এই প্রকারের কাজ আমাকে বন্ধ করতে বলেন ত মনে করব আপনি আমাকে আমার শ্বাস বন্ধ করতে বলছেন। লোকমনে আত্মার বল তথা প্রেমবল যদি জাগাতে পারি তবে দেখতে পাবেন এমন ভারত গড়ে উঠেছে যা সারা দুনিয়ার ভ্রূকুটি উপেক্ষা করতে পারবে। অতএব দুঃখ বরণ করার এই সনাতন নীতিকে নিজ জীবনে ফুটিয়ে তোলার জন্য আমি সতত তপস্যা করে যাব ও অন্যকেও তেমনটা করতে বলব, আর অন্য কোন কর্মে কখনও যদি হাত দিই ত এই অনুপম নীতির শ্রেষ্ঠতা দর্শানোর জন্যই দিব।

'মুসলমান রাজ্যগুলির বিষয়ে ব্রিটিশ মন্ত্রিমণ্ডলকে সুস্পষ্ট আশ্বাস দিতে আপনি লিখুন পরিশেষে আপনার নিকট এই আমার অনুরোধ। প্রশ্নটা যে মুসলমানদের সুখ-দুঃখের প্রশ্ন তা আপনি অবশ্যই জানেন। হলামই বা আমি হিন্দু, তাদের ভালমন্দের কথায় আমি উদাসীন থাকতে পারি না।

তাদের ভালমন্দ আমাদেরও ভালমন্দ। এই সকল মুসলমান রাষ্ট্রের ন্যায্য অধিকারের প্রতি ও ধর্মস্থান সমূহের বিষয়ে মুসলমানদের মনোভাবের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের এবং হোমরুল বিষয়ক ভারতের সঙ্গত দাবি সুসময়ে মেনে নেওয়ার ওপর সাম্রাজ্যের ভালমন্দ নির্ভর করছে। আমি এই পত্র লিখছি তার কারণ আমি ইংরেজদের ভালবাসি ও ভারতবাসী মাত্রকে ইংরেজের মত রাজভক্ত বানাতে চাই।'

২৮
মরিতে মরিতে

সৈন্য-সংগ্রহের কাজে আমার শরীর ভাঙ্গিয়া যাওয়ার মত হইয়াছিল। মুখ্যত ভাজা চীনা বাদামের গুড়া, সঙ্গে গুড়, কলা ও জলে দুই তিনটি লেবুর রস এই ছিল তখন আমার খাদ্য। আমি জানিতাম যে মাত্রার অধিক স্নেহ-পদার্থ খাইলে শরীরের ক্ষতি হইতে পারে। এ কথা জানা সত্ত্বেও বেশি খাইতাম। ফলে অল্পস্বল্প আমাশয় হয়। ওদিকে তেমনটা নজর দেই নাই। কখন কখন আমার আশ্রমে যাইতে হইত। সেদিন বিকালে আমি আশ্রমে যাই। তখনকার দিনে আমি ওষুধ প্রায় খাইতাম না। মনে করিয়াছিলাম এক বেলা লঙ্ঘন দিলে সারিয়া যাইবে। পরের দিন সকাল-বেলা কিছু খাইলাম না। ফলে ব্যথা প্রায় ছিল না। কিন্তু আমি বুঝিয়া-ছিলাম যে একটু দীর্ঘ সময় আমার উপবাস করা আবশ্যক অথবা খাইতেই যদি হয় ত ফলের রস মাত্র খাওয়া উচিত।

কোন পর্বের দিন ওটা ছিল। মনে পড়ে কস্তুরবাকে বলিয়াছিলাম দুপুরে কিছু খাইব না। কিন্তু সে আমাকে খাইতে বলিল; আমি লোভ সামলাইতে পারিলাম না। দুধ বা দুধের কোন জিনিস সেই দিনে আমি খাইতাম না। তাই সে আমার জন্য গমের গুড়া ঘি চলিবে না বলিয়া তেলে ভাজিয়া লপসী তৈয়ার করিয়াছিল। আমার জন্যই বিশেষ করিয়া কিছু গোটা মুগও বাঁধিয়াছিল। এসব আমার প্রিয় খাদ্য ছিল। জিভের লোভে খাইলাম। লোভ সত্ত্বেও ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলাম অল্পস্বল্প খাইব; কস্তুরবা তাতে তুষ্ট হইবে আর জিভের তৃপ্তি মিলিবে। কিন্তু শনি ওত পাতিয়া বসিয়াছিল। খাইতে বসিলাম ত উনো না খাইয়া পুরো খাইলাম। জিভকে খুশী

করিলাম অথবা বলিব কি যমরাজকে আমন্ত্রণ করিলাম। খাওয়ার ঘণ্টা খানিক মধ্যে ভয়ানক আমাশয় দেখা দিল।

সন্ধ্যায় নাদিয়াদে ফিরিবার কথা ছিল। সবরমতী স্টেশন পর্যন্ত গেলাম। কিন্তু সওয়া মাইল চলিতে আমার প্রাণান্ত হইয়াছিল। শ্রীবল্লভ-ভাই অহমদাবাদ স্টেশনে উঠিলেন (কথা তাই ছিল); তিনি বুঝিতে পারিলেন আমার শরীর অসুস্থ, কিন্তু আমার যে অসহ্য বেদনা চলিতেছিল তা তাঁকে বা অন্য কোন সাথীকে জানিতে দিলাম না।

নাদিয়াদ পৌঁছিলাম। তখন দশটা। স্টেশন হইতে হিন্দু অনাথাশ্রম মাত্র আধা মাইল। কিন্তু আধ মাইল মনে হইয়াছিল দশ মাইল। অতি কষ্টে আশ্রমে পৌঁছিলাম। নাড়ীভুঁড়ি যেন ছিঁড়িয়া যাইতেছিল; ব্যথা বাড়িয়াই চলিয়াছিল, পনর মিনিট বাদে বাদে বেগ হইতেছিল। শেষটায় হার মানিলাম; অসুখের কথা স্বীকার করিলাম। বিছানা লইলাম। পায়খানা একটু দূরে ছিল। পাশের ঘরে কমোড-এর ব্যবস্থা করিতে বলিলাম; নাচার হইয়া লজ্জা গিলিলাম। ফুলচন্দ বাপূনী তড়িঘড়ি কমোড যোগাড় করিয়া আনিলেন। ব্যাকুল হইয়া সঙ্গীরা আমায় ঘিরিয়া বসিলেন। পারেন ত আমার বেদনা তাঁরা কাড়িয়া লন। কিন্তু আমার যাতনার ভাগ তাঁরা লইবেন কি করিয়া! আমার জেদের অন্ত ছিল না। তাঁরা ডাক্তার ডাকিতে চাহিলেন; আমি মানা করিলাম। ওষুধ ত খাইলামই না, এই কথা মনে করিয়া যে পাপ করিলে তার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। তাঁদের কোন কথা চলিবে না জানিয়া মুখ চুন করিয়া তাঁরা সব সহিয়া লইতে-ছিলেন। চব্বিশ ঘণ্টায় ত্রিশ-চল্লিশ বার দাস্ত হয়। খাওয়া ত বন্ধ করিয়া দিয়াছিলামই। প্রথম দিন ফলের রস পর্যন্ত নয়। খাওয়ার ইচ্ছা মোটেই ছিল না। দেখিলাম, যে শরীরকে আমি এতকাল লোহা মনে করিতাম তা কাদামাটি বই নয়। রোগের সঙ্গে যুঝিবার শক্তি আদৌ ছিল না। ডাক্তার কানূগা আসিলেন। ওষুধ খাইতে অনুরোধ করিলেন। অস্বীকার করিলাম। ইন্‌জেকসন দিতে চাহিলেন। তাতেও রাজী হইলাম না। ইন্‌জেকসনের সম্বন্ধে তখন আমার যে অজ্ঞতা ছিল তা মনে হইলে হাসি পায়। আমার ধারণা ছিল ইন্‌জেকসন এক প্রকারের জীবরস। কিন্তু এই ভুল যখন দূর হয় তখন আর তা নেওয়ার সময় ছিল না। বার বার দাস্ত হওয়ায় শরীর দুর্বল হইয়া গেল; জ্বর হইল ও সঙ্গে বিকার। বন্ধুরা আরও ঘাবড়াইয়া

গেলেন। আরও ডাক্তার ডাকিলেন। কিন্তু যে রোগী তাঁদের কথা শোনে না তাঁরা তার কি করিতে পারেন!

শেঠ অম্বালাল ও তাঁর সহধর্মিণী নাদিয়াদে আসেন। সাথীদের সহিত পরামর্শ করিয়া আমাকে তাঁরা অতি সাবধানে তাঁদের মির্জাপুর বাংলোতে লইয়া যান। আমি অবাধে বলিতে পারি যে অসুখের অবস্থায় যে নির্মল নিষ্কাম সেবা আমি পাইয়াছিলাম তাহা অপেক্ষা অধিক কারো ভাগ্যে জুটিতে পারে না। সামান্য একটু জ্বর চলিতেছিল, আর শরীর দিন দিন দুর্বল হইতেছিল। মনে হইতেছিল অসুখ অনেক দিন চলিবে, কি জানি বিছানা হইতে উঠিব কিনা। এত ভালবাসা ও এমন সেবা-শুশ্রূষা পাইতেছিলাম তাহা হইলেও অম্বালালের ওখানে মন টিকিতেছিল না। তাঁকে অনুরোধ করিলাম আমাকে আশ্রমে লইয়া চলুন। আমার একান্ত আগ্রহ দেখিয়া তিনি আমাকে আশ্রমে লইয়া আসেন।

আশ্রমে যখন আমি অসুখে কাতরাইতে ছিলাম তখন শ্রীবল্লভভাই আসিয়া খবর দেন যে জর্মনী একদম হারিয়া গিয়াছে এবং কমিশনার বলিয়া পাঠাইয়াছেন যে সৈন্য ভরতি করার আর প্রয়োজন নাই। এই খবর পাইয়া সৈন্য-সংগ্রহের চিন্তা দূর হইল আর মনের অশান্তিও গেল।

জল-চিকিৎসার পরীক্ষা তখন আমার চলিতেছিল। তাতে রোগ-শান্তি হয় বটে, কিন্তু শরীর কিছুতেই শুধরাইতেছিল না। বৈদ্য ও ডাক্তার বন্ধুরা নানা পরামর্শ দিতেছিলেন, কিন্তু ওষুধ খাইতে আমি রাজী ছিলাম না। দুই তিন জনে বলেন যে দুধের কাজ মাংসের যূষে হইতে পারে। অসুখে ওষুধরূপে মাংস খাওয়া চলে এই কথার সমর্থনে তাঁরা আয়ুর্বেদের মত উদ্ধৃত করেন। অন্য কেহ ডিম খাইতে বলেন। এই সকল ব্যবস্থার একটাই আমি উত্তর দিয়াছিলাম—না। খাদ্যাখাদ্যের বিচারে শাস্ত্রের বচন আমার মান্য ছিল না; তা আমার জীবনসূত্রের এক সূত্র হইয়া গিয়াছিল। যে কোন বস্তু খাইয়া ও যে কোন চিকিৎসা করিয়া বাঁচিয়া থাকার বাসনা মোটেই আমার ছিল না। স্ত্রীর বেলায়, পুত্রদের বেলায়, স্নেহভাজন অন্য সবের বেলায় যে ধর্মের আচরণ করিয়াছি নিজের বেলায় কি সেই ধর্মের অন্যথাচরণ সম্ভব ছিল?

এই দীর্ঘ ও জীবনের প্রথম বড় অসুখে এভাবে আপন ধর্ম নিরীক্ষণ করার ও উহাকে যাচাই করিয়া লওয়ার অপূর্ব সুযোগ আমার হইয়াছিল। এক

রাত আমি সম্পূর্ণ আশা ছাড়িয়া দিয়াছিলাম। মনে হইয়াছিল যম শিয়রে খাড়া। শ্রীঅনসূয়া বাইকে খবর পাঠাই। সে আসে। ডাক্তার কানুগাকে লইয়া বল্লভভাই আসেন। নাড়ী দেখিয়া ডাক্তার কানুগা বলিলেন, 'নাড়ীর গতি বেশ ভাল। কোন ভয় দেখছি না। অত্যন্ত দুর্বলতার কারণ স্নায়ু-বিকলতা হেতু এমনটা আপনার মনে হচ্ছে।' কিন্তু আমার মনে ভরসা আসিল না। রাত কাটিল—বিনা ঘুমে।

ভোর হইল। মরিলাম না। কিন্তু মৃত্যু শিয়রে এই ভাব গেল না। যতটুকু সময় আছি গীতা শুনি এই ভাব হইতে সাথীদের মুখে গীতাপাঠ শুনিতে লাগিলাম। কোন কাজ করার শক্তি ছিল না। পড়ারও না। কারো সঙ্গে কথা বলারও মন ছিল না। কথা একটু বলিলেই মগজ বিকল হইতেছিল। বাঁচিয়া থাকার জন্যই বাঁচিয়া থাকার সাধ আমার কোন দিনও ছিল না সুতরাং বাঁচিয়া থাকার আগ্রহ আমার ছিল না। দিন দিন ক্ষয় হইতেছে এমন অকেজো দেহকে বন্ধুদের সেবা-শুশ্রূষায় টিকাইয়া রাখার অবস্থাটা আমার কাছে বিষের মত লাগিতেছিল।

যমের অপেক্ষায় ছিলাম এর মধ্যে ডাক্তার তলবরকর এক সৃষ্টিছাড়া লোককে লইয়া আসিলেন। তিনি মারাঠী ছিলেন। নাম কেলকর। তাঁর নাম-ডাক ছিল না। কিন্তু দেখিতেই আমি বুঝিতে পাইলাম আমারই মত এর মাথায় ছিট। নিজের পদ্ধতিতে আমার চিকিৎসা করিতে তিনি আসিয়াছিলেন। গ্র্যাণ্ট মেডিকেল কলেজে প্রায় তিনি পড়া শেষ করিয়া আনিয়াছিলেন কিন্তু ডিগ্রী লন নাই। পরে জানিয়াছিলাম তিনি ব্রাহ্ম সমাজের লোক। অতীব স্বাধীন প্রকৃতির লোক তিনি ছিলেন আর জেদীও তেমনি। বরফ-চিকিৎসায় তিনি বিশ্বাস করিতেন। আমার ওপর তিনি তাঁর পদ্ধতি প্রয়োগ করিতে চাহেন। তাই আমরা তাঁকে 'আইস-ডাক্তার' বলিতাম। তাঁর দৃঢ় ধারণা ছিল যে ডাক্তারেরা ধরিতে পারে নাই এমন কতকগুলি ভাল জিনিস তাঁর কাছে ধরা পড়িয়াছে। তিনি তাঁর বিশ্বাস আমাতে সঞ্চার করিতে পারেন নাই এই আক্ষেপ তাঁর ও আমার উভয়েরই থাকিয়া গিয়াছে। তাঁর পদ্ধতিতে আমি কিছুটা পর্যন্ত বিশ্বাস করি তবে আমি মনে করি কতকগুলি অনুমান তিনি বড় বেশি তাড়াতাড়ি করিয়া লইয়াছেন।

তাঁর আবিষ্কার ঠিক হোক বা অঠিক হোক আমার ওপর তা প্রয়োগ

করিতে দিয়াছিলাম। বাহ্য চিকিৎসায় আমার আপত্তি ছিল না আর ছিলও তা বরফের অর্থাৎ জলের। আমার সারা অঙ্গে তিনি বরফ বুলাইতে থাকেন। তাঁর চিকিৎসায় যতটা ফল হইয়াছিল বলিয়া তিনি মনে করিয়াছিলেন ততটা না হইলেও যে-আমি জীবনের আশা ছাড়িয়া দিয়াছিলাম সেই আমাতে জীবনের আশা ও উৎসাহ ফিরিয়া আসিয়াছিল। আর মনের ক্রিয়া দেহের ওপর হইয়াছিল। মুখে রুচি ছিল না, রুচি ফিরিয়া পাইলাম। পাঁচ-দশ মিনিট রোজ আস্তে আস্তে পায়চারি করিতে লাগিলাম। এবার তিনি পথ্য পরিবর্তনের কথা বলিলেন। বলিলেন, 'নিশ্চিত বলছি, কাঁচা ডিম খান ত শরীরে যে বল পাচ্ছেন তার চাইতে বেশি বল পাবেন। ডিম দুধের মতই নির্দোষ, মাংস ত নয়ই। কতকগুলি ডিম ফোটে না। এমন নির্জীব বাওয়া ডিম বাজারে মেলে।' কিন্তু এরূপ বাওয়া ডিম খাইতেও আমি রাজী ছিলাম না। তা সত্ত্বেও শরীর আরও কতকটা সুস্থ হয় ও দশের কাজে স্পৃহা জন্মে।

২৯

রাউলট এ্যাক্ট ও আমার ধর্মসংকট

বন্ধুরা বলেন মাথেরানে গেলে শরীর অল্প দিনে চাঙ্গা হইবে। মাথেরানে গেলাম। কিন্তু ওখানকার জল ভারী বলিয়া আমার মত রোগীর ওখানে থাকা মুশকিল। আমাশয়ের কারণ আমার মলদ্বার অতিশয় নরম হইয়া গিয়াছিল, ছিঁড়িয়াও গিয়াছিল, সুতরাং মলত্যাগের সময়ে দারুন লাগিত। অতএব কিছু খাইতে ভয় হইত। সপ্তাহ মধ্যে মাথেরান হইতে পালাইতে হইল। এই সময়ে শঙ্করলাল ব্যাঙ্কার আমার শরীরের দেখাশুনার ভার নিজ হাতে নেন। ডাক্তার দালালের পরামর্শ লইতে আমাকে তিনি বিশেষ অনুরোধ করেন। ডাক্তার দালাল আসিলেন। তাঁর নির্ণয়শক্তি দেখিয়া আমি মুগ্ধ হইয়াছিলাম।

তিনি বলেন, 'দুধ না খেলে আপনার ভাঙ্গা শরীর আমি জোড়া লাগাতে পারব না। তদুপরি আপনি লৌহ ও সেঁকো ইনজেকসন নেন ত আমি কথা দিচ্ছি আপনার পূর্ব স্বাস্থ্য আমি ফিরিয়ে দেব।'

'ইনজেকসন দিতে হয় দিন। কিন্তু দুধ ত চলবে না'—বলিলাম।

'আপনার দুধের প্রতিজ্ঞা কিরূপ?' ডাক্তার জিজ্ঞাসা করিলেন।

'গাই ও মোষে ফুকা দেওয়া হয় এ কথা শোনার পরে দুধের ওপর বিতৃষ্ণা জন্মে। তা ছাড়া দুধ মানুষের খাদ্য নয় এ ভাব আগেও ছিল। তাই আমি দুধ ছেড়ে দিই।'

কস্তুরবা আমার চৌকির পাশে দাঁড়ানো ছিল। এই কথা শুনিয়া সে বলিয়া ওঠে:

'তা তুমি ছাগীর দুধ ত খেতে পার।'

ডাক্তার এ কথার ওপর বলিলেন, 'ছাগীর দুধ খেলেও আমার কাজ চলবে।' হটিলাম। সত্যাগ্রহ লড়াইয়ের মোহে বাঁচিয়া থাকার লোভ জন্মিল। আর তাই ছায়া রাখিয়া প্রতিজ্ঞার কায়া বিসর্জন দিলাম। প্রতিজ্ঞা করার সময় অবশ্য গাই ও মোষের দুধের কথাই মনে ছিল তবু প্রতিজ্ঞা যে দুধমাত্র সম্বন্ধেই ছিল ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। দুধ মানুষের স্বাভাবিক খাদ্য নয় এই বিশ্বাস যতদিন আছে ততদিন আমার দুধ খাওয়া চলে না— ইহা জানা সত্ত্বেও ছাগীর দুধ খাইতে আমি রাজী হইলাম। সত্যাগ্রহ লড়াইর জন্য বাঁচার আগ্রহে সত্যের পূজারীর সত্য ভাসিয়া গেল। আমার ওই ক্রিয়া আজও আমার অন্তরে হুলের মত বিঁধে: অন্তর ডুকুরিয়া কাঁদে আর ছাগদুধ ছাড়ার পথ খোঁজে। যখনই ছাগদুধ খাই ব্যথা পাই। তা হলে কি হয়, সেবা করার অতি সূক্ষ্ম যে মোহ আমায় পাইয়া বসিয়াছে তা আমায় ছাড়ে না।

খাদ্যের পরীক্ষা-প্রয়োগ আমার অহিংসা সাধনার অঙ্গ। তাই তা আমার প্রিয়। তাহা হইতে আমি আনন্দ পাই, স্ফূর্তি পাই। এই দৃষ্টিতে ছাগদুধ আমার অস্বস্তির কারণ নয়, সত্যের দৃষ্টিতে তা আমার ব্যথার কারণ। আমার মনে হয়, অহিংসা আমি যতটা চিনিয়াছি সত্য তা অপেক্ষা অধিক চিনিয়াছি। আমার অনুভব এই যে, সত্য ছাড়ি ত অহিংসার কঠিন গাঁট কোন দিনও আমি খুলিতে পারিব না। সত্যের পালন মানে যে ব্রত নেওয়া হইয়াছে তা কেবল অক্ষরে নয় মর্মেও পালন করা। এই ক্ষেত্রে আমি ব্রতের আত্মা অর্থাৎ ভাব হনন করিয়াছি, এই বেদনা সতত আমার অন্তরে বিঁধে। এ কথা জানা সত্ত্বেও আমার ব্রতের প্রতি আমার ধর্ম যে কি তা আমি ধরিতে পারি নাই, অথবা এ কথা বলাই সঙ্গত হইবে যে তা পালন করার শক্তি আমাতে নাই। এই দুই বস্তুই

এক ; কারণ সংশয় জন্মে বিশ্বাসের অভাবে বা শিথিলতা হেতু। 'ঈশ্বর! তুমি আমায় বিশ্বাস দাও' এই আমার দিবা-রাত্রির প্রার্থনা।

ছাগদুধ ধরার কিছুদিন পরে ডাক্তার দালাল মলদ্বারের ছিন্নস্থল অস্ত্রক্রিয়া করেন। ক্ষত ভরিয়া যায়। শরীর একটু ভাল হইতেই বাঁচিয়া থাকার বাসনা ফিরিয়া আসে, বিশেষত এই কারণে যে ঈশ্বর আমার জন্য কাজ তৈরি করিয়া রাখিয়াছিলেন।

সবে ভরসা হইয়াছে সারিয়া উঠিব ও সংবাদপত্র দেখিতে আরম্ভ করিয়াছি ত রাউলট কমিটীর সদ্যপ্রকাশিত রিপোর্ট চোখে পড়ে। উহার সুপারিশ দেখিয়া চমকিয়া উঠি। ভাই ওমর সোবানী ও শঙ্করলাল আসিয়া বলেন যে তড়িঘড়ি এর কোন যোগ্য উত্তর দেওয়া আবশ্যক। মাসেক মধ্যে আমি অহমদাবাদে যাই। বল্লভভাই প্রায় প্রত্যহ আমাকে দেখিতে আসিতেন। আমার আশঙ্কার কথা তাঁকে বলিয়া বলি যে কিছু একটা করা আবশ্যক। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, 'কিন্তু কি করা যায়?' উত্তরে বলি, 'কমিটীর সুপারিশ অনুসারে যদি আইন হয়, আর তার বিরোধ করার জন্য কিছু লোক যদি প্রতিজ্ঞা করে তবে অবিলম্বে আমাদের সত্যাগ্রহ করতে হবে। বিছানায় পড়া না থাকলে একাই এর বিরুদ্ধে লড়তাম আর প্রত্যাশা রাখতাম লোক আমার পিছনে দাঁড়াবে। কিন্তু এই দুর্বল শরীরে একা লড়বার শক্তি আমার আদৌ নেই।'

এই কথাবার্তার ফলে আমার সহিত যোগাযোগ ছিল এমন কিছু লোকের এক বৈঠক ডাকা ঠিক হয়। কমিটীর রিপোর্টে প্রকাশিত প্রমাণ বা সাক্ষ্য দৃষ্টে আমার মনে হয় যে এরূপ আইন করার কোনই আবশ্যকতা নাই। ইহাও আমি বেশ স্পষ্ট বুঝিতে পাই যে আত্মমর্যাদাভিমানী কোন লোকের পক্ষে এইরূপ আইন মানিয়া লওয়া চলে না।

ওই বৈঠক আশ্রমে বসে। বড়জোর কুড়ি জনকে ডাকা হইয়াছিল। যতদূর আমার মনে পড়ে, বল্লভভাই ছাড়া শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু, মি. হর্নিম্যান, ওমর সোবানী, শঙ্করলাল ব্যাঙ্কার, শ্রীমতীঅনসূয়া বাই প্রভৃতি বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। সত্যাগ্রহের প্রতিজ্ঞাপত্র তৈরি হয় ও তাতে যতদূর আমার মনে আছে উপস্থিত সকলে স্বাক্ষর করেন। তখন আমি কোন খবরের কাগজ বাহির করিতাম না। সময় সময় সংবাদপত্রে লিখিতাম। তেমনটা লিখিতে আরম্ভ করিলাম। শঙ্করলাল ব্যাঙ্কার

জোর আন্দোলন চালাইলেন। এই প্রসঙ্গে আমি তাঁর কর্ম ও সংগঠন-শক্তির উত্তম পরিচয় পাই।

কোন চলতি সংস্থা সত্যাগ্রহের মত নূতন অস্ত্র হাতে তুলিয়া লইবে এই আশা আমার ছিল না। তাই সত্যাগ্রহ সভা গঠিত হয়। সভার মুখ্য ব্যক্তিরা বোম্বাইয়ের ছিলেন। তাই উহার কেন্দ্রীয় দপ্তর বোম্বাইতে ছিল। প্রতিজ্ঞাপত্রে বহু লোকে স্বাক্ষর করিতে লাগিল। খেড়া সত্যাগ্রহের সময়ে যেমন প্রচারপত্র প্রকাশ করা হইত তেমন প্রচারপত্রের প্রকাশ শুরু হইল। নানা স্থানে সভা হইতে থাকিল।

আমি সভার সভাপতি ছিলাম। দেখিতে পাইলাম যে শিক্ষিত শ্রেণীর ও আমার মধ্যে বনিবনার সম্ভাবনা বড় কম। সভায় আমি চাহিতাম গুজরাটী ব্যবহার করিতে। তা তাঁদের ভাল লাগিত না। অন্য কতকগুলি ব্যাপারেও তাঁরা অস্বস্তি বোধ করিতেন। তবুও অনেকে উদারভাবে সে সব মানিয়া লইতেন এ কথা আমার স্বীকার করিতেই হইবে।

কিন্তু আরম্ভেই আমি বুঝিতে পারিয়াছিলাম এই সভা বেশিদিন টিকিবে না। তা ছাড়া আমি দেখিতে পাই যে সত্য ও অহিংসার ওপর আমি যে জোর দিতাম কেউ কেউ তা বরদাস্ত করিতে পারিতেন না। তা সত্ত্বেও প্রথম দিকে এই নূতন কাজ খুব জোরে আগাইয়া গিয়াছিল।

৩০

সেই আশ্চর্য দৃশ্য

এদিকে রাউলট কমিটী রিপোর্টের বিরুদ্ধে আন্দোলন যতই প্রবল হইতেছিল অন্যদিকে গবর্নমেণ্ট কমিটীর সুপারিশ মত আইন করার জন্য ততই শক্ত হইতেছিল। রাউলট বিল প্রকাশ হইল। ভারতের বিধান সভায় আমি এক বার গিয়াছিলাম, গিয়াছিলাম রাউলট বিলের বিতর্ক শুনিতে। শাস্ত্রীজী * জোর বক্তৃতা করেন, সাবধানবাণী উচ্চারণ করেন। শাস্ত্রীজীর বাক্যপ্রবাহ যখন বহিতেছিল বড়লাট তাঁর দিকে তাকাইয়া ছিলেন। আমি ধরিয়া লইয়াছিলাম তাঁর ওপর ওই ভাষণের ক্রিয়া হইয়াছে। শাস্ত্রী মহাশয়ের আবেগ উছলিয়া পড়িয়াছিল।

* স্বর্গীয় শ্রীনিবাস শাস্ত্রী

কিন্তু ঘুমের মানুষকে জাগানো যায়; জাগিয়া যে ঘুমায় তাকে জাগানো যায় না, কানে ঢাক বাজাইয়াও না। বিধান সভায় বিলের আলোচনার প্রহসন না করিলে নয় তাই প্রহসন চলিয়াছিল। যা করার তা আগেই ঠিক করা ছিল। সুতরাং শাস্ত্রীজীর সাবধানবাণী বৃথা গেল।

এই অবস্থায় আমার প্রতিবাদ অরণ্যে রোদনের সামিল হইয়াছিল। বড়লাটের সহিত দেখা করিলাম; তাঁকে বুঝাইলাম। তাঁকে ঘরোয়া চিঠি লিখিলাম। সংবাদপত্র মারফত লিখিলাম। স্পষ্ট কথায় বলিলাম, সত্যাগ্রহ ছাড়া আমার পথ থাকিতেছে না। সবই নিষ্ফল হইল।

বিল তখনও গেজেটে ছাপা হয় নাই। মাদ্রাজে যাওয়ার এক নিমন্ত্রণ পাইলাম। দূরে যাওয়ার মত শক্তি দেহে ছিল না। তবু ঝুঁকি লইলাম। চেঁচাইয়া বলার বা দাঁড়াইয়া বলার শক্তি তখনও আমার ফিরিয়া আসে নাই। খানিক দাঁড়াইয়া বলিলে আমার শরীর কাঁপিতে থাকিত (দাঁড়াইয়া আজও বলিতে পারি না) এবং বুকে পেটে মোচড় লাগিত। তবুও মনে হইল মাদ্রাজের নিমন্ত্রণে সাড়া না দিলেই নয়। সেই দিনেও দক্ষিণ ভাগ আমার আছে নিজের ঘরের মত ছিল। দক্ষিণ আফ্রিকায় তামিল তেলুগু প্রভৃতি দক্ষিণীদের সহিত আমার যে সম্পর্ক গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহা হইতে আমার ধারণা হইয়াছিল যে তাদের ওপর আমার দাবি আছে আর আজও আমি মনে করি আমার সেই ধারণা অনুমাত্র ভুল ছিল না। আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন স্বর্গত কস্তুরী রঙ্গা আয়ঙ্গর। মাদ্রাজে যাওয়ার পরে বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে ওই আমন্ত্রণের মূলে ছিলেন শ্রীরাজগোপালাচারী। উহাকে রাজগোপালাচারীর সহিত আমার প্রথম পরিচয় মনে করা যাইতে পারে। যাই হোক, ব্যক্তিগত সম্বন্ধের সূত্রপাত তখন হয়।

শ্রীকস্তুরী রঙ্গা আয়ঙ্গর প্রভৃতির আগ্রহে দশের কাজে অধিক ভাগ লওয়ার উদ্দেশ্যে সালেম ছাড়িয়া শ্রীরাজগোপালাচারী সবে তখন মাদ্রাজে ওকালতি করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। আমার থাকার ব্যবস্থা তাঁর বাড়ীতেই করা হইয়াছিল। দুই দিন ওখানে থাকার পরে আমি ইহা জানিতে পাই। বাড়ীটা কস্তুর রঙ্গা আয়ঙ্গরের ছিল তাই আমি ধরিয়া লইয়াছিলাম আমি তাঁরই অতিথি। মহাদেব দেশাই আমার ভুল ভাঙ্গে। স্বভাবে লাজুক বলিয়া রাজগোপালাচারী সদা পিছনে থাকিতেন। কিন্তু মহাদেবের সহিত অল্পেতেই

তাঁর হৃদ্যতা জন্মিয়াছিল। একদিন মহাদেব আমাকে বলে, 'এ লোকটিকে কাজে টানতে হবে।'

আর তাই আমি করিলাম। লড়াই সংগঠনের কথা প্রতিদিন তাঁর সহিত আলোচনা করিতাম। ভাবিয়া পাইতেছিলাম না সভার অতিরিক্ত আর কি করা যায়। রাউলট বিল আইন হইলে অহিংসভাবে তা ভঙ্গ করার কোন উপায় আমি খুঁজিয়া পাইতেছিলাম না। সরকার সে অবসর দিলে তবেই না অহিংসার পথে তার বিরোধ করা চলে। অন্য আইন লঙ্ঘন করা যায় কি? আর যায় ত তার সীমা কোথায় ইত্যাদি আলোচনা চলিত।

শ্রীকস্তুরী রঙ্গা আয়ঙ্গর নেতাদের ছোটখাট এক বৈঠক ডাকেন। তাতে খুব আলোচনা হয়। শ্রীবিজয়রাঘবাচারী তাতে মুখ্য ভাগ নেন। খুঁটিনাটি তথ্য সমেত সত্যাগ্রহের এক সংহিতা তিনি আমায় লিখিতে বলেন। তা আমার শক্তির বাইরে এ কথা তাঁকে জানাই।

এরূপ ভাবনাচিন্তা চলিতেছিল ইতিমধ্যে খবর মিলিল যে বিল আইন হইয়াছে আর গেজেটে ছাপা হইয়াছে। রাতে কথাটা ভাবিতে ভাবিতে আমি ঘুমাইয়া পড়ি। শেষ রাতে অন্য দিন অপেক্ষা একটু আগে আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়। আধা-ঘুম আধা-জাগা অবস্থায় স্বপ্নের মত মনে একটা চিন্তা ঝিলিক দিয়া গেল। ভোরে রাজগোপালাচারীকে ডাকিয়া পাঠাইলাম। বলিলাম:

'স্বপ্নে মনে এই ভাব খেলে গেল যে এই আইনের প্রতিবাদে সারা দেশে হরতাল করতে হবে। সত্যাগ্রহ আত্মশুদ্ধির লড়াই। ধর্মের যুদ্ধ। ধর্ম-কাজ শুদ্ধি দ্বারা আরম্ভ করতে হয়। সে দিন সকলে উপোস করবে, কাজকর্ম বন্ধ রাখবে। মুসলমানদের রোজার অতিরিক্ত উপোস না করতে হয় তাই চব্বিশ ঘণ্টার উপোসের কথা বলা যাক। বলা কঠিন সকল প্রদেশ এ ডাকে সাড়া দেবে কিনা। বোম্বাই, মাদ্রাজ, বিহার ও সিন্ধু দেবে এই আশা আমার আছে। এই সব জায়গায় ঠিকমত হরতাল হয় ত আমরা সন্তোষ মানব।'

এই প্রস্তাব রাজগোপালাচারীর খুব ভাল লাগে। অন্য বন্ধুদেরও অল্প সময় মধ্যে কথাটা জানানো হয়। সকলে আনন্দে প্রস্তাবটি স্বাগত করেন। ছোট্ট একটা আবেদন লিখিয়া ফেলি। প্রথমে ১৯১৯-এর ৩০শে মার্চ ধার্য হয়। পরে তা বদলাইয়া ৬ই এপ্রিল করা হয়। অল্প সময় মধ্যে

লোকের হরতাল করিতে হয়। তড়িঘড়ি কাজ করার ছিল বলিয়া প্রস্তুতির জন্য বেশি সময় দেওয়া সম্ভব ছিল না।

তবুও কে বলিবে কি ভাবে অঘটন ঘটিয়া গেল। কি শহরে কি গ্রামে সারা ভারতে হরতাল হইল। সে এক অপূর্ব দৃশ্য!

৩০

সেই সপ্তাহ—১

দক্ষিণে অল্পস্বল্প ঘুরাঘুরি করিয়া খুব সম্ভব ৪ঠা এপ্রিল আমি বোম্বাই পৌঁছি। শঙ্করলাল ব্যাঙ্কারের তার পাইয়াছিলাম যে ৬ই এপ্রিলের অনুষ্ঠানে আমার বোম্বাই থাকিতে হইবে।

কিন্তু তার আগেই ৩০শে মার্চ দিল্লীতে হরতাল পালিত হইয়াছিল। পরলোকগত শ্রদ্ধানন্দজী ও হকীম অজমল খাঁর কথায় দিল্লী উঠিত-বসিত। ৩০শে মার্চের বদলে হরতালের দিন ৬ই এপ্রিল করা হইয়াছে তারের এই খবর দিল্লীতে বড় বেশি দেরীতে পৌঁছে। অমনটা হরতাল পূর্বে কখনও দিল্লীতে দেখা যায় নাই। হিন্দু-মুসলমান একদিল একপ্রাণ হইয়া গিয়াছিল। মুসলমানেরা শ্রদ্ধানন্দজীকে জুম্মা মসজিদে ডাকিয়া লয় ও ভাষণ দিতে বলে। তিনি ভাষণ দেন। কর্তাদের এই সব অসহ্য হয়। শোভাযাত্রা স্টেশনের দিকে যাইতেছিল। পুলিস তা আটকায়; গুলি চালায়। কিছু লোক জখম হয়। জনকয়েক মারা যায়। দিল্লীতে দমননীতি চলিতে থাকে। অবিলম্বে দিল্লী যাওয়ার জন্য শ্রদ্ধানন্দজী আমাকে তার করেন। উত্তরে জানাই ৬-ইর অনুষ্ঠান শেষ করিয়া বিনা বিলম্বে দিল্লী পৌঁছিব।

লাহোর ও অমৃতসরেও দিল্লীর মত কাণ্ড ঘটে। 'এই তার পাওয়ামাত্র আসিবেন' এই মর্মে ডা. সত্যপাল ও ডা. কিচলুর ডাক আসে। এই দুই বন্ধুর সহিত তখন আমার মোটেই পরিচয় ছিল না। তা হোক, তাঁদের জানাই যে দিল্লী হইয়া অমৃতসরে পৌঁছিব।

৬ই এপ্রিল— ভোরবেলা। হাজার হাজার মানুষ সমুদ্রে স্নান করিতে চৌপাটীতে যায় এবং সেখান হইতে শোভাযাত্রা করিয়া ঠাকুরদ্বারের *

* ঠাকুরদ্বার-এর জায়গায় 'মাধববাগ' পড়ুন। সংক্ষিপ্ত গুজরাটী সংস্করণ (১৯৫২ সনে মুদ্রিত) সংশোধন কালে শ্রীত্রিকমজী ঠাকুরদাস এই ভুলের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। শ্রীত্রিকমজী সেই সময়ে গান্ধীজীর সঙ্গে শোভাযাত্রায় ছিলেন।

দিকে অগ্রসর হয়। শোভাযাত্রায় স্ত্রীলোক ও শিশুও ছিল। মুসলমানও বেশ ছিল। ঠাকুরদ্বার হইতে মুসলমান বন্ধুরা আমাদের কয়েকজনকে নিকটের এক মসজিদে লইয়া যান ও ভাষণ দিতে বলেন। সরোজিনী দেবী ও আমি কিছু বলি। শ্রীবিঠ্ঠলদাস জেরাজানী তথায় স্বদেশী ও হিন্দু-মুসলমান একতার প্রতিজ্ঞা গ্রহণের প্রস্তাব ওঠান। এরূপ ব্যস্তসমস্ত হইয়া প্রতিজ্ঞা করিতে নাই আর প্রতিজ্ঞা করিলে তা ভাঙ্গিতে নাই এই কথা বলিয়া তাঁকে নিরস্ত করি। যতটা হইতেছে ততটাতে সন্তুষ্ট থাকিতে পরামর্শ দিয়া বলি যে স্বদেশীর অর্থ বোঝা চাই, হিন্দু-মুসলমান একতার দায়িত্বের কথা ভাবিয়া দেখা চাই। প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক লোকদের পরের দিন ভোরে চৌপাটীর ময়দানে একত্র হইতে বলি।

বলা বাহুল্য, বোম্বাইতে পূর্ণ হরতাল হয়। নিরুপদ্রব আইন অমান্যের দুইটি ব্যবস্থা আগেই করিয়া রাখা হইয়াছিল। স্থির করা হইয়াছিল সকলে সহজে অমান্য করিতে পারে বাতিল হওয়ার যোগ্য এমন দুই একটি আইন অমান্য করা হইবে। লবণশুল্ক তেমন এক চক্ষুশূল আইন ছিল। তা নাকচ করার জন্য কিছু দিন ধরিয়া এক জোর আন্দোলনও চলিতেছিল। তাই আমি প্রস্তাব করি যে সমুদ্র-জল হইতে ঘরে ঘরে বে-আইনী লবণ তৈয়ার করিতে লোককে আহ্বান করা হোক। অন্য যে প্রস্তাব আমি করি তা ছিল বাজেয়াপ্ত পুস্তকের মুদ্রণ ও বিক্রয়। আমারই দুইখানি বই—'হিন্দ্-স্বরাজ' ও 'সর্বোদয়'—বাজেয়াপ্ত হইয়াছিল। এই দুই পুস্তকের মুদ্রণ ও বিক্রয় নিরুপদ্রব আইন অমান্যের সহজতম উপায় বলিয়া বিবেচিত হয়। অতএব এই দুই পুস্তকের পর্যাপ্ত প্রতিলিপি ছাপানো হয় এবং উপবাস অন্তে চৌপাটীর বিরাট সভায় সন্ধ্যায় সে সব বিক্রয় করার ব্যবস্থা হয়।

বহু স্বেচ্ছাসেবক বই বেচার জন্য সন্ধ্যায় বাহির হয়। আমি এক মোটরে বাহির হই। অন্য এক মোটরে সরোজিনী নাইডু। যত বই ছাপা হইয়াছিল সব বিক্রয় হইয়া যায়। ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলাম বই-বেচা পয়সা লড়াইর জন্য খরচ করা হইবে। বইয়ের দাম চার আনা ছিল। কিন্তু আমার কি সরোজিনী দেবীর হাতে প্রায় কেউ চার আনা দেয় নাই। যার পকেটে যা ছিল তা উজাড় করিয়া লোকে বই কিনিয়াছিল: দশ টাকার, পাঁচ টাকার নোটও কেউ কেউ দিয়াছিল। মনে আছে এক ব্যক্তি পঞ্চাশ টাকা দিয়া আমার কাছ হইতে একখানা বই নিয়াছিল। লোককে জানাইয়া দেওয়া

হইয়াছিল যে এই বই কিনিলে জেল হইতে পারে। কিন্তু তখনকার মত লোকে জেলের ভয় ভুলিয়া গিয়াছিল।

পরের দিন জানা গেল যে গবর্নমেণ্ট মনকে চোখ ঠার দিয়া ঠিক করিয়াছে যে, যে সব বই বিক্রয় হইয়াছে তা বাজেয়াপ্ত সংস্করণের পুনর্মুদ্রণ নহে। সুতরাং ও সব বইকে বাজেয়াপ্ত বলিয়া গণনা করা চলে না। আর তাই এই নূতন সংস্করণ ছাপানো, বেচা বা কেনা অপরাধ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না—সরকার এই সাফাইয়ের আশ্রয় নেয়। লোক নিরাশ হয়।

স্বদেশী ও হিন্দু-মুসলমান একতার প্রতিজ্ঞা লওয়ার জন্য সেদিন সকালে লোকদের চৌপাটীতে আসিতে বলা হইয়াছিল। বিঠ্‌ঠলদাস জেরাজানী সেদিন প্রথম দেখিতে পাইলেন যে মেঘ যত গর্জে তত বর্ষে না। জন কয়েক মাত্র প্রাণী আসিয়াছিল। তাদের মধ্যে দুই-চার জন বোনের কথা আমার মনে আছে। পুরুষের সংখ্যা নেহাত কম ছিল। ব্রতের খসড়া করাই ছিল। প্রতিজ্ঞার অর্থ ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিয়া তবে প্রতিজ্ঞা করাইয়াছিলাম। লোক কম আসিয়াছিল বলিয়া আমি অবাক্ হই নাই। দুঃখও তাতে আমার ছিল না। কারণ জনসাধারণের উঠতি-পড়তি মনোভাব—উত্তেজনার কাজে উৎসাহ ও নীরব গঠনকর্মে অনুৎসাহ—আমি বরাবর লক্ষ্য করিয়া আসিয়াছি। আর আজও তাহাই দেখিতে পাই।

যাক, সে কথা অন্য কোন প্রকরণে বলিব। যে কথা বলিতেছিলাম —৭ই রাতে আমি দিল্লী তথা অমৃতসর রওনা হই। ৮ই মথুরায় গাড়ী পৌঁছিলে শুনিতে পাইলাম আমাকে গ্রেপ্তার করা হইবে। মথুরার পরে যে স্টেশনে গাড়ী দাঁড়ায় সেখানে আচার্য গিদবানী আমার সঙ্গে দেখা করেন, গ্রেপ্তারের সঠিক খবর দেন ও বলেন যে কাজে লাগাইলে কাজ করিতে তিনি প্রস্তুত। ধন্যবাদ জানাইয়া বলিলাম, ‘প্রয়োজন যখন মনে হবে আপনার সেবা নিতে ভুলব না।’

পলবল স্টেশনে গাড়ী পৌঁছার আগেই আমার ওপর হুকুম জারী হইল: ‘আপনি পঞ্জাবে গেলে অশান্তি সৃষ্টির ভয় রয়েছে। তাই পঞ্জাবের সীমানায় আপনার প্রবেশ মানা।’ পুলিশ আমাকে গাড়ী হইতে নামিতে বলে। অস্বীকার করিয়া আমি বলি, ‘অশান্তি বাড়াতে আমি যাচ্ছি না, যাচ্ছি তা শান্ত করতে, ওখান থেকে ডাক এসেছে বলে। অতএব সখেদে বলতে হচ্ছে, হুকুম মানতে পারছিনে।’

পলবলে গাড়ী পৌঁছিল। মহাদেব সঙ্গে ছিল। তাকে দিল্লী যাইয়া শ্রদ্ধানন্দজীকে খবর দিতে ও লোকদের শান্ত রাখিতে বলি: লোকদের বুঝাইয়া বলিতে বলি যে আদেশ অমান্য করার কারণ যে সাজা হইবে তা ভুগিতে আমি প্রস্তুত হইয়াছি; আমার সাজা হইলে লোকে যেন শান্ত থাকে কেন না লোক শান্ত থাকিলে আমরা জয়ী হইব।

পলবল স্টেশনে নামাইয়া আমাকে পুলিসের হাওলা করিয়া দেওয়া হইল। দিল্লী হইতে আসা কোন ট্রেনের তৃতীয় শ্রেণীতে আমাকে পুলিস উঠাইল; পুলিসেরাও উঠিল। মথুরায় পৌঁছিলে পুলিস-বারাকে আমাকে লইয়া গেল। আমার কি হইবে, কোথায় লইয়া যাইবে, কোন পুলিস অফিসার তা জানিত না। শেষ রাত চারটায় আমায় তারা জাগাইল ও বোম্বাইগামী এক মালগাড়ীতে চাপাইল। দুপুরে সওয়াই মাধুপুর স্টেশনে আবার আমায় নামানো হইল। বোম্বাই ডাক গাড়ীতে ইন্সপেক্টর বোরিঙ্গ লাহোর হইতে আসিয়া আমার ভার লইল।

এবার প্রথম শ্রেণীতে চড়াইল। সঙ্গে সাহেব থাকিল। এযাবৎ আমি সাধারণ কয়েদী ছিলাম। এখন 'ভদ্রলোক' কয়েদী বলিয়া গণ্য হইলাম। সার মাইকেল ওডায়রের গুণকীর্তন সাহেব শুরু করিল, বলিল আমার বিরুদ্ধে তাঁর কোনই অভিযোগ নাই তবে আমি পঞ্জাবে গেলে অশান্তি ঘটিতে পারে এই তাঁর ভয়। অবশেষে সে আমাকে স্বেচ্ছায় বোম্বাই ফিরিয়া যাইতে ও পঞ্জাবের সীমা লঙ্ঘন না করিবার কথা দিতে অনুরোধ করিল। তাকে বলিয়া দেই যে হুকুম তামিল করিতে আমি পারিব না আর নিজের ইচ্ছায়ও বোম্বাই ফিরিয়া যাইব না। সাহেব তখন বলিল, আইনের আশ্রয় নেওয়া ছাড়া তবে তার পথ নাই। জিজ্ঞাসা করিলাম, 'বলুন ত কি করতে চান?' উত্তরে সে বলিল, 'তা জানি না। এর পরে কি করা হবে সে নির্দেশের অপেক্ষা করছি। এখন আপনাকে আমি বোম্বাই নিয়ে যাচ্ছি।'

গাড়ী সুরাটে পৌঁছিল। অন্য অফিসার আমার ভার লইল। গাড়ী বোম্বাইর কাছাকাছি আসিলে সে বলে, 'এখন আপনি মুক্ত। মেরিন লাইন্‌সে নাবেন ত ভাল হয়। সে মতে আমি গাড়ী থামাব। কোলাবা-তে সম্ভবত খুব ভিড় হবে।' উত্তরে বলি, 'যেমন বলবেন, খুশী মনে করব।' অত্যন্ত খুশী হইয়া সে ধন্যবাদ জানাইল। মেরিন লাইন্‌সে নামি। কোন

জানা লোকের ঘোড়ার গাড়ী দেখিতে পাই। ভদ্রলোক আমায় রেব-শঙ্কর ঝবেরীর বাড়ী পৌঁছাইয়া দেন। ঝবেরী আমায় বলেন, 'আপনার গ্রেপ্তারের খবরে লোক তেতে আছে, পাগলপারা হয়েছে। পায়ধনীর কাছে হাঙ্গামার ভয় রয়েছে। ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিস সেখানে গেছে।'

প্রায় তখনই ওমর সোবানী ও অনসূয়া বাই আমাকে পায়ধনী লইয়া যাওয়ার জন্য আসেন ও বলেন, 'লোক অশান্ত ও উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। আমাদের সাধ্য নাই তাদের ঠাণ্ডা করি। আপনাকে দেখলে শান্ত হবে। আমাদের কোন কথা খাটবে না।'

তাঁদের মোটরে গিয়া বসিলাম। পায়ধনীর কাছে যাইতেই দেখিলাম, বিরাট্ ভিড়। আমাকে দেখিয়া জনতার আনন্দের সীমা থাকিল না। দেখিতে দেখিতে ভিড় শোভাযাত্রার রূপ ধরিল। বন্দে-মাতরম্, আল্লাহো-আকবর রবে আকাশ-বাতাস মাতিয়া উঠিল। পায়ধনীতে ঘোড়সওয়ার পুলিসের এক পল্টন দেখিতে পাইলাম। ওপর হইতে ইট-পাটকেল পড়িতে-ছিল। জোড়-হাতে লোককে শান্ত হওয়ার আবেদন জানাইলাম। কিন্তু মনে হইল আমাদের ওপরও ইট-পাটকেল পড়িবে। অবদুর রহমান স্ট্রীট হইতে বাহির হইয়া শোভাযাত্রা 'ক্রফোর্ড মার্কেটের' দিকে আগাইয়াছে কি এক দল ঘোড়সওয়ার পথ রুখিয়া দাঁড়ায়—উদ্দেশ্য শোভাযাত্রা কেল্লার দিকে বাড়িতে না পায়। অত লোক ধরার ঠাঁই ওখানটায় ছিল না। পুলিসের লাইন চিরিয়া লোকে ঠাঁই করিয়া লইতে যায়। ওই জনসমুদ্রে আমার কথা পৌঁছানো অসম্ভব ছিল। ঠিক সে সময়ে ঘোড়সওয়ারদের অধিনায়ক ভিড় ছত্রভঙ্গ করিয়া দেওয়ার হুকুম দেয়। অমনি ঘোড়সওয়াররা বর্শা বাগাইয়া ঘোড়া ছুটাইয়া দেয়। মুহূর্তের তরে মনে হইয়াছিল ঘোড়-সওয়ারদের বর্শা বুঝি আমাকে গাঁথিয়া লইবে। কিন্তু ওই ভয় অকারণ ছিল। ছুটিয়া-চলা ঘোড়সওয়ারদের হাতের বর্শা গাড়ীটা ছুঁইয়া যায়। ভিড়ে ভাঙ্গন ধরিল ; দৌড়াদৌড়ি আরম্ভ হইল। লোক একদম দিশাহারা। কত লোক চটকাইল, কত লোক জখম হইল। ওই ঠাসাঠাসিতে না পাইতেছিল ঘোড়া আগাইবার পথ আর না পাইতেছিল লোকে সরিয়া পড়ার জায়গা। পিছনে হাজারো লোকের জমাট ভিড়, ফিরিবারও উপায় ছিল না। দিশাহারা জনতা : দিশাহারা ঘোড়সওয়ার। দুই দিশাহারার মস্ত সমাবেশ। অতি ভয়ঙ্কর সেই দৃশ্য। জনতা ছিন্নভিন্ন করার জন্য ঘোড়সওয়ারেরা

দিগ্বিদিকে ঘোড়া ছুটাইতেছিল। কি যে তারা করিতেছিল হয়ত বা তারা দেখিতেছিল হয়ত বা দেখিতেছিল না।

এভাবে তারা ভিড় ছত্রভঙ্গ করে, এভাবে তারা তাদের রোখে আর তবে ক্ষান্ত হয়। আমাদের মোটরকে আগে যাইতে দেয়। পুলিস কমিশনারের আপিসের সামনে আমি গাড়ী থামাই এবং পুলিসের কুকীর্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতে তাঁর কাছে যাই।

৩২

সেই সপ্তাহ—২

কমিশনার গ্রিফিথের আপিসে গেলাম। সিঁড়ির যে দিকেই তাকাই, দেখি হাতিয়ার-বন্ধ সিপাই—আসন্ন লড়াইয়ের জন্য যেন তৈরি! বারান্দায়ও ব্যস্তসমস্ততা লক্ষ্য করিলাম। খবর দিলাম; আপিসে ঢুকিলাম। দেখিতে পাইলাম কমিশনারের পাশে মি. বোরিঙ্গ রহিয়াছেন।

চোখে দেখা দৃশ্য কমিশনারের কাছে বর্ণনা করিলাম। সংক্ষেপে তিনি বলিলেন, 'শোভাযাত্রা ফোর্টের দিকে যেতে না পায় সেটাই ছিল আমার লক্ষ্য। গেলে হাঙ্গামা হতই হত। দেখতে পেয়েছিলাম জনতার ফিরে যাওয়ার মনোভাব ছিল না। ঘোড়া না চালিয়ে উপায় ছিল না।'

'কিন্তু তার পরিণাম যে কি হতে পারে তা ত আপনি জানতেন। ঘোড়ার পায়ে মানুষ না চটকে যায় কি? আমি মনে করি ঘোড়সওয়ার ছোটানোর দরকার ছিল না'—আমি বলি।

'তা আপনি বুঝবেন না। আপনার শিক্ষার প্রভাব লোকের ওপর যে কি হয়েছে তা আপনার চাইতে পুলিস আমরা ভাল জানি। প্রথম হতেই যদি আমরা শক্ত না হতাম তবে তাল সামলানো যেত না। আমি আপনাকে বলছি লোক আপনার বশে থাকবে না। আইন অমান্যের কথা তারা চট্ করে বোঝে; শান্তির কথা তাদের মগজে ঢোকে না। আপনার উদ্দেশ্য ভাল, কিন্তু লোকে তা বুঝবে না। তারা চলবে তাদের স্বভাব অনুসারে'—মি. গ্রিফিথ বলিলেন।

'এখানেই আপনার ও আমার দৃষ্টিতে ব্যবধান। মানুষ স্বভাবে লড়িয়ে নয়, শান্তিপ্রিয়।'—আমি উত্তরে বলি।

এভাবে আমাদের কথা-কাটাকাটি চলিতে থাকে। সাহেব অবশেষে বলেন, 'বেশ, যদি আপনি দেখতে পান যে লোকে আপনার কথা ধরতে পারে নাই ত আপনি কি করবেন?'

উত্তরে আমি বলি, 'তেমনটা আমার মনে হয় ত লড়াই আমি স্থগিত রাখব।'

'তার মানে! আপনি ত মি· বোরিঙ্গকে বলেছেন, মুক্ত হলেই সঙ্গে সঙ্গে আপনি ফের পাঞ্জাব রওনা হবেন।'

'ইচ্ছা ত তা-ই ছিল। কিন্তু আজ আর তা সম্ভব নয়।'

'সবুর করুন, সবটা ব্যাপার আপনি বুঝতে পাবেন। জানেন কি অহমদাবাদে কি চলেছে? অমৃতসরে কি ঘটেছে? সব লোক যেন ক্ষেপে গেছে। সব খবর আমিও জানি না। জায়গায় জায়গায় তার কাটা হয়েছে। আমি বলব এ সবের জন্য আপনিই দায়ী।'

আমি বলি, 'আমার দায়িত্ব কোথাও দেখতে পাই ত সে দায়িত্ব নিতে পিছবো না। অহমদাবাদে অমনটা হাঙ্গামা ঘটে থাকে ত আমি অত্যন্ত দুঃখিত ও আশ্চর্য হব। অমৃতসরের কথায় আমার কিছু বলার নেই। সেখানে কোন দিন আমি যাইনি। সেখানকার লোকে আমাকে জানে না। তবে এ কথা আমি বলতে পারি যে পঞ্জাব সরকার যদি সেখানে যেতে আমায় বাধা না দিত তবে শান্তি রক্ষার কাজে আমি অনেকটা সাহায্য করতে পারতাম। আমাকে আটকে সরকার খামকা লোককে চটিয়েছে।'

এভাবে আমাদের বাদপ্রতিবাদ চলিতেই থাকে। একমত, একদৃষ্টি হওয়ার পথ ছিল না। চৌপাটীতে সভা করিব ও লোকদের শান্তি রক্ষা করিতে বলিব এ কথা বলিয়া ওখান হইতে আমি চলিয়া আসি।

চৌপাটীতে জনসভা হইল। লোকদের আমি অহিংসার কথা ও সত্যাগ্রহের মর্যাদা (সীমা) কি ও কোথায় তা সবিশেষ বুঝাইয়া বলিয়া বলি, 'সত্যাগ্রহ আসলে সত্যের লড়াই। লোকে যদি শান্তি রক্ষা না করে তবে আমাদ্বারা কোন দিনও গণ-সত্যাগ্রহ হবে না।'

অনসূয়া বাইও অহমদাবাদ হইতে খবর পাইয়াছিল যে সেখানে হাঙ্গামা হইয়াছে। তাকেও গ্রেপ্তার করা হইয়াছে এইরূপ কেউ কেউ রটাইয়া দেয়। তাতে শ্রমিকেরা খেপিয়া ওঠে, হরতাল করে, হাঙ্গামা বাধায়। একজন সার্জেণ্ট খুন হয়।

অহমদাবাদে যাই। জানিতে পাই নাদিয়াদের কাছে রেল-লাইন উপড়ানোর চেষ্টা করা হইয়াছে। বীরমগামে এক সরকারী কর্মচারীর জীবন নাশ হইয়াছে, অহমদাবাদে সামরিক আইন (মার্শল ল) জারী হইয়াছে। লোক ভয়ে কম্পমান। তারা হিংসাচরণ করিয়াছিল, তার জন্য সুদে আসলে তাদের মূল্য গুনিয়া দিতে হয়।

আমাকে কমিশনার মি· প্র্যাটের কাছে লইয়া যাওয়ার জন্য কোন পুলিস অফিসার স্টেশনে ছিল। তাঁর কাছে গেলাম। তিনি ভয়ানক রাগিয়া আছেন দেখিলাম। ধীরভাবে তাঁর কথার উত্তর দেই এবং যা ঘটিয়াছে তার জন্য দুঃখ প্রকাশ করি। মার্শল ল জারী করা অনাবশ্যক ছিল এ কথাও বলি। আরও বলি যে শান্তি ফিরাইয়া আনার যে কোন প্রচেষ্টায় সহযোগিতা করিতে আমি প্রস্তুত আছি। আশ্রমে জনসভা করার অনুমতি চাই। প্রস্তাবটা তাঁর ভাল লাগে। সভা হয়—সম্ভবত সেই দিন ১৩ই এপ্রিল রবিবার ছিল। সেই দিনেই বা তার পরের দিনে মার্শল ল তুলিয়া লওয়া হইয়াছিল। লোকে যে দোষ করিয়াছে সভায় তা বুঝাইবার আমি চেষ্টা করি, প্রায়শ্চিত্তরূপে তিন দিন উপবাস করিব বলি এবং লোকদেরও এক দিন উপবাস করিতে আহ্বান জানাই। যারা খুনখারাবি করিয়াছিল তাদের উদ্দেশ্যে বলিয়াছিলাম যে তারা যেন নিজেদের দোষ স্বীকার করে।

আমার কর্তব্য আমি পরিষ্কার দেখিতে পাই। যে শ্রমিকদের মধ্যে আমি এত দিন কাজ করিয়াছি, যাদের সেবা আমি করিতেছি, অন্যদের অপেক্ষা যারা ভালভাবে চলিবে বলিয়া আশা করিয়া আসিয়াছি, তারা দাঙ্গায় যোগ দিয়াছিল ইহা আমার কাছে অসহ্য বোধ হয়। তাদের দোষে নিজকে আমি দোষী মনে করি।

লোকদের আমি যেমন দোষ স্বীকার করিতে বলিয়াছিলাম, সরকারকেও তেমন আমি দোষীদের দোষ মাফ করিতে বলিয়াছিলাম। দুইয়ের কেউ আমার কথা শোনে নাই।

স্বর্গীয় রমনভাই প্রমুখ শহরবাসীরা আমার কাছে আসেন ও সত্যাগ্রহ স্থগিত করার জন্য অনুরোধ জানান। তাঁদের এই প্রস্তাবের আগেই আমি ঠিক করিয়াছিলাম যে যতদিন না লোকে শান্তির পাঠ শিখিবে ততদিন সত্যাগ্রহ স্থগিত থাকিবে। এই কথা তাঁদের বলিলে তাঁরা সন্তুষ্ট হইয়া ফিরিয়া যান।

কিছু লোক এই সিদ্ধান্তে অসন্তুষ্টও হইয়াছিলেন। তাঁদের কথা ছিল এই যে, সকলে শান্ত থাকিবে ইহা যদি আমি আশা করি আর তা-ই যদি সত্যাগ্রহের আমার শর্ত হয় তবে ব্যাপক সত্যাগ্রহ কোন দিনও করা যাইবে না। তাঁদের আমি বলিয়াছিলাম এই বিষয়ে আমার দৃষ্টি ভিন্ন। যাদের মধ্যে আমি কাজ করিয়াছি, যারা সত্যাগ্রহের বাহন হইবে বলিয়া আশা করিয়াছি, তারা যদি হিংসার আশ্রয় লয় তবে সত্যাগ্রহের সম্ভাবনা কোন দিনই নাই। তা ছাড়া, লোকের কাছ হইতে যতটা অহিংসা প্রত্যাশা করি তাদের ততটা অহিংসার গণ্ডিতে রাখার শক্তি জননায়কদের না থাকিলে চলিবে কেন। আজও আমার ঠিক উহাই মত।

৩৩

পর্বতপ্রমাণ ভুল

অহমদাবাদের সভার পরে তাড়াতাড়ি আমি নাদিয়াদে যাই। 'পাহাড়-সমান ভুল' নামে যে কথা প্রসিদ্ধ হইয়া গিয়াছে তা নাদিয়াদেই আমি প্রথম বলি। ভুল যে আমার হইয়াছে তার অস্পষ্ট অনুভূতি অহমদাবাদেই হইয়াছিল। কিন্তু নাদিয়াদে যাওয়ার পরে, ওখানকার ব্যাপার চোখে দেখার পরে এবং খেড়া জেলায় বহু লোক গ্রেপ্তার হইয়াছে এ কথা শোনার পরে সভায় যখন ভাষণ দিতেছিলাম তখন আচম্বিতে আমার মনে হয়, ক্ষেত্র ঠিক তৈরি না হইতে খেড়ার তথা অন্য জায়গার লোককে অহিংস আইন অমান্য করিতে বলিয়া আমি অতি মস্ত ভুল করিয়াছি। কথাটা স্বীকার করিয়াছিলাম বলিয়া লোকে আমায় খুব ঠাট্টা-পরিহাস করিয়াছিল। কিন্তু এই স্বীকার-উক্তির জন্য আমার কখনও আপসোস হয় নাই। আমার চিরদিনের বিশ্বাস এই যে, যে মানুষ অপরের তাল-সমান ভুলকে তিল-সমান দেখে এবং নিজের তিল-সমান ভুলকে তাল-সমান দেখে সে আপনার ও অপরের ভুলকে ঠিক ঠিক দেখে। এ কথাও আমি মনে করি যে সত্যাগ্রহী হইতে ইচ্ছুক মানুষের এই সাধারণ সত্যটা অক্ষরে অক্ষরে পালন করা উচিত।

ওই 'পাহাড়-সমান ভুল'-টা যে কি ছিল তা বিচার করিয়া দেখা যাক। কর্তব্যবুদ্ধি হইতে কেউ যখন রাষ্ট্রের নানা আইন মানিয়া চলে কেবল তখনই সবিনয় আইনভঙ্গের অধিকার তার জন্মে। আইন ভাঙ্গিলে সাজা

ভুগিতে হইবে এই ভয়ে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে আমরা আইন মানিয়া চলি—এ কথা নীতি-অনীতির প্রশ্ন নাই এরূপ আইন সম্পর্কে বিশেষভাবে খাটে। আইন থাক বা না থাক, চুরি করার কথা সৎ ব্যক্তির মনে কখনও ঠাঁই পায় না। অথচ রাতে সাইকেলে বাতি জ্বালাইবার নিয়ম ভাঙ্গিতে এই সৎ ব্যক্তিরও বাধে না। আর এই নিয়ম মানিয়া চলিতে বলেন ত ঝট্ করিয়া তা তিনি মানিয়া নেন না। কিন্তু তা যদি আইনের আদেশ হয় এবং অমান্য করিলে সাজা হওয়ার ভয় থাকে তবে সাজার হাত হইতে বাঁচার জন্য রাত হইতেই তিনি সাইকেলে বাতি জ্বালাইবেন। স্বেচ্ছার যে নিয়ম পালন সত্যাগ্রহীর কাছ হইতে আশা করা হয় এই নিয়ম পালন স্বেচ্ছার সেই নিয়ম পালন নহে। কিন্তু সত্যাগ্রহীর দৃষ্টি কি হইবে? সমাজের অথবা রাষ্ট্রের যে সব আইন মানিয়া লওয়ার যোগ্য সেই সব সে জানিয়া-বুঝিয়া ধর্মবুদ্ধি হইতে স্বেচ্ছায় মানিয়া চলিবে। এরূপ নিষ্ঠা সহকারে যে মানুষ নিয়ম মানিয়া চলে সেই কেবল কোন্ নিয়ম ন্যায্য আর কোন্ নিয়ম অন্যায্য তা ঠিক ঠিক বাছিয়া লইতে পারে। সে অবস্থায় স্থলবিশেষে কোন কোন নিয়ম ভঙ্গ করার অধিকার তার জন্মে। এরূপ অধিকার না জন্মিতেই লোককে আমি অহিংসভাবে আইন অমান্য করিতে বলিয়াছিলাম। এই ভুলটা আমার কাছে পর্বতপ্রমাণ মনে হইয়াছিল। খেড়া জেলায় প্রবেশ করিতেই খেড়া সত্যাগ্রহের নানা পুরানো কথা আমার মনে পড়ে আর অবাক্ হইয়া ভাবি এরূপ স্পষ্ট জিনিসটা আমার কাছে ধরা পড়ে নাই। তখন আমার কাছে এই কথা স্পষ্ট হইয়া যায় যে সবিনয় আইন ভঙ্গের অধিকারী হইতে হইলে উহার গভীর রহস্য যে কি আগে তা ভালভাবে বুঝিয়া লওয়া আবশ্যক। * মনে মনে যারা নিত্য আইন ভাঙ্গে, চুপি চুপি যারা বহুবার আইন ভাঙ্গিয়াছে, হঠাৎ তারা কি করিয়া বুঝিবে সবিনয় আইন অমান্য কি? আর উহার মর্যাদাই বা কি? হাজারো কি লাখো লোকের পক্ষে এই অবস্থায় পৌঁছানো যে অসম্ভব তা সুস্পষ্ট।* আমার মনে হইল, ইহাই যদি

* তারকা-চিহ্নিত অংশ ইংরেজী অনুবাদে বাদ দেওয়া হইয়াছে। ইংরেজী সংস্করণের মুখবন্ধে মহাদেব দেশাই লিখিয়াছেন, 'The translation, as it appeared serially in Young India, had, it may be noted, the benefit of Gandhiji's revision.'—অনুবাদ যখন ধারাবাহিকভাবে 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' পত্রে প্রকাশ হইত তখন গান্ধীজী তা সংশোধন করিয়া দিতেন।

অবস্থা হয় তবে লোককে সবিনয় আইন অমান্য করিতে বলার আগে নির্ভর করা চলে চরিত্রবান এরূপ এক স্বেচ্ছাসেবক দল খাড়া করিতে হইবে যারা লোককে সত্যাগ্রহের মর্মকথা বুঝাইতে ও প্রয়োজনমত তাদের পথ দেখাইতে পারিবে। এরূপ ভাবনা-চিন্তা লইয়া আমি বোম্বাই যাই এবং সত্যাগ্রহ সভা নামে সত্যাগ্রহী স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন করি। আর তাদের দ্বারা লোককে সত্যাগ্রহ ও তার তাৎপর্য শিক্ষা দেওয়ার কাজ শুরু হয়। ওই উদ্দেশ্যে প্রচারপত্রও বাহির করা হয়।

কাজ ত চলিল, কিন্তু দেখিতে পাইলাম ও কাজে লোকের তেমন আগ্রহ সৃষ্টি করিতে পারি নাই। স্বেচ্ছাসেবক হওয়ার জন্য ভিড় লাগে নাই। যারা নাম দিল তারা সকলে নিয়মমত আসিত না। যারা আসিত তারাও সংকল্পে দিন দিন দৃঢ় হওয়ার পরিবর্তে খসিয়া পড়িতে লাগিল। বুঝিতে পাইলাম, যে গতিতে সবিনয় আইন ভঙ্গ চলিবে ভাবিয়াছিলাম তা অপেক্ষা মন্দ গতিতে তা চলিবে।

৩৪

'নবজীবন' ও 'ইয়ং ইণ্ডিয়া'

এক দিকে ঢিমে তালে হইলেও শান্তিরক্ষার কাজ চলিতেছিল ত অন্য দিকে সরকারের দমননীতির দাপট চলিতেছিল। পঞ্জাব উহার পুরা কোপের নিশানা হইল। ফৌজী কানুন জারী হইল : নাদীরশাহী চলিল ; নেতাদের ধরিয়া জেলে পোরা হইল। সাধারণ বিচারালয় হটিল ; তার স্থান লইল স্বৈরাচারী শাসকের তাঁবেদার বিশেষ বিচারালয়। সাক্ষী নাই, সাবুদ নাই, ওই সব ট্রাইবুনল লোককে সাজা দিতে লাগিল। সৈন্যরা নির্দোষ নির্বিরোধ মানুষকে স্ত্রী-পুরুষ ভেদ নাই অমৃতসরে কেঁচোর মত বুকে হাঁটাইল। জালিনওয়ালাবাগের যে হত্যাকাণ্ডে ভারতের ও সারা জগতের দৃষ্টি পঞ্জাবের ওপর পড়িয়াছিল, আমি মনে করি এর তুলনায় সেই হত্যাকাণ্ড তুচ্ছ ছিল।

সব কিছু অগ্রাহ্য করিয়া লোকে আমাকে পঞ্জাবে যাইতে পীড়াপীড়ি করিতেছিল। ভাইসরয়কে পত্র দিলাম, তার করিলাম। অনুমতি পাইলাম না। বিনা অনুমতিতে গেলে পঞ্জাবে প্রবেশ করিতে পাইতাম না। সবিনয়

গিয়াছিল। এক সময় চল্লিশ হাজারের কাছাকাছি পৌঁছিয়াছিল। নবজীবন-এর প্রচার এক লাফে বাড়িয়াছিল, ইয়ং ইণ্ডিয়ার গ্রাহক ধীরে ধীরে বাড়িয়াছিল। আমার জেল হইলে এই দুইয়ের প্রচার পড়িয়া যায় : এখন দুইয়ের প্রচার আট হাজারের নীচে।

শুরুতেই ঠিক করিয়াছিলাম এই দুই পত্রে বিজ্ঞাপন ছাপিব না। আমার বিশ্বাস তাতে কোন ক্ষতি হয় নাই, উল্টা তার ফলে বিচার-স্বাধীনতা রক্ষার পক্ষে সাহায্য হইয়াছে।

এখানে বলা যাইতে পারে যে, এই দুই পত্রের মারফতে আমি অনেকটা শান্তিও লাভ করিয়াছিলাম। তখনই অহিংসভাবে আইন অমান্য না করিতে পারিলেও এই দুই পত্র মারফত আমার মত আমি খোলাখুলি ব্যক্ত করিতাম এবং যাঁরা আমার পরামর্শ ও পথনির্দেশ চাহিতেন এই দুইয়ের মাধ্যমে আমি তাঁদের তা যোগাইতাম। আমি এ কথাও মনে করি যে সেই ঘোর দুর্দিনে এই দুই পত্র দ্বারা জঙ্গী শাসনের জুলুম আমি কিছু খর্ব করিতে পারিয়াছিলাম।

৩৫

পঞ্জাবে

পঞ্জাবে যা কিছু ঘটিয়াছিল তার জন্য সার মাইকেল ও'ডায়র আমাকে দায়ী করিয়াছিলেন এবং কিছু কিছু ক্রুদ্ধ পঞ্জাবী যুবক আমাকে জঙ্গী আইন জারি হওয়ার জন্য দায়ী করিয়াছিল। আইন অমান্য মুলতবী না করিলে জালিনওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড ঘটিত না আর ফৌজী কানুনও জারি হইত না এই ছিল ওই সব যুবকদের যুক্তি। পঞ্জাবে গেলে আমাকে প্রাণে মারিবে এই ভয়ও কেউ কেউ দেখাইয়াছিল।

আমার মনে হয় আমার কার্য এত নির্ভুল ও সঙ্গত ছিল যে কোন বিবেচক লোক তা ভুল বুঝিতে পারে না।

পঞ্জাবে যাওয়ার জন্য আমি অধীর হইয়াছিলাম। পঞ্জাবে পূর্বে কখনও যাই নাই। সেখানে যা ঘটিয়াছে তা দেখার তীব্র ইচ্ছা হইয়াছিল। যাঁরা আমাকে ডাকিয়াছিলেন সেই ডা. সত্যপাল, ডা. কিচলু ও পণ্ডিত রামভজ দত্তকে দেখার ইচ্ছাও ছিল। তাঁরা তখন জেলে ছিলেন, কিন্তু আমার

নিশ্চিত বিশ্বাস ছিল তাঁদের ও অন্যদের সরকার বেশিদিন জেলে রাখিতে পারিবে না। বোম্বাই যখনই যাইতাম, বহু পঞ্জাবী আমার সহিত দেখা করিতে আসিতেন। তাঁদের আমি সাহস দিতাম, ভরসা দিতাম; তা পাইয়া তাঁরা খুশী হইতেন। আমার তখনকার আত্মবিশ্বাস অন্যে বর্তাইত।

কিন্তু আমার পঞ্জাবে যাওয়া কেবলই পিছাইয়া যাইতেছিল্। অনুমতির জন্য লিখিতাম ত ভাইসরয় উত্তরে বলিতেন 'এখনও সময় হয়নি'।

জঙ্গী আইনের আমলে পঞ্জাব সরকারের কার্য তদন্ত করার জন্য এই সময়ে হাণ্টার কমিটী নিযুক্ত হয়। দীনবন্ধু এণ্ডরুজ কিছু আগেই পঞ্জাবে পৌঁছিয়া গিয়াছিলেন। ওখানে যে কি চলিতেছিল তার হৃদয়বিদারক বর্ণনা তিনি আমাকে পত্রে জানাইতেছিলেন। তাহা হইতে আমার প্রতীতি জন্মে যে জঙ্গী আইনের অত্যাচারের যে বিবরণ সংবাদপত্র মারফত দেশ ও জগৎ পাইয়াছিল তাহা অপেক্ষা তা অনেক বেশি নিকৃষ্ট ছিল। পত্রপাঠ যাওয়ার জন্য তিনি বারবার পীড়াপীড়ি করিতেছিলেন। ওদিকে মালব্যজীও অবিলম্বে পঞ্জাবে যাওয়ার জন্য তারের ওপর তার করিতেছিলেন। আবার ভাইসরয়কে তার করিলাম। জবাব পাইলাম: অমুক দিনের পরে যেতে পারেন। সে তারিখটা মনে নাই, খুব সম্ভব ১৭ই অক্টোবর।

লাহোরে পৌঁছিলাম—যা দেখিলাম জীবনে ভুলিব না। স্টেশন লোকে লোকারণ্য—বহু কালের ছাড়াছাড়ির পরে অতি প্রিয় জনের সহিত মিলিবার আনন্দে আত্মহারা স্বজন যেন অধীর আগ্রহে পথ চাহিয়াছিল।

৺পণ্ডিত রামভজ দত্ত চৌধুরীর গৃহে আমার থাকার স্থান করা হইয়াছিল। শ্রীসরলাদেবী চৌধুরাণীর (তাঁর সহিত পূর্বেই আমার পরিচয় ছিল।) ওপর আমাকে সামলানোর ধকল পড়িয়াছিল। 'সামলানো' ও 'ধকল' শব্দ দুইটি আমি ভাবিয়া-চিন্তিয়াই ব্যবহার করিতেছি, কেন না এখন যেমন তখনও তেমন আমি যেখানে উঠিতাম সে স্থানটা যেন ধর্মশালা হইয়া উঠিত।

দেখিতে পাইলাম প্রধান প্রধান পঞ্জাবী নেতারা জেলে। এরূপ অবস্থায় পণ্ডিত মালব্যজী, পণ্ডিত মোতিলালজী ও স্বর্গীয় শ্রদ্ধানন্দজী তাঁদের কর্তব্য করিয়াছিলেন—আটক নেতাদের স্থান নিয়াছিলেন। মালব্যজী ও শ্রদ্ধানন্দজীর সম্পর্কে পূর্বেই ভালভাবে আসিয়াছিলাম। লাহোরে পণ্ডিত মোতিলালের নিকট-সম্পর্কে আসি। এই নেতাগণ ও জেলে যাওয়ার ভাগ্য

হয় নাই এরূপ স্থানীয় নেতারা দেখিতে না দেখিতে আমাকে আপন জন করিয়া লইলেন। পঞ্জাবে আমি ওই প্রথম গিয়াছি এমনটা আমার মনেও হয় নাই।

হাণ্টার কমিটীর কাছে সাক্ষ্য না দেওয়া কেন যে সাব্যস্ত করা হইয়াছিল সে কথা সুবিদিত। সংবাদপত্রে সেই কারণ প্রকাশ হইয়াছিল। তাই এখানে তার উল্লেখ করা অনাবশ্যক। সেই সব কারণ যে সঙ্গত ছিল এবং কমিটী বয়কট করাও যে ঠিকই হইয়াছিল এ কথা আজও আমি মনে করি।

হাণ্টার কমিটী বয়কট করা হইয়াছিল বলিয়া উহার পাল্টা সাধারণের তরফ হইতে কংগ্রেসের পক্ষে এক তদন্ত কমিটী গঠন করা স্থির হয়। পণ্ডিত মোতিলাল নেহেরু, ৺ চিত্তরঞ্জন দাস, শ্রীঅব্বাস তৈয়বজী, শ্রীজয়াকর ও আমাকে সভ্য করিয়া পণ্ডিত মালব্যজী বস্তুত এক কমিটী গঠন করিয়া দেন। আমরা বিভিন্ন স্থানে তদন্তের জন্য যাই। কমিটীর ব্যবস্থাপনার ভার আমার ওপর পড়ে। এবং বেশির ভাগ জায়গায় তদন্ত করার সৌভাগ্য আমারই হইয়াছিল বলিয়া পঞ্জাব ও পঞ্জাবের গ্রামের ঘনিষ্ঠ পরিচয় লাভ করার অপূর্ব সুযোগ আমি পাইয়াছিলাম।

এই তদন্ত প্রসঙ্গে পঞ্জাবী স্ত্রীলোকদের সহিত আমার এমন ঘনিষ্ঠ পরিচয় হইয়াছিল যে মনে হইত তারা যেন আমার যুগযুগান্তরের স্বজন। যেখানেই যাইতাম দলে দলে তারা আসিত ও নিজেদের হাতে কাটা সুতার স্তূপ আমার সামনে রাখিত। এই তদন্তের সময়ে আমি বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে পঞ্জাব খাদির প্রশস্ত ক্ষেত্র হইতে পারে।

লোকের ওপর অনুষ্ঠিত অত্যাচারের তদন্ত আমার যতই অগ্রসর হইতেছিল ততই অভাবনীয় সরকারী অরাজকতার ও আমলাদের নাদিরশাহী খামখেয়ালির কথা শুনিতে পাইতেছিলাম। আর আমার অন্তর বেদনায় কাতর হইতেছিল। যে পঞ্জাব সরকারী ফৌজে সব চাইতে বেশি লোক যোগায় সেই পঞ্জাব এমন অত্যাচার কিরূপে সহ্য করিল এই কথা আজও আমি অবাক্ হইয়া ভাবি।

কমিটীর রিপোর্ট তৈরি করার কাজও আমার ওপর পড়িয়াছিল। পঞ্জাবে কি রকম অত্যাচার চলিয়াছিল তা যাঁরা জানিতে চান তাঁদের আমি এই রিপোর্ট পড়িতে বলি। রিপোর্ট সম্বন্ধে এ কথা বলিতে পারি যে জ্ঞানত কোন অতিশয়োক্তি এতে নাই। যে প্রমাণ এই রিপোর্টে দেওয়া হইয়াছে তাহা

অপেক্ষা অনেক বেশি প্রমাণ কমিটী পাইয়াছিল। যে প্রমাণ বিষয়ে অণুমাত্র সংশয় ছিল তা রিপোর্টে ছাপা হয় নাই। সত্যের নিছক কষ্টিপাথরে যাচাই করিয়া লেখা এই রিপোর্ট হইতে পাঠক দেখিতে পাইবেন ব্রিটিশ রাজ আপন সত্তা বজায় রাখার জন্য কতদূর পর্যন্ত যাইতে পারে, কি অমানুষিক কার্য করিতে পারে। এই রিপোর্টের একটি কথাও আমার জানা মতে আজ তক্ মিথ্যা প্রমাণিত হয় নাই।

৩৬

খিলাফতের বদলে গো-রক্ষা

পঞ্জাবের হত্যাকাণ্ডের কথা কিছু সময়ের জন্য ছাড়িয়া যাইতেছি।

কংগ্রেসের পক্ষ হইতে পঞ্জাবের ডায়রশাহীর বিষয়ে সবে তদন্ত আরম্ভ হইয়াছে ত দিল্লীতে হিন্দু-মুসলমানের মিলিত এক সভায় উপস্থিত হওয়ার আমন্ত্রণ পাইলাম। পত্রের স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে স্ব. হকীম সাহেব ও ভাই আসফ আলীর নামও ছিল। স্ব. শ্রদ্ধানন্দজী সভায় আসিবেন এ কথার উল্লেখ পত্রে ছিল এবং আমার যেন মনে পড়ে, সভার তিনি উপ-সভাপতি হইবেন এ কথাও ছিল। যতটা মনে পড়ে, সভার কাল ছিল নভেম্বর। সভার আলোচ্য বিষয় ছিল: খিলাফতের প্রশ্নে উদ্ভূত পরিস্থিতির আলোচনা ও যুদ্ধ-শান্তি উৎসবে হিন্দু ও মুসলমানেরা যোগ দিবে কিনা তার বিবেচনা। পত্রে আরও বলা হইয়াছিল যে, খিলাফতের প্রশ্ন ছাড়া গো-রক্ষার কথাও সভায় আলোচনা করা হইবে অতএব গো-রক্ষা প্রশ্নের সমাধান-চেষ্টার উত্তম সুযোগ মিলিবে। ওই প্রসঙ্গে গো-রক্ষার উল্লেখ আমার কাছে ভাল লাগে নাই। আমন্ত্রণ-পত্রের উত্তরে জানাইয়াছিলাম যে সভায় যাইতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিব এবং লিখিয়াছিলাম যে খিলাফতের ও গো-রক্ষার কথা একত্র করিয়া এই দুইকে দর-কষাকষির ব্যাপার করা সঙ্গত হইবে না; পৃথক্‌ভাবে এই দুইয়ের প্রয়োজনীয়তাকে বিবেচনা করা কর্তব্য।

সভায় যোগ দেই। সভায় বেশ লোক আসিয়াছিল। অবশ্য পরে হাজারো জনতার যে ভিড় সভায় দেখা যাইত তেমনটা কিছু ও-সভা ছিল না। সভায় শ্রদ্ধানন্দজী উপস্থিত ছিলেন। তাঁকে আমি ওই প্রশ্ন

সম্পর্কে আমার মনের ভাব জানাই। আমার কথা তাঁর ভাল লাগে এবং আমাকেই বিষয়টা তুলিতে বলেন। হকীম সাহেবের সহিত আলোচনা করিয়া লইয়াছিলাম। সভায় কথাটা এভাবে ধরিয়াছিলাম: খিলাফতের প্রশ্ন যদি যুক্তিসহ ও ন্যায়সঙ্গত হয়—আমি তাই মনে করি—এবং ব্রিটিশ সরকার যদি এ ক্ষেত্রে ঘোর অন্যায় করিয়া থাকে তবে মুসলমানদের সহিত হিন্দুদের যোগ দেওয়া কর্তব্য, এবং উহার সহিত গো-রক্ষার কথা জোড়া উচিত নহে। এরূপ শর্ত করা হিন্দুদের অশোভন হইবে। খিলাফতের প্রশ্নে সহায়তা পাওয়ার বদলে মুসলমানেরা গো-বধ বন্ধ করে ত তাও তাদের পক্ষে শোভন হইবে না। পড়শী বলিয়া, একই ভূমিতে একত্র থাকে বলিয়া, হিন্দুদের মনের দিকে চাহিয়া কর্তব্যবোধে আলাদা ভাবে গো-বধ বন্ধ করে ত তারা মহান্ কর্ম করিবে। ইহা পৃথক্ প্রশ্ন; ইহা তাদের কর্তব্য। ইহা কর্তব্য হয় ত আর তারা কর্তব্য মনে করে ত হিন্দুরা খিলাফতের প্রশ্নে সহায়তা করুক বা না করুক মুসলমানের গো-বধ বন্ধ করা উচিত। তাহাই যদি হয় তবে এই দুই প্রশ্নের বিচার পৃথক্‌ভাবে করা কর্তব্য, অতএব সভায় কেবল খিলাফতের প্রশ্নই আলোচনা করা হোক এ কথা আমি বলি। আমার যুক্তি সভার ভাল লাগে, সুতরাং গো-রক্ষার প্রশ্ন সভায় আলোচিত হয় নাই।

কিন্তু এভাবে সাবধান করিয়া দিলেও মৌলনা আবদুল বারী সাহেব বলেন, হিন্দুরা খিলাফতে সহায়তা করুক বা নাই করুক একই ভূমির লোক বলে হিন্দুর মনের দিকে চাহিয়া মুসলমানদের গো-বধ বন্ধ করা কর্তব্য। এক সময়ে মনে হইয়াছিল, মুসলমানেরা সত্যই গো-বধ বন্ধ করিবে।

পঞ্জাবের প্রশ্নও খিলাফতের সহিত জুড়িয়া দেওয়ার প্রস্তাব কেউ কেউ করিয়াছিল। আমি ওই প্রস্তাবের বিরোধ করিয়াছিলাম। পঞ্জাবের প্রশ্ন স্থানীয় প্রশ্ন, তা সাম্রাজ্যের শান্তি-উৎসবের প্রশ্নের সহিত জোড়া যায় না; স্থানীয় প্রশ্নের সহিত খিলাফতের প্রশ্নের জগাখিচুড়ি করিলে অত্যন্ত অবিবেচনার কাজ হইবে। আমার যুক্তি সকলের ভাল লাগে।

সভায় মৌলনা হসরত মোহানী উপস্থিত ছিলেন। তাঁর সহিত আগেই আমার পরিচয় ছিল। কিন্তু তিনি যে কিরূপ লড়িয়ে ছিলেন তা'র পরিচয় এই সভায় আমি পাই। এখানে আমাদের মতভেদের শুরু হয়, আর অনেক বিষয়ে তা শেষ অবধি ছিল।

নানা প্রস্তাবের একটা ছিল : হিন্দু-মুসলমান সকলের স্বদেশী ব্রত গ্রহণ ও বিদেশী কাপড় বর্জন। খাদির তখনও পুনর্জন্ম হয় নাই। এই প্রস্তাবে হসরত মোহানী সাহেব সায় দিতে পারিলেন না। খিলাফতের প্রতি অন্যায় করা হইলে ইংরেজ শাসনের ওপর শোধ তুলিতে তিনি স্থিরসংকল্প ছিলেন। তাই পাল্টা প্রস্তাব তুলিয়া তিনি বলিলেন যে, যতটা পারা যায় কেবল ব্রিটিশ মাল বয়কট করা হোক। কেন যে ব্রিটিশের সব মাল বয়কট করা সম্ভব নহে আর উচিতও নহে সেই যুক্তি—যে যুক্তি দেশের কাছে এখন নূতন নয়—দর্শাইয়া আমি ওই প্রস্তাবের বিরোধ করিলাম। আমার অহিংসাবৃত্তিও প্রতিপাদন করিলাম। আমার যুক্তির গভীর প্রভাব হইল। হসরত সাহেবের ভাষণকালে এমন হর্ষধ্বনি লোকে করিয়াছিল যে আমি ভাবিয়াছিলাম আমার বক্তৃতায় কেউ কানও দিবে না। কিন্তু আমার মনে হইল, আপন ধর্ম ভোলা, নিজ কর্তব্য এড়ানো ত কাজের কথা নয়। তাই উঠিলাম। আর বিস্ময়ে দেখিলাম যে সকলে আমার কথা অতীব আগ্রহে শুনিল। মঞ্চের ওপর যাঁরা ছিলেন তাঁরা আমাকে পূর্ণ সমর্থন করিলেন। পরে পরে অনেক বক্তা আমার পক্ষে বলিলেন। নেতারা বুঝিতে পাইলেন যে কেবল ব্রিটিশ মালের বয়কটে কোন উদ্দেশ্য সাধিত হইবে না, লোক হাসানো হইবে মাত্র। খুব সম্ভব সভায় এমন কোন লোক ছিল না যার অঙ্গে কোন না কোন বিলাতী দ্রব্য ছিল না। শ্রোতাদের অনেকে অনুভব করিলেন যে, যে প্রস্তাব অনুসারে তাঁরা নিজেরাই চলিতে পারিবেন না তা পাস হইলে লাভ না হইয়া হইবে অনর্থ।

'কেবলমাত্র বিদেশী বস্ত্রের বয়কটে কোনই লাভ হবে না। কে জানে কবে আমাদের আবশ্যক কাপড় দেশে তৈরী হবে আর তার দরুন বিদেশী বস্ত্রের বয়কট সফল হবে? অবিলম্বে ব্রিটিশের গায়ে আঁচ লাগবে এমন কিছু আমাদের চাই। আপনার বিদেশী বস্ত্রের বয়কট থাকে থাকুক, তদুপরি আমাদের আশু কার্যকরী কিছু দিন'— মৌলনা হসরত মোহানী বস্তুত এ কথাই বলিয়াছিলেন। তাঁর ভাষণ শুনিতে শুনিতে আমার মনে হয় যে বিদেশী বস্ত্রের বয়কটের অতিরিক্ত কিছু করা আবশ্যক। বিদেশী বস্ত্রের বয়কট যে রাতারাতি হইবে না এ কথা আমার কাছেও সুস্পষ্ট ছিল। আজিকার মতন তখন আমি জানিতাম না যে আমাদের বস্ত্রের অভাব আমরা খাদি দিয়া মিটাইতে পারি। আমি জানিতাম যে দেশী মিলের

ভরসা করিলে তারা আমাদের ঠকাইবে। কি করা যায় এই কথা যখন ভাবিতেছিলাম হসরত সাহেবের ভাষণ শেষ হয়।

হিন্দী বা উর্দু শব্দ আমার ঠিক ঠিক যোগাইতেছিল না। উত্তর ভারতের মুসলমানদের খাস সভায় যুক্তিপ্রধান বক্তৃতা করার ওই ছিল আমার প্রথম পালা। কলিকাতায় মুশ্লিম লীগের বৈঠকে আমি উর্দুতে বলিয়াছিলাম কিন্তু তা ছিল মিনিট কয়েকের হৃদয় স্পর্শ করার আবেদন। আর এখানে ছিল ঠিক বিরোধী না হইলেও সমালোচক শ্রোতৃমণ্ডলীকে স্বমতে আনার প্রশ্ন। কিন্তু সংকোচ ও লজ্জা দূর করিলাম। দিল্লীর মুসলমানদের সামনে শুদ্ধ চোস্ত উর্দুতে ভাষণ দেওয়ার কাজ আমার ছিল না, আমার কাজ ছিল সাধ্যে যতটা কুলায় ততটা স্পষ্ট করিয়া আমার কথা তাদের সামনে আমার টুটাফুটা হিন্দীতে বলা। আর ও কাজটা আমি উত্তমরূপেই করিয়াছিলাম। এই সভায় আমি বুঝিতে পাই যে হিন্দী-উর্দুই মাত্র আমাদের রাষ্ট্রভাষা হইতে পারে। আমি যদি ইংরাজীতে ভাষণ দিতাম তবে আমার কথার যে প্রভাব হইয়াছিল তা হইত না, আর যে চ্যালেঞ্জ মৌলনা সাহেব দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন সে চ্যালেঞ্জ তাঁর দিতে হইত না। আর ওই চ্যালেঞ্জের ঠিক জবাবও আমি দিতে পারিতাম না।

যে নূতন ভাব মনে উঁকিঝুঁকি মারিতেছিল তা প্রকাশের শব্দ হিন্দী কি উর্দুতে * জুটিতেছিল না বলিয়া একটু অপ্রস্তুত বোধ করিতেছিলাম। শেষটায় 'নন-কোঅপারেশন' শব্দ মিলিয়া গেল। মৌলনার ভাষণ শুনিতে শুনিতে মনে হইল, যে সরকারের সহিত নানা বিষয়ে তিনি সহযোগিতা করিতেছেন সেই সরকারের বিরোধ করার কথা মুখেরই কথা; বিনা তরবারিতে বিরোধ করিতে হয় ত সহযোগিতা না করাই সেই পথ। আর ওই প্রসঙ্গেই 'নন-কোঅপারেশন' শব্দ আমার মুখ হইতে প্রথম বাহির হয়। এই শব্দের নানা দিক্ ও নানা তাৎপর্যের সুস্পষ্ট ধারণা তখন আমার ছিল না। তাই উহার খুঁটিনাটিতে না গিয়া ইহাই মাত্র আমি বলিয়াছিলাম :

'মুসলমান বন্ধুরা আর এক গুরুগম্ভীর প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন। ভগবান না করুন, সন্ধির শর্ত যদি তাঁদের প্রতিকূলে যায় তবে তাঁরা সরকারের সহিত সব রকম সহযোগিতা ছিন্ন করবেন। এরূপ অসহযোগিতা লোকের স্বভাব-

* মূলে 'উর্দু' শব্দের জায়গায় 'গুজরাটী' শব্দ রহিয়াছে। ইংরেজী অধিক প্রামাণিক বিধায় মূল পুস্তকে ইংরেজী পাঠ অনুসৃত হইল। 'অনুবাদের কথায়' দ্রষ্টব্য।

প্রাপ্ত অধিকার। গবর্নমেণ্টের দেওয়া খেতাব ও সম্মান রাখতে, সরকারী নোকরি করতে আমরা বাধ্য নই। খিলাফতের মত গুরু প্রশ্নে গবর্নমেণ্ট যদি আমাদের সহিত দাগাবাজি করে ত অসহযোগিতা ছাড়া আমাদের পথ থাকবে না। অতএব গবর্নমেণ্ট বিশ্বাসঘাতকতা করলে অসহযোগ করার অধিকার আমাদের আছে।'

কিন্তু এর পরে 'নন-কোঅপারেশন' শব্দের চলতি হইতে কয়েক মাস কাটিয়া যায়। তখনকার মত উহা সম্মেলনের কার্যবিবরণীতেই চাপা পড়িয়া থাকে। এক মাস পরে অমৃতসর কংগ্রেসে আমি যখন অসহযোগ প্রস্তাব সমর্থন করিয়াছিলাম তখনও আমার আশা ছিল যে হিন্দু-মুসলমানদের অসহযোগ করার হেতু ঘটিবে না।

৩৭

অমৃতসর কংগ্রেস

ফৌজী আইনের দিনে নামত আদালতে নাম মাত্র প্রমাণে শতশত নির্দোষ পঞ্জাবীকে কম বা বেশী দিনের জন্য জেলে পোরা হইয়াছিল। এই নিছক অন্যায়ের বিরুদ্ধে চারিদিক হইতে এরূপ প্রতিবাদ হয় যে সরকার কয়েদীদের ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হয়। কংগ্রেসের পূর্বেই অধিকাংশ বন্দী মুক্তি পায়। লালা হরকিশনলাল ও অন্য নেতারা কংগ্রেসের অধিবেশনের সময়ে জেল হইতে বাহির হন। আলী ভাইয়েরা জেল হইতে সোজা কংগ্রেসে যোগ দেন। লোকের আনন্দের সীমা ছিল না। যে ব্যক্তি নিজের বিরাট্ পসার উপেক্ষা করিয়া পঞ্জাবে থাকিয়া পঞ্জাবের মস্ত সেবা করিয়াছিলেন সেই পণ্ডিত মোতিলাল কংগ্রেসের সভাপতি হইয়াছিলেন। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন স্বামী শ্রদ্ধানন্দজী। ছোট্ট হিন্দী বক্তৃতার মারফতে হিন্দীর ওকালতি করা ও উপনিবেশবাসী ভারতীয়দের সমস্যা মহাসভার সামনে ধরা—এই ছিল এতকাল কংগ্রেস অধিবেশনে আমার কাজ। অমৃতসর কংগ্রেসে এর বেশি আমার করিতে হইবে এ কথা স্বপ্নেও আমি ভাবি নাই। কিন্তু আমার বেলায় পূর্বে বার বার যা ঘটিয়াছে এখানেও তা ঘটিল—দায়িত্ব আসিয়া হঠাৎ মাথায় চাপিল।

নূতন শাসন সংস্কার বিষয়ে সম্রাটের ঘোষণা তখন সদ্য প্রকাশ

হইয়াছিল। আমার মতেও উহা পুরা সন্তোষজনক ছিল না। অন্যদের ত তা একেবারেই অপছন্দ ছিল। কিন্তু তখন আমার মনে হইয়াছিল যে ওই ঘোষণায় সংস্কারের যে কথা ছিল তা স্বীকার করিয়া লওয়া যাইতে পারে। সম্রাটের ঘোষণায় ও উহার ভাষায় আমি যেন লর্ড সিংহের হাত দেখিতে পাইয়াছিলাম। আর তাতে আমার মনে ক্ষীণ আশার সঞ্চার হইয়াছিল। কিন্তু পরলোকগত লোকমান্য ও দেশবন্ধু প্রভৃতি প্রবীণ ব্যক্তিরা মাথা নাড়িয়াছিলেন। পণ্ডিত মালব্যজী নিরপেক্ষ ছিলেন।

মালব্যজী তাঁর কুটিরে আমায় ঠাঁই দিয়াছিলেন। হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপনাকালে তাঁর সাদাসিধা চলনের আভাস আমি পাইয়াছিলাম। কিন্তু এখানে তাঁর কুটিরে তাঁর সঙ্গে থাকার ফলে তাঁর দিনচর্যার খুঁটিনাটি দেখিবার সুযোগ আমার হইয়াছিল। তা দেখিয়া অবাক্ হইয়াছিলাম আর আনন্দও আমার হইয়াছিল। তাঁর ঘর ঘর ছিল না, হইয়াছিল ধর্মশালা। এখানে-ওখানে সর্বত্র লোক, এদিক হইতে ওদিক যাওয়ার যো ছিল না। যে কোন সময় যে কোন লোক আসিত আর যতক্ষণ ইচ্ছা তাঁর সহিত কথা বলিত। এই নেহাত অন্ধকার কুঠরির এক কোণে মহা গৌরবে ছিল আমার দরবার মানে চারপায়া।

কিন্তু মালব্যজীর চালচলনের কথা আর অধিক বলার অবকাশ এই প্রকরণে নাই। আসল কথায় ফিরিয়া যাই।

মালব্যজীর সহিত আলোচনা করার সুযোগ প্রতিদিন আমি পাইতাম। বড় ভাইয়ের স্নেহে তিনি বিভিন্ন পক্ষের মতামতের কথা আমাকে বলিতেন। আমার মনে হইল সংস্কার সম্পর্কীয় প্রস্তাব বিষয়ে আমার উদাসীন থাকা উচিত নয়। পঞ্জাবের নির্যাতনের কংগ্রেসী রিপোর্ট তৈরীর ব্যাপারে আমার হাত ছিল। সুতরাং সেই সম্পর্কে আমার আরও কিছু কাজ করার ছিল। পঞ্জাবের কথায় সরকারের সহিত কথাবার্তার প্রয়োজনও ছিল। খিলাফতের প্রশ্ন ত ছিলই, তা ছাড়া আমি মনে করিয়াছিলাম যে মণ্টেগু সাহেব ভারতের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিবেন না অথবা হইতে দিবেন না। বন্দীদের তথা আলী ভাইদের মুক্তিতে আমার মনে হইয়াছিল শুভের ইঙ্গিত রহিয়াছে। তাই আমার মনে হইয়াছিল যে সংস্কার বিষয়ক প্রস্তাব পাস হওয়া উচিত। অন্য দিকে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের দৃঢ় মত ছিল যে সংস্কারের পক্ষে কিছুই বলার নাই

আর তাই তা অগ্রাহ্য করা উচিত। পরলোকগত লোকমান্য কতকটা নিরপেক্ষ ছিলেন। তবে তিনি ঠিক করিয়াছিলেন যে যে প্রস্তাবের পক্ষে দেশবন্ধু যাইবেন সে প্রস্তাবই তিনি সমর্থন করিবেন।

এইরূপ বিচক্ষণ পরীক্ষিত সর্বমান্য লোকনায়কদের সহিত মতভেদ হওয়ায় আমি অতিশয় পীড়া বোধ করিতেছিলাম। অন্য দিকে বিবেকের নির্দেশ আমি স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছিলাম। কংগ্রেস অধিবেশন হইতে সরিয়া থাকার চেষ্টা করিলাম : পণ্ডিত মালব্যজী ও মোতিলালজীকে বলিলাম যে বাকী কয়দিন কংগ্রেসের অধিবেশনে না যাই ত সব দিক রক্ষা হইবে এবং পূজ্য নেতাদের প্রকাশ্যে বিরোধ করার দায় হইতে আমি বাঁচিয়া যাইব।

আমার কথায় এই গুরুজনেরা কান দিলেন না। আমার এইরূপ ভাবের কথা জানি না লালা হরকিশনলাল কার কাছে শুনিয়াছিলেন। তিনি আসিয়া বলিলেন, 'তা হতেই পারে না। পঞ্জাবীদের মনে এতে ভীষণ লাগবে।' লোকমান্য, দেশবন্ধু ও মি. জিন্নার সহিত এই বিষয়ে কথা বলিলাম। কিন্তু কোন উপায় বাহির হইল না। অবশেষে আমার বেদনা মালব্যজীকে জানাইলাম, বলিলাম, 'মিটমাটের কোন সম্ভাবনা দেখছি না। প্রস্তাব যদি আমার উপস্থিতই করতে হয় তবে কংগ্রেসের মতও নির্ধারণ করতে হবে। এখানে তার কোন ব্যবস্থাই নাই। এতকাল ভরা সভায় আমরা হাত তুলতে বলে এসেছি। হাত তোলার সময় দর্শক ও সদস্যে কোন ব্যবধান থাকে না। এরূপ বিশাল সভায় ভোট গণনার কোনই ব্যবস্থা আমাদের নাই। তাই যদি আমার প্রস্তাবের পক্ষে ভোট নিতে হয় ত সেই সুবিধা এখানে কোথায়?' লালা হরকিশনলাল এই অসুবিধা দূর করার ভার লইলেন। তিনি বলিলেন, 'ভোটের দিন দর্শকদের সভায় আসতে দেওয়া হবে না। কেবল সভ্যেরা প্রবেশ করতে পাবে। আর ভোট গণনার ভার আমি নিজে নেব। কংগ্রেসে অনুপস্থিত হওয়া আপনার চলবে না।' এই শর্তে রাজী হইলাম।

প্রস্তাব মুসাবিদা করিলাম, অস্বস্তিভরা অন্তরে তা উপস্থিত করিতে প্রস্তুত হইলাম। ঠিক হইল পণ্ডিত মালব্যজী ও মি. জিন্না প্রস্তাব সমর্থন করিবেন। আমি লক্ষ্য করিলাম যে আমাদের মতভেদে কোন তিক্ততা না থাকিলেও, বক্তাদের বক্তৃতায় নিছক যুক্তি ছাড়া অন্য কিছু না থাকিলেও, সেরেফ

মতভেদটাই সভার কাছে বিশ্রী লাগিতেছিল, নেতাদের মতভেদ তাদের পীড়ার বস্তু হইয়াছিল ; সভা চাহিতেছিল এক মত।

ভাষণ যখন চলিতেছিল মঞ্চে তখনও ব্যবধান ঘুচানোর চেষ্টা চলিতেছিল, এক হাত হইতে অন্য হাতে চিরকুটের লেনদেন চলিতেছিল। মালব্যজী মিটমাটের সর্বপ্রকার চেষ্টা করিতেছিলেন। এর মধ্যে জয়রামদাস আমার হাতে তাঁর সংশোধনী প্রস্তাব দিলেন এবং তাঁর স্বভাবসুলভ মিষ্ট কথায় সভ্যদের ভোট দেওয়ার সংকট হইতে বাঁচাইতে আমায় অনুরোধ করিলেন। তাঁর সংশোধনী প্রস্তাব আমার ভাল লাগিল। কোথায় আশার আলো মিলিবে এই জন্য মালব্যজীর চোখ চারিদিকে ফিরিতেছিল। তাঁকে আমি বলিলাম যে আমার মনে হয় দুই পক্ষেরই এই প্রস্তাব পছন্দ হইবে। পরে লোকমান্যকে প্রস্তাবটা দেখাইলে তিনি বলিলেন, 'সি. আর. দাসের পছন্দ হলে আমি আপত্তি করব না।' অবশেষে দেশবন্ধু নরম হইলেন। 'স্বীকার করা চলে, কি বলো ?'—এরূপ দৃষ্টিতে তিনি শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পালের দিকে তাকাইলেন। মালব্যজীর অন্তরে আশার সঞ্চার হইল। সংশোধনী প্রস্তাবটা তিনি ছিনাইয়া লইলেন এবং দেশবন্ধু নিঃসংশয় 'হাঁ' শব্দ উচ্চারণ করার পূর্বেই বলিয়া উঠিলেন, 'সহ-প্রতিনিধিবর্গ, আপনারা জেনে খুশী হবেন যে মিটমাট হয়ে গেছে।' এই কথায় যা ঘটিল তা বর্ণনার অতীত। মণ্ডপ হাততালিতে বিদীর্ণ হইল ; শ্রোতাদের মলিন মুখমণ্ডলে হাসির রেখা দেখা দিল।

এই প্রস্তাবের খসড়া এখানে ধরা অনাবশ্যক। যে প্রয়োগের কথা আমি এই লেখার মাধ্যমে লোকের সামনে ধরিয়াছি সেই প্রয়োগের অঙ্গরূপেই এই প্রস্তাব আমি উপস্থিত করিয়াছিলাম।

মিটমাটে আমার দায়িত্ব আরও বাড়িয়া গেল।

৩৮

কংগ্রেসে প্রবেশ

অমৃতসরে সাক্ষাৎভাবে আমি কংগ্রেসের ব্যাপারে ভাগ লই। বস্তুত ইহাকেই কংগ্রেস রাজনীতিতে আমার প্রবেশ বলিতে হইবে। এর আগে কংগ্রেসে যাইতাম ত যাইতাম সেরেফ আনুগত্য প্রদর্শনের জন্য। সিপাহীর

কাজ ছাড়া কংগ্রেসে আমার কিছু করার আছে এই ভাব হইতে পূর্বেকার কোন কংগ্রেসে আমি যাই নাই; অমন ভাবও আমার মনে উঁকি মারে নাই।

অমৃতসরের অনুভব হইতে আমি দেখিতে পাই যে আমাতে এরূপ দুই-একটি শক্তি আছে যা কংগ্রেসের কাজে লাগিতে পারে। আমার পঞ্জাব তদন্তের কাজ দেখিয়া যে লোকমান্য, মালব্যজী, মোতিলালজী, দেশবন্ধু প্রভৃতি নেতারা সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন তা আমি বুঝিতে পাই। তাঁরা আমাকে তাঁদের বৈঠকে বা আলোচনায় ডাকিতেন। আমি লক্ষ্য করিয়াছিলাম যে এইরূপ বৈঠকেই বিষয় নির্বাচনের আসল কাজ হইত। নেতাদের নেহাত বিশ্বাসভাজন ও সহায়ক লোকদেরই কেবল এই সব বৈঠকে ডাকা হইত। অবশ্য ছলছুতার আশ্রয়েও কিছু লোক ঢুকিয়া যাইত।

আগামী বছরের কর্তব্য কর্মের দুইটি দিকে আমার ঝোঁক ছিল। আর তার যোগ্যতাও কিছুটা ছিল। জালিনওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের স্মৃতি-রক্ষা তার একটি ছিল। কংগ্রেসে পরম উৎসাহে এই বিষয়ে প্রস্তাব পাস হইয়াছিল; তার জন্য লাখ পাঁচেক টাকা তোলার ছিল। ওই ভাণ্ডারের আমি একজন অছি হইলাম। দশের কাজের জন্য টাকা তোলার ব্যাপারে মালব্যজী যে ভিখারী-শিরোমণি ছিলেন তা আমি জানিতাম। কিন্তু এও আমি জানিতাম যে ও বিষয়ে আমি তাঁর খুব পিছনে নহি। আমার এই শক্তির পরিচয় আমি দক্ষিণ আফ্রিকায় পাইয়াছিলাম। দেশের রাজা-মহারাজাদের কাছ হইতে লাখো টাকা চাঁদা আদায় করার জাদুশক্তি আমার তখনও ছিল না আর আজও নাই। এই দিকে মালব্যজীর সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে এমন লোক আমি দেখি না। জালিনওয়ালাবাগ স্মৃতির জন্য রাজামহারাজাদের কাছে হাত পাতিয়া লাভ নাই এ কথা আমি জানিতাম। তাই অছি হইতে স্বীকার করার সময়েই আমি বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে স্মৃতি তহবিলের টাকা তোলার বোঝা মুখ্যত আমাকেই বহিতে হইবে আর হইলও তাহাই। এই স্মৃতি তহবিলে বোম্বাইর উদার শহরবাসীরা দরাজ হাতে টাকা দিয়াছিলেন। অছি মণ্ডলের নামে আজ বেশ মোটা টাকা ব্যাঙ্কে জমা রহিয়াছে। হিন্দু-মুসলমান-শিখের মিলিত রক্তধারায় যে ভূমি পবিত্র হইয়াছিল সেই ভূমিতে কি রকম স্মৃতি নির্মাণ হইবে তা এক কঠিন প্রশ্ন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই তিনের—দুইয়ের

বলাই ঠিক হইবে—মধ্যে বন্ধুত্বের বদলে শত্রুতা ভাবই মাথা চাড়া দিয়া উঠিয়াছে, আর দেশ ভাবিয়া পাইতেছে না এই স্মৃতিভাণ্ডারের টাকার সদ্ব্যবহার করার উপায় কি।

আমার অন্য এক শক্তির, মুসাবিদা করার শক্তির, ব্যবহার কংগ্রেস করিতে পারিত। কি ভাবে, কত কম কথায় ভদ্রভাবে বক্তব্য প্রকাশ করিতে হয় বহু দিনের অভ্যাসের ফলে তাতে আমি নিপুণ হইয়াছিলাম এ কথা নেতারা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। যে বিধান অনুসারে তখন কংগ্রেস চলিত তা গোখেল দিয়া গিয়াছিলেন। গুটিকয়েক নিয়ম তিনি রচনা করিয়া দেন। উহার রচনার রোচক কাহিনী তাঁর কাছেই শুনিয়াছিলাম। ওই বিধান দিয়াই কংগ্রেসের কাজ চলিত। কিন্তু সকলেই ওই সময়ে বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে উহা দ্বারা আর কংগ্রেসের কাজ চলিতে পারে না। প্রশ্নটা প্রতি বছর কংগ্রেসে উঠিত। দুই অধিবেশনের মধ্যকার মামুলী কাজের জন্য অথবা কোন জরুরী বিষয় উপস্থিত হইলে সেই সম্পর্কে আবশ্যক ব্যবস্থা করার মত কোন তন্ত্র ছিল না। সেক্রেটারী তিন জন ছিলেন। বস্তুত কাজের দায় বহিতেন একজন আর তাতেও তিনি তাঁর সব সময় দিতেন না। একা তিনি আপিস চালাইবেন, না ভবিষ্যতের কথা ভাবিবেন, না অতীতে যে কাজ হাতে নেওয়া হইয়াছে তাকে কার্যে রূপ দিবেন, এই ছিল অবস্থা। তাই ওই বছর বিধানের প্রশ্ন জরুরী হইয়া উঠিয়াছিল। কংগ্রেস ছিল হাজারো লোকের হাট। দেশ-দশের কথা আলোচনার সুযোগ সেখানে ছিল না। প্রতিনিধির সীমা বাঁধা ছিল না। যে প্রদেশ যত খুশী প্রতিনিধি পাঠাইতে পারিত। যে কেউ প্রতিনিধি হইতে পারিত। ওই হাটুরে অবস্থার অন্ত হওয়া যে একান্ত প্রয়োজন সকলেই তা অনুভব করিতেছিল।

বিধান রচনা করিয়া দেওয়ার ভার এক শর্তে আমি লই। লোকমান্য ও দেশবন্ধু এই দুই নেতার প্রভাব লোকের ওপর অধিক ছিল। তাই জনমতের প্রতিনিধিরূপে আমি তাঁদের বিধান-রচনা কমিটীতে থাকিতে অনুরোধ করি। কিন্তু ইহাও বুঝিতে পাই যে তাঁদের পক্ষে কমিটীতে কাজ করা সম্ভব নহে সুতরাং কমিটীতে তাঁদের প্রতিনিধি দিতে অনুরোধ করিয়া বলি যে কমিটীর সদস্যসংখ্যা যেন তিনের বেশি না হয়। আমার প্রস্তাবে তাঁরা রাজী হন। লোকমান্য তাঁর বদলি দেন কেলকরকে আর দেশবন্ধু দেন শ্রী আই. বি. সেনকে। একদিনও কমিটীর একত্র বসার অবকাশ হয়

নাই, কিন্তু পত্রে পরস্পরের সহিত আমাদের আলোচনা চলিত, এবং অন্তে একমতে আমরা আমাদের রিপোর্ট পেশ করিয়াছিলাম। এই বিধানের জন্য আমি একটু গর্ব অনুভব করি। আমার বিশ্বাস, এই বিধানমত কাজ হইলে সেই কাজের সূত্রেই আমরা আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছিয়া যাইব। সে যা-ই হোক, এই দায়িত্ব গ্রহণ করাতে কংগ্রেসে আমার সত্যকার প্রবেশ ঘটিয়াছে এ কথা আমি মনে করি।

৩৯

খাদির জন্ম

ভারতবর্ষের দিন দিন বাড়তি গরিবি চরকার দৌলতে মিটিতে পারে এই কথা ১৯০৮ সনে 'হিন্দ স্বরাজ'-এ আমি লিখিয়াছিলাম বটে কিন্তু তখন অবধি চরকা কি তাঁত চোখে দেখিয়াছিলাম বলিয়া আমার মনে পড়ে না। আর এ কথা কে না জানে যে, যে পথে অনাহারের মৃত্যু দূর হইবে সেই পথেই স্বরাজ আসিবে। ১৯১৫ সনে দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে যখন ফিরিয়া আসি তখনও জানিতাম না চরকা কিরূপ। সত্যাগ্রহ আশ্রম খোলা হইল ত তাতে তাঁত বসিল। কিন্তু মুশকিল হইল তা শিখায় কে! তাঁত বসাইলেই ত চলে না, আমরা জানিতাম কলম চালাইতে নয় ত ব্যবসা করিতে, হাতের কাজে সকলেই ছিলাম দিগ্‌গজ। তাই বুনন শেখানোর কারিগর দরকার হইল। খোজাখুঁজির পরে পালানপুর হইতে এক বুনকর আনা হইল: কিন্তু বোনার সবটা বিদ্যা সে আমাদের দিত না। মগনলাল গান্ধী কোন কাজে হাত দিলে সহজে ছাড়িত না। হাতের কাজে তার সহজ পটুতাও ছিল। অল্প সময় মধ্যে বোনার খুঁটিনাটি সে পুরাপুরি শিখিয়া লইল আর একে একে কয়েকজন নূতন বুনিয়ে আশ্রমে সৃষ্টি হইল।

আমাদের লক্ষ্য হইল, নিজেদের কাপড় নিজেরা তৈরি করিয়া লইব। অতএব মিলের কাপড় পরা ছাড়িয়া হাত-তাঁতে দেশী সুতায় বোনা কাপড় পরা সাব্যস্ত হইল। এর ফলে নানা দিকে আমাদের জ্ঞান বাড়ে। জানিতে পাই তাঁতীদের জীবনের কথা, তাদের রুজি-রোজগারের কথা, সুতা যোগাড় করিতে যে কষ্ট তাদের ভুগিতে ও যে রকম ঠকিতে হয় সেই

কথা, আর কাজের বোঝা তাদের দিন দিন কিরূপ ভারি হইতেছে সেই কথা। নিজেদের সব কাপড় তখনই বুনিয়া লওয়ার মত ব্যবস্থা ছিল না। তাই বাকী কাপড় বাইরের তাঁতীদের দিয়া বুনাইয়া লওয়া হইত। কারণ দেশী মিলের স্থতায় তাঁতে বোনা কাপড় সব সময় বাজারে অথবা তাঁতীর কাছে পাওয়া যাইত না। তাঁতীরা বিলাতী স্থতায় মিহি কাপড় বুনিত তার কারণ দেশী মিলে তখন মিহি স্থতা হইত না। আজও খুব মিহি স্থতা হয় না। অনেক সাধ্যসাধনায় কয়েকজন তাঁতীকে কাপড় বুনিয়া নিতে রাজী করানো গিয়াছিল, এই শর্তে যে যত কাপড় তারা বুনিবে তার সবটা আমরা কিনিয়া লইব। এইভাবে তৈরি কাপড় আমরা নিজেরা পরিতাম ও বন্ধুদের গছাইতাম। তার অর্থ আমরা মিলের বিনা কমিশনের এজেন্ট হইলাম। আর তার ফলে মিলের সম্পর্কে আমরা আসি এবং মিলের ব্যবস্থাদির ও যে সব অস্থবিধার মধ্যে মিলের কাজ করিতে হয় তা জানিতে পাই। দেখিতে পাই যে মিলে যত স্থতা হয়, পারে ত তার সবটা স্থতা দিয়া তারা কাপড় বুনিয়া লয়। তাঁতকে সহায়তা করার জন্য স্থতা বেচিত না, বেচিত না বেচিলে নয় বলিয়া। এই সব দেখিয়া-শুনিয়া নিজেদের হাতে স্থতা কাটার জন্য আমরা ব্যস্ত হইয়া উঠি। বুঝিতে পাইলাম যে স্থতা যতদিন না কাটিব ততদিন অন্যের অধীন থাকিব। মিলের এজেন্ট হওয়া যে দেশসেবা নয় এই বোধ আমাদের ছিল।

কিন্তু দর্শন না মিলিতেছিল চরকার, না কাটুনীর। আশ্রমে নলীতে স্থতা ভরার চরকি ছিল। তাতে একটু হেরফের করিলে যে স্থতা কাটা যায় সে কথা আমাদের জানা ছিল না। উকিল কালিদাস ঝবেরি একদিন আসিয়া বলেন যে তিনি এক কাটুনীর সন্ধান পাইয়াছেন; স্থতা কাটা সে শিখাইতে পারে। নূতন কাজ চট্ করিয়া ধরিয়া লইতে পারে আশ্রমের এমন এক জনকে ওই কাটুনীর কাছে পাঠাইলাম। কিন্তু স্থতা কাটার কৌশল সে আয়ত্ত করিতে পারিল না।

সময় বাহিয়া চলিল। আমার অধীরতা বাড়িতে লাগিল। খোঁজ-খবর রাখে এমন লোক আশ্রমে আসিলে তাকে চরকার কথা জিজ্ঞাসা করিতাম। কিন্তু স্থতাকাটা নেহাতই স্ত্রীলোকের ব্যাপার ছিল এবং কাটুনী প্রায় লোপ পাইয়াছিল বলিয়া কোন্ কোণায় এক আধজন কাটুনী তখনও ছিল সেই খবর স্ত্রীলোকের পক্ষেই কেবল দেওয়া সম্ভব ছিল।

গুজরাটী বন্ধুরা ১৯১৭ সনে আমাকে ভরোচ শিক্ষা-সম্মেলনে ধরিয়া লইয়া যান। মহাসাহসী বিধবা গঙ্গাবাইয়ের দেখা সেখানে আমি পাই। লেখাপড়া তেমন তিনি জানিতেন না। লেখাপড়া জানা মেয়েদের মধ্যে সাধারণত যে সাহস ও সাধারণ জ্ঞান দেখা যায় তা অপেক্ষা তাঁর সাহস ও সাধারণ জ্ঞান ঢের বেশি ছিল। অস্পৃশ্যতা হইতে তিনি একেবারে মুক্ত হইয়াছিলেন, প্রকাশ্যে তিনি অন্ত্যজদের সহিত মিলিতেন, তাদের সেবা করিতেন। কিছু সংগতি তাঁর ছিল। কিন্তু তাঁর নিজের চাহিদা ছিল বড় কম। তাঁর দেহ রোদ-বৃষ্টি-সহনপটু শক্তপোক্ত ছিল। বিনা সংকোচে যেখানে ইচ্ছা একাকী চলিয়া যাইতেন। প্রয়োজন হইলে ঘোড়ায়ও চড়িতেন। গোধরা পরিষদে তাঁর বিশেষ পরিচয় পাই। তাঁকে আমার দুঃখের কথা বলি আর দময়ন্তী যেমন নলের খোঁজে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছিলেন, চরকার খোঁজে তেমন ঘুরিয়া বেড়াইবার কথা দিয়া তিনি আমার বোঝা হাল্কা করেন।

৪০

মিলিল

গুজরাটে এমন জায়গা ছিল না যেখানে গঙ্গাবাই চরকার খোঁজ না করিয়াছিলেন। অবশেষে বরোদা রাজ্যের বিজাপুর-এ তিনি চরকা পান। অনেকের ঘরে চরকা ছিল, কিন্তু অকেজো বস্তু হিসাবে সে সব তোলা ছিল জঞ্জাল-খুপরিতে। গঙ্গাবাই আমাকে এই সুখবর দেন: পাঁজ যোগাইলে ও সুতা কিনিয়া লইলে কাটুনীরা সুতা কাটিতে রাজী আছে। প্রশ্ন খাড়া হইল—পাঁজ কোথা পাই। এই মুশকিলের কথা শুনিয়া স্বর্গীয় ওমর সোবানী বলেন যে তাঁর মিল হইতে তিনি পাঁজ যোগাইবেন। গঙ্গাবাইকে আমি পাঁজ পাঠাইতে লাগিলাম। সুতা-কাটাইর কাজ এত দ্রুত চলিতে লাগিল যে আমি ফাঁপরে পড়িলাম।

বন্ধু ওমর সোবানীর উদারতার অবধি ছিল না। কিন্তু ওই সুবিধা কত দিন নেওয়া যায়! পাঁজ কিনিয়া লইব এই প্রস্তাব করিতে বাধিল, আর তা ছাড়া মিলের পাঁজে সুতা কাটানোও আমার কাছে দোষের মনে হইল। মিলের পাঁজে যদি আপত্তি না থাকে তবে মিলের সুতায় আপত্তি

কেন, এই প্রশ্ন মনে উঠিল। পুরাতন যুগের লোক মিলের পাঁজ পাইত কি! তারা ত নিজেরাই পাঁজ করিয়া লইত। কি ভাবে করিত? পাঁজ করিতে পারে এমন লোকের খোঁজ করিতে গঙ্গাবাইকে লিখিলাম। সেই ভার তিনি লইলেন ও ধুনরী খুঁজিয়া বাহির করিলেন। মাসে পঁয়ত্রিশ বা আরও কিছু বেশি টাকা তাকে দিতে হইত। টাকার প্রশ্ন তখন আমার নিকট বড় ছিল না। গঙ্গাবাই বালকদের পাঁজ করানো শিখাইয়া নেন। বোম্বাইতে আমি তুলা ভিক্ষা চাহিলাম। বন্ধু যশবন্তপ্রসাদ দেশাই তুলা যোগাইবার ভার লইলেন। গঙ্গাবাই কাজ খুব বাড়াইলেন এবং কাটা সুতায় কাপড় বুনাইতে লাগিলেন। অল্প দিনে বিজাপুরের খাদির খুব নাম হইল।

এদিকে আশ্রমেও কিছু দিন মধ্যে চরকা চলিল। মগনলালের উদ্ভাবনী শক্তিতে চরকার উন্নতি হইল। চরকা ও টাকু আশ্রমে তৈরী হইতে লাগিল। আশ্রমে তৈরী প্রথম খাদি থানের পড়তা গজপ্রতি সতের আনা পড়িয়াছিল। মোটা নরম সুতায় বোনা খাদি বন্ধুদের সতের আনায় কিনিতে বলি। তাঁরা খুশীমনে কেনেন।

বোম্বাইতে আমি বিছানা লইয়াছিলাম। ওই অবস্থায়ই লোককে চরকার কথা জিজ্ঞাসা করিতাম। দুই কাটুনী ভগ্নীর সন্ধান সেখানে মিলে। এক সেরের অর্থাৎ ২৮ তোলার মজুরী তারা এক টাকা চায়। খাদির হিসাবনিকাশে তখন আমি আকাট আনাড়ী ছিলাম। পয়সা তখন আমার কথা ছিল না। আমার ছিল দরকার হাতে-কাটা সুতার ও কাটুনীর। হিসাব করিয়া দেখিতে পাইলাম, গঙ্গাবাই যে হারে দিতেন সেই হিসাবে আমি ঠকিতেছি। কাটুনীরা কমে রাজী ছিল না, তাই তাদের ছাড়িতে হয়। কিন্তু তাদের দ্বারা কাজ হইয়াছিল। শ্রীমতী অবন্তিকা বাই, শ্রীমতী রমীবাই কামদার, শঙ্করলাল ব্যাঙ্কারের পূজ্যা মাতা ও ভগ্নী শ্রীমতী বসুমতী তাদের কাছে সুতাকাটা শিখিয়া লইয়াছিলেন। আর আমার ঘরে চরকার গুঞ্জন চলিয়াছিল। এই যন্ত্র রোগী আমাকে চাঙ্গা করিয়া তুলিতে সহায় হইয়াছিল এ কথা বলিলে অতিশয়োক্তি করা হইবে না। উহার ক্রিয়া শারীরিক অপেক্ষা মানসিক অধিক ছিল এ কথা কেউ যদি বলেন ত তা মানিয়া লইতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু মানুষের সুস্থ-অসুস্থ হওয়ার প্রশ্নে মনের ক্রিয়া কি তুচ্ছ? চরকা আমিও কাটিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম। কিন্তু তখন বড় একটা অগ্রসর হইতে পারি নাই।

বোম্বাইয়ে হাতের পাঁজ পাওয়ার উপায়? শ্রীরেবাশঙ্কর ঝবেরীর বাড়ীর পাশ দিয়া এক ধুনকর প্রতিদিন পিঞ্জনের তাঁত বাজাইয়া যাইত। তাকে ডাকি। সে তোশকের তুলা ধুনিত। পাঁজের জন্য তুলা ধুনিয়া দিতে সে রাজী হইল। পয়সা বেশি চাহিল। তাতেই রাজী হইলাম। ওই পাঁজে কাটা সুতা আমি জনকয়েক বৈষ্ণব বন্ধুর কাছে বেচিয়াছিলাম—পবিত্র একাদশীতে ঠাকুরকে মালা পরাইবার জন্য তা দিয়া তাঁরা মালা তৈরী করিয়াছিলেন। শ্রীশিবজী বোম্বাইতে এক কাটুনী ক্লাস খোলেন। এই সব প্রয়োগ-পরীক্ষায় বেশ খরচ হইয়াছিল। দেশপ্রেমিক দেশভক্ত খাদি-বিশ্বাসী বন্ধুরা আগ্রহে সেই পয়সা যোগাইতেন। আমার সবিনয় কৈফিয়ত এই যে, ওই পয়সা নিষ্ফলে যায় নাই। তাহা হইতে উত্তম অভিজ্ঞতা লাভ হইয়াছে আর খাদির ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার আন্দাজও পাওয়া গিয়াছে।

এই সময়ে পুরাপুরি খদ্দর পরার জন্য আমি অধীর হইয়া উঠি। আমি তখনও মিলের ধুতি পরিতাম। আশ্রমে ও বিজাপুরে যে মোটা খদ্দর তৈরী হইত তার বহর ছিল মাত্র ত্রিশ ইঞ্চি। গঙ্গাবাইকে নোটিশ দিলাম যে মাসেক মধ্যে তিনি যদি আমাকে ৪৫" বহরের খাদি ধুতি বুনাইয়া না দেন ত বাধ্য হইয়া আমাকে হাঁটু-লম্বী, মোটা খাদিই পরিতে হইবে। ভগ্নী ব্যাকুল হইলেন; মিয়াদ তাঁর ছোট মনে হইল, কিন্তু হার মানিলেন না। মাসেক মধ্যে ৫০" বহরের এক জোড়া ধুতি তিনি পাঠাইলেন, অসুবিধায় পড়া হইতে আমায় তিনি বাঁচাইলেন।

ঠিক ওই সময়ে শ্রীলক্ষ্মীদাস লাঠী নামক জায়গা হইতে তাঁতী রামজী ও তার স্ত্রী গঙ্গাবাইকে আশ্রমে লইয়া আসে এবং তাদের দিয়া চওড়া বহরের ধুতি বোনায়। খাদির প্রচারে এই দম্পতির দান সামান্য নহে। গুজরাটের ও বাইরের অনেককে তারা খাদি বোনার কৌশল শিখাইয়াছিল। গঙ্গাবাই যখন তাঁতে বসেন লোকের মনে তখন উদ্দীপনার সঞ্চার হয়। নিজের কাজে এরূপ তন্ময় হইয়া যান যে আশপাশে কি চলিতেছে সে খেয়াল তাঁর থাকে না, তাঁত হইতে দৃষ্টি তোলার ফুরসত তার থাকে না।

৪১

কথোপকথন

খাদি-আন্দোলনের (তখন স্বদেশী আন্দোলন বলা হইত) শুরুতেই মিল-মালিকেরা টীকা-টিপ্পনী কাটিতেছিল। বন্ধু ওমর সোবানী নিজে চৌকস মিল-মালিক ছিলেন। তিনি তাঁর জানা ব্যাপারের ও অভিজ্ঞতার কথা আমাকে বলিতেন। অন্য মিল-মালিকেরা এই আন্দোলনকে কোন্ চোখে দেখে সে কথাও তিনি জানাইতেন। কোন এক মিল-মালিক তাঁকে যা বলিয়াছিলেন বন্ধু সোবানীর ওপর তার প্রভাব হইয়াছিল। তাঁর কাছে তিনি আমায় লইয়া যাইতে চাহেন। খুশী মনে যাইতে স্বীকার করি। আমরা যাই। ভদ্রলোক এই ভাবে কথা শুরু করেন :

'এর আগেও স্বদেশী আন্দোলন হয়েছে তা আপনি খুবই জানেন। নয় কি ?'

বলিলাম, 'হয়েছে, জানি।'

'বঙ্গ-ভঙ্গের সময়ে খুব জোর স্বদেশী আন্দোলন চলেছিল তা নিশ্চয় আপনার মনে আছে ? আমরা মিল-মালিকেরা তার সুবিধা খুব নিয়েছিলাম। কাপড়ের দাম চড়িয়ে দিয়েছিলাম। করা উচিত নয় এমন অনেক কাজও করেছিলাম।'

'সে সব কথা শুনেছি, ব্যথা পেয়েছি।'

'আপনার বেদনা বুঝতে পারি। কিন্তু বৃথাই এ বেদনা। পরোপকার করার জন্য আমরা ব্যবসা করতে কিছু বসি নাই। আমরা বসেছি পয়সা কামাতে। শেয়ার-হোল্ডারদের কাছে আমাদের জবাবদিহি করতে হয়। চাহিদা অনুসারে জিনিসের দাম ওঠে-নামে। এই নিয়ম উল্টানো যায় কি ? বাঙ্গালীদের ভেবে দেখা উচিত ছিল, তাদের আন্দোলনের ফলে কাপড়ের দাম চড়বেই।'

'বেচারা ওরা আমার মতই স্বভাব-বিশ্বাসী বলে ধরে নিয়েছিল, মিল-মালিকেরা এখন স্বার্থপর হবে না, ঠকাবে ত না-ই—বিদেশী কাপড় স্বদেশী বলে কখনও চালাবে না।'

'এমনটাই আপনার ধারণা এ কথা জানি বলেই এখানে আসার কষ্ট আপনাকে দিয়েছি, এই কথা বলব বলে যে আত্মভোলা বাঙ্গালীদের মত আপনিও যেন ভুল না করেন।'

এই বলিয়া শেঠজী গোমস্তাকে ইশারায় কিছু আনিতে বলিলেন। ছাঁট-তুলায় তৈরি কম্বলের নমুনা আনিয়া গোমস্তা তাঁর হাতে দিল। তা আমার হাতে দিয়া শেঠজী বলিলেন, 'দেখুন, এই জিনিস আমরা নূতন বানিয়েছি। এর চাহিদা খুব। ছাঁট থেকে তৈরি বলে দামও কম। হিমালয়ের উপত্যকায় পর্যন্ত এই জিনিস আমরা পৌঁছে দিয়েছি। আমাদের এজেণ্ট সব জায়গায় আছে—এমন জায়গায়ও যেখানে আপনার কথা অথবা এজেণ্ট কোন দিনও পৌঁছুবে না। অতএব দেখতে পাচ্ছেন, আপনার মত এজেণ্টের আমাদের দরকার নাই। তা ছাড়া যে পরিমাণ কাপড় দরকার তা অপেক্ষা অনেক কম কাপড় ভারতে তৈরি হয়। সুতরাং স্বদেশীর প্রশ্ন প্রকৃতপক্ষে উৎপাদনের প্রশ্ন। আমরা যখন আবশ্যক কাপড় তৈরি করতে ও তার উন্নতি করতে পারব তখন বিদেশী কাপড়ের আমদানি আপনাআপনি বন্ধ হয়ে যাবে। তাই আমি বলি যে যে ভাবে স্বদেশী আন্দোলন চালাচ্ছেন সে ভাবে না চালিয়ে মিল বাড়ানোর দিকে মন দিন। আমাদের দেশে স্বদেশী মাল চালাবার আন্দোলন করার দরকার নাই। দরকার উৎপাদন বাড়াবার।

'তবে ত আমি আপনার আশীর্বাদ পেতেই পারি, কারণ আমি উৎপাদন করছি।'

'সে কি রকম! আপনি কি মিল খোলার চেষ্টা করছেন! তা যদি হয় ত অবশ্যই আপনি ধন্যবাদ পেতে পারেন।'—একটু অপ্রস্তুত হইয়া শেঠজী বলিলেন।

'ঠিক তা নয়। আমি চরকা চালাতে চাইছি।'

আরও অধিক অপ্রস্তুত হইয়া ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করিলেন, 'সেটা কি?'

চরকা যে কি ও কত খোঁজাখুঁজির পরে তা যে কিরূপে পাইয়াছি সে কথা বলিয়া তাঁকে বলিলাম, 'মিলের দালালি করা আমার কাজ নয় এ বিষয়ে আমি আপনার সহিত একমত। তাতে লাভ না হয়ে ক্ষতিই হবে। মিলের মাল পড়ে থাকে না। আমাকে উৎপাদনের কাজে লাগতে ও সেই উৎপন্ন বস্তু বেচতে হবে। তাই ত খদ্দর উৎপাদনের কাজে আমি আমার সকল শক্তি লাগিয়েছি—ব্রত বলে এই স্বদেশী আমি নিয়েছি। নিয়েছি তার কারণ এর দ্বারা আধ-পেটা ও আধা-বেকার স্ত্রীলোকদের আমি কাজ দিতে পারব। আমি চাই যে তারা সুতা কাটুক আর সেই সুতায় বোনা কাপড় লোকে

পরুক।' এই আমার মনের ভাব আর এই আমার আন্দোলন। চরকার কাজ কতটা সফল হবে তা আমি জানি না। সবে আরম্ভ। কিন্তু এতে আমার পুরো বিশ্বাস রয়েছে। আর যাই হোক ক্ষতি তাতে হবে না। এই আন্দোলনের ফলে কাপড়ের উৎপাদন যতটা বাড়বে—হলই বা তা তুচ্ছ —ততটাই ছাঁকা লাভ। সুতরাং আপনি যে সব দোষের কথা বলছেন এই আন্দোলনকে তা ছোঁবে না।'

এ কথার পরে তিনি বলিলেন, 'উৎপাদন বাড়ানো আপনার আন্দোলনের লক্ষ্য হয় ত এর বিরুদ্ধে আমার কিছু বলার নেই। এই যুগে চরকা চলবে কি চলবে না সে কথা ভিন্ন। নিজে আমি এই চেষ্টার সাফল্য কামনা করি।'

৪২

অসহযোগ প্লাবন

ইহার পরে খাদি কিভাবে আগাইয়া যায় তার অধিক বিবরণ এই সব প্রকরণে আমি দিব না। আমার নানা কর্ম কিভাবে লোকের সুমুখে আসিয়াছে সে কথা বলার পরে সে সবের ইতিহাস বর্ণনা করার ক্ষেত্র এই সব প্রকরণ নয়। তা বলিতে গেলে সে সব বিষয়ে বই হইয়া যাইবে। সত্যের সাধন পথে কিরূপে একের পর আর এক বস্তু আপনা হইতে আসিয়া গিয়াছে সে কথা বলাই এই সব প্রকরণের লক্ষ্য।

মূল সূত্রে ফিরিয়া যাই। অসহযোগ সম্বন্ধে দু'চার কথা এখন বলা দরকার। খিলাফতের প্রশ্নে আলী ভাইদের আন্দোলন সজোরে চলিতেছিল। স্বর্গীয় মৌলনা আব্দুল বারী সাহেব ও অন্য উলেমাদের সহিত এই বিষয়ে আমার খুব আলোচনা হয়। শান্তি ও অহিংসা মুসলমানেরা কতটা মানিয়া চলিতে পারিবে এই ছিল আলোচনার বিষয়। অবশেষে স্থির হয় যে উপায় হিসাবে কোন এক নির্দিষ্ট সীমা অবধি অহিংসা মানিয়া চলিতে ইসলামের বাধে না এবং একবার প্রতিজ্ঞা করিলে নীতি হিসাবে অহিংসা পালন করিতে তারা বাধ্য। শেষ পর্যন্ত খিলাফত সম্মেলনে অসহযোগ প্রস্তাব পেশ ও অনেক তর্ক-বিতর্কের পরে পাস হয়। এই বিষয়ে এলাহাবাদে এক বার সারা রাত আলোচনা চলিয়াছিল। সেই

ছবি আজও আমার চক্ষে ভাসে। শান্তিপূর্ণ অসহযোগ কতটা সম্ভব এই বিষয়ে প্রথমটায় হকীম সাহেবের সংশয় ছিল। কিন্তু সংশয় দূর হইলে মনে প্রাণে তিনি আন্দোলনে যোগ দেন। তাঁর সহায়তার মূল্য নিরূপণ করা সম্ভব নয়।

এর পরে গুজরাট রাজনৈতিক সম্মেলনে আমি অসহযোগ প্রস্তাব উপস্থিত করি। প্রস্তাবের বিরোধীদের প্রথম যুক্তি ছিল: কংগ্রেসে পাস হওয়ার আগে ওরূপ প্রস্তাবের বিবেচনা করার অধিকার প্রাদেশিক সম্মেলনের নাই। ওই যুক্তির জবাবে আমি বলিয়াছিলাম: মূল-সংস্থার প্রস্তাব উল্টানোর অধিকার শাখা-সংস্থার নাই, মূল-সংস্থার আগে চলার অধিকার শাখা-সংস্থার আছে। কেবল তাহাই নয়, সাহসে কুলায় ত তা করাই তার ধর্ম। মূল-সংস্থার গৌরবই তাতে বাড়ে। পরে প্রস্তাবের দোষগুণের খুব আলোচনা হয়। আলোচনায় আবেগ ছিল, আক্ষেপ ছিল না। ভোট গণনা করা হয়: অতি বহু মতে তা পাস হয়। এই প্রস্তাব পাস করাইবার পিছনে আব্বাস তৈয়বজী ও বল্লভভাইয়ের খুব হাত ছিল। সভাপতি আব্বাস সাহেব অসহযোগের পক্ষে ছিলেন।

নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটী এই প্রশ্নের আলোচনার নিমিত্ত ১৯২০ সনের সেপ্টেম্বর মাসে কলিকাতায় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন ডাকে। তোড়জোড়ের অন্ত ছিল না। লালা লাজপতরায় সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছিলেন। বোম্বাই হইতে কলিকাতা খিলাফত ও কংগ্রেস স্পেশল রওনা হয়। সভ্য ও দর্শকের মস্ত জমায়েত হয়।

মৌলনা সৌকত আলীর অনুরোধে ট্রেনে আমি অসহযোগের প্রস্তাব রচনা করি। এতাবৎ আমার কোন মুসাবিদায় আমি 'শান্তিময়' শব্দটি প্রায় ব্যবহার করি নাই, যদিও ভাষণমাত্রেই এই শব্দটি আমি ব্যবহার করিতাম। ভাবটাকে কথায় ধরার শব্দ আমি ঠিক পাইতেছিলাম না। আমি দেখিতে পাই যে মুসলমান শ্রোতাদের নিকট 'নন-ভায়লেন্স'-এর সংস্কৃত প্রতিশব্দ 'শান্তিময়' শব্দ দ্বারা আমি আমার ভাব সঠিক ফুটাইয়া তুলিতে পারিতেছি না। তাই মৌলনা আবুল কালাম আজাদের কাছে আমি অন্য কোন প্রতিশব্দ চাই। তিনি আমায় 'বা-অমন' শব্দ দেন আর অসহযোগের জন্য দেন 'তর্কে মবালাত'।

'নন-কোঅপারেশন'-এর গুজরাটী, হিন্দী ও উর্দু প্রতিশব্দ কি হইতে

পারে সেই খোঁজ ও চিন্তা তখনও আমার চলিতেছিল এমন সময় এইভাবে কংগ্রেসের গুরুত্বপূর্ণ অধিবেশনের জন্য অসহযোগ প্রস্তাব মুসাবিদা করার ভার আমার ওপর পড়ে। মূল মুসাবিদায় 'শান্তিময়' শব্দ বাদ গিয়াছিল। মুসাবিদা মৌলনা সৌকত আলীকে পাঠাইয়া দেই, তিনি ওই গাড়ীতেই ছিলেন। রাত্রে মনে পড়িল যে মুখ্য শব্দ 'শান্তিময়' বাদ পড়িয়াছে। ভোরবেলা মহাদেবকে মৌলনা সাহেবের কাছে পাঠাই। প্রস্তাবে বাদ-পড়া শব্দ জুড়িয়া দিয়া ছাপাইতে পাঠাইবার কথা সে তাঁকে বলিয়া আসে। কিন্তু আমার যেন মনে পড়ে যে শব্দটা সংযোগ করার অবসর তখন আর ছিল না ; তার আগেই প্রস্তাবটা ছাপা হইয়া গিয়াছিল। বিষয়-নির্বাচনী সমিতির বৈঠক ওই দিন সন্ধ্যায়ই ছিল অতএব ওই শব্দটা ছাপা প্রস্তাবে আমাকে হাতে লিখিয়া দিতে হইয়াছিল। পরে দেখিয়াছিলাম যে আগেই প্রস্তাব ঠিক করিয়া না রাখিলে অত্যন্ত অসুবিধা হইত।

তাহা সত্ত্বেও আমার অবস্থা হইয়াছিল অতীব করুণ। কে যে আমার পক্ষে আর কে যে বিপক্ষে তার ঠাহর পাওয়া যাইতেছিল না। লালাজীর ঝোঁক কোন দিকে তা জানিতাম না। বিদুষী আনি বেসাণ্ট, পণ্ডিত মালব্যজী, শ্রীবিজয়রাঘবাচার্য, পণ্ডিত মোতিলালজী, দেশবন্ধু প্রভৃতি বাঘা বাঘা নেতা সভায় উপস্থিত ছিলেন।

খিলাফত ও পঞ্জাবের অন্যায়ের প্রতিকার মানসে প্রস্তাবে আমি অসহযোগের কথা বলিয়াছিলাম। শ্রীবিজয়রাঘবাচার্যের তা ভাল লাগে নাই। তিনি বলেন, 'অসহযোগ যদি করতে হয় তবে অমুক অমুক অন্যায়ের জন্য কেন? স্বাধীনতার অভাব অপেক্ষা বড় অন্যায় আর কি হতে পারে? সেই জন্যই অসহযোগ আবশ্যক। পণ্ডিত মোতিলালজীও স্বরাজের দাবি সংযোগ করার পক্ষে ছিলেন। বিনা ওজরে ওই সংকেত আমি মানিয়া লই ; স্বরাজের দাবি প্রস্তাবে জুড়িয়া দেই। সবিশেষ গম্ভীর আর কিছুটা তিক্ত আলোচনার অন্তে অসহযোগ প্রস্তাব পাস হয়।

এই আন্দোলনে সকলের আগে মোতিলালজী যোগ দিয়াছিলেন। প্রস্তাব সম্পর্কে তাঁর সঙ্গে আমার যে সুমধুর কথাবার্তা হইয়াছিল তা আজও আমার মনে আছে। কয়েকটি শব্দ অদল-বদল করিতে তিনি বলিয়াছিলেন। তা আমি করিয়াছিলাম। দেশবন্ধুকে আন্দোলনে টানার ভার তিনি নেন। দেশবন্ধুর ঝোঁক আন্দোলনের দিকে ছিল কিন্তু তাঁর সংশয় ছিল জনসাধারণ

তাতে সাড়া দিবে কিনা। নাগপুরে অবশ্য দেশবন্ধু ও লালাজী অসহযোগের পক্ষে ষোল-আনা আসিয়া যান।

লোকমান্যের অভাব বিশেষ অধিবেশনে একান্তভাবে অনুভব করিয়াছিলাম। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সেই দিন যদি তিনি থাকিতেন তবে কলিকাতার প্রস্তাব সাদরে তিনি গ্রহণ করিতেন। স্বাগত না করিয়া ইহার বিরোধও যদি করিতেন তাতেও আমি খুশী হইতাম, আলোক ও আশীর্বাদ বলিয়া তা গ্রহণ করিতাম। মতের অমিল তাঁর সহিত বরাবর আমার ছিল, তা বলিয়া মনের অমিল কোন দিনও হয় নাই। আমাদের পরস্পরের সম্পর্ক অতীব ঘনিষ্ঠ এ কথাই তাঁর আচরণে সতত আমার মনে হইত। এই কথা লিখিতে লিখিতে তাঁর শেষ মুহূর্তের ছবি আমার চক্ষের সামনে ভাসিয়া উঠিতেছে। তখন দুপুর রাত। অত রাতেও সহকর্মীরা কাছে রহিয়াছেন। টেলিফোনে পট্টবর্ধন—তখন তিনি আমার সঙ্গে কাজ করিতেন—ওই খবর দেন আর আমি বলিয়া উঠি: 'মস্ত বড় সহায় আমার গেল'। অসহযোগ আন্দোলন তখন পুরা দমে চলিতেছিল; তাঁর কাছ হইতে উৎসাহ ও প্রেরণা পাইব এই আশা আমার ছিল। পরে অসহযোগ যখন সম্পূর্ণ মূর্তিমন্ত হইয়াছিল তখন তাঁর মনের গতি কোন্ দিকে যাইত তা জানেন ভগবান। সে কথা কল্পনা করিয়া লাভ নাই। তবে এ কথা ঠিক যে দেশের ওই সংকটকালে কলিকাতায় সমবেত লোকেরা তাঁর অভাব অত্যন্ত অনুভব করিয়াছিল।

৪৩

নাগপুরে

কলিকাতার বিশেষ অধিবেশনে পাস হওয়া অসহযোগ ও অন্যান্য প্রস্তাব নাগপুরের বার্ষিক অধিবেশনে অনুমোদন করাইয়া লওয়া আবশ্যক ছিল। প্রতিনিধির সংখ্যা তখন নির্দিষ্ট ছিল না। আমার মনে পড়ে চৌদ্দ হাজার প্রতিনিধি উপস্থিত ছিল। লালাজীর কথায় বিদ্যালয়বিষয়ক অংশে অল্পবিস্তর ও দেশবন্ধুর কথায় অন্য কোথাও কোথাও এক-আধটু পরিবর্তন করিলে শান্তিময় অসহযোগ প্রস্তাব একমতে পাস হইয়া যায়।

কংগ্রেসের সংশোধিত বিধান-এর মুসাবিদার বিবেচনাও এই অধিবেশনেই

পেশ করা হইয়াছিল স্থতরাং উহার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার আগেই হইয়া গিয়াছিল। নাগপুর কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন শ্রীবিজয়রাঘবাচার্য ; একটা মাত্র গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের পরে বিষয়-নির্বাচনী সমিতিতে উহা পাস হয়। আমার মনে পড়ে, আমার মুসাবিধায় প্রতিনিধির সংখ্যা ১,৫০০ করার স্থপারিশ ছিল। বিষয়-নির্বাচনী সমিতি উহার জায়গায় ৬,০০০ করিয়া দেয়। আমার মনে হইয়াছিল যে ভালভাবে ভাবনাচিন্তা না করিয়া সহসা ওই পরিবর্তন করা হইয়াছিল এবং এত বছরের অভিজ্ঞতা হইতে দেখিতে পাইতেছি যে আমার এই ধারণা ঠিকই ছিল। অধিক প্রতিনিধি হইলে কাজ অধিক ভাল হয় বা গণতন্ত্রের মূল দৃঢ় হয়, আমি মনে করি এই ধারণা একেবারে ভুল। যে কোন রকমে বাছাই ছয় হাজার নিজ-গরজী প্রতিনিধি অপেক্ষা উদারচেতা গণস্বার্থ রক্ষায় ব্রতী নিষ্ঠাবান পনের শত প্রতিনিধির হাতে গণের স্বার্থ অধিক স্থরক্ষিত। গণতন্ত্রের রক্ষার নিমিত্ত চাই স্বাধীনতার, আত্মমর্যাদার ও একতার ভাবনা এবং নিষ্ঠাবান খাঁটী প্রতিনিধি নির্বাচনের আগ্রহ। কিন্তু সংখ্যার মোহে অন্ধ বিষয়-নির্বাচনী সমিতি চাহিতেছিল ছয় হাজারেরও বেশি প্রতিনিধি। দরকষাকষি করিয়া তাই ছয় হাজারে রফা হয়।

কংগ্রেসের লক্ষ্যের কথায় তীক্ষ্ণ বাদানুবাদ হইয়াছিল। সম্ভব হইলে সাম্রাজ্যের ভিতর বা প্রয়োজন হইলে উহার বাইরে স্বরাজলাভ আমাদের লক্ষ্য, মুসাবিদায় এই কথা ছিল। কংগ্রেসের এক দল সাম্রাজ্যে থাকিয়া স্বরাজ লাভ করার পক্ষপাতী ছিল। এই মতের মুখপাত্র পণ্ডিত মালব্য ও মি॰ জিন্না। কিন্তু তাঁরা বেশি ভোট পান নাই। বিধানের এক ধারায় বলা হইয়াছিল যে শান্তিপূর্ণ ও সত্যরূপ পথে স্বরাজ পাইতে হইবে। সাধারণকে শর্তে বাঁধা উচিত নয় এই তর্ক এই ধারার বিরুদ্ধে উঠিয়াছিল। কংগ্রেসে এই আপত্তি অগ্রাহ্য হয় এবং খোলাখুলি কিন্তু শিক্ষণীয় তর্ক-বিতর্কের পরে সবটা বিধান পাস হয়। আমার বিশ্বাস, বুদ্ধিযুক্ত উৎসাহ ও নিষ্ঠায় যদি এই বিধান মত কার্য হইত তবে জনসাধারণের শিক্ষার তা উত্তম বাহন হইত আর সেই প্রচেষ্টার ফলেই স্বরাজ আসিয়া যাইত। কিন্তু সে কথা আলোচনার স্থান এটা নয়।

হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য, অস্পৃশ্যতা ও খাদি সম্পর্কেও এই অধিবেশনে প্রস্তাব পাস হইয়াছিল। কংগ্রেসের হিন্দু সদস্যেরা সেইদিন হইতে

অস্পৃশ্যতা দূর করার দায়িত্ব নিজেদের কাঁধে তুলিয়া লইয়াছে এবং কংগ্রেস খাদির মারফতে 'নরকঙ্কালদের' সহিত নিজ সম্পর্ক জুড়িয়াছে। খিলাফতের প্রশ্নে অসহযোগ করার সংকল্প করিয়া কংগ্রেস হিন্দু-মুসলমান একতার মহান্ প্রযত্ন করিয়াছে।

৪৪

পূর্ণাহুতি

এই কথা বন্ধ করার সময় এখন উপস্থিত হইয়াছে। এর পরেকার আমার জীবন এতটাই দশের সামনে আসিয়া গিয়াছে যে আমার প্রায় কোন কথাই এখন আর লোকের অজানা নয়। তা ছাড়া, ১৯২১ সন হইতে কংগ্রেসের নেতাদের সহিত এত অধিক ওতপ্রোত হইয়া রহিয়াছি যে জীবনের কোন কথা বলিতে গেলেই নেতাদের কথা আসিয়া যাইবে এবং তা যদি বাদ দেই ত সেই বর্ণনা অসম্পূর্ণ হইবে। শ্রদ্ধানন্দজী, দেশবন্ধু, লালাজী ও হকীম সাহেব আমাদের ছাড়িয়া গিয়াছেন। কিন্তু আমাদের ভাগ্যগুণে অন্য অনেক নেতা বাঁচিয়া আছেন। মহাসভার মহাপরিবর্তনের পরেকার ইতিহাসের রচনা আজও চলিতেছে। আর গত সাত বছর আমার সকল মুখ্য প্রয়োগ কংগ্রেসের মারফতেই হইয়াছে। অতএব এই সব প্রয়োগের কথা বলিতে যাই ত নেতাদের সহিত আমার সম্পর্কের কথা আসিয়া যাইবেই। ভদ্রতার অনুরোধে অন্তত সেই সব কথা এখন বলা চলিবে না। সর্বোপরি, এই সব চালু প্রয়োগের সম্বন্ধে নিশ্চয় করিয়া কোন কথা বলাও চলে না। সুতরাং এই কথা এখানেই শেষ করা আমার কর্তব্য মনে হইতেছে। এ কথাও বলা যাইতে পারে যে আমার কলম আর অগ্রসর হইতে চাহিতেছে না।

পাঠকদের কাছে বিদায় লইতে বেদনা বোধ করিতেছি। আমার প্রয়োগ সমূহের মূল্য আমার কাছে অনেক। জানি না প্রয়োগ সমূহের ঠিক ঠিক বর্ণনা আমি করিতে পারিয়াছি কিনা। যথাযথ বর্ণনা করার কোন ত্রুটিই আমি করি নাই। যে রূপে সত্যকে আমি দেখিয়াছি, যে পথে তাকে আমি পাইয়াছি, তা আমি ঠিক তেমনি ধরার সতত প্রযত্ন করিয়াছি এবং তাহা হইতে সত্য ও অহিংসার প্রতি পাঠকদের অনুরাগ বৃদ্ধি পাইবে

এই বিশ্বাসে তাঁদের সামনে তা উপস্থিত করিয়া অন্তরে পরম শান্তি লাভ করিয়াছি।

জীবনে কোন দিনও মনে হয় নাই সত্য হইতে পরমেশ্বর পৃথক্‌। সত্যময় হওয়ার একমাত্র পথ অহিংসা এই সত্য যদি এই কথার প্রতি পৃষ্ঠায় না ফুটিয়া থাকে তবে মনে করিব আমার প্রযত্ন ব্যর্থ হইয়াছে। প্রযত্ন যদি বা ব্যর্থ হইয়া থাকে তা বলিয়া বচন ব্যর্থ নয়।* আমার অহিংসা সাচ্চা হইলেও কাঁচা, অপূর্ণ। অতএব হাজারো সূর্য একত্র করিলেও সেই সত্যরূপী সূর্যের তেজের ঠিকমত আন্দাজ হয় না, আমার সত্যের ঝিলিক সেই সূর্যের একটি কিরণের সমানমাত্র। তবে এই পর্যন্তকার প্রয়োগের অভিজ্ঞতা হইতে এ কথা নিঃসংশয়ে বলিতে পারি যে সত্যের পূর্ণ দর্শন পূর্ণ অহিংসা বিনা কখনও সম্ভব নহে।

এই ব্যাপক সত্যনারায়ণকে প্রত্যক্ষ দর্শন করিতে হইলে জীবমাত্রের প্রতি আত্মবৎ প্রেমের উদয় হওয়া পরম আবশ্যক। † এইরূপ মুমুক্ষু ব্যক্তির পক্ষে জীবনের কোন ক্ষেত্র হইতেই সরিয়া থাকার উপায় নাই। তাই সত্যের সাধনাসূত্রেই রাজনীতিতে আমার প্রবেশ করিতে হইয়াছে। আর এ কথাও নিঃসংশয়ে অপিচ নিরতিশয় বিনয়ে বলিব যে, যাঁরা বলেন রাজনীতিতে ধর্মের ঠাঁই নাই, ধর্ম যে কি তা তাঁরা জানেন না।

আত্মশুদ্ধি বিনা জীবমাত্রের সহিত একত্ববোধ আসে না। আত্মশুদ্ধি ছাড়া অহিংসার আরাধনা একেবারেই অসম্ভব। অশুদ্ধাত্মা পরমাত্মার দর্শন পাইতেই পারে না। অতএব জীবনমার্গের সকল ক্ষেত্রেই শুদ্ধি আবশ্যক। আর শুদ্ধি (পবিত্রতা) এমনই ছোঁয়াচে যে কারও শুদ্ধিতে তার পরিবেশও শুচিশুদ্ধ হইয়া যায়। ††

* ইংরেজীতে বাক্যটি এভাবে ধরা হইয়াছে: আর আমার প্রযত্ন যদি ব্যর্থও হইয়া থাকে ত পাঠক জানিয়া রাখুন যে সেই দোষ বাহনের, মহান্‌ সেই তত্ত্বের নহে।

† এই বাক্যটিকে ইংরেজীতে ধরা হইয়াছে এভাবে: সত্যের সর্বত্র বিদ্যমান সাকার বিশ্বরূপ প্রত্যক্ষ করিতে হইলে জীবমাত্রকে নিজের মত ভালবাসা চাই।

†† মূলে এরূপ আছে: এই শুদ্ধির সাধনা করা আবশ্যক কেন না ব্যষ্টি ও সমষ্টির মধ্যে সম্বন্ধ এরূপ নিকট যে একের শুদ্ধি অনেকের শুদ্ধির হেতু হয়। আর এরূপ ব্যক্তিগত প্রযত্ন করার শক্তি ত সত্যনারায়ণ জন্ম হইতে সকলকে দিয়া আসিয়াছেন।

কিন্তু আত্মশুদ্ধির পথ শক্ত চড়াইর পথ। পূর্ণ শুচিশুদ্ধ হওয়া মানে চিন্তায় কথায় কাজে নির্বিকার হওয়া, রাগ-দ্বেষ রহিত হওয়া, এই নির্বিকারতা লাভের জন্য আমি প্রতিক্ষণ অশেষ প্রযত্ন করিয়া আসিয়াছি কিন্তু আজও সেই অবস্থায় পৌঁছিতে পারি নাই। তাই লোকের স্তুতিতে আমি ভুলি না, বরং এই স্তুতি অনেক সময় হুলের মত আমায় বিঁধে। আমি দেখিতে পাই যে মনোবিকার জয় করা অস্ত্রবলে জগৎ জয় করা অপেক্ষা কঠিন কাজ। ভারতে ফিরিয়া আসার পরেও দেখিয়াছি যে ভিতরের ঘুমানো বিকার মাথা চাড়া দিয়াছে। লজ্জায় মরিয়াছি। কিন্তু হার মানি নাই। সত্যের প্রয়োগ হইতে আমি আনন্দ লুটিয়াছি, আজও লুটিতেছি। কিন্তু আমি জানি, আরও অতীব কঠিন পথ আমার সামনে পড়িয়া আছে; তা আমার পার হইতে হইবে। তার জন্য আমার শূন্য হইতে হইবে। যতদিন মানুষ স্বেচ্ছায় নিজেকে সকলের শেষে, সকলের পিছনে না রাখে ততদিন তার মুক্তি নাই। অহিংসা মানে নম্রতার পরাকাষ্ঠা। এই নম্রতা বিনা কস্মিন কালেও মুক্তি মিলে না ইহা অনুভবসিদ্ধ কথা।

এই বিদায়ের বেলায়, অন্তত এখনকার মত ত বটেই, সত্যরূপী ঈশ্বরের কাছে চিন্তা-কথা-কার্যের অহিংসা যাচ্ঞা করিয়া ও আমার এই আকূতিতে পাঠকেরা তাঁদের আকুতি যোগ করিবেন এই কামনা করিয়া এই কথা আমি শেষ করিতেছি।

সমাপ্ত

নির্ঘণ্ট

অনসূয়া বাই ৪৩৮, ৪৩৯, ৪৪০, ৪৪৩, ৪৪৪, ৪৪৬, ৪৬৪, ৪৬৭, ৪৭৫, ৪৭৭

অনুগ্রহবাবু (অনুগ্রহনারায়ণ সিংহ) ৪৩১

'অমৃতবাজার পত্রিকা' ১৮৯, ২০১

অমৃতসর ৪৭১, ৪৭৩, ৪৭৭

অমৃতসর কংগ্রেস ৪৯১-৯৭

অ্যালিসন, ডা. ৩৬৮, ৩৬৯

অরেঞ্জ ফ্রী স্টেট ১৩৪, ১৩৫, ১৪৫

অহমদাবাদ ৩৯, ৪০, ২০৭, ৪০৭, ৪০৮, ৪১০, ৪৩৮, ৪৪১, ৪৪৫, ৪৪৬, ৪৬২, ৪৭৭, ৪৭৮, ৪৭৯, ৪৮২, ৪৮৩

আগ্রা ২৪৮

আজাদ, মৌলানা আবুল কালাম ৫০৫

আতাজনিয়া, সোরাবজী ৩৫৭, ৩৬২-৬৪

'আনটু দিস্ লাস্ট' ৩০৮-০৯

আনন্দানন্দ ৩৯৩

আনন্দীবাই ৪৩২, ৪৩৩

আনসারী, ডাক্তার ৪৫২

আমদ জীবা ১৪৮, ১৫০

আয়ঙ্গর কস্তুরী রঙ্গা ৪৬৯, ৪৭০

আয়রলণ্ড, রেভারেণ্ড ৪৫৫-৫৬

আর্নল্ড, সার এডুইন ৬৪, ৭৩, ৭৪, ১৬৭

আরভিং, ওয়াশিংটন ১৬৬

আলী, আসফ ৪৮৭

আলী ভ্রাতৃদ্বয় ৪৫২, ৪৫৩, ৪৫৫, ৪৫৮, ৪৯১, ৪৯২, ৫০৪

আলী, মৌলানা সৌকত ৪৫১, ৫০৫. ৫০৬

আলেকজাণ্ডার, মি. ২০০-০২

আলেকজাণ্ডার, মিসিস ২০০

'ইণ্ডিয়ন ওপিনিয়ন' ২৮০, ২৯৩-৯৬, ২৯৮, ৩০০, ৩০৪, ৩০৭, ৩১০, ৩১১, ৩১২-১৫, ৩৩০, ৪৮৩

ইম্পিরিয়ল সিটীজেনশিপ এসোসিয়েশন ৪১৩

'ইয়ং ইণ্ডিয়া' ২৯৫, ৪৮১, ৪৮৩, ৪৮৪

উইলিয়ম ৮৬

উইলিয়ম, হাওয়ার্ড ৫৩

উইলিংডন, লর্ড ৩৮৭, ৩৯১

উডগেট, জেনারেল ২২৩

উপনিষদ ১৬৬

উপযোগিতাবাদ ৫১

এডেন ৯৩, ৩৭১

এডওয়ার্ডস্ ৮৬

এডওয়ার্ড, সপ্তম ১৮০

এফিল টাওয়ার ৮২-৮৪

এণ্ডরুজ, রেভারেণ্ড সি. এফ. ২৯৬, ৩৮৫,৩৯৩, ৩৯৫, ৪৫২, ৪৫৩, ৪৫৪, ৪৫৫, ৪৮৫

এলিন্সন, ডা. ৫৪, ৬৫, ৬৬

এস্কম্ব, মি. হ্যারী ১৪৬, ১৪৯, ১৫৩, ১৫৪, ১৯৬, ১৯৯, ২০২, ২২১

ও'ডায়র, সার মাইকেল ৪৭৪, ৪৮৪

ওয়লী, কর্নেল ৩২৫, ৩২৬

ওয়াচা, সার দীনশা ১৮১, ১৮৩, ২৩০, ২৩১, ২৩৬, ২৩৭

ওয়ালটন, মি. স্পেন্সর ১৬৬

ওয়েলিংটন ১৪২

ওয়েস্ট, আলবর্ট ৩০৩-০৪, ৩০৭-১৪, ৩২০, ৩২৮

কমরুদ্দিন, মহম্মদ কাসেম ১২২, ১৪৮
করাচী ৪১৫, ৪১৬
কলিকাতা ১৭৫, ১৮৮-৯০, ২৩০-৪৮, ৩৯৯,৪০১, ৪০৩, ৪১৫, ৪১৬, ৪১৭, ৪১৮, ৪৫২, ৫০৫, ৫০৭
কলিকাতা কংগ্রেস ২৩০-৩৭
কল্যাণ জংশন ৩৯৭
কল্যাণ দাস ৩০০-০১
কাউল, শ্রী ৩৯৭
কাটিয়াওয়াড় ১২, ১৭, ৩৯, ১০৪, ১০৬, ১৬৬, ২৫২, ২৫৪, ৩৯১, ৩৯২, ৪০৪
কাথবটে, অধ্যাপক ২৪১
কানপুর ৪১৭
কানুগা, ডাক্তার ৪৬২, ৪৬৪
কামদার, শ্রীমতী রমীবাই ৫০০
কামা ১৮১
'কারেণ্ট থট' ৩৩০
কার্জন, লর্ড ২৩৭-৩৯
কার্লাইল ৭৫, ১৬৬
কালিবাবু (কালিমোহন ঘোষ) ৩৯৩
কালেলকর, কাকা ৩৯২, ৩৯৩
কাশিমবাজার ৪১৬
কাশী ২৪৮, ২৫০-৫২
কাশী-বিশ্বনাথ ২৫০-৫২
কিচলু, ডাক্তার ৪৭১, ৪৮৪
কিচিন ২৯০
কিংসফোর্ড, এনা ১৪৪
কিংসফোর্ড, ডা. মিসিস আনা ৫৪
কুঞ্জরু, হৃদয়নাথ ৪০১
কুম্ভমেলা ৩৯৯-৪০৩, ৪০৭
'কুলী-লোকেশন' ২৯৬-৩০৭
কুরেশী, শোয়েব ৪৫২
ক্যালে ২৫৬, ২৭৫, ২৭৮, ৩২১
কৃপালানী, আচার্য জে. বি. ৪১৯, ৪২০, ৪৩১-৩২
কে' ৮৮, ৯৯
কেণ্টলী, ডাক্তার ৩৫৯
কেলকর ৪৬৪, ৪৯৬
কেলেনবেক, মি. ২৯২, ৩৩২, ৩৩৯-৪১, ৩৪৫, ৩৪৬, ৩৫১, ৩৫২, ৩৫৩, ৩৫৫-৫৬ ৩৬৬, ৩৬৭, ৩৭০
কোচরব ৪০৮, ৪৪০, ৪৪১
কোটস, মি. ১২৮, ১২৯, ১৩০, ১৩১,১৩৫,১৩৬, ১৩৭
কোরান ১১৩, ১৪৪
'ক্রনিকল' ৪৮২, ৪৮৩
ক্রাউজ, ডা. ১৩৬
ক্রু, লর্ড ৩৫৯
ক্রুগর, মি. ১৩৬
ক্রিপস্ক্রুট ৩০৬
ক্ষিতিমোহনবাবু (ক্ষিতিমোহন সেনশাস্ত্রী) ৩৯৩

খগেনবাবু ৩৯৪
খরশেদ, মি. সি. এম. ১৮৩
খাজা সাহেব ৪৫২
খাঁ, হাকিম আজমল ৪৫২, ৪৭১, ৪৮৭, ৪৮৮, ৫০৫, ৫০৯
খিলাফত ৪৫৩, ৪৫৪, ৪৮৭, ৪৮৮, ৪৮৯, ৪৯০, ৪৯২, ৫০৪, ৫০৬
খেড়া ৪৫৬, ৪৮০
খেড়া সত্যাগ্রহ ৪৩৮, ৪৪৫, ৪৪৬-৫৯, ৪৬৮, ৪৮০
খৃষ্ট যীশু ৫৩, ৭৪, ১২৯, ১৩০, ১৪৩, ১৬৭, ১৬৮, ১৭৪, ২৭২

গঙ্গাবাই ৪৯৯, ৫০০, ৫০১
গঙ্গাবাই (তাতিনী) ৫০১
গডফ্রে, ডা. উইলিয়ম ৩০০-০২
গডফ্রে, জর্জ ২৬৯

গডফ্রে, জেমস ১১৫

গডফ্রে, সুভান ১১৫, ১৪৮

গয়াবাবু ৪২০

গান্ধী, উত্তমচাঁদ বা ওতা ৭

গান্ধী, করমচাঁদ বা কবা ৭-৯, ১১-১৪, ২০, ২৫, ৩১, ৩২, ৩৩-৩৫, ৩৭, ৩৮

গান্ধী, কর্ষণদাস (মেজদা) ১২, ৩১

গান্ধী, কস্তুরবা ১৪-১৮, ২৩, ২৪, ২৯, ৩৭, ৩৪, ৩৫, ৯৭, ১০৮, ২২৭-৩০, ২৮৫-৮৭, ৩৩৩-৩৯, ৩৫৫, ৩৯৫, ৩৯৭, ৪৩৩, ৪৩৫, ৪৬১, ৪৬৬

গান্ধী, ছগনলাল ৩১০, ৩২৮, ৪০৫

গান্ধী, তুলসীদাস ৭

গান্ধী, দেবদাস ৪৩৩

গান্ধী, পুতলীবাই ৭, ৮, ৯, ২৩, ২৫, ৩৭, ৪১, ৯৩, ৯৪

গান্ধী, বীরচাঁদ ৯৯, ১৮১

গান্ধী, মগনলাল ২৫৯, ২৬০, ৩১০-১১, ৩২৮, ৩৯৩, ৩৯৫, ৩৯৬, ৪০১, ৪১০, ৪৪ ৫০০

গান্ধী, মণিলাল ২৫৫-৫৮, ৩৩৬

গান্ধী, মোহনদাস করমচাঁদ ১-৫১১

গান্ধী, রামদাস ৩১৭, ৩৩৬, ৩৯৯

গান্ধী, লক্ষ্মীদাস (বড়দা) ১২, ৪০, ৪১, ৪২, ৪৩, ৪৪, ৪৫, ৪৬, ৫৫, ৫৯, ৯৩, ৯৬, ৯৭, ৯৮, ৯৯, ১০২, ১০৩, ১০৪, ১০৫, ১০৬, ১০৭, ১০৮, ২৭৪, ২৭৫

গান্ধী, হরিলাল ৩২২

গিদবানী, আচার্য ৪৭৪

গিরমীটিয়া ১৬০-৬৫, ২২৪, ২২৬, ২৯৮, ২৯৯, ৩৮৬, ৩৮৯, ৪১২-১৬

গিরমীটিয়া, বদ্রী ২৭৬, ২৯৮, ২৯৯

গীমী, দোরাবজী এদলজী ১৯, ২০

গুজরাট রাজনৈতিক সম্মেলন ৫০৫

গুজরাট সভা ৪৪৬

গুডিভ ৮৬

গুরুকুল ৪০৩, ৪০৪

গেট, সার এডওয়ার্ড ৪৩৭

গেব, মিস ১২৮

গেলওয়ে, কর্নেল ৩৬৫

গোখেল, অবন্তিকা বাই ৪৩২, ৪৩৩, ৫০০

গোখেল, গোপালকৃষ্ণ ১৬৫, ১৮৬, ১৮৭, ২২০, ২২১, ২৩৫, ২৩৬, ২৩৮, ২৩৯-৪৮, ২৫২, ২৫৯, ২৯৩, ৩৫৫, ৩৫৭, ৩৬৬, ৩৬৭, ৩৬৮, ৩৭২, ৩৮৬, ৩৮৭-৮৯, ৩৯৫, ৩৯৭, ৩৯৮, ৪০০, ৪৯৬

গোধরা পরিষদ ৪৯৯

গোবিন্দস্বামী ৩১০

গোরখবাবু ৪২৩, ৪২৪, ৪২৯

গ্রিফিথ, মি. ৪৭৬

গ্ল্যাডস্টোন, মি. ২১২

গ্ল্যাডস্টোন, মিসিস ২১২, ২১৩

ঘোষ, মতিলাল ২৩১

ঘোষাল, জানকীনাথ ২৩১, ২৩৩-৩৫

চম্পারণ ৪১৬-৩৭, ৪৩৮, ৪৩৯, ৪৬০, ৪৪৭

চার্লস্‌টাউন ১১৯, ১২০

চেজনী, মি. ১৭৫, ১৭৬

চেম্বারলেন, মি. ২০২, ২০৩, ২৫৯, ২৬০, ২৬৩, ২৬৬, ২৬৭, ২৬৮, ২৬৯

চেমসফর্ড, লর্ড ৩৯১-৯২, ৪১৩, ৭৫১, ৪৫৪

চোইথরাম, ডা. ৪১৯

চৌধুরাণী, সরলাদেবী ৪৮৫

ছোটেলাল ৪৩২

জনকধারীবাবু ৪৩১

জনস্টন ১২৫, ১২৬, ১২৭

জমিস্টন ১২৪

জয়পুর ২৪৮

জামনগর ২৫২, ২৫৪

জয়াকর, মি. ৪৮৬
জগদানন্দবাবু (রায়) ৩৯৩
জনক রাজা ৪১৬
জাঞ্জীবার ১১০, ১১১, ১১৬, ১৮৪
জালিয়ানওয়ালাবাগ ৪৮১, ৪৮৪, ৪৯৫
জিন্না, মি. ৩৮৬, ৪৯৩
জুনাগড় ৭, ৪৫, ৪৬
জুলু বিদ্রোহ ২১৬, ৩২৪-২৮
জুস্ট ২৭৮, ২৭৯
জোহানিসবর্গ ১১৯, ১২২, ১৩৬, ২১৬, ২২০, ২৭০, ২৭১, ২৭৫, ২৭৭, ২৮২, ২৯০, ২৯৫, ৩০০, ৩০৫, ৩০৬, ৩০৮, ৩১৫-১৬, ৩১৯-২১, ৩২৪, ৩২৯, ৩৫২, ৩৫৩
জেরাজানী, বিঠ্ঠল দাস ৪৭২, ৪৬৩

ঝবেরী, অবদুল করীম ১০৭, ১০৮
ঝবেরী, কালিদাস ৪৯৮
ঝবেরী, রেবাশঙ্কর ৪৭৫, ৫০১

টলস্টয় ৮৩, ৯৬, ১৪৪, ১৬৭,
টমস্টয় ফার্ম ৩১২-২০, ৩৪০, ৩৪২, ৩৪৩, ৩৪৪-৫৫
'টাইমস্', লণ্ডন ১৫১
'টাইমস অব ইণ্ডিয়া' ১৫১
টাটা, লেডী ৪১৪
টুডর ৮৬
টোঙ্গাট ১৫৮
টেগোর, মহারাজ ১৮৮
ট্যাটুম. মি. ১৯৯
ট্রান্সভাল ১১২, ১২২, ১২৩, ১৩২, ১৩৪, ১৩৫, ১৯০, ২০৪, ২৬৩-২৬৪, ২৬৫, ২৬৭, ২৬৯, ২৭০, ২৮২, ৩১৯, ৩৭৬, ৩৭৭

ঠক্কর, অমৃতলাল ৪০৯, ৪৪৬
ঠাকুর, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ৭৯, ২৪৫
ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ (কবিগুরু) ৩৮৫, ৩৯৪
ঠাকুরদাস, ত্রিকমজী ৪৭১

ডারবন ১১২, ১১৩, ১১৫, ১১৮, ১১৯, ১৪৫, ১৪৮, ১৬০, ১৯০, ১৯৬, ১৯৭, ২০৬, ২২৫, ২৬৫, ২৬৬, ২৭৭, ২৮৫, ২৮৯, ৩০৪, ৩০৮, ৩২৬, ৩৩৩, ৩৩৫
ডিজরেলি ৮০
ডি-ওয়েট, জেকবস্ ১৩৪
ডিক, মিস্ (মিসিস ম্যাকডোনাল্ড) ২৯১-৯২, ২৯৩
ডোক, রেভারেণ্ড যোশেফ ৩০৩

তায়েবজী, বদরুদ্দীন ৮৮, ১০০, ১৮১, ১৮৪
তলবরকর, ডাক্তার ৪৬৪
তিলক, লোকমান্য ১৮৫, ১৮৬, ১৮৭, ২৩১, ৪৫১, ৪৫৫, ৪৫৮, ৪৯২, ৪৯৩, ৪৯৪, ৪৯৫, ৪৯৬, ৫০৭
'তিনকাঠিয়া' ৪১৬, ৪৩৭
তুলসীদাস ৩৭
তেলঙ্গ ২৪১,
তৈয়বজী, অব্বাস ৪৮৬, ৫০৫,
তৈয়ব হাজী খান মহম্মদ ১১৭, ১৩২, ১৪০, ১৪১
ত্রিবেদী, উত্তমলাল ৩৮৬

থিয়োসফিকল সোসাইটী ৭৩, ১৬৬, ২৭১, ২৭২

দক্ষিণ আফ্রিকা ৬৪, ৬৭, ৮৯, ১০৬-৭৪, ১৭৬, ১৮৪, ১৯৯-২৩০, ২৬৩-৩৫৫, ৩৭২-৩৮১
দত্ত-চৌধুরী, পণ্ডিত রামভুজ ৪৮৪, ৪৮৫
দবে, কেবলরাম মাবজী ৪০, ৪১, ২৫২, ২৫৩, ২৫৪
দানী বহেন ৪০৯, ৪১১
দালাল, ডাক্তার ৪৬৫, ৪৬৬, ৪৬৭

দাস চিত্তরঞ্জন (দেশবন্ধু) ৪৮৬, ৪৯২, ৪৯৩, ৪৯৪, ৪৯৫, ৪৯৬, ৫০৬, ৫০৭, ৫০৯
দাস, ডা. ত্রিভুবন ২১১
দিলশাদ বেগম ৪১৪
দিল্লী ৪১৫, ৪৫৩, ৪৫৫, ৪৫৬, ৪৭১, ৪৭৩, ৪৭৪, ৪৯০
দীনশা, কেকোবাদ কাওয়সজী ৩৭১
দুদাভাই ৪০৯, ৪১১
দেব, ডাক্তার ৩৮৮, ৪০১, ৪৩৩, ৪৩৪
দেশাই, গুণবন্তরায় ৩০০
দেশাই, জীবনলাল ৪০৮
দেশাই, দুর্গাবাই ৪৩৩
দেশাই, প্রাগজী ৩৪৫
দেশাই, বালজী গোবিন্দজী ৩৩০
দেশাই, মহাদেব ৪৩৩, ৪৪৬, ৪৬৯, ৪৭০, ৪৭৪, ৪৮০, ৫০৬
দেশাই, যশবন্তপ্রসাদ ৫০০
দেশপাণ্ডে, কেবলরাম ১৮৩, ১৮৪
দেশপাণ্ডে, কেশবরাম ৩৯৩
দেশপাণ্ডে, গঙ্গাধররাও ৪৩২
দৌলতরাম, জয়রামদাস ১, ২৮৯
দ্বারভাঙ্গা ৪২০

ধাত্রী রম্ভা ৩৬
ধোরাজী ৪২
ধ্রুব, অন্নদাশঙ্কর ৪৪৪

নওরোজী, দাদাভাই ৪৮, ৮৭, ৮৮
নগেনবাবু ৩৯৩
নটরাজন, মি. ৪১৩
নদীয়াদ ৪৬২, ৪৬৩, ৪৭৮, ৪৭৯
নদীয়াদ অনাথ আশ্রম ৪৪৭
'নন-কোঅপারেশন' ৪৯০, ৪৯১, ৫০৫
'নবজীবন' ১, ৪, ২৯৫, ৩৩০, ৪৮১, ৪৮৩, ৪৮৪
নভুভাই ২৭২
নর্মদ ২৫
নর্মদাশঙ্কর ১৬৬
নাইডু, শ্রীমতী সরোজিনী ৩৫৯, ৪৬৭, ৪৭২
নাগপুর কংগ্রেস ৫০৭-০৯
নাজর, মনসুখলাল ১৯৬, ২০৫, ২৯৪, ৩১৫
নাতাল ১১১, ১১২, ১১৪, ১১৮, ১২৪, ১৩২, ১৪৫, ১৪৮, ১৫০, ১৫১-৫৬, ১৬০-৬৫, ১৬৯, ১৭৪, ১৯২, ১৯৪, ২০৪, ২৫৪, ২৬৩, ২৬৯, ৩০৮, ৩২৪, ৩৭৬, ৩৭৭, ৩৭৯
নাতাল ইণ্ডিয়ন কংগ্রেস ১৫৬-৬০, ১৬৪, ১৬৫, ১৭২, ২০৫, ২২৭
নানাভাই, জমিয়তরাম ২৫৯
নাসিক ৯৬
নিবেদিতা, সিস্টার ২৪৫-৪৬
নিরুপদ্রব আইন অমান্য ৪৭২
নিষ্কুলানন্দ ১৪
নীলকর ৪২২, ৪২৬, ৪২৭, ৪২৮, ৪৩১, ৪৩২, ৪৩৩, ৪৩৫, ৪৩৬
নীলকর সংঘ ৪২২, ৪৩১
নেটলী ৩৬৫, ৩৭০
'নেটাল অ্যাডভারটাইজর' ২০৩
নেপালবাবু (নেপালচন্দ্র রায়) ৩৯৩
নেহরু, পণ্ডিত মোতীলাল ৪৮৫, ৪৮৬, ৪৯১, ৪৯৩, ৪৯৫, ৫০৬
নোত্রাদাম গির্জা ৮৩

পটবর্ধন ৫০৭
পটবর্ধন (আপ্পা) ৩৯৩
পয়গম্বর ৭৫
পরীখ, নরহরি ৪৩৩
পরীখ, মণিবেন ৪৩৩
পরীখ, শঙ্করলাল ৪৩৮, ৪৪৬, ৪৪৭, ৪৪৯
পরীখ, স্যর গকুলদাস কহাণদাস ৪৪৬
পলবল ৪৭৩, ৪৭৪
পাইথাগোরস ৫৩

পাটনা ৪১৮, ৪১৯, ৪২৭
পাতঞ্জল যোগশাস্ত্র ২৭২
পাদশা, পেস্তনজী ১৮৪, ১৮৫, ২৪৬
পাদশা, বারজোরজী ১৮৪
পাণ্ড্যা, মোহনলাল ৪৩৮, ৪৪৬, ৪৪৯
পাণ্ড্যে, কৃষ্ণশঙ্কর ২২
পায়োনিয়র ১৭৫, ১৭৬
পার্কার, ডা. ১২৯
পারডীকোপ ১২০
পারসী, রুস্তমজী ১১৫, ১৫০, ১৭২, ১৮৪, ১৯৯ ২০০, ২০১, ২১০, ২২৮, ৩১০, ৩৭৮-৮১
পাল, বিপিনচন্দ্র ৪৯৪
পালানপুর ২৪৮
পিঙ্কট, মি. ফ্রেডারিক ৮৮, ৯৯, ১৩৯
পিয়ার্সন, মি. ১২৯, ৩৯৩, ৩৯৪
পিলে, জি. পরমেশ্বর ১৮৭
পীলে, এ. কোলন্দাবেল্লু ১৪৮
পুণা ১৮৫, ১৮৭, ৩৮৬, ৩৮৭-৮৯, ৩৯৬, ৩৯০
পুণ্ডলিক ৪৩২
পুরী ৪১৮, ৪২০
পেইন, গিলবার্ট ও সয়নী ২৫৫
পেটিট, মি. জাহাঙ্গীর ৩৮৬, ৪১৩
পেটিট, মিসিস জয়াজী ৪১৪
পোর্টস্মথ ৭৬, ৭৭
পোরবন্দর ৭, ৯, ১০, ১৩, ১৪, ৩৬, ৪১, ৪২ ৪৩, ১০৩, ১০৭, ৪০৪,
পোলক, মি. ৩০৩, ৩০৭, ৩০৮, ৩১৪, ৩১৮-১৯, ৩২১, ৩২৩, ৩২৪, ৩৬০, ৩৬১
পোলক, মিসিস ৩১৯, ৩২১
প্যাটেল, বল্লভভাই ৪৪০, ৪৪৩, ৪৪৬, ৪৫১, ৪৫৬, ৪৬২, ৪৬৩, ৪৬৭, ৫০৫
প্যাটেল, বিটলভাই ৪৪৬
প্যারীস ৮২-৮৪, ৩৫৭
প্রয়াগ (এলাহাবাদ) ১৭৫
প্রসাদ, ধরণীধর ৪২৩, ৪৩১
প্রসাদ, ব্রজকিশোর ৪১৭, ৪২০, ৪২১, ৪২২, ৪২৩, ৪২৮, ৪২৯, ৪৩১
প্রসাদ, ড. রাজেন্দ্র (রাজেন্দ্রবাবু) ৪১৮, ৪২০, ৪২৯, ৪৩১
'প্রার্থনা সমাজ' ২৫০
প্রিটোরিয়া ১১২, ১১৫, ১১৬, ১১৭, ১১৯, ১২২, ১২৩, ১২৪, ১২৫, ১৩২, ১৩৪, ১৩৬, ১৩৮, ১৪৫, ১৬৬, ১৭৪, ২২১, ২৬৩, ২৬৫, ২৭০
প্র্যাট, মি. ৪৭৮
প্রীমথ ব্রিদ্রেন ।০, ১৩১, ১৭৪

ফড়কে ('মামা') ৩৯৩
ফিনিক্স ২১৬, ৩১০, ৩১২-২০, ৩২৪, ৩২৮, ৩৩৫, ৩৩৬, ৩৫৩, ৩৫৪
ফিনিক্স পার্টি ৩৮৫-৮৬, ৩৯৩-৯৫, ৪০১, ৪০৪

'বঙ্গবাসী' ১৮৯
বঙ্গ-ভঙ্গ ৫০২
বর্ধমান ৩৯৫, ৩৯৬
বসু, ভূপেন্দ্রনাথ ২০৩, ৩৯৯, ৪১৭
বসুমতী, শ্রীমতী ৫০০
বাইবেল ৭৪, ১২৯, ১৩১, ২৪৩, ২৭২
বাটলার ১২৯
বাপুনী, ফুলচন্দ ৪৬২
বারডোলী সত্যাগ্রহ ৪৫১
বার্নস, জন ৮০
বারী, মৌলানা আবদুল ৪৮৮, ৫০৪
বালাসুন্দরম ১৬০-৬২, ১৮৭
বিজয়রাঘবাচার্য ৪৭০, ৫০৬, ৫০৮
বিজাপুর ৪৯৯, ৫০০, ৫০১
বিন্দ্যাবাবু ৪৩১
বিবেকানন্দ, স্বামী ২৪৫, ২৭২
বীনস, সার হেনরী ১৬৪
বীরমগাম (বঢ়বান) ৩৮৯-৯২, ৪৭৮
বুদ্ধ, গৌতম ১৬৭, ১৬৮, ২৪৪

বুদ্ধচরিত ৭৩, ৭৪
বুলর, জেনারেল ২২৩, ২২৪
বুথ, ডা. ১৮০, ২১০, ২২২, ২২৩
বেকর, এ. ডব্লু. (এটর্নী) ১২৬, ১২৭, ১২৮, ১৪১, ১৪২
বেকার, কর্নেল ৩৫৯
বেচরজী স্বামী ৪৩
বেত্তিয়া ৪২৩, ৪৩৮
বেন্থাম ৫১
বেরাবল ২৫৩-৫৪
বেল ৫৬
বেসাণ্ট, মিসিস আনি ৭৩, ৭৫, ২৪৭, ২৫২, ৩৭২, ৪৫১, ৪৫৮, ৫০৬
বৈদ্যনাথ ধাম ৪০৭
বৈষ্ণব ২৫, ৩৪, ৩৬, ৪০৫
বোঅর যুদ্ধ ২১০, ২১৪, ২২২-২৪, ২৪৬, ২৯০, ৩৬০
বোম্বাই ১৮, ৩৯, ৪০, ৪৪, ৪৬, ৫৫, ৮৯, ৯৩, ৯৬, ৯৮, ৯৯, ১০২, ১০৩, ১০৯, ১৫২, ১৬৯, ১৭৫, ১৭৬, ১৭৭, ১৮০, ১৮২, ১৮৫, ২৪৭, ২৫২-৫৮, ৩৮৬, ৩৮৭, ৩৮৯, ৪১৩, ৪১৪,৪২৯, ৪৬৮, ৪৭০, ৪৭১, ৪৭২, ৪৭৪,৪৮২,৫০০,৫০১
বোম্বাই কংগ্রেস ৪১৯
বোরিঙ্গ, মি. ৪৭৪, ৪৭৬, ৪৭৭
ব্যাঙ্কানের ৭
ব্যাঙ্কার, শঙ্করলাল ৪৪০, ৪৪৬, ৪৬৫, ৪৬৭-৬৮, ৪৭১, ৪৮২, ৪৮৩, ৫০০
ব্যানার্জি, রেভারেণ্ড কালীচরণ ২৪২-৪৬
ব্যানার্জি, সার গুরুদাস ২৪৩, ৪০৮
ব্যানার্জি, সার সুরেন্দ্রনাথ ১৮৮, ১৮৯, ২৩৫
ব্রহ্মচর্য ২১২-১৯
ব্রাইটন ৭০, ৭১
ব্রাহ্ম সমাজ ২৪৫, ৪৬৪
ব্রিস্টল ১৪২
ব্রুম ৮৬
ব্রুম, সার চার্লস ২৩০
ব্রেডল' ৭৫
ব্রেলভি, মি. ৪৮২
ব্লেবেট্স্কী ৭৩, ৭৪

ভগবদ্গীতা ৭৩, ৭৪, ১৮৫, ২১৯, ২৪৩, ২৭২-৭৪, ২৭৭, ৩৪৩, ৪৬৪
ভরোচ শিক্ষা-সম্মেলন ৪৯৯
ভাগবত ৩৭
ভাণ্ডারকর, ড. ১৮৬, ১৮৭
ভাবনগর ৪০
ভালক্রাষ্ট ২২৩
ভীতিহরবা ৪৩৫
ভেণ্টনর ৬৬, ৬৯, ৭০

মজমুদার, ত্র্যম্বকরায় ৪৬, ৪৭, ৪৮, ৪৯, ৬১
মজুমদার, রেভারেণ্ড প্রতাপচন্দ্র ২৪৫
মথুরা ৪৩৭, ৪৭৪
মদনজীত ২৯৪, ৩০০, ৩০১, ৩০৮
মদীরা ৩৫৭
মনুস্মৃতি ৩৮, ৩৯, ৩৩৬
মণ্টেগু, মি. ৪৯২
মমীবাই ১০০
মরিশস ২৩০
মরিৎস্বর্গ ১১৮
মলকানী, প্রফেসর ৪১৯, ৪২০
মল্লিক, ডা. ২৪৬
মাণ্ডলিক ২৪১
মাথেরান ৪৬৫
মানচেস্টার ২৭৭
মানিকলাল ৩০০-০১
মারে, মি. ১৪২
মালব্য, মদনমোহন ৩৭, ২৩৯, ৪১২, ৪১৩, ৪২৭, ৪২৮, ৪৮৫, ৪৮৬, ৪৯২, ৪৯৩, ৪৯৪, ৪৯৫, ৫০৬

মালাবার ১১১

মাদ্রাজ ১৬২, ১৮৫, ১৮৭, ১৮৮, ৪৬৯

'মাদ্রাজ স্ট্যাণ্ডার্ড' ১৮৭

মাল্টা ৪৯

মিত্র, জাস্টিস সারদাচরণ ২৪৩

মীরাবাই ২২৭

মুক্তানন্দ ৯৪

মুখুজ্যে, রাজা সার প্যারীমোহন ১৮৮, ২৪৩

মুজফ্‌ফরপুর ৪১৯

মুন্শীরাম, মহাত্মা ৪০০, ৪০৩

মুসলিম লীগ ৪১৯, ৪৫২

মুল, মি. আর্থার ১৪৯

মুলর ১৪২

মেইন ৮৬, ১০০

মেকিনটায়র ৩১৬

মেকী, সার জন ৪১৩

মেকেঞ্জি, জেনারেল ৩২৫, ৩২৬

মেটলণ্ড, এডওয়ার্ড ১৪৪

মেফী, মি. ৪৫৪

মেলেসন ৮৮, ৮৯

মেসন, মি. ১৬৪

মেহতা, ডা. জীবরাজ ৩৫৬-৫৭, ৩৬৬, ৩৬৭, ৩৭০, ৩৭১

মেহতা, ডা. প্রাণজীবন ৪৮, ৪৯, ৫০, ৫২, ৯৩, ২৭৭, ৩৫৭, ৩৯৯, ৪০০, ৪২৯

মেহতা, সার ফিরোজ শা ৮৮, ৮৯, ৯৯, ১০০, ১০৫, ১৮১-৮৩ ১৮৬, ২০৩, ২৩০, ২৩১, ২৩৫, ২৩৬, ৩৮৬

মেহতা, রেবাশঙ্কর জগজীবন ৯৪

মোগলসরাই ৩৯৬, ৩৯৭

মোজাম্বিক ১১১

মোতিহারী ৪২৩, ৪২৯

মোতীলাল দরজী ৩৮৯-৯০

মোম্বাসা ১১০

মোরভী, স্বামী দয়ানন্দ ২৪৭

মোহানী, মৌলানা হসরত ৪৮৮, ৪৮৯, ৪৯০

ম্যানিঙ্গ, কার্ডিনল ৮০-৮১

যাজ্ঞিক, ইন্দুলাল ৪৪৬, ৪৮৩

যেরবডা জেল ১৭৩

রঙ্গস্বামী, পডিয়াচী ১৪৮

রবার্টস্‌, মি. ৩৬৫, ৩৭০

রবার্টস্‌, লর্ড ২২৪

রবার্টস্‌, লেডী সিসিলিয়া ৩৬৯

রবার্টস্‌, লেফটন্যাণ্ট ২২৪

রবিনসন, ক্রুশো ২৯৭

রবিন্সন, সার জন ১৪৯

রবিশঙ্কর ৯৯

রমনভাই ৪৭৮

রহমান, ডাক্তার অবদুর ৪৫২

রাউলট অ্যাক্ট ২৮১, ৪৬৫-৬৮

রাজকোট ৭, ৮, ১৩, ১৮, ২৩, ২৪, ৩৪, ৩৬, ৩৭, ৪৩, ৪৪, ৯৬, ৯৮, ১০২, ১০৫, ১০৯, ১৭৬, ১৭৭, ১৭৯, ১৮০, ২৪৮, ২৫২, ২৫৪, ৩৯০, ৩৯২

রাজাগোপালাচারী, চক্রবর্তী ৪৬৯, ৪৭০

রাজেন্দ্রবাবু (ড. রাজেন্দ্রপ্রসাদ) ৪১৮, ৪২০, ৪২৯, ৪৩১

রানাডে, মহাদেব গোবিন্দ ১৮১, ২২০, ২৪১

রামজী ৫০১

রামদেব ৪০৪

রামনবমীবাবু ৪২০, ৪৩১

রামায়ণ ৩৬, ৩৭, ৩৫৫

রায়, সার প্রফুল্লচন্দ্র ২৪০, ২৪৬, ২৪৭

রায়চন্দ ভাই ৯৩-৯৬, ১৪৪, ২১৩, ৩৩৯

রাস্কিন, জন ৯৬, ৩০৮-০৯, ৩১৮, ৩২০

রিচমণ্ড ৫২

রিপন, লর্ড ১৪৯

রীচ, মি. ২৭০, ২৭১, ২৯৩, ৩০১, ৩১৬

রীড, ডা. (সার) ৪১৩, ৪১৪
রুদ্র, সুশীল ৩৮৭, ৪৫২, ৪৫৫
রেঙ্গুন ২৪৭, ৩৯৯, ৪০০, ৪০৩
রেবাশঙ্কর জগজীবন ২৫৮, ২৭৪

লক্ষ্মণঝোলা ৪০৩-০৭
লক্ষ্মীদাস ৫০১
লক্ষৌ ৪১৭, ৪২০
লক্ষৌ কংগ্রেস ৪১৭
লছীরাম, সী. ১৪৮
লণ্ডন ৪৮, ৪৯, ৭০, ১৬৯, ৩৩৯, ৩৫৫,৩৫৭-৭০, ৩৮৭
লয়েড জর্জ ৪৫৩
লাইসিয়ম ক্লাব ৩৫৯
লাউথ ৩০৪
লালা লাজপতরায় ৫০৫, ৫০৬, ৫০৭, ৫০৯
লাহোর ৪১৫, ৪৭১ ৪৮৫
লাঠা মহারাজ ৩৬-৩৭
লামু ১০৯, ১১০
লিংকনশায়ার ৩০৪
লেডীস্মিথ ২২৩
লেনর্ড, মি. ১৩৯, ১৪০
লেভেটর ৮৮, ৮৯
লেলী, সার ফ্রেডারিক ৪২, ৪৩, ৫৮
লেস্টার ৩২০
ল্যাটন, মি. ১৯৬, ১৯৯, ২০০, ২০২, ২০৩, ২২১

শম্ভুবাবু ৪৩১
শর্মা, হরিহর ('আন্না') ৩৯৩
শরৎবাবু ৩৯৩
শান্তিনিকেতন ৩৮৫, ৩৮৬, ৩৮৮, ৩৯২-৯৫, ৪০১
শামল ভট ৭৪
শামলদাস কলেজ ৪০
শামলদাস, লল্লুভাই ৪১৩, ৪১৪
শাস্ত্রী, চিন্তামন ৩৯৩
শাস্ত্রী, পণ্ডিত শিবনাথ ২৪৫
শাস্ত্রী, দি রাইট অনারেবল শ্রীনিবাস ২৯৬, ৩৯৮, ৪৬৮, ৪৬৯
শিবজী ৫০১
শীতলবাদ, সার চীমনলাল ২৩০, ২৩১
শুক্ল, দলপতরাম ৪৮, ৬২
শুক্ল, রাজকুমার ৪১৬-২০, ৪২৩, ৪২৫
শেক্সপিয়র ৮৯
শেমলপেনিক ৮৮, ৮৯
শেঠ, আদমজী মিয়াখান ১১৫, ১৪৮, ১৫০, ১৭২-৭৩, ২০৫, ২২৭, ৩৪০
শেঠ, আবদুল গনী ১২২, ১২৩, ১২৪
শেঠ, আবদুল্লা ১০৭, ১১২-২২, ১২৪, ১২৬, ১২৭, ১২৮, ১৩২, ১৩৮, ১৪০, ১৪১,১৪৪-৫০, ১৫২, ১৫৩, ১৫৪, ১৫৫, ১৫৬, ১৯০, ১৯৬, ২৯৯
শেঠ, আবদুল্লা হাজী আদম ১৪৮, ১৯৬
শেঠ, ঈশা ১২১, ১২২
শেঠ, তৈয়ব হাজী খাঁ মহম্মদ ২৬৬-৬৮
শেঠ, দাউদ মহম্মদ ১৪৮, ১৫০
শেঠ, হাজী মহম্মদ হাজী জুসভ ১৩২, ১৪৮
শ্রদ্ধানন্দ স্বামী ৩৮৭, ৪০৭, ৪৭১, ৪৭৪, ৪৮৫, ৪৮৭-৮৮, ৪৯১, ৫০৯
শ্রাবক ২৫
শ্লেশিন, মিস ২৯২-৯৩

সওরাই মাধুপুর ৪৭৪
সত্যপাল, ডাক্তার ৪৭১, ৪৮৪
'সত্যাগ্রহ' ৩২৯-৩০, ৩৯২
সত্যাগ্রহ আশ্রম (সবরমতী) ৪০৭-১২, ৪১৭, ৪৪০-৪২. ৪৪৩, ৪৬৩, ৪৯৭, ৫০০, ৫০১
সন্তোষবাবু (সন্তোষচন্দ্র মজুমদার) ৩৯৩
সবরমতী ৪৬২

'সবুজপত্র' ১৭৬, ১৮৭
সরভেণ্ট অব ইণ্ডিয়া সোসাইটী ৩৮৭-৮৮,৩৯৭-৯৯, ৪০০, ৪৩৩
'সর্বোদয়' ৩০৯, ৪৭২-৭৩
সণ্ট ৫৩
সাউথেম্পটন ৪৮, ৩৫৭
সারাভাই, অম্বালাল ৪৩৯, ৪৪৪, ৪৬৩
সারাভাই, শ্রীমতী সরলা ৪৪৪, ৪৬৩
সাহারানপুর ৪০১
সিমলা ৪৫৫
সিং, প্রিন্স রণজিত ৪৮
সিংহ, জয়রাম ২৯৮, ২৯৯
সিংহ, লর্ড সতেন্দ্রপ্রসন্ন ৪৯২
সুব্রহ্মণ্যম, জি. ১৮৭
সুরদাস ৫
সুরাট ৪৭৪
সুরেন্দ্রনাথ ৪৩৩
সেন, আই. বি. ৪৯৬
সেন, কেশবচন্দ্র ২৪৫
সেল ১৪৪
সোবানী, ওমর ৪৬৭, ৪৭৫, ৪৮২, ৪৮৩, ৪৯৯, ৫০২
সোমন, বাবাসাহেব ৪৩২, ৪৩৫-৩৬
'স্টেট্সম্যান' ১৯৯
স্টেওারটন ১১৯, ১২০, ১২১, ১২২
স্নেল ৮৬, ৮৯, ২৭৩
স্পার্কস, কর্নেল ৩২৫, ৩২৬
স্পিয়াংকোপ ২২৩
স্বামী আনন্দ ১, ২৮৯
স্মাটস-গান্ধী চুক্তি ৪১২
স্যাণ্ডার্স, মি. ১৮৯, ১৯০, ২৪৬
স্লাই, সার ফ্রাঙ্ক ৪৩৭

হক, মৌলানা মজরুল ৪১৯, ৪৩২
হবহাউস, মিস এমিলি ৩৬৩
হরকিশনলাল, লালা ৪৯৩
হরদ্বার ৪০০-০৭
হর্নিম্যান, মি. ৪৬৭, ৪৮২
হাওয়ার্ড, মি. ৬৬
হাণ্টার কমিটী ৪৮৫, ৪৮৬
হাণ্টার, সার ডব্লু. ডব্লু. ৪১৬
হাভেলি ৮, ২৫, ৩৬, ৩৭, ১৭৮, ৩৪২
হায়দরাবাদ ৪১৯
হার্ডিং, লর্ড ২৩৯, ৩৭০, ৪১২
'হিন্দ্ স্বরাজ' ৪৭২-৭৩, ৪৯৭
'হিন্দু' ১৮৭
হিলস, মি. ৬৫
হীরাচাঁদ, পুঞ্জাভাই ৪৪১
হৃষীকেশ ৪০৪, ৪০৬
হেকক, মি. ৪২৭
হেমচন্দ্র, নারায়ণ ৭৮-৮২
হেরিস, মিস ১২৮
'হোমরুল' ৪৫১, ৪৬১
হোয়াইট ৮৬